পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন
ও
তৎকালীন রাজনীতি

(প্রথম খণ্ড)

বদরুদ্দীন উমর
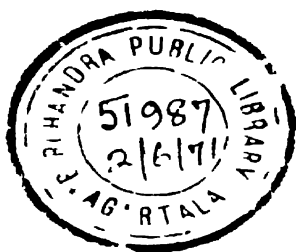
আনন্দধারা প্রকাশন

প্রকাশক
মনোরঞ্জন মজুমদার
আনন্দধারা প্রকাশন
৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
সুধীর পাল
সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১৪/১এ, রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ
খালেদ চৌধুরী

॥ পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন সহ
অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সত্যিকার
নায়ক পূর্ব বাঙলার
সংগ্রামী জনগণের উদ্দেশ্যে ॥

ভূমিকা

পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলনের কতকগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনা এই আন্দোলনের ঐতিহাসিক মূল এবং তাৎপর্যকে কখনোই সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারে না। এই তাৎপর্য বিচার পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাস ও তার শ্রেণী চরিত্র; পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তী পর্যায়ে শ্রেণীসমূহের বিকাশ, বিন্যাস ও দ্বন্দ্ব; সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নীতি ও কর্মসূচীর মধ্যে তার অভিব্যক্তি—এ সমস্তকে বাদ দিয়ে কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। অন্য কথায় আমাদের দেশের সামগ্রিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলনকে বাদ দিয়ে যেমন অসম্পূর্ণ থাকে ঠিক তেমনি ভাষা আন্দোলনের পর্যালোচনাও সেই পরিস্থিতিকে বাদ দিয়ে হয়ে দাঁড়ায় তাৎপর্যহীন এবং অন্তঃসারশূন্য। বস্তুতঃপক্ষে পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন তৎকালীন রাজনীতির সাথে একই গ্রন্থিতে অবিচ্ছিন্নভাবে গ্রথিত এবং সেই অনুসারে পরস্পরের সাথে নিবিড় ও গভীরভাবে একাত্ম।

প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রাম হিসেবে ভাষা আন্দোলনের মুখ্যতঃ দুটি পর্যায়—১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারি-মার্চ এবং ১৯৫২ এর জানুয়ারি-মার্চ। এই দুই পর্যায়ের আন্দোলনের মধ্যে সচেতনতা, ব্যাপকতা, সাংগঠনিক তৎপরতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে তারতম্য এতবেশী যে প্রথম দৃষ্টিতে এই তারতম্যকে মনে হয় গুণগত। ১৯৪৮ এবং ১৯৫২-র মধ্যেকার এই তফাতকে বুঝতে হলে মধ্যবর্তী চার বছরের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির খতিয়ান ব্যতীত তা কিছুতেই সম্ভব নয়।

পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত, সাংস্কৃতিক আন্দোলনরূপে তার প্রাথমিক বিকাশ এবং রাজনৈতিক সংগ্রামের উন্নততর পর্যায়ে তার উত্তরণের বর্ণনা এ বইয়ের প্রথম খণ্ডে সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্বাভাবিক-ভাবেই মুসলিম লীগ এবং কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা অনুসৃত নীতি ও তাদের আভ্যন্তরীণ সংকট সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন অপরিহার্য। কারণ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই দুই রাজনৈতিক পার্টি ব্যতীত পূর্ব বাঙলায় প্রকৃতপক্ষে অন্য কোনো রাজনৈতিক সংগঠনই ছিলো না। এবং এই দুই পার্টির শ্রেণী চরিত্র, তাদের অনুসৃত তাত্ত্বিক ও সাংগঠনিক লাইন, তাদের

কর্মসূচী ও ভুল-ভ্রান্তি এবং সেই কর্মসূচী ও ভুল-ভ্রান্তি উদ্ভূত পরিস্থিতিই পূর্ব বাঙলার রাজনীতিকে নোতুন এক গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর স্থাপন করে। এগুলিকে কেন্দ্র করেই এক প্রান্তে মুসলিম লীগ এবং অন্যপ্রান্তে কমিউনিস্ট পার্টিকে রেখে পূর্ব বাংলায় গড়ে ওঠে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও শ্রেণী সংগঠন। এই সমস্ত দল ও সংগঠন সম্পর্কে, তাদের উত্থানের পটভূমি এবং অনুসৃত নীতি ও কার্যকলাপ সম্পর্কে, মোটামুটি একটা আলোচনা ব্যতীত ভাষা আন্দোলনের রাজনৈতিক চরিত্রের উপলব্ধি ও বর্ণনা সম্ভব নয়। এই বর্ণনাকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্যে দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে একটা সামগ্রিক পর্যালোচনা সংযোজিত হবে।

বইটিতে আমি কাগুজে তথ্য এবং মৌখিক আলাপ ও সাক্ষাৎকার এ দুইয়ের ভিত্তিতেই বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা দিয়েছি। কাগুজে তথ্য অর্থাৎ খবরের কাগজ, অন্যান্য সাময়িকী, পার্টিসমূহের দলিলপত্র, ইস্তাহার, পুস্তিকা ইত্যাদি সংগ্রহ করার জন্যে আমি বস্তুতঃপক্ষে ১৯৬৩ সাল থেকেই চেষ্টা করে আসছি। এ ব্যাপারে যখন যে সূত্রে কোনো তথ্য সম্বলিত কাগজ পাওয়া সম্ভব সেখানেই আমি ব্যক্তিগতভাবে অথবা অন্যের মাধ্যমে যোগাযোগ করেছি। অনেক ক্ষেত্রেই নিরাশ হতে হয়েছে। কারণ যাঁদের কাছে কাগজপত্র থাকার কথা তাঁরা সেগুলির গুরুত্ব উপলব্ধির অভাব থেকেই হোক বা অন্য কোনো ব্যবস্থা করতে সক্ষম না হওয়ার ফলেই হোক এমনভাবে সেগুলি রেখেছিলেন যাতে করে ১৯৫২ সালে এবং পরবর্তী ১৯৫৮ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের সময় সেগুলির প্রায় সমস্তই নষ্ট হয়ে যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুলিশ বাড়ি তল্লাশ করে সেগুলি নিয়ে যায়। কোনো ক্ষেত্রে কাগজের মালিক নিজেই পুলিশের ভয়ে সেগুলি পুড়িয়ে ফেলেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার তাঁরা যাঁদের কাছে সেগুলি গোপনে সংরক্ষণের জন্যে জমা রেখেছিলেন তাঁরাই পুলিশী আক্রমণ ও তল্লাশীর সম্ভাবনা কল্পনা করে সেগুলি অনাবশ্যকভাবে পুড়িয়ে দিয়ে নিজেদের কাপুরুষতা ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেন। আমি যত জনকে তথ্যমূলক কাগজপত্র ইস্তাহার ইত্যাদির কথা জিজ্ঞেস করেছি তাঁদের অধিকাংশই এই শেষোক্ত কাহিনীই আমার কাছে বিবৃত করেছেন।

যাই হোক এ সত্ত্বেও আমি কয়েক বৎসরের একটানা খোঁজাখুঁজির ফলে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি। এ ব্যাপারে আমার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। দলমত নির্বিশেষে তাঁরা প্রত্যেকেই পূর্ব বাঙলার একটা অধ্যায়ের যথাসম্ভব তথ্যপূর্ণ ইতিহাস রচনার খাতিরে আমার সাথে সহযোগিতা করেছেন। এই

সহযোগিতা আমি যে অসংখ্য রাজনৈতিক নেতা, কর্মী, বন্ধুবান্ধব এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের থেকে পেয়েছি তার পূর্ণ তালিকা দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। তবে এঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ না করলে এ বইয়ের ভূমিকা নিতান্তই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

জনাব তাজউদ্দীন আহমদের নাম এ ব্যাপারে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। তিনি বহু ইস্তাহার ও রাজনৈতিক প্রচার পুস্তিকা এবং নিজের ব্যক্তিগত ডায়েরি দেখার সুযোগ আমাকে দিয়েছেন। তাঁর ডায়েরিতে প্রতিটি দিনের একটি হিসাব আছে এবং সেটা থেকে বহু সভা-সমিতি ও ঘটনার সময় এবং তারিখ নির্ধারণ আমার পক্ষে সহজ হয়েছে। ছোট ছোট অনেক ঘরোয়া সভার বিবরণ এবং অংশ গ্রহণকারীদের নামধামও তাঁর ডায়েরি থেকেই আমি পেয়েছি। এদিক দিয়ে ডায়েরিটির গুরুত্ব অপরিসীম। জনাব মাহমুদ আলী তাঁর সাপ্তাহিক পত্রিকা 'নওবেলাল'-এর ফাইল আমাকে বিনা দ্বিধায় দেখতে দিয়েছেন। এই পত্রিকাটি ১৯৪৮-এর জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয় এবং পূর্ব বাঙলার তৎকালীন পত্র-পত্রিকার মধ্যে রাজনীতিগতভাবে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 'নওবেলাল' দেখার সুযোগ না পেলে তৎকালীন রাজনীতিতে বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির বিবরণ সংগ্রহ করা আরও কঠিন ব্যাপাপ হতো। নানা রকম দুর্বলতা সত্ত্বেও এ পত্রিকাটি সেদিক দিয়ে খুবই উল্লেখযোগ্য।

'নওবেলাল' প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পর তমদ্দুন মজলিশের মুখপত্র হিসেবে সাপ্তাহিক 'সৈনিক' আত্মপ্রকাশ করে। ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে এ পত্রিকাটির ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। তবে তমদ্দুন মজলিশের সংকীর্ণ সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে এর গুরুত্ব অনেকাংশে খর্ব হয়েছে। ভাষা আন্দোলনকে তমদ্দুন মজলিশের আন্দোলন হিসাবে চিত্রিত করতে গিয়েই পত্রিকাটি আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। এ পত্রিকাটি দেখার ব্যাপারে অধ্যাপক শাহেদ আলী, জনাব এমদাদ আলী এবং বাংলা একাডেমীর গ্রন্থাগারিক জনাব শামসুল হক আমাকে সাহায্য করেছেন। কলকাতার পত্র-পত্রিকাগুলি থেকে আমার নির্দেশিত প্রাসঙ্গিক অংশগুলি কপি করে পাঠিয়েছেন জনাব সৈয়দ হোসেন রেজা। তাঁর এই অমূল্য সহযোগিতা না পেলে যে কি অসুবিধা হতো এ বইয়ের পাঠকমাত্রেই তা উপলব্ধি করবেন। দৈনিক আজাদ থেকে বিশেষ বিশেষ অংশ কপি করার ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবদুল কাদের ভুঁইয়া এবং স্নেহভাজন সাইফুল ইসলাম। ১৯৫২ সালের 'ইত্তেফাক'

থেকে নির্দেশিত অংশসমূহ কপি করার ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করেছেন সিলেট মুসলিম সাহিত্য সংসদের গ্রন্থাগারিক জনাব নূরুল হক চৌধুরী এবং অধ্যাপক শামসুল আলম। দৈনিক মর্নিং নিউজ-এর সম্পাদক জনাব সৈয়দ বদরুদ্দীন 'মর্নিং নিউজ'-এর ফাইল ব্যবহারের ব্যবস্থা করে দেন। এঁদের প্রত্যেকের কাছেই এই সব সহযোগিতার জন্যে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

পত্র-পত্রিকা ছাড়া অন্যান্য তথ্যমূলক কাগজপত্র যাঁদের থেকে পেয়েছি তাঁদের মধ্যে জনাব আবদুর রশিদ খান, জনাব কমরুদ্দীন আহমদ, জনাব আতাউর রহমান (রাজশাহী), জনাব অলি আহাদ, জনাব শহীদুল্লাহ কায়সার, জনাব শফিউদ্দীন আহমদ, জনাব শামসুদ্দীন আহমদ, জনাব মাহবুব জামাল জাহেদী, ডক্টর রশিদুজ্জামান প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে তোলা একটি ছবি প্রকাশের অনুমতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দিয়েছেন জনাব আমানুল হক (এ ছবি দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হবে)। এঁদের সকলের কাছেই এই অমূল্য সহযোগিতার জন্যে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

যাঁদের সাথে এই বই লেখার ব্যাপারে আমার সাক্ষাৎ আলাপ হয়েছে তাঁদের নামের একটা তালিকা শেষের দিকে দেওয়া হলো। অনেকে ব্যক্তিগত কারণে নাম উল্লেখ না করার অনুরোধ জানানোর ফলে তাঁদের নাম এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হলো না। কাজেই সেদিক দিয়ে তালিকাটি অসম্পূর্ণ।

মৌখিক আলাপ ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক সতর্কতা আমাকে অবলম্বন করতে হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে অতিশয়োক্তি, নিজের ভূমিকাকে অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা, অন্যের ভূমিকাকে ছোট করার চেষ্টা এবং সর্বোপরি অনিচ্ছাকৃতভাবে অথবা দুর্বল স্মৃতির জন্যে অনেক ভুল ঘটনা বিবৃতিকে নানাভাবে যাচাই করে গ্রহণ ও প্রয়োজনে বাতিল করতে হয়েছে। কিন্তু আমার এই চেষ্টা সত্ত্বেও এর মধ্যে ভুল ত্রুটি অনেক ক্ষেত্রে থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। যাঁরা এ ব্যাপারে উপযুক্তভাবে ওয়াকেবহাল তাঁরা এ ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলে আমি বাধিত হবো।

ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে যে নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক কর্মীরা এই আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন তাঁদের প্রত্যেকের ভূমিকা ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিলো না। কারও গুরুত্ব প্রথম দিকে এবং কারও গুরুত্ব শেষের দিকে বেশী ছিলো। কারও গুরুত্ব সব পর্যায়েই মোটামুটি উল্লেখযোগ্য হলেও বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে সেখানেও তারতম্য ছিলো। কাজেই ভাষা আন্দোলনে ব্যক্তি বিশেষের সামগ্রিক ভূমিকাকে বুঝতে গেলে ১৯৪৭

থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত পুরো সময়ের ইতিহাস আলোচনা ব্যতীত সেটা সম্ভব নয়।

ভাষা আন্দোলনের মৌলিক স্বতঃস্ফূর্ততা সত্ত্বেও ব্যক্তিগতভাবে তাতে যাঁরা কিছুটা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা অবশ্য পুরাতন আমলের নেতৃবৃন্দ নন। এই নেতৃত্ব যাঁরা দেন তাঁরা অল্পবয়স্ক এবং মোটামুটিভাবে এক নোতুন রাজনৈতিক চেতনারই প্রতিনিধি। কিন্তু এঁদের মধ্যেও কোনো একজন বা একাধিক ব্যক্তিকে আন্দোলনের নায়ক হিসেবে নির্দেশ অথবা চিহ্নিত করা চলে না। এ আন্দোলনের প্রকৃত নায়ক পূর্ব বাঙলার সংগ্রামী জনগণ।

বইটির শেষে যে নির্ঘণ্ট সংযোজিত হলো সেটি তৈরী করার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছেন স্নেহভাজন সিরাজুল হক কুতুব, পিনাকী দাস, সালাহুদ্দীন আবুল আসাদ এবং জনাব আবদুর রশিদ খান।

তথ্যনির্দেশের উদ্দেশ্যে অনেক ক্ষেত্রে প্যারার শেষে ক্রমিক নম্বর দেওয়া আছে। এসব ক্ষেত্রে পুরো প্যারার তথ্যই একই সূত্র থেকে প্রাপ্ত বলে ধরে নিতে হবে।

বইটি লেখার কাজ আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালে শুরু করলেও সে বিখ্যাত বিদ্যাপীঠে বিভিন্ন অসুবিধার জন্যে কাজ প্রকৃতপক্ষে কিছুই অগ্রসর হয়নি। এ লেখার কাজ আমি নোতুনভাবে শুরু করি ১৯' সালের এপ্রিল মাস থেকে। অন্যান্য নানা কাজে ব্যাপৃত থাকলেও বইটির কাজও তার সাথে অগ্রসর হতে থাকে এবং ছাপাও সেইভাবে চলে। এজন্যে সব সময়ে প্রথম খসড়াই পর্যায়ক্রমে লেখার সাথে সাথে প্রেসে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। মধ্যে ছাপাখানার গণ্ডগোল ও হরেক রকম অসুবিধার জন্যে ছাপার কাজ বন্ধ থাকে এবং লেখাও সেই অনুসারে প্রায়ই স্থগিত থাকে। এইভাবে এক অসুবিধাজনক পরিস্থিতির মধ্যে প্রথম ছাপার কাজ শেষ করতে হয়।

স্নেহভাজন আবু নাহিদ এবং আহমেদ আতিকুল মাওলা বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নেওয়ায় এবং শেষ পর্যন্ত এটিকে ছেপে বের করার জন্যে তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বদরুদ্দীন উমর

সূচী

পূর্ব্ব-পাকিস্তান কর্ম্মী সম্মেলন !

স্থান—ঢাকা

তারিখ—২০ শে ২১ শে ভাদ্র।

(৬ই ও ৭ই সেপ্টেম্বর) শনিবার ও রবিবার।

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের দীর্ঘ দিনের সংগ্রাম সফল হইয়াছে। যে নবজাত পাকিস্তান রাষ্ট্র কর্মী ও দুর্গতির দীর্ঘ দিনের ত্যাগ, সাধনা ও সংগ্রামের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাকে জনগণের আদর্শ রাষ্ট্ররূপে গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব আমাদেরই। যদি আমরা পাকিস্তান রাষ্ট্রকে আদর্শ রাষ্ট্র হিসাবে গঠন করিতে না পারি, তবে আমাদের সমস্ত ত্যাগ ও আন্দোলন বৃথা হইয়া যাইবে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের অগণিত জনসাধারণের প্রতি আমাদের কর্তব্য সম্পূর্ণ হইবে না। তাই এই রাষ্ট্র অর্জন করিবার দায়িত্ব যেমন আমাদের ছিল, তেমনই এই রাষ্ট্রকে গঠন করিবার দায়িত্বও আমাদিগকেই লইতে হইবে।

পূর্ব-পাকিস্তান রাষ্ট্রকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষের রাষ্ট্ররূপে গঠন করিবার কার্য্যসূচী এবং কর্ম পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া তাহা পাকিস্তান গণপরিষদ ও পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের সম্মুখে পেশ করিবার উদ্দেশ্যে আগামী ৬ই ও ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে ঢাকায় পূর্ব-পাকিস্তান কর্মী সম্মেলন আহুত হইয়াছে। সমস্ত মুসলীম লীগ কর্মী যাহারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করিয়াছেন তাহাদিগকে এবং যে সমস্ত হিন্দু কর্মী বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তান রাষ্ট্রকে সুষ্ঠু ও সুন্দররূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য সর্বতোভাবে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত তাহাদিগকেও এই সম্মেলনে যোগ দিয়া পূর্ব-পাকিস্তানকে একটি আদর্শ জনগণের রাষ্ট্রে পরিণত করিবার কাজে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

পূর্ব্ব পাকিস্তান কর্ম্মী-সম্মেলন।

অফিস—১৫০ মোগলটুলী, ঢাকা।

প্রতিনিধি-সম্মেলন—

তারিখ—৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ ইং।

সময়—সকাল ও বিকাল বেলা।

প্রকাশ্য অধিবেশন—

স্থান—সিরাজ উদ্দৌলা পার্ক।

তারিখ—৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ ইং।

সময়—বৈকাল ২ ঘটিকা।

উদ্দেশ্য :—পূর্ব্ব পাকিস্তানকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক, আদর্শ ও জনকল্যানকর রাষ্ট্রে পরিণত করিবার জন্য গঠনমূলক স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কার্য্যসূচী ও কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করিয়া তাহা পাকিস্তান গণপরিষদ ও পূর্ব্ব পাকিস্তান সরকারের নিকট পেশ করা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডেলিগেট ফি ১৲ টাকা।

অভ্যর্থনা সমিতি ফি ৫৲ টাকা।

ফি গ্রহণ করিবার শেষ তারিখ ৫ই সেপ্টেম্বর।

হেড অফিস :—মুসলিম লীগ অফিস, ঢাকা।

নিবেদক—

শামছুল হক।

সম্পাদক,

পূর্ব্ব পাকিস্তান কর্ম্মী সম্মেলন

দি এলাইড প্রিন্টিং ওয়ার্কস (তাজমহল টকিজ সংলগ্ন), চৌধুরী বাজার, ঢাকা

পূর্ব্ব পাকিস্তান কর্ম্মী সম্মেলনের ইস্তাহার ও কর্ম্মসূচী নির্দেশক ইস্তাহার, ১৯৪৯ [পৃষ্ঠা : ২২]

The Committee of Action in the Engineering ground first before Demonstration we had to declare strike on 16th March for educational Institutions.
Back to Mess at about 12 pm.

// Weather: Rain from early morning — it stopped at about 12 noon — Clear afterwards.

16.3.48 — Rise 7 Am. — Study no.
— To F.H. Hall at 9 Am. — Some amendments were taken about the terms made yesterday with the Premier in the Committee meeting.
At 1-30 pm. meeting began in the University premises — Mujibur Rahman presided — amendments were adopted and sent to the Premier by Wali Ahad — Though there was no programme made by Committee of Action a demonstration went to the Assembly House — they stayed there upto evening Cornering The Govt. Party M.L.As. — inspite of request students did not disperse — we the members of the Committee of Action met in a room in the ASE Main Hostel — remained there upto 5 pm. when we heard of the attempts of the students to catch their M.L.As — at this many M.L.As of Govt. Party could not get out.

* Just at 7 pm. a band of police under Mr. Gafur and Dist. Magistrate Rahman arrived and took to lathi charge, tear gas and blank fire — they opened fire & tear gassed in the Medical College Hospital compound too — from lathi charge 19 persons were wounded seriously — Shamsuddin was one of them — Shamsuddin and 3 informs(?) tries to the opposition M.L.As were at a meeting in - Baliadi House.

// At about 11-30 pm. meeting of the Committee of Action sat at a room in the Hall (N) — Continued upto 2 Am — Decided to hold protest strike in Institutions only and hold meeting but not demonstration on 17th March.
Back at 2-30 Am. Bed at 3 Am.

Weather: Normal — excessive cold owing to rain former day.

তাজউদ্দীন আহমদ-এর ডায়েরী, ১৬ই মার্চ ১৯৪৮ [পৃষ্ঠা : ৮৯]

ঢাকা জেলে ৪৩ জন রাজবন্দীর আমরন অনশন।

ছাত্র-মেহনতী জনসাধরণ! দেশপ্রেমিকদের অমূল্য জীবন বাঁচাইতে আগাইয়া আস্থন।

গত ২২শে মে হইতে ঢাকা জেলে ৪৩ জন রাজবন্দী আবার অনশন ধর্মঘট শুরু করিয়াছেন। এই রাজবন্দীরাই গত ১১ই মার্চ জেল কর্তৃপক্ষের অকথ্য দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে ও অন্যান্য অভাব অভিযোগের প্রতিকারার্থে আবেদন নিবেদনে বিফল হইয়া শেষ পর্যান্ত অনশন ধর্মঘট করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তখন ঢাকার ছাত্র ও জনসাধারণের আন্দোলনে সন্ত্রস্ত হইয়া সরকার তাহাদের দাবী মানিয়া লইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। এই প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করিয়া রাজবন্দীরা এক সপ্তাহ অনশনের পর ধর্মঘট প্রত্যাহার করেন। কিন্তু লীগ [illegible] সরকার ওয়াদা ভঙ্গ করে। রাজবন্দীদের কোন দাবীই মিটান হয় নাই। উপরন্তু অনশন ধর্মঘটের পর তাহাদের পৃথক পৃথক ঘরে আলাদা করিয়া রাখা হইতেছে এবং সামাজিক মর্য্যাদা (Social status) অনুযায়ী দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়—আজ অনশনের ষষ্ঠ দিবসে ও কর্তৃপক্ষ সংবাদটি বেমালুম চাপা দিয়া রাখিয়াছেন। প্রকাশ কয়েকজন ধর্মঘটীর অবস্থা আশংকাজনক, এইভাবে সংবাদ চাপিয়া রাখা পাকিস্তান সরকারের, ফ্যাসিষ্ট শাসনেরই একটি নমুনা, মানুষের মৌলিক অধিকার হরণের এক ঘৃণিত অপচেষ্টা। এই সরকারী নেতারাই আবার 'ইসলামী গণতন্ত্রের" বুলি কপচাইয়া থাকেন।

৪৩ জন অনশন কারীর মধ্যে রহিয়াছেন পাকিস্তানে শ্রমিক কৃষক ছাত্র আন্দোলনের প্রধান প্রধান নেতারা আমাদের সমাজের শ্রেষ্ঠ সন্তান, যাহারা জীবনের সর্বস্ব পণ করিয়া অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে শোষিত জনতার ন্যায্য সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছিলেন, ইহাই তাহাদের অপরাধ (?) তাহাদের অপরাধ (?) তাহারা সাম্রাজ্যবাদ ও তাহারা দালাল জাতীয় বুর্জুয়া শ্রেণী, জমিদার জোতদার চোরাকারবারীর স্বৈরাচার, মুনাফা লুণ্ঠণ ও দুর্নীতি হইতে দেশবাসীকে মুক্ত করিয়া এক স্বাধীন এবং সুখী জীবন গড়িয়া তুলিতে [illegible] ছিলেন। এই জন্যই বছরের পর বছর তাহারা বিনা বিচারে কয়েদখানায় পচিতেছেন। [illegible] শাসকগণ ও রাজবন্দীদের যে সুযোগ সুবিধা দিয়াছিল ফ্যাসিষ্ট পাকিস্তান সরকার তাহা কাড়িয়া লইয়াছে।

অনশনকারীদের অন্যতম প্রধান দাবী:—(১) রাজবন্দীদের সামাজিক মর্য্যাদা অনুযায়ী [illegible] করা চলিবে না সকলকে একশ্রেণী-ভুক্ত করিতে হইবে। (২) সকলকে একসঙ্গে থাকিবার [illegible] (৩) খোলা বাতাসে খেলা ধূলা ও ব্যায়ামের বন্দোবস্ত, (৪) পড়াশোনার পর্য্যাপ্ত [illegible] (৫) [illegible] এবং কাপড়-চোপড়ের সুব্যবস্থা, (৬) পারিবারিক ভাতা (৭) ওয়ার্ডে তালাবদ্ধ করা চলিবে না [illegible]।

ছাত্র-শ্রমিক কৃষক কর্মচারী, প্রত্যেকটি দেশবাসীর নিকট আমাদের আবেদন—[illegible] সমর্থনে আগাইয়া দাঁড়ান। এই নির্ভিক দেশপ্রেমিকগন ফ্যাশিষ্ট কয়েদখানার মধ্যে ও সংগ্রামী [illegible] ধরিয়াছেন, রাজ-বন্দীদের উপযুক্ত মর্য্যাদা রক্ষার জন্য অনিবার্য্য মৃত্যুর কথা জানিয়াও তাহারা [illegible] পথে পা বাড়াইয়াছেন। গরীব জনতার মুক্তি লড়াইয়ের এই নির্ভিক সৈনিকদের অমূল্য জীবন রক্ষা [illegible] হইবে। ফ্যাশিষ্ট জেলে তাহাদের হত্যা করিতে দিবনা—পাকিস্তানের ছাত্র মেহনতী জনতা এই [illegible] তুলুন, সর্বত্র ধর্মঘট, সভা, শোভাযাত্রা মারফত রাজবন্দীদের উপর অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবাদ করুন, তাহাদের দাবী মানিয়া লইতে সরকারকে বাধ্য করুন।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

ফ্যাশিষ্ট লীগ সরকার ধ্বংস হোক।

রাজবন্দীদের দাবী মানতে হবে।

২৮।৫।৪৯ ইং

সম্পাদক,

পূর্ব বাংলা ছাত্র-ফেডারেশন

অনশন ধর্মঘটের সমর্থনে একটি ছাত্র ইস্তাহার ১৯৪৯ [পৃষ্ঠা : ৩১৪]

How Humanity Attacked Under

Liakat-Nurul Amin Regime ?

Below is the statement of Sm. ILA MITRA made before the court at Rajshahi with regard to inhuman treatment meted out to a lady, only because she holds a political opinion other than that of Liakat-Nurul Amin Feudal class :—

Sm. Ila Mitra in her statement pleading 'not guilty' to the charges said;

I know nothing about the case. On 7-1-50 last I was arrested in Rahanpur and taken to Nachole the next day. The police guards assaulted me on the way and thereafter I was taken inside a cell. The S. I. threatened to make me naked if I did not confess everthing about the murder. As I had nothing to say all my garment were taken away and I was imprisoned inside the cell in stark naked condition.

No food was given to me, not even a drop of water. The same day in the evening the sepoys began to beat me on the head with butt ends of their guns, in the presence of the S I. I was profusely bleeding through the nose. Afterwards my garments were returned to me, and at about 12 midnight I was taken out of the cell and lead possibly to the quarters of the S. I., but I was not certain

In that room where I was taken they tried brutal methods to bring out confession. My legs were pressed between o sticks, and the people around was being administered a 'Pakistani injection.' When this torture was going on they tied my mouth with a napkin. They also pulled off my hairs, but as they could not force me to say anything. I was taken back to the cell carried by the sepoys, as after the torture it was not possible for me to walk.

Inside the cell again the S. I. ordered the sepoys to bring four hot eggs, and said, now she will talk. Thereafter four or five sepoys forced me to lie down on my back, and one pushed a hot egg through my private parts. I was feeling like being burnt with fire, and became unconscious.

When I came back to my senses in the morning of 9-1-50, the S I and some sepoys came into my cell, and began to kick me on the belly with boots on. Thereafter a nail was pierced through my right heel. I was then lying half conscious, and heard the S I. muttering we are coming again at night, and if you do not confess, one by one the sepoys will ravish you. At dead of night, the S. I. and his sepoys came back and the threat was repeated. But as I still refused to say anpthing, three or four men got hold of me, and a sepoy actually began to rape me. Shortly afterwards I became unconscious.

Next day on 10.1.50 when I became conscious again, I found that I was profusely bleeding and my cloth was drenched in blood. I was in that state taken to Nawabganj from Nachole. The sepoys in Nawabganj jail gate received me with smart blows.

I was at that time in a prostate condition and the Court Inspector and some sepoys carried me to a cell. I had high fever then and I was still bleeding. A doctor, possibly from the Govt. Hospital at Nawabganj had noted the temperature of my body to be 105°. When he heard from me of the profuse bleeding I had he assured me, I would be treated with the help of a women nurse. I was also given some medicines and two pieces of rugs

On 11.1.50 the women nurse of the Govt Hospital examined me. I do not know what report she gave about my condition. After she came, the blood stained piece of cloth I was wearing was changed for a clean one. During all this time I was in a cell of the Nawabganj . S under the treatment of a doctor. I had high fever and profuse bleeding and was unconscious from time to time

On 16. 1. 50 a stretcher was brought before my cell in the evening and I was told that I would have to go elsewhere for examination, on my protest that I was too ill to move about, I was, struck with a stick and forced to get on the stretcher after which I was carried on it to another house. I told nothing there, but the sepoys forced me a sign a blank paper. I was at time in a semi-conscious state with high fever. As my condition was going worse. I was next day transferred to the Nawabganj Govt. Hospital, and on 21. 1. 50 when the state of my health was still very precarious, I was brought from Nawabganj to Rajshahi Central Jail, and was admitted to the jail hospital.

I had not under any circumstances said anything to the police, and I have nothing more to say than I have stated above.

ইলামিত্রের জবানবন্দী। এই জবানবন্দী-ই ইস্তাহার আকারে পূর্ব বাংলার সর্বত্র ১৯৫০ সালেব গোড়ার দিকে বিলী করা হয়।

[পৃষ্ঠা : ৩৩৬]

31.8.47

At about 12 a.m. Naimuddin came — gave ~~him points~~ of ~~speech to~~ be delivered in the Students meeting.

At 3-30 p.m. started ~~both for~~ meeting — took Shamsuddin ~~to~~ from Nazir Library — reached F. H. Hall at 4-15 p.m.

Students were [illegible] in large no. from different institutions — a big gathering — in the meantime Saleh came with Jaher, Dalil, Mukhles and the boys of Kalta Bazar headed by Nizam — Alauddin was busy in whipping — their attitude showed that they were upto anything to frustrate the meeting — when conveners and all other senior students of Halls were outside and thinking whether meeting should be held outside the Hall, Saleh as prearranged mounted the presidential chair — Mr. Moazzem Chowdhury proposed Mr. Habibur Rahman to preside and it was duly seconded — but Saleh refused to vacate the chair — over this fighting began — A. Khair took lead — ~~Kalayetullah~~ [illegible] and many other Hall students were active on mainly Saleh — Those who were helping Saleh got beat — Alauddin, Zaher and Nizam ~~were sent to Saleh~~ ~~beaten~~ — Saleh escaped through a window and fled ~~away and took~~ shelter near Rly. Hospital — students ran after him — ~~but came back~~ immediately — a few students went away and the ~~rest~~ held the meeting in front of the Assembly Hall.

তাজউদ্দীন আহমদ-এর ডায়েরী ৩১শে আগষ্ট ১৯৪৭ [পৃষ্ঠা : ৯]

বাংলাকে পাকিস্তানের

অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে

১১ই মার্চ্চ ধর্ম্মঘট পালন করুন

তিন বৎসর পূর্ব্বে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ্চ আমরা ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করি। সমগ্র পাকিস্তানের শতকরা ৬২ জনের মাতৃভাষা বাংলাকে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করে বাদ দেওয়ার, চক্রান্তকে প্রদেশব্যাপী আন্দোলন করে আমরা বানচাল করে দেই।

আমাদের আন্দোলনের চাপে পড়ে তদানিন্তন মন্ত্রীসভা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল যে, উর্দ্দুর সাথে বাংলাও সমগ্র পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হবে।

কিন্তু সে অঙ্গিকার এখনও প্রতিপালিত হয় নাই, বাংলাকে এখনও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হয় নাই, শিক্ষার মাধ্যম করা হয় নাই। বরং দ্বিতীয় পি, সি, সুপারিশে ষড়যন্ত্র করে বাংলাকে সরাসরি বাদ দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, বাংলাকে সমূলে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে 'আরবী হরফে বাংলা লেখার' হীন চক্রান্ত করে লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয় করতেও এতটুকু লজ্জাবোধ করে নাই।

বন্ধুগণ! যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কর্তৃপক্ষের এই ফ্যাসিষ্ট মনোভাবকে সমূলে বিনষ্ট করে আমাদের মাতৃভাষা বাংলার দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে না পারি ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের সংগ্রাম ক্ষান্ত হতে পারে না।

অতএব, আসুন—আমরা ১১ই মার্চ্চে নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ম্মঘট ও সভা করে আমাদের ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে স্মরণ করে পুনরায় লৌহ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে বাংলাকে উর্দ্দুর সাথে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে ঘোষণা করতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করি।

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা—করতেই হবে।

ছাত্র ঐক্য—জিন্দাবাদ

(বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম্ম পরিষদ)

১১ই মার্চ ১৯৪৮ ধর্মঘট পালনের জন্য লিখিত ইশতাহার [পৃষ্ঠা : ১৬]

6.9.47 — Saturday —

Could not move from office from morning till 12 noon for incessant rain.
At 12 noon took meal in Pakistan Restaurant.

// At 2 pm Delegates session began in Haranath's house with Tasaddak in the chair — about 500 delegates present from all Dists of E.P. save Chittagong — many were stopped attending by the other party — Hindus representing various organizations fairly attended. — Subject Committee formed at 6 pm — meeting adjourned till 8 pm

From Kamruddin Sb. brought one chowki to Nimtali Mess — Dr. Karim was to wait for me in Begum Bazar Masque — while back in the evening from Mess could not get him.

Meeting of delegates again adjourned till 8-30 am tomorrow as the Subject Committee could not finish work.

Came to Kamruddin Sb with Bahauddin — heavy rain — waited upto 11 pm. — led Bahauddin to his house and I came to Haranath's House Subject Committee meeting continuing — at 2 am all tired finished discussion — passed the night in the floor all of us.

Could not take bath — no meal at night. // Atmosphere and weather very gloomy — rain without break — continuing till next day.

* Opposition party did vigorous anti-propaganda of the Convention — distributed pamphlets and shouted against it throughout the city in a truck at about 10 pm — all [illegible] means adopted to frustrate the meeting — [illegible] delegates were influenced.

7.9.47 Sunday —

Met Oli Ahad in League office — took heavy nasta in Pakistan Restaurant with biriani [illegible] at about 8.30 am.

// Delegates session reassembled at 9-20 am — peacefully conducted the business — resolutions duly submitted by subject committee [illegible] passed — charter of demands. Food problems. formation of Democratic Youth League of Pakistan etc. — Shamsul Huq Sb made a long speech for 1/2 hour regarding the purpose of the Convention & what he did to come to a compromise with Youth Conference — dissolved at 12 pm.

After the meeting was over about 300 National Guards and other people under Akkas [illegible] of Jinnah's appeared — though Shamsul Huq Sb first declared the open meeting to be held in North Brooke Hall ultimately decided to hold it in Bhagyakul park at 2 pm.

Oli Ahad & I came to Kamruddin Sb — Mujib and Moazzem appeared — they are angry with Shamsul Huq Sb — they suppose that the Convention was called for establishing leadership of Shamsul Huq Sb — they were angry because he wanted to preside over the open meeting — I informed of these to Aziz Sb & Hazrat Ali in League office at about 1 pm.

Oli Ahad and I came to Nimtali Mess — Took bath after 3 days — took meal with polao in Variety Hotel at the expense of Oli Ahad at about 5 pm.

Went to Tajuddin Sb in Hall — Oli Ahad talked with him regarding E.P.F.L — he seemed indifferent.

// Weather very bad — incessant rain
Did not attend the open Conference mainly owing to rain.
Slept in the Mess for the first time

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ সূত্রপাত

১ ॥ গণ-আজাদী লীগ

১৯৪৭ সালের ৩রা জুন বৃটিশ-ভারতের সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন তাঁর রোয়েদাদ ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার পর মুসলিম লীগের অল্পসংখ্যক বামপন্থী কর্মীদের উদ্যোগে জুলাই মাসে ঢাকায় 'গণ-আজাদী লীগ' নামে একটি ক্ষুদ্র সংগঠন গঠিত হয়। 'আশু দাবী কর্মসূচী আদর্শ' এই নামে তাঁরা একটি ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করেন এবং তাতে তাঁদের মধ্যে এক নোতুন চেতনার উন্মেষ লক্ষিত হয়। প্রথমেই নিজেদের আদর্শ ও কর্মসূচীর যৌক্তিকতাস্বরূপ তাঁরা ঘোরা ঘোষণা করেন :

> দেশের স্বাধীনতা ও জনগণের স্বাধীনতা দুইটি পৃথক জিনিস। বিদেশী শাসন হইতে একটি দেশ স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারে; কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে, সেই দেশবাসীরা স্বাধীনতা পাইল। রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোনো মূল্যই নাই যদি সেই স্বাধীনতা জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি আনয়ন না করে; কারণ, অর্থনৈতিক মুক্তি ব্যতীত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সম্ভব নয়। সুতরাং, আমরা স্থির করিয়াছি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আমরা সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে থাকিব। এতদুদ্দেশ্যে আমরা দেশবাসীর সম্মুখে আদর্শ ও কর্মসূচী উপস্থিত করিতেছি।[১]

পাকিস্তানে নাগরিক অধিকার অব্যাহত রাখা এবং সুদৃঢ় করার জন্যে এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটির প্রচেষ্টা শক্তিশালী এবং দীর্ঘস্থায়ী না হলেও প্রথম উদ্যোগ হিসাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকাস্থ মুসলিম লীগ কর্মীদের অন্যতম প্রধান নেতা কমরুদ্দীন আহমদ গণ-আজাদী লীগের আহ্বায়ক নিযুক্ত হন। সেদিক থেকেও প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোগ তাৎপর্যপূর্ণ। স্বাধীনতার পূর্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ একটি বিরাট গণপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং ১৯৪৪ সালেই তার সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচ লক্ষেরও বেশী।[২] কিন্তু তা সত্ত্বেও কৃষক মজুর নিম্ন-মধ্যবিত্তের স্বার্থ রক্ষার সংগ্রামে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানগতভাবে মোটেই সচেষ্ট হয়নি। উপরন্তু তেভাগা আন্দোলন এবং সেই সংক্রান্ত বিলকে

প্রাদেশিক পরিষদে বানচাল করার ক্ষেত্রে মুসলিমলীগের জোতদার শ্রেণীভুক্ত প্রভাবশালী সদস্যদের ষড়যন্ত্র সংগঠনের অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল মহলে যথেষ্ট হতাশার সঞ্চার করে। ১৯৪৭-৪৮ সাল পর্যন্ত অব্যাহত তেভাগা আন্দোলনে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের এক বিরাট শক্তিশালী অংশের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির চরিত্রও উদ্ঘাটিত হয়।

গণ-আজাদী লীগের ম্যানিফেস্টোটি কোনো শক্তিশালী সংগঠনের ঘোষণা ছিলোনা। সে ঘোষণা ছিলো মুসলিম লীগ কর্মীদেরই একটি প্রগতিশীল অংশের আত্মসমালোচনা এবং আত্মোপলব্ধির ঘোষণা। এতে তাঁরা আরও বলেন:

> সত্যিকার পাকিস্তান অর্থে আমরা বুঝি, জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি। সুতরাং আমাদের এখন কর্তব্য এই নবীন পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রকে সুন্দরভাবে গঠিত করা, এবং মানুষের মধ্যে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি আনয়ন করা।[৩]

যে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী আনয়ন করার কথা উপরোদ্ধৃত অংশে বলা হয়েছে সে দৃষ্টিভঙ্গী অনেকাংশে সমাজতন্ত্রমুখী। তবে এই ঘোষণা যে মুসলিম লীগ চিন্তার প্রভাব মুক্ত নয় তার প্রমাণও এর মধ্যে আছে। এ জন্যে আশু দাবী হিসাবে একদিকে বলা হচ্ছে "লাঙল যার জমি তার ভিত্তিতে জমির বিলি-ব্যবস্থা করিতে হইবে। তেভাগা বিল পাস করিতে হইবে এবং বিল পাস হইবার পূর্বে একটি অর্ডিন্যান্স দ্বারা এই বিলটি চালু করিতে হইবে।"[৪] এবং "বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করিতে হইবে এবং জমির উপর হইতে সর্বপ্রকার মধ্যস্বত্ব লোপ করিতে হইবে।"[৫] অন্যদিকে আবার বলা হচ্ছে "মুসলমানদের জাকাত সরকার সংগ্রহ করিতে পারেন। এই টাকা মুসলিম শিক্ষার জন্য খরচ করিতে পারা যাইবে। কারণ, জাকাতের টাকা সব খাতে খরচ করা যায় না।"[৬] এবং "মসজিদকে ভিত্তি করিয়া জনগণের নিরক্ষরতা দূরীকরণের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাইতে পারে"।[৭]

গণ-আজাদী লীগের এই ঘোষণাটিতে শিক্ষা ও ভাষা বিষয়ে যে দাবী করা হয় সেটা এই জাতীয় ম্যানিফেস্টোর মধ্যে এর পূর্বে দেখা যায়নি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক আবুল হাশিম প্রাদেশিক কাউন্সিলের সামনে পেশ করার জন্যে ১৯৪৬ সালে যে খসড়া ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করেন তার মধ্যে শিক্ষার অধিকার সম্পর্কে অনেকগুলি গণতান্ত্রিক দাবীর উল্লেখ ছিলো[৮] কিন্তু ভাষা বিষয়ক কোনো দাবী তার মধ্যে উত্থাপিত হয়নি। আলোচ্য ঘোষণাটিতে কিন্তু মাতৃভাষা, শিক্ষার মাধ্যম এবং রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। যেমন: "মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান করিতে হইবে"[৯] এবং

"বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই ভাষাকে দেশের যথোপযোগী করিবার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাংলা হইবে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।"[১০]

বাংলা পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে এর দ্বারা গণ-আজাদী লীগের মুখপাত্রেরা কি বলতে চেয়েছিলেন তা খুব স্পষ্ট নয়। তবে ঘোষণাটির মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে তার মধ্যে যে সকল দাবী-দাওয়ার কথা আছে সেগুলি প্রায় সবই পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে। সারা পাকিস্তানে কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তাঁদের যেন কোনো বক্তব্যই নেই। শুধু ভাষার প্রশ্নেই নয়, অন্যান্য সকল প্রশ্ন সম্পর্কে তাঁদের ঐ একই মনোভাব। ম্যানিফেস্টোটি এমনভাবে লিখিত যেন পূর্ব পাকিস্তান একটি সম্পূর্ণ পৃথক রাষ্ট্র, তার সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো সম্পর্ক নেই। এর একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এই যে তখনো পর্যন্ত মুসলিম লীগ বাঙলা দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হয়নি। কাজেই গণ-আজাদী লীগের মুখপাত্রদের হয়তো ধারণা ছিলো যে পাকিস্তানের দুই অংশে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে যার ফলে পূর্ব পাকিস্তানকে একটি রাষ্ট্রীয় একক হিসাবে মোটামুটিভাবে গণ্য করা যেতে পারবে।

গণ-আজাদী লীগের বৈঠকগুলি অনুষ্ঠিত হয় জিন্দাবাহার প্রথম গলিতে কমরুদ্দীন আহমদের বাসায়। মোহাম্মদ তোয়াহা, অলী আহাদ, তাজউদ্দীন আহমদ এবং কমরুদ্দীন আহমদ যৌথভাবে কিছুসংখ্যক কর্মীদেরকে একত্রিত করেন। এঁরা সকলেই মুসলিম লীগের প্রতি আস্থা হারিয়েছিলেন এবং স্বাধীনতার পর এদেশে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি গঠনের চিন্তা করছিলেন। উপরে আলোচিত ম্যানিফেস্টোটি সেই চিন্তারই ফল। নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়েই এই সংগঠনটির কাজকর্ম সীমাবদ্ধ ছিলো। ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারিতে সংগঠনটির নাম পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় সিভিল লিবার্টিস লীগ।[১১]

২॥ ডক্টর শহীদুল্লাহর অভিমত

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর জিয়াউদ্দীন আহমদ হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশের অনুকরণে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানগতভাবে কোনো প্রতিবাদ কেউ করেনি। মুসলিম লীগ মহলেও এ নিয়ে কোনো বিতর্কের সূচনা হয়নি। কিন্তু জিয়াউদ্দীন

আহমদের এই সুপারিশের অসারতা সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ ও শিক্ষিত সমাজকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রকাশ করেন।[১] এ প্রবন্ধে তিনি বলেন :

> কংগ্রেসের নির্দিষ্ট হিন্দীর অনুকরণে উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা-রূপে গণ্য হইলে তাহা শুধু পশ্চাদগমনই হইবে।...ইংরেজী ভাষার বিরুদ্ধে একমাত্র যুক্তি এই যে ইহা পাকিস্তান ডোমিনিয়নের কোনো প্রদেশের অধিবাসীরই মাতৃভাষা নয়। উর্দুর বিপক্ষেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। পাকিস্তান ডোমিনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মাতৃভাষা বিভিন্ন, যেমন—পুষ্‌তু, বেলুচী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, এবং বাংলা; কিন্তু উর্দু পাকিস্তানের কোনো অঞ্চলেই মাতৃভাষারূপে চালু নয়।...যদি বিদেশী ভাষা বলিয়া ইংরেজী ভাষা পরিত্যক্ত হয়, তবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ না করার পক্ষে কোনো যুক্তি নাই। যদি বাংলা ভাষার অতিরিক্ত কোনো দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করতে হয়, তবে উর্দু ভাষার দাবী বিবেচনা করা কর্তব্য।[২]

এখানে একটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উর্দুর দাবী বিবেচনার ক্ষেত্রে ডক্টর শহীদুল্লাহ ধর্মের প্রসঙ্গ একেবারেই উত্থাপন করেননি। এক শ্রেণীর লোকে উর্দুর সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন শুধু এই যুক্তিতে যে উর্দুর সাথে ইসলামের যোগাযোগ বাংলা ভাষার থেকে ঘনিষ্ঠ। শহীদুল্লাহ সাহেব এ ব্যাপারে কিছু উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করেননি। তাঁর মতে আরবী ভাষাই বিশ্বের মুসলমানদের জাতীয় ভাষা।[৩] সেই হিসাবে তিনি মনে করেন যে আরবী ভাষাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।[৪] তবে ধর্মীয় ভাষা হিসাবে উর্দুর কোনো স্থান নেই। ডক্টর শহীদুল্লাহ তাঁর প্রবন্ধটির শেষে বলেন :

> বাংলা দেশের কোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দু বা হিন্দী ভাষা গ্রহণ করা হইলে ইহা রাজনৈতিক পরাধীনতারই নামান্তর হইবে। ডাঃ জিয়াউদ্দীন আহমদ পাকিস্তানের প্রদেশসমূহের বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহনরূপে প্রাদেশিক ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষার সপক্ষে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন আমি একজন শিক্ষাবিদ্‌রূপে উহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। ইহা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও নীতি বিরোধীই নয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের নীতি বিগর্হিতও বটে।[৫]

এই প্রবন্ধটির পর ডক্টর শহীদুল্লাহ ১৭ই পৌষ, ১৩৫৪ তকবীর পত্রিকায় 'পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার ভাষা সমস্যা' নামে আর একটি লেখা প্রকাশ করেন।[৬] এই লেখাটিতে তিনি বাংলা, আরবী, উর্দু এবং ইংরেজী ভাষা সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানীদের নীতি কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে আলোচনা করেন। বাংলা সম্পর্কে তিনি বলেন :

হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে প্রত্যেক বাঙালীর জন্য প্রাথমিক শিক্ষণীয় ভাষা অবশ্যই বাঙলা হইবে। ইহা জ্যামিতির স্বীকৃত বিষয়ের ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ। উন্মাদ ব্যতীত কেহই ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে পারে না। এই বাঙলাই হইবে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষা।[৭]

আরবী সম্পর্কে তাঁর অভিমত :

মাতৃভাষার পরেই স্থান ধর্মভাষার, অন্ততঃ মুসলমানের দৃষ্টিতে। · এই জন্য আমি আমার প্রাণের সমস্ত জোর দিয়া বলিব, বাঙলার ন্যায় আমরা আরবী চাই।···সেদিন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম সার্থক হইবে, যে দিন আরবী সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে গৃহীত হইবে।···কিন্তু বর্তমানে আরবী পাকিস্তান রাষ্ট্রের একটি বৈকল্পিক ভাষা ভিন্ন একমাত্র রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণের যথেষ্ট অন্তরায় আছে।[৮]

উর্দু শিক্ষা সম্পর্কে ডক্টর শহীদুল্লাহ বলেন :

পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশের জনগণের মধ্যে যোগ স্থাপনের জন্য, যাঁহারা উচ্চ রাজকর্মচারী কিংবা রাজনীতিক হইবেন, তাঁহাদের জন্য একটি আন্তঃপ্রাদেশিক (inter-provincial) ভাষা শিক্ষা করা প্রয়োজন। এই ভাষা উচ্চ শিক্ষিতদের জন্য ইংরেজীই আছে। ইহা অনস্বীকার্য বাস্তব ব্যাপার (fact)। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে ইহা চলে না। তজ্জন্য উর্দুর আবশ্যকতা আছে।···এইজন্য রাজনৈতিক কারণে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উচ্চ রাজকর্মচারী ও রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষী প্রত্যেক নাগরিকেরই উর্দু শিক্ষা করা কর্তব্য।[৯]

ইংরেজীকে পাকিস্তানের অন্যতম ভাষারূপে চালু রাখার সপক্ষে তিনি নিম্নোক্ত অভিমত প্রকাশ করেন :

আমরা পাকিস্তান রাষ্ট্রকে একটি আধুনিক প্রগতিশীল রাষ্ট্ররূপে দেখিতে চাই। তজ্জন্য ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, ইতালীয়ান, বা রুশ ভাষাগুলির মধ্যে যে কোনো একটি ভাষা আমাদের উচ্চ শিক্ষার পঠিতব্য ভাষারূপে গ্রহণ করিতে হইবে। এই সকলের মধ্যে অবশ্য আমরা ইংরেজীকেই বাছিয়া

লইব। ইহার কারণ দুইটি (১) ইংরেজী আমাদের উচ্চ শিক্ষিতদের নিকট সুপরিচিত; (২) ইংরেজী পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত আন্তর্জাতিক ভাষা। আমি এই ইংরেজীকেই বর্তমানে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে বজায় রাখিতে প্রস্তাব করি।[১০]

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর উপরোক্ত ভাষা বিষয়ক মন্তব্য এবং সুপারিশগুলির মধ্যে অনেক জটিলতা এবং পরস্পরবিরোধিতা থাকলেও এগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ জটিলতা এবং পরস্পরবিরোধী চিন্তা তাঁর মধ্যেই শুধু ছিলো না। সমসাময়িক রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ্ এবং জনসাধারণের চিন্তার মধ্যেও এ জটিলতা এবং পরস্পরবিরোধিতা যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিলো।

৩॥ গণতান্ত্রিক যুব লীগ

১৯৪৭ সালের ১৫ই অগাস্টের পর কলকাতার সিরাজউদ্দৌলা হোটেলে কিছুসংখ্যক রাজনৈতিক কর্মী ও ছাত্রেরা পূর্ব পাকিস্তানে তাঁদের পরবর্তী কর্তব্য এবং কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্যে সমবেত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আতাউর রহমান (রাজশাহী,) কাজী মহম্মদ ইদরিস, শহীদুল্লাহ কায়সার, আখলাকুর রহমান প্রভৃতি। এ ব্যাপারে তাঁরা অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গেও আলাপ আলোচনা করেন। এই সব আলোচনার পর স্থির হয় যে স্বাধীনতাউত্তর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পাকিস্তানে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক আন্দোলন এবং তার উপযুক্ত সংগঠন গঠন করা প্রয়োজন।[১]

এর পর উপরোক্ত রাজনৈতিক কর্মীরা ঢাকা এসে কমরুদ্দীন আহমদ, শামসুল হক, শেখ মুজিবর রহমান, তাজউদ্দিন আহমদ, শামসুদ্দীন আহমদ, তসদ্দুক আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, নূরুদ্দীন আহমদ, আবদুল ওদুদ, হাজেরা মাহমুদ প্রভৃতির সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। নোতুন পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্যে একটি সম্মেলন আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁরা সকলেই একমত হন এবং এ ব্যাপারে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্তী এবং অজিত বসুও এ ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহশীল ছিলেন।[২]

এই প্রাথমিক আলাপ আলোচনার পর নেতৃস্থানীয় কর্মীরা সারা পূর্ব বাঙলাকে কতকগুলি এলাকাতে ভাগ করে সেখানকার কর্মীদের সাথে সম্মেলন সংক্রান্ত ব্যাপারে যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে সফর শুরু করেন। এই

সফরের পর বেশ কিছু সংখ্যক কর্মী সম্মেলনে যোগদান করতে সম্মত হন এবং ১৯৪৭ সালের ২৪শে অগাস্ট ঢাকায় রাজনৈতিক কর্মীদের এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারিত হয়।[৩]

৩১শে জুলাই সম্মেলনের জন্যে একটি অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়। কফিল-উদ্দীন চৌধুরী এবং শামসুল হক যথাক্রমে সেই কমিটির সভাপতি এবং সম্পাদক মনোনীত হন। সম্মেলনের জন্যে একটি খসড়া ম্যানিফেস্টো ৫ই অগাস্ট ম্যানি-ফেস্টো নির্বাচন কমিটিতে পেশ করার পর সামান্য পরিবর্তিত হয়ে সেটি গৃহীত হয়। এই সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে মহম্মদ তোয়াহা, কমরুদ্দীন আহমদ, আজিজ আহমদ, নজমুল করিম, অলি আহাদ, তসদ্দুক আহমদ এবং তাজউদ্দীন আহমদের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সভাতে আরও সিদ্ধান্ত হয় যে ম্যানিফেস্টোটি মুসলিম লীগের অন্তর্গত একটি পৃথক পার্টির নামে প্রকাশ করা হবে।[৪]

সম্মেলন শুরু হওয়ার অল্প কয়েকদিন পূর্বে নানা অসুবিধার জন্যে সম্মেলনের তারিখ পরিবর্তিত হয় কিন্তু জেলা প্রতিনিধিদেরকে সময়মতো খবর দিতে না পারার জন্যে তাঁরা অনেকে নির্ধারিত তারিখের পূর্বদিন অর্থাৎ ২৩শে অগাস্ট ঢাকা উপস্থিত হন। এইসব কর্মীদের নিয়ে সেদিন ১৫০ মোগলটুলীর মুসলিম লীগ অফিসে কমরুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে একটি সভা হয়। এই সভায় ত্রিপুরা, নোয়াখালী, বরিশাল, ময়মনসিংহ, সিলেট, ঢাকা এবং উত্তর বাঙলার কয়েকটি জেলার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।[৫]

মুসলিম লীগ সরকার এই সম্মেলনটিকে সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের সমাবেশ বলে ধরে নিয়েছিলেন। ফলে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও বার লাইব্রেরী হল জাতীয় কোনো জায়গায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের অনুমতি লাভ সম্ভব হয়নি।[৬] শুধু তাই নয়, অনুমতি পাওয়া গেলেও শহরের প্রতিকূল অবস্থার জন্যে সেখানে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপরও ছিলো না। কাজেই শেষ পর্যন্ত ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব ভাইস চেয়ারম্যান খান সাহেব আবুল হাসনাত আহমদের বাসায় এই সম্মেলনের স্থান নির্ধারিত হয়।[৭]

এই সময়কার ছাত্র রাজনীতির কয়েকটি ঘটনা খুব উল্লেখযোগ্য কারণ সেগুলি আসন্ন সম্মেলনটির কর্মসূচী ইত্যাদির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

দেশ বিভাগের পূর্বে নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র লীগ নামে মুসলিম ছাত্রদের যে সংগঠন ছিলো তার কিছুসংখ্যক সদস্য ১৯৪৭-এর অগাস্ট মাসে ঢাকায় চলে আসেন। কলকাতা থেকে আগত এই সমস্ত ছাত্রদের মধ্যে সে সময়

সকলেই ছিলেন সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন। ঢাকার ছাত্রদের মধ্যে সে সময় তাঁদের বিশেষ প্রভাব ছিলো না, কিন্তু তা সত্বেও তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানে নোতুন করে একটি সাম্প্রদায়িক ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠন করার কথা চিন্তা করছিলেন। কিন্তু এই ছাত্রদের মধ্যে শাহ আজিজুর রহমান ও শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে উপদলীয় ঝগড়ার ফলে পুরাতন ছাত্র সংগঠনকে অবলম্বন করে নোতুন একটা সংগঠন গড়ে তোলা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।[৮]

ঢাকার ছাত্রদের মধ্যেও এই সময় নোতুন প্রতিষ্ঠান গঠন সম্পর্কে নানা আলাপ আলোচনা শুরু হয়। নঈমুদ্দীন আহমদ, আজিজ আহমদ, মহম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, তাজউদ্দীন আহমদ প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় ছাত্রেরা একটি অসাম্প্রদায়িক ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন।[৯] ছাত্র ফেডারেশন নামে একটি প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান তখনো পর্যন্ত ছিলো, কিন্তু কম্যুনিস্টদের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার জন্যে মুসলমান ছাত্রেরা সরাসরিভাবে তাতে যোগদানের পক্ষপাতী ছিলেন না।

উপরোল্লিখিত যে সমস্ত ছাত্রেরা অসাম্প্রদায়িক ছাত্র প্রতিষ্ঠান এবং অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির কথা চিন্তা করছিলেন তাঁদের মধ্যেও আলাপ-আলোচনাকালে কিছু মত-পার্থক্য দেখা দেয়। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সরাসরি একটি অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উপর জোর দিলেও অন্যেরা বাস্তব অবস্থার কথা বিবেচনা করে মনে করেন যে তখনো পর্যন্ত পুরোপুরি অসাম্প্রদায়িক ছাত্র প্রতিষ্ঠানের জন্যে মুসলমান ছাত্রেরা প্রস্তত ছিলো না। কাজেই তাঁরা প্রস্তাব করেন যে আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠনের নাম 'মুসলিম ছাত্র লীগ' রাখা হোক, কিন্তু কাজকর্মের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানটিকে পরিশেষে একটি অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার কাজও অব্যাহত থাকুক। পাছে প্রতিষ্ঠানটিকে কম্যুনিস্ট প্রতিষ্ঠান বলে বিরোধী পক্ষীয় ছাত্র এবং সরকার-সংশ্লিষ্ট মহল আক্রমণ করতে না পারে বিশেষ করে তার জন্যেই এই দ্বিতীয় প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয়। এই প্রাথমিক আলোচনা অবশ্য প্রকাশ্য সভায় কোনোদিন উত্থাপিত হয়নি, অত্যন্ত অল্প সংখ্যক উদ্যোগী এবং নেতৃস্থানীয় ছাত্রদের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিলো।[১০]

এই ছাত্র প্রতিষ্ঠানটি গঠনের উদ্দেশ্যে ৩১শে অগাস্ট ফজলুল হক হলে ঢাকার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের একটি সভা আহ্বান করা হয়। ৩০শে অগাস্ট নাজির লাইব্রেরিতে একটি ঘরোয়া বৈঠকে নঈমুদ্দীন আহমদ, আজিজ আহমদ, তাজউদ্দীন আহমদ প্রভৃতি পরদিনের সভাতে 'মুসলিম' শব্দটি

ব্যবহার না করার বিষয়ে একমত হন। স্থির হয় যে নঈমুদ্দীন আহমদ প্রথমেই সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা করবেন। সভাতে ঢাকা শহরের জন্যে একটি অস্থায়ী সাংগঠনিক কমিটি গঠনের সিদ্ধান্তও এই বৈঠকে গ্রহণ করা হয়।[১১]

৩১শে অগাস্ট বিকেলের দিকে ছাত্রেরা দলে দলে ফজলুল হক হলে সমবেত হতে শুরু করেন। এই সময় তাহের, দলিল, মুখলেস প্রভৃতিকে সাথে নিয়ে সালেক এবং তারপর নিজাম ও আলাউদ্দিনের নেতৃত্বে কলতাবাজারের কিছু সংখ্যক ছেলে সেখানে উপস্থিত হয়। তারা প্রকৃতপক্ষে সেদিনকার সেই সভা পণ্ড করার উদ্দেশ্যেই হাজির হয়েছিলো। কাজেই পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে সভা আরম্ভ হওয়ার কিছু পূর্বেই সালেক সভাপতির আসন অধিকার করে বসলো। ফজলুল হক হল ইউনিয়নের সহ-সভাপতি মোয়াজ্জেম চৌধুরী সভাপতি হিসাবে হাবিবুর রহমানের নাম প্রস্তাব করেন এবং তা যথারীতি সমর্থিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সালেক সভাপতির চেয়ার পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করে। এর ফলে চারিদিকে হৈ চৈ এবং মারপিট শুরু হয় এবং প্রধানতঃ সালেকের প্রতিই সকলের দৃষ্টি পড়ে। হেদায়েত, ইসমাইল, মোয়াজ্জেম চৌধুরী এবং অন্যান্য ছাত্রেরা খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠে সালেককে ধরে দারুণভাবে মারপিট করে। গুণ্ডারাও এইভাবে ছাত্রদের কাছে মার খেয়ে হেরে যাওয়ার উপক্রম হয়। সালেকের শরীর মারের আঘাতে রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। সে অবশেষে দৌড়ে পালিয়ে রেলওয়ে হাসপাতালের কাছাকাছি একটি বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে।[১২]

গুণ্ডা ছাত্রদেরকে বিতাড়িত করার পর হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে সভার কাজ যথারীতি শুরু হয়। প্রথমেই সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন নঈমুদ্দীন আহমদ এবং পরে মোয়াজ্জেম চৌধুরী, মতিউর রহমান ও অন্যান্য কয়েকজন বক্তৃতা করে গুণ্ডামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। সভা এইভাবে ঘণ্টাখানেক চলার পর শাহ আজিজদের দলভুক্ত ইব্রাহিম এবং সুলতান সভাস্থলে প্রবেশ করে সভাপতির সাথে সরাসরি ঝগড়া শুরু করে। এর ফলে সভায় দারুণ হৈ চৈ আরম্ভ হয় এবং প্রভোস্ট মাহমুদ হোসেন সেখানে উপস্থিত হয়ে সকলকে সভাস্থল ত্যাগ করতে অনুরোধ করেন। ঠিক এই সময়ে একটি ট্রাকে করে কলতাবাজার এলাকায় বেশ কিছুসংখ্যক গুণ্ডা ছোরা-ছুরি-রড ইত্যাদি নিয়ে ফজলুল হক হলের কম্পাউণ্ডে উপস্থিত হয়ে মোয়াজ্জেম, আজিজ আহমদ, খয়ের, হেদায়েত প্রভৃতিকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু পুনর্বার মাহমুদ হোসেন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে গুণ্ডাদেরকে ধমকে হল থেকে তাড়িয়ে দেন। এই সমস্ত

গণ্ডগোলের ফলে সেদিনকার সভায় যথেষ্ট ছাত্র সমাবেশ সত্ত্বেও ঢাকা শহর সাংগঠনিক কমিটি গঠন অথবা অন্য কোনো সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভবপর হয়নি।

ছাত্রদের হাতে মার খাওয়ার পর সালেক শহরের বিভিন্ন এলাকায় তার ক্ষত চিহ্নগুলি দেখিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করে এবং তার ফলে শহরের বহু লোকে ছাত্রদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা প্রচার করে যে নাজিমুদ্দীন এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ছাত্রেরা সভা করছিলো এবং সেই সভা ভেঙে দিতে যাওয়ার জন্যে ছাত্রেরা সালেকের উপর হামলা করেছে। মোটকথা সেদিনকার ঘটনাকে কেন্দ্র করে শহরে বেশ কয়েকদিন উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে।

যে ট্রাকটিতে চড়ে গুণ্ডারা ফজলুল হক হলে এসেছিলো তাজউদ্দীন আহমদ তার নম্বর টুকে রেখেছিলেন (B. G. D. 629) এবং খোঁজ নিয়ে তাঁরা জানতে পারেন যে সেটি ছিলো পূর্ব বাঙলা সরকারের সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টের। একথা জানার পর তাজউদ্দীন আহমদ, সামসুদ্দীন আহমদ, মোয়াজ্জেম চৌধুরী এবং আরও তিনজন ছাত্র ২রা সেপ্টেম্বর বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী নূরুল আমীনের বাড়িতে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তি দাবী করেন। নূরুল আমীন কিন্তু ছাত্রদেরকে বলেন যে সিভিল সাপ্লাই বিভাগের কোনো কর্মচারীর ছেলে যদি ট্রাকটিকে ঐভাবে ব্যবহার করে থাকে তাহলে সে সম্পর্কে তাঁর করার কিছু নেই। ছাত্রেরা তখন তাঁকে জানান যে ট্রাকের সঠিক নম্বর তাঁদের কাছে আছে, কাজেই তিনি অনায়াসে তার থেকে বের করতে পারেন কে প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তারপর তাকে শাস্তিদানের ব্যবস্থাও করতে পারেন। কিন্তু নূরুল আমীন শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনো কিছুই করেননি। এ ব্যাপারে তাঁর নিষ্ক্রিয়তার কারণ ছাত্রদের মধ্যে তাঁদের নিজেদের লোকরাই একাজ করেছিলো এবং তিনি সেকথা জানতেন।[১৩]

যুব সম্মেলনের পরিবর্তিত তারিখ নির্ধারিত হয়েছিলো ৬ই ও ৭ই সেপ্টেম্বর। সরকার পক্ষীয় লোকেরা সম্মেলনটিকে পণ্ড করার জন্যে নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ৫ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা আটটার দিকে ইব্রাহিম, ইরতিজা প্রভৃতি কয়েকজন মুসলিম লীগ অফিসের কাছাকাছি এবং অন্যান্য এলাকাতে সম্মেলনের বিরুদ্ধে ইস্তাহার বিলি করে গণ্ডগোল সৃষ্টির চেষ্টা করে। ৬ই সেপ্টেম্বরও তারা একটি ট্রাকে চড়ে সমস্ত শহর ঘুরে ইস্তাহার বিলি এবং সম্মেলনের বিরুদ্ধে নানা প্রকার ধ্বনি উচ্চারণ করতে থাকে।[১৪]

যুব সম্মেলনে সকল দলের সেই সব রাজনৈতিক কর্মীদেরকে বিশেষভাবে

আহ্বান করা হয়েছিলো, যাঁরা ছিলেন পার্লামেণ্টারী রাজনীতির সাথে সম্পর্কহীন। কিন্তু এই সম্মেলনে প্রায় পাঁচশত জন[১৫] কর্মী সমবেত হলেও বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সুহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিম গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত এবং অন্যান্য বামপন্থী কর্মীরা ছাড়া অন্য কেউ এতে যোগদান করেননি। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে বেশ কিছু সংখ্যক হিন্দু প্রতিনিধিও এই সম্মেলনে সমবেত হন। জেলাগুলির মধ্যে একমাত্র চট্টগ্রাম ছাড়া অন্য সব জেলার প্রতিনিধিরাই সম্মেলনটিতে উপস্থিত ছিলেন।[১৬]

৬ই সেপ্টেম্বর দুপুর দুটোয় খান সাহেব আবুল হাসনাতের বাসায় তসদ্দুক আহমদের সভাপতিত্বে সম্মেলন আরম্ভ হয়। সন্ধ্যে ছয়টার দিকে বিষয় নির্বাচনী কমিটি গঠিত হয় এবং সেই কমিটির সভা ভোর তিনটে পর্যন্ত চলে।[১৭]

৭ই সেপ্টেম্বর সকাল ৯-৩০ মিনিটে সম্মেলনের কাজ আবার শুরু হয় এবং বিষয় নির্বাচনী কমিটির প্রস্তাবগুলি সবই একে একে শান্তিপূর্ণভাবে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবগুলি প্রধানতঃ ছিলো গণদাবীর সনদ, খাদ্য সমস্যা এবং গণতান্ত্রিক যুব লীগ গঠন সম্পর্কে। এই দিন শামসুল হক সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে আধ ঘণ্টার একটি বক্তৃতা দান করেন।[১৮]

কর্মী সম্মেলনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে সম্মেলনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত গণদাবীর সনদের ভূমিকায় শামসুল হক বলেন :

> পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কায়েদে আজম জিন্নাহ সাহেব বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার কাজ করিয়াছেন এখন যুবকদেরই এই দেশ গড়িতে হইবে। কর্মী সম্মেলনেরও উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি কর্মপন্থা স্থির করা যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের সকল হিন্দু-মুসলমান যুবক বর্তমান অবস্থায় তাহাদের কর্তব্য বুঝিয়া আজাদ পাকিস্তান রাষ্ট্রকে সুখী, গণতান্ত্রিক ও সমৃদ্ধিশালী আদর্শ রাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া তুলিতে অগ্রসর হইতে পারেন।[১৯]

তিনি আরও বলেন :

> সম্মেলনের প্রস্তাব অনুযায়ী কর্মীদের মনের এই আদর্শবাণী পাকিস্তান রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ রাষ্ট্রগঠন পরিষদ, দেশের নেতৃবৃন্দ এবং জনসাধারণ সকলেরই কাছে উপস্থিত করা হইবে।[২০]

সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য সম্পর্কে শামসুল হক বলেন :

> পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলনের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য ছিল একটি ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক যুব প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচী তৈয়ার করা এবং সারা দেশব্যাপী এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য কর্মীদিগকে উদবুদ্ধ করা।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যেই যুব সংগঠনের ইস্তাহারখানা রচিত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, নবজাত শিশু পাকিস্তান রাষ্ট্রকে সাহায্য করার জন্য দেশে বহু যুব প্রতিষ্ঠান স্বভাবতঃই গড়িয়া উঠিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সকল যুবশক্তির মিলন না ঘটিলে কোনো বৃহৎ কাজই করা সম্ভব হইবে না। তাই যুব সংগঠনের ইস্তাহার যুবকদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধন ও পূর্ণ বিকাশের জন্য সাধারণ গণতান্ত্রিক নীতির উপর ভিত্তি করিয়াই রচিত হইয়াছে। কোনো বিশেষ বিতর্কমূলক সমস্যা ও তাহার সমাধানের অবতারণা ইহাতে করা হয় নাই এবং জনগণের মূলদাবীর সনদকেও সরাসরি যুব সংগঠনের ইস্তাহার বলিয়া বলিয়া গৃহীত হয় নাই নাই।[২১]

পূর্ব-পাকিস্তান কর্মী সম্মেলনে নিম্নলিখিত ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব গৃহীত হয়:

পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন ও আইন আদালতের ভাষা করা হউক। সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে তৎ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার জনসাধারণের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক এবং জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হউক।[২২]

পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগের পক্ষ থেকে যুব-ইস্তাহার নামে একটি পৃথক ঘোষণা এই সম্মেলনে গৃহীত হয়। তাতে শিক্ষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে বলা হয়:

নিজের মাতৃভাষায় বিনা খরচে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা পাওয়ার মৌলিক অধিকার প্রত্যেক ছেলেমেয়ের রহিয়াছে এবং তাহা তাহাদের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। জাতীয় এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইবে।[২৩]

এই ঘোষণাটিতে আরও বলা হয়:

যুবকদের সকল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার মূলনীতিকে সর্বদা প্রাধান্য দিতে হইবে এবং যুবকেরা কার্যে যাহাতে উত্তম সঙ্গীত, নাটক, সাহিত্য এবং ছবি উপভোগ করিতে ও বুঝিতে পারে তাহার সুযোগ দিতে হইবে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির মূল্যবোধ বাড়াইবার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য এবং বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে প্রয়োজনীয় সুবিধা দান করিতে হইবে। এই প্রয়োজনে গড়িয়া-উঠা যুবকেন্দ্র এবং যুব সংগঠনকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য দান করিতেই হইবে।[২৪]

এছাড়া সাংস্কৃতিক স্বাধিকার সম্পর্কে ইস্তাহারটিতে স্পষ্টভাবে দাবী করা হয়:

রাষ্ট্রের অধীনস্থ বিভিন্ন এলাকার পৃথক পৃথক সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশকে সরকার স্বীকার করিয়া নিবেন, জীবন এবং সংস্কৃতিকে গড়িয়া তুলিতে এইসব এলাকার সকল ব্যাপারে স্বায়ত্তশাসন মানিয়া লইতে হইবে।[২৫]

১৯৪৭ সালের ৬ই ও ৭ই সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত এই কর্মী সম্মেলনে একটি স্বতন্ত্র যুব প্রতিষ্ঠান গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। সেই অনুসারে প্রায় ২৫ জন সদস্য নিয়ে পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুব-লীগের পূর্ব পাকিস্তান সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়।[২৬] এ সম্পর্কে আরও সিদ্ধান্ত হয় যে উপরোক্ত সাংগঠনিক কমিটি জেলা এবং অন্যান্য ইউনিটে প্রাথমিক কাজকর্ম শেষ করে ছয় মাসের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক যুবকদের একটি সম্মেলন আহ্বান করবে।[২৭]

পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলন এবং গণতান্ত্রিক যুব লীগ সম্পর্কিত কোনো খবর তৎকালীন কোনো সংবাদপত্রে ছাপা হয়নি। সরকারী এবং সরকার-সমর্থক বেসরকারী হস্তক্ষেপই তার প্রধান কারণ। ছয় মাস পর নবগঠিত সংগঠনটির উদ্যোগে একটি বর্ধিত সম্মেলন আহ্বানের যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিলো সেটাও কার্যকরী হয়নি। বস্তুতঃপক্ষে গণতান্ত্রিক যুব লীগ যে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে গঠিত হয়েছিলো তা বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। সংগঠনটির পক্ষ থেকে 'গণতান্ত্রিক যুব লীগ' নামে একটি বুলেটিন আখলাকুর রহমান এবং আতাউর রহমানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু মাত্র কয়েকটি সংখ্যা বের হওয়ার পরই তা বন্ধ হয়ে যায়।[২৮]

এই কর্মী সম্মেলনের পর ২৮শে ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ই মার্চ, ১৯৪৮-এর মধ্যে কলকাতায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে দেশ-বিদেশের বহু যুব প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। গণতান্ত্রিক যুব লীগের পক্ষে এই সময় শামসুল হক, আবদুর রহমান চৌধুরী, শহীদুল্লাহ কায়সার, লিলি খান, লায়লা আরজুমান্দ বানু প্রভৃতি যোগদান করেন। মোহাম্মদ তোয়াহারও এই সম্মেলনে যোগদানের কথা ছিলো কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয়নি। শাহ আজিজুর রহমান এবং তাঁর দলভুক্ত পূর্বতন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম ছাত্র লীগের কিছু সদস্য এই সম্মেলনে যোগদানের চেষ্টা করলেও গণতান্ত্রিক যুব লীগের প্রতিনিধিরাই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিদল হিসাবে এই সম্মেলনে স্বীকৃতি লাভ করেন।[২৯]

৪ ॥ তমদ্দুন মজলিশের প্রাথমিক উদ্যোগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র এবং অধ্যাপকের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিস নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে আলাপ-আলোচনা সভাসমিতি ইত্যাদি ব্যাপারে প্রথম থেকেই বেশ কিছুটা সক্রিয় হয়। তারা ১৫ই সেপ্টেম্বর 'পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষা বাংলা—না উর্দু?' এই নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। তাতে লেখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরি-সংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'ইত্তেহাদে'র সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদ। তাছাড়া এই পুস্তিকাটির প্রথম দিকে তমদ্দুন মজলিসের পক্ষে ভাষা বিষয়ক একটি প্রস্তাব সংযোজিত হয়। সেটি লেখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিভাগের অধ্যাপক এবং তমদ্দুন মজলিনের প্রধান কর্মকর্তা আবুল কাসেম। নিচে সেই প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হলো :

১। বাংলা ভাষাই হবে :

(ক) পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন।

(খ) পূর্ব পাকিস্তানের আদালতের ভাষা।

(গ) পূর্ব পাকিস্তানের অফিসাদির ভাষা।

২। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা হবে দুটি—উর্দু ও বাংলা।

৩। (ক) বাংলাই হবে পূর্ব পাকিস্তানেব শিক্ষা বিভাগের প্রথম ভাষা। ইহা পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা একশজনই শিক্ষা করবেন।

(খ) উর্দু হবে দ্বিতীয় ভাষা বা আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা। যারা পাকিস্তানের অন্যান্য অংশে চাকুরি ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হবেন তাঁরাই শুধু ও ভাষা শিক্ষা করবেন। ইহা পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ৫ হতে ১০ জন শিক্ষা করলেও চলবে। মাধ্যমিক স্কুলের উচ্চতর শ্রেণীতে এই ভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শিক্ষা দেওয়া যাবে।

(গ) ইংরেজী হবে পূর্ব পাকিস্তানের তৃতীয় ভাষা বা আন্তর্জাতিক ভাষা। পাকিস্তানের কর্মচারী হিসাবে যাঁরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চাকুরি করবেন বা যাঁরা উচ্চতর বিজ্ঞান-শিক্ষায় নিয়োজিত হবেন তাঁরাই শুধু ইংরেজী শিক্ষা করবেন। তাঁদের সংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানের হাজার করা ১ জনের চেয়ে কখনো বেশী হবে না। ঠিক একই নীতি হিসাবে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলিতে ওখানের স্থানীয় ভাষা

বা উর্দু প্রথম ভাষা বাংলা দ্বিতীয় ভাষা আর ইংরেজী তৃতীয় ভাষার স্থান অধিকার করবে।

৪। শাসনকার্য ও বিজ্ঞান-শিক্ষার সুবিধার জন্য আপাততঃ কয়েক বৎসরের জন্য ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পূর্ব পাকিস্তানের শাসনকার্য চলবে। ইতিমধ্যে প্রয়োজনানুযায়ী বাংলা ভাষার সংস্কার সাধন করতে হবে।[১]

আবুল কাসেম রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে তাঁর এই লেখায় বলেন যে ইংরেজরা একসময় জোর করে আমাদের ঘাড়ে ইংরেজী ভাষা চাপিয়ে দিয়েছিলো। সেইভাবে কেবলমাত্র উর্দু অথবা বাংলাকে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করলে পূর্বের সেই সাম্রাজ্যবাদী অযৌক্তিক নীতিরই অনুসরণ করা হবে। তিনি উল্লেখ করেন যে কোনো কোনো মহলে সেই প্রচেষ্টা চলছে এবং তাকে প্রতিহত করার জন্যে আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। সর্বশেষে তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ থেকে তিনি দাবী করেন :

লাহোর প্রস্তাবেও পাকিস্তানের প্রত্যেক ইউনিটকে সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কাজেই প্রত্যেক ইউনিটকে তাদের স্ব স্ব প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষা কি হবে তা নির্ধারণ করবার স্বাধীনতা দিতে হবে।[২]

পুস্তিকাটির অন্য দুজন লেখকের মধ্যে কাজী মোতাহার হোসেনের "রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা-সমস্যা" নামক প্রবন্ধটিতে ভাষা সমস্যাকে তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখার কিছুটা চেষ্টা আছে। তিনি তাঁর প্রবন্ধে বাংলা ভাষার উন্নতি ও চর্চার ক্ষেত্রে মুসলমানদের ভূমিকা উল্লেখ করে বলেন :

মোগল যুগে বিশেষ করে আরাকান রাজসভার অমাত্যগণ, বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করেছেন। মুসলমান সভাকবি দৌলত কাজী এবং সৈয়দ আলাওল বাংলা কবিতা লিখে অমর কীর্তি লাভ করেছেন। এঁদের ভাষা সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী, উর্দু, প্রাকৃত প্রভৃতি নানা ভাষার শব্দ-সম্ভারে সমৃদ্ধ ছিল; কিন্তু এঁরা জোর করে কোনো নির্দিষ্ট ভাষা থেকে বিকট বিকট শব্দ আমদানী করতে চেষ্টা করেননি, তৎকালীন জনসমাজের নিত্য ব্যবহৃত বা সহজবোধ্য ভাষাতেই তাঁরা কাব্য রচনা করে গেছেন।[৩]

এসব কথা বলার প্রয়োজন হয়েছিলো তার কারণ এক শ্রেণীর লোকের ধারণা অনুসারে বাংলা হিন্দুদের ভাষা কাজেই পরিত্যাজ্য এবং উর্দু ইসলামের

ভাষা কাজেই গ্রহণীয়। এই সমস্যার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন :

পূর্ব বাংলার মুসলমানদের আড়ষ্টতার আরও দুটি কারণ ঘটেছিল। প্রথমটি মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অবহেলা, আর দ্বিতীয়টি ধর্মীয় ভাষার সম্পর্কিত মনে করে উর্দু ভাষার প্রতি অহেতুক আকর্ষণ বা মোহ।[৪]

এর ফলে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তা হলো :

বাঙালী মুসলমানের সত্যিকার সভ্যতা বলতে যেন কোনো জিনিসই নাই, পরের মুখের ভাষা বা পরের সেখানো বুলিই যেন তার একমাত্র সম্পদ। স্বদেশে সে পরবাসী বিদেশীই যেন তার আপন।

তাই তার উদাসীভাব, পশ্চিমের প্রতি অসহায় নির্ভর, আর নিজের প্রতি নিদারুণ আস্থাহীনতা পশ্চিমা চতুর লোকেরা এ অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছে। তারা জানে যে, বৃহৎ পাগড়ী বেঁধে বাংলা দেশে এলেই এঁদের পীর হওয়া যায়, কমের পক্ষে মৌলবীর আসন গ্রহণ করে বেশ দু-পয়সা রোজগারের যোগাড় হয়। শহুরে দোকানদার যেমন করে গ্রাম্য ক্রেতাকে ঠকিয়ে লাভবান হতে পারে, এ যেন ঠিক সেই অবস্থা! বাস্তবিক বাঙালী মুসলমান বাঙাল বলেই শুধু পশ্চিমা কেন, পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণের সর্বভূতের কাছেই উপহাস ও শোষণের পাত্র।[৫]

বিকৃত ধর্মীয় সংস্কার কিভাবে মানুষকে বিপথগামী করে সে বিষয়ে তিনি বলেন :

আমি উর্দু ভাষাকে নিন্দা বা অশ্রদ্ধা করি না, কিন্তু বাঙালী মুসলমানের উর্দুর মোহকে সত্যসত্যই মারাত্মক মনে করি। যখন দেখি, উর্দু ভাষায় একটা অশ্লীল প্রেমের গান শুনেও বাঙালী সাধারণ ভদ্রলোক আল্লাহের মহিমা বর্ণিত হচ্ছে মনে ক'রে ভাবে মাতোয়ারা, অথবা বাংলা ভাষায় রচিত উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীতও হারাম বলে নিন্দিত, তখনই বুঝি এই সব অবোধ ভক্তি বা অবোধ নিন্দার প্রকৃত মূল্য কিছুই নাই।[৬]

কাজেই ডক্টর মোতাহার হোসেনের মতে বাংলা চর্চা ব্যতীত মুসলমানদের অন্য উপায় নেই :

এতদিন মুসলমান কেবল হিন্দুর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে বসে বলেছেন যে হিন্দুরা বাংলা ভাষাকে হিন্দুয়ানীভাবে ভরে দিয়েছে, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে ত তা চলবে না। এখানে ইসলামী ঐতিহ্য পরিবেশন করার দায়িত্ব মুখ্যতঃ মুসলমান সাহিত্যিকদেরই বহন করতে হবে। তাই

আজ সময় এসেছে, মুসলমান বিদ্বজ্জন পুঁথি-সাহিত্যের স্থলবর্তী বাংলা-সুসাহিত্য সৃষ্টি করে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয় স্থাপন করবেন; তবেই মাতৃভাষা সম্পূর্ণ সমৃদ্ধ হবে এবং ইসলামী ভাবধারা যথার্থভাবে জনসাধারণের প্রাণের সামগ্রী হয়ে তাদের দৈন্য ও হীনতা-বোধ দূর করবে। উর্দুর দুয়ারে ধর্না দিয়ে আমাদের কোনো কালেই যথার্থ লাভ হবে না।[৭]

উপরোল্লিখিত উক্তিগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হলেও কাজী মোতাহার হোসেনের অন্য কতকগুলি অংশের বক্তব্য অধিকতর উল্লেখযোগ্য :

দারিদ্র্য দূর করতে হলে সামাজিক বৈষম্য দূর করা, বৈদেশিক শোষণ থেকে আত্মরক্ষা করা, এবং জাতীয় সম্পদ যাই থাক, শিল্প বাণিজ্যের সাহায্যে তার সুবিনিময়ের ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। শুধু প্রভাব কিছুটা খর্ব হলেই হবে না—ইংরেজের স্থান যেন বৈদেশিক বা অন্য কোনো প্রদেশীয় লোকে দখল করে না বসে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। কুচক্রী লোকেরা যাতে শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে, ভাষার বাধা সৃষ্টি ক'রে নানা অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মানসিক বিকাশে বাধা না জমাতে পারে, সে বিষয়ে নেতৃবৃন্দ এবং জনসাধারণকে সজাগ থাকতে হবে।[৮]

কাজেই,

উর্দুকে শ্রেষ্ঠ ভাষা বা বনিয়াদী ভাষা বলে চালাবার চেষ্টার মধ্যে যে অহমিকা প্রচ্ছন্ন আছে তা আর চলবে না। নবজাগ্রত জনগণ আর মুষ্টিমেয় চালিয়াত বা তথাকথিত বনিয়াদি গোষ্ঠীর চালাকিতে ভুলবে না। বরং পূর্ব পাকিস্তানে সরকারী চাকুরি করতে হলে প্রত্যেককে বাংলা ভাষায় মাধ্যমিক মান পর্যন্ত পরীক্ষা দিয়ে যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। অন্যথায় শিক্ষানবীশী সময়ের পরে অযোগ্য এবং জনসাধারণের সহিত সহানুভূতিহীন বলে এরূপ কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হবে।[৯]

সর্বশেষে কায়েমী স্বার্থবাদীদেরকে সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন :

আমাদের দেশেও, নোতুন পাকিস্তান রাষ্ট্রে জনগণ প্রমাণ করবে যে তারাই রাজা—উপাধিধারীদের জনশোষণ আর বেশী দিন চলবে না। বর্তমানে যদি গায়ের জোরে উর্দুকে বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের উপর রাষ্ট্রভাষা রূপে চালাবার চেষ্টা হয়, তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে। কারণ ধূমায়িত অসন্তোষ বেশী দিন চাপা থাকতে পারে না। শীঘ্রই তাহলে পূর্ব পশ্চিমের সম্বন্ধের অবসান হবার আশঙ্কা আছে। জনমতের দিকে লক্ষ্য রেখে ন্যায়সঙ্গত

এবং সমগ্র রাষ্ট্রের উন্নতির সহায়ক নীতি ও ব্যবস্থা অবলম্বন করাই দূরদর্শী রাজনীতিকের কর্তব্য।[১০]

'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু?'। পুস্তিকাটিতে আবুল মনসুর আহমদ 'বাংলা ভাষাই হবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক তাঁর দুই পৃষ্ঠার ছোট লেখাটির মধ্যে বলেন:

> উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিলে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজ রাতারাতি 'অশিক্ষিত' ও সরকারী চাকুরির "অযোগ্য" বনিয়া যাইবেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফারসীর জায়গায় ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে রাতারাতি "অশিক্ষিত" ও সরকারী কাজের "অযোগ্য" করিয়াছিল।[১১]

অর্থাৎ তাঁর বক্তব্যের সরল অর্থ দাঁড়ায় এই যে ইংরেজরা সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা অনুযায়ী যেমন ভারতবর্ষের মুসলমানদেরকে অযোগ্য করেছিলো অনুরূপভাবে পশ্চিম পাকিস্তানীরাও উর্দুকে পূর্ব পাকিস্তানের উপর চাপিয়ে দিলে বাঙালীদেরকে অশিক্ষিত এবং অযোগ্য করার ষড়যন্ত্রে তাঁরা লিপ্ত আছেন বলে মনে করাই যুক্তিসঙ্গত হবে।

প্রথম পর্যায়ে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে ভাষা আন্দোলনের জন্ম এবং দ্রুত প্রসারের জন্যে পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত অনেক উর্দুভাষী সরকারী কর্মচারী এবং পশ্চিম পাকিস্তানী আমলাদের বাঙালী বিরোধী মনোভাব এবং কার্যকলাপই অনেকাংশে দায়ী। উপরোল্লিখিত উক্তিগুলি থেকে একটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। স্বাধীনতা লাভের মাত্র একমাসেরও কম সময়ের মধ্যে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে তিক্ততা শুধু যে সৃষ্টি হয়েছে তাই নয়, যথেষ্ট বৃদ্ধি লাভ করেছে। ভাষার প্রশ্নটি এক অংশের দ্বারা যে অপর অংশের উপর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ আধিপত্য বিস্তারের প্রশ্নের সাথে জড়িত সে চেতনাও এই স্তরে ভাষা বিষয়ক চিন্তা এবং আলোচনার মধ্যে উপস্থিত।

সম্প্রতি ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে ফরিদ আহমদও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।[১২] তাঁর মতে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সাধারণ মানুষের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার আগ্রহ কারো মধ্যে দেখা গেলো না। উপরন্তু দেশের অবস্থা দেখে মনে হলো যেন সাদা প্রভুদের স্থলে শুরু হলো দেশীয় প্রভুদের এক নিশ্চিন্ত রাজত্ব। এই নোতুন প্রভুদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ স্বাধীনতা লাভের পথ থেকেই পুঞ্জীভূত হতে থাকলো এবং তার ফলে সরকারী আমলারা ক্রমশঃ জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকলেন।

এই সমস্ত সরকারী আমলারা উর্দুতে এবং ইংরেজীতে কথা বলতেন এবং তাঁদের প্রায় সকলের মাতৃভাষাই ছিলো উর্দু। কাজেই অতি সত্বর সাধারণ মানুষেরা এই সব কর্মচারীদেরকে বিদেশী বলে চিহ্নিত করলো এবং তাদের ভাষা উর্দুও পরিগণিত হলো একটি বিদেশী ভাষা রূপে।

'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা—না উর্দু?' নামে এই পুস্তিকাটি বেশী কপি বিক্রি করা সম্ভব হয়নি। যাঁদের কাছে সেটা বিক্রি করার চেষ্টা হয়েছিলো তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই তখন ছিলেন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিরুদ্ধে। শুধু শিক্ষিত জনসাধারণ নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক ছাত্রেরও অভিমত তাই ছিলো। সেজন্যে তাঁরা রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে তেমন উৎসাহ দেখাননি। এমন কি মুসলিম হল, ফজলুল হক হল ইত্যাদি ছাত্রাবাসেও এ নিয়ে প্রথম দিকে কোনো ছোট-খাট ঘরোয়া বৈঠকের আয়োজন করাও ছিলো কষ্টসাধ্য।[১৩]

১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে তমদ্দুন মজলিসের সম্পাদক আবুল কাসেম ভাষা প্রশ্ন আলোচনা ও বিবেচনার জন্যে ফজলুল হক হলে একটি সাহিত্য সভার আয়োজন করেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন পূর্ব বাঙলা সরকারের মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী। সভাপতি ব্যতীত উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে কবি জসিমউদ্দীন, কাজী মোতাহার হোসেন, প্রাদেশিক মন্ত্রী সৈয়দ মহম্মদ আফজল এবং আবুল কাসেম অন্যতম। বক্তাদের মধ্যে সকলেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার যৌক্তিকতা এবং তার জন্যে উপযুক্ত আন্দোলন গঠনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন।[১৪]

৫ ॥ ভাষার দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রথম সভা

৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭ ঢাকাতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সর্বশেষ বৈঠক বসে। ওয়ার্কিং কমিটির এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে উর্দুকে পূর্ব বাঙলার সরকারী ভাষা করা হবে না। কমিটির সভাপতি মৌলানা আকরম খানকে এই মর্মে সংবাদপত্রে একটি ঘোষণা প্রকাশের ক্ষমতা প্রদান করা হয়।[১]

প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সরকারী বাসভবন 'বর্ধমান হাউসে' এই বৈঠক চলাকালে বহুসংখ্যক ছাত্র এবং কয়েকজন শিক্ষক সেখানে উপস্থিত হয়ে বাংলাকে অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে বিক্ষোভ

প্রদর্শন করেন। তাঁদের দাবী সহানুভূতির সাথে বিবেচিত হবে, মৌলানা আকরম খানের থেকে এই আশ্বাস লাভের পর বিক্ষোভকারীরা 'বর্ধমান হাউস' পরিত্যাগ করেন।[২]

ঐ দিনই তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ থেকে আবুল কাসেম এবং আবু জাফর শামসুদ্দীন মৌলানা আকরম খানের সাথে ভাষার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেন। এই আলোচনার পর একটি প্রেস বিবৃতিতে আবুল কাসেম বলেন, আলোচনা প্রসঙ্গে মৌলানা আকরম খান তাঁদেরকে আশ্বাস দেন যে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষারূপে বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষাকে চাপোনোর চেষ্টা করলে পূর্ব পাকিস্তান বিদ্রোহ ঘোষণা করবে এবং তিনি নিজে সেই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেবেন।[৩]

এর পূর্বে করাচীতে একটি শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই সম্মেলনে অংশ গ্রহণের পর পূর্ব বাঙলা সরকারের মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার এবং আবদুল হামিদ ৫ই সন্ধ্যায় ঢাকা বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সাথে সাক্ষাৎকারের সময় শিক্ষা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে যা বলেন তার বিবরণ ৬ই ডিসেম্বরের মর্নিং নিউজে প্রকাশিত হয়। এই বিবরণ অনুসারে তাঁরা বলেন যে শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। ঐদিন মর্নিং নিউজে প্রকাশিত এবং এ. পি. আই. পরিবেশিত একটি খবরে বলা হয় যে, শিক্ষা সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে উর্দুকে পাকিস্তানের লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই। পাকিস্তান সংবিধান সভাই রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নের মীমাংসা করবে।

শিক্ষা সম্মেলনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ৬ই ডিসেম্বর বেলা ছুটোর সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ, জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের এক বিরাট সভা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং তমদ্দুন মজলিসের সম্পাদক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।[৪] রাষ্ট্রভাষার দাবীতে বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই হলো সর্বপ্রথম সাধারণ ছাত্রসভা। এই সভায় যাঁরা বক্তৃতা করেন তাঁদের মধ্যে মুনীর চৌধুরী, আবদুর রহমান, কল্যাণ দাশগুপ্ত, এ. কে. এম. আহসান, এস. আহমদ অন্যতম। ভাষা সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তারা বক্তৃতা দেন এবং বাংলা ভাষাকে সাংস্কৃতিক দাসত্বের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্রের বিষয় উল্লেখ করেন। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের বাঙালীত্বকে খর্ব করার এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্য তাঁরা শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে আহ্বান জানান।[৫]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট ফরিদ আহমদ এই সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পেশ করেন এবং সেগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:

১। বাংলাকে পাকিস্তান ডমিনিয়নের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করা হোক।

২। রাষ্ট্রভাষা এবং লিংগুয়া ফ্রাংকা নিয়ে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে তার মূল উদ্দেশ্য আসল সমস্যাকে ধামাচাপা দেওয়া এবং বাংলা ভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।

৩। পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী ফজলুল রহমান এবং প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার উর্দু ভাষার দাবীকে সমর্থন করার জন্যে সভা তাঁদের আচরণের তীব্র নিন্দা করছে।

৪। সভা 'মর্নিং নিউজ'-এর বাঙালী বিরোধী প্রচারণার প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করছে এবং জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্যে পত্রিকাটিকে সাবধান করে দিচ্ছে।[৬]

এক ঘণ্টাকাল এই সভা চলার পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে মিছিল সহকারে ছাত্রেরা বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে সেক্রেটারিয়েট ভবনে উপস্থিত হন। সেখানে কৃষিমন্ত্রী মহম্মদ আফজল ছাত্রদের সামনে বক্তৃতা দেন এবং বাংলা ভাষার দাবীকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দান করেন। এর পর ছাত্রেরা প্রাদেশিক মন্ত্রী নূরুল আমীনের বাসভবনে উপস্থিত হলে মন্ত্রী তাদেরকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি বাংলার জন্য সংগ্রাম করবেন এবং একাজে ব্যর্থ হলে মন্ত্রীত্ব পদে ইস্তাফা দেবেন। নূরুল আমীনের বাসভবন থেকে মিছিলটি হামিদুল হক চৌধুরীর বাসভবনে গমন করে। তিনিও বাংলার দাবী সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং কাজে ব্যর্থ হলে ইস্তাফা দেওয়ার কথা বলেন।[৭] মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য বলেন যে, হামিদুল হক প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষার দাবীকে সমর্থন করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং ছাত্রদের সাথে এই বিষয়ে তাঁর অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়।[৮] যাই হোক, হামিদুল হক চৌধুরীর বাসভবন থেকে মিছিলটি প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের বাসভবনে উপস্থিত হয়। নাজিমুদ্দীন সে সময় অসুস্থ থাকায় তিনি ছাত্রদের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে তাঁর অক্ষমতা জানান এবং লিখিতভাবে তিনি তাদেরকে বলেন যে, শরীর সুস্থ হওয়ার পর তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি এবং পার্লামেন্টারী পার্টির মতামত না জানা পর্যন্ত তিনি ভাষার প্রশ্নে কোনো সুনির্দিষ্ট মত প্রকাশ করতে অক্ষম।[৯] ফরিদ

আহমদ কিন্তু উল্লেখ করেছেন যে নাজিমুদ্দীন তাঁদের সাথে স্বাস্থ্যগত কারণে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেও তাঁরা সেকথা অগ্রাহ্য করে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের জন্য দাবী জানাতে থাকেন এবং পরিশেষে নাজিমুদ্দীনের ব্যক্তিগত সেক্রেটারী খাজা নসরুল্লাহ তাঁদেরকে জানান যে, তিনজনের একটি প্রতিনিধিদলের সাথে তিনি সাক্ষাৎ করতে সম্মত হয়েছেন। এর পর ফরিদ আহমদ সহ তিনজনের একটি প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর সাথে বেশ কিছুক্ষণ বিতর্কের পর তিনি একটি কাগজে লিখিতভাবে আশ্বাস দেন যে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে তিনি চেষ্টা করবেন।[১০] খাজা নাজিমুদ্দীনের বাসভবন থেকে মিছিলটি মর্নিং নিউজের ঢাকা অফিসে গিয়ে কাগজের স্থানীয় প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাৎ করে ভাষা সম্পর্কে তাঁদের নীতি পরিহার করার দাবী জানান।[১১]

৬॥ করাচীর শিক্ষা সম্মেলন

১৯৪৭-এর ৩ই ডিসেম্বর মর্নিং নিউজে প্রাদেশিক মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার এবং আবদুল হামিদের শিক্ষা সম্মেলন সম্পর্কে যে বক্তব্য প্রকাশিত হয়, তার প্রতিবাদে হাবিবুল্লাহ বাহার ১১ই ডিসেম্বর একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন :

> করাচীতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলন সম্পর্কে অনেক বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। ঢাকা থেকে দূরে থাকার ফলে আমার পক্ষে সবগুলি সংবাদপত্র দেখা সম্ভব হয়নি। মর্নিং নিউজে বড় বড় হেড লাইনে প্রকাশিত একটি বিবৃতির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিলো। সেই অনুসারে আমি এবং শিক্ষামন্ত্রী জনাব আবদুল হামিদ সাংবাদিকদের কাছে বলেছি যে সম্মেলনে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। আমি তৎক্ষণাৎ এ. পি. আই.-এর মাধ্যমে ঘটনাটিকে অস্বীকার করে বলেছিলাম যে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে সম্মেলনে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। বিভিন্ন সংবাদপত্রে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কার্যবিবরণী প্রকাশিত হওয়াতে আমার বিবৃতি সত্ত্বেও বিভ্রান্তি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিলো।
>
> ডিসেম্বরের ১১ তারিখে আজাদে প্রকাশিত জনাব ফজলুর রহমানের বিবৃতির ফলে বিভ্রান্তি আরও বৃদ্ধি লাভ করেছে। জনসাধারণের অবগতির জন্যে আমি এ বিষয়ে একটি বিস্তৃত বিবৃতি প্রকাশ করবো স্থির করেছি। কিন্তু তাতে অনেক সময় লাগবে। ইত্যবসরে আমি ব্যাখ্যা

প্রসঙ্গে একথা বলতে চাই যে, সংশ্লিষ্ট সাবকমিটি পাকিস্তানের সমস্ত স্কুলে উর্দুকে একটি বাধ্যতামূলক ভাষা হিসাবে শিক্ষা দেওয়া এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় উত্তরোত্তরভাবে উর্দুকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার জন্যে সুপারিশ করেন। কিন্তু হামি·দ সাহেব, আমি এবং বাঙলার অন্যান্য প্রতিনিধি এতে সম্মত হইনি। আমরা অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রতিবাদ করে বলেছি যে বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষাকে বাঙলাদেশ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করবে না। আমরা একথাও বলেছি যে বাঙলাদেশের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে উর্দুকে বাধ্যতামূলক ভাষা করা যেতে পারে না। দুইদিনব্যাপী আলোচনার পর আমরা প্রতিনিধিদেরকে একথা বোঝাতে সক্ষম হই এবং তার ফলে সাব কমিটির সুপারিশ বাতিল হয়ে যায়। সভাপতি কর্তৃক আনীত একটি প্রস্তাবের শেষে উর্দুকে পাকিস্তানের লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা হিসাবে ঘোষণা করার কথা বলা হয়।
লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা বলতে মতামত বিনিময়ের জন্যে একটি সাধারণ ভাষা বোঝানো হয়েছিলো। রাষ্ট্রভাষা অথবা শিক্ষার মাধ্যমের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। সংবিধান সভার কাছে সম্মেলন কোনো সুপারিশ পেশ করেনি এবং ফজলুর রহমান সাহেবের বিবৃতিতে রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে যে প্রস্তাবের উল্লেখ করা হয়েছে সে রকম কোনো প্রস্তাবও সেখানে গৃহীত হয়নি।[১]

শিক্ষা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত এবং ফজলুর রহমানের বিবৃতিকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাঙলায় উত্তেজনা সৃষ্টির ফলে সরকারী মহলে যথেষ্ট উদ্বেগের সঞ্চার হয়। এই কারণে ১৫ই ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা দফতর থেকে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি[২] প্রচার করে বলা হয় যে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে এই নিয়ে পূর্ব বাঙলায় সম্প্রতি যে আন্দোলন চলছে সে বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিটিতে আরও বলা হয় যে ফজলুর রহমানের বিবৃতির অনেক ভুল বিবরণ বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশিত হয়েছে এবং তাঁকে ভ্রান্তভাবে উদ্ধৃতও করা হয়েছে। এর পর প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ফজলুর রহমানের উদ্বোধনী বক্তৃতা থেকে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর আসল বক্তব্যকে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করার প্রচেষ্টা হয় :

> শুধু শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে নয়, যে সংস্কৃতির তারা বাহন সেই সংস্কৃতির প্রসারের জন্যেও পাকিস্তানে প্রাদেশিক ভাষাগুলির সর্বোচ্চ বিকাশের ব্যবস্থা আমাদের করা প্রয়োজন। কিন্তু সেটা করার সময় আমাদের সাধারণ সংস্কৃতির ঐক্যকে আমরা বিসর্জন দিতে পারি না। এই ঐক্যকে

রক্ষা করার জন্যে আমাদের প্রয়োজন একটি আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা এবং সেক্ষেত্রে উর্দুর দাবীকে বিশেষভাবে বিবেচনা করা কর্তব্য।

এর পর উর্দুর দাবী সম্পর্কে নানা যুক্তির অবতারণা করে ফজলুর রহমান তাকে সারা পাকিস্তানের লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা হিসাবে গ্রহণের সুপারিশ করেন। এ বিষয়ে শিক্ষা সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় :

এই সম্মেলন উর্দুকে পাকিস্তানের লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যে সংবিধান সভার কাছে সুপারিশ করছে। এই সভা আরও প্রস্তাব করছে যে উর্দুকে স্কুলে একটি বাধ্যতামূলক ভাষা হিসাবে শিক্ষা দেওয়া হোক কিন্তু প্রাইমারী স্কুলে কোন্ পর্যায়ে উর্দু শিক্ষা শুরু করা হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্তের ভার প্রাদেশিক সরকারের হাতে অর্পণ করা হোক। স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম কি হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্তও প্রাদেশিক সরকার গ্রহণ করবে।[৩]

কেন্দ্রীয় শিক্ষা দফতরের এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশিত শিক্ষা সম্মেলনের উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি একটু আগে উদ্ধৃত হাবিবুল্লাহ বাহারের বিবৃতির বক্তব্যের সাথে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। প্রথমতঃ, হাবিবুল্লাহ বাহার তাঁর বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে শিক্ষা সম্মেলনের একটি সাব-কমিটি উর্দুকে পাকিস্তানের সমস্ত স্কুলে বাধ্যতামূলক ভাষা হিসাবে শিক্ষা দেওয়ার যে প্রস্তাব করেছিলো, সে প্রস্তাব তাঁর, শিক্ষামন্ত্রী আবদুল হামিদের এবং বাঙলাদেশের অন্যান্য প্রতিনিধিদের প্রতিবাদ ও প্রচেষ্টার ফলে বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু শিক্ষা দফতরের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে প্রস্তাবটি বাতিল হয়নি, যথারীতি গৃহীত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, হাবিবুল্লাহ বাহার বলেছেন যে সম্মেলন সংবিধান সভার কাছে কোনো সুপারিশ করেনি। কিন্তু সরকারী বিজ্ঞপ্তিটি থেকে দেখা যাচ্ছে যে সম্মেলন উর্দুকে পাকিস্তানের লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যে সংবিধান সভার কাছে সুপারিশ পেশ করেছে। হাবিবুল্লাহ বাহারের বিবৃতির তারিখ ১১ই ডিসেম্বর এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা দফতরের প্রেস বিজ্ঞপ্তির তারিখ ১৫ই ডিসেম্বর। বিজ্ঞপ্তিটি প্রচারিত হওয়ার পর হাবিবুল্লাহ বাহারের কোনো পালটা বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি।

৭ ॥ দুর্বৃত্তদের হামলা

৭ই ডিসেম্বর বিকেল ২-৩০ মিনিটে রেল কর্মচারীদের একটি সভা অনুষ্ঠিত

হয়। ইউনিয়নের নির্বাচিত সভাপতি অসুস্থ থাকায় সভাপতিত্ব করার জন্যে ফজলুল হককে নিয়ে আসা হয় কিন্তু সমস্ত অবাঙালী কর্মচারী একযোগে তাতে আপত্তি করলে ফজলুল হক সভাপতির আসন পরিত্যাগ করে চলে যান। এর পর বেলা প্রায় পাঁচটা পর্যন্ত দারুন ঝগড়া-বিবাদ এবং মারামারির পর সমস্ত অবাঙালীকে সভাস্থল থেকে তাড়িয়ে দিয়ে নূরুল হুদার সভাপতিত্বে নোতুন করে সভার কাজ শুরু হয়।[১]

এই সভা সম্পর্কে সেদিন ঢাকা শহরের লোকদের, বিশেষতঃ কুট্টিদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয় যে, সভাটি আসলে ছিলো হিন্দুদের সাথে মিলে ফজলুল হকের নেতৃত্বে একটি পাকিস্তানবিরোধী চক্রান্ত। তাছাড়া বাংলার মতো একটি হিন্দু ভাষাকে উর্দুর পরিবর্তে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্রের কথাও উল্লেখ করা হয়। এই সব প্রচারণার ফলে সেদিনই সিরাজউদ্দৌলা পার্কে ফজলুল হকের সভাপতিত্বে অন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হওয়াকালে কুট্টিরা সেখানে উপস্থিত হয়ে চেয়ারে অগ্নিসংযোগ ও অন্যান্য হাঙ্গামার সৃষ্টি করে এবং সাধারণভাবে ছাত্রদের উপর তারা ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।[২]

এই ঘটনার কয়েকদিন পর ১২ই ডিসেম্বর কিছুসংখ্যক লোক বাস ও ট্রাকে চড়ে পলাশী ব্যারাক এবং আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে উপস্থিত হয় এবং সরকারী কর্মচারী ও ছাত্রদেরকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকে। কয়েক রাউণ্ড গুলিও এ সময় তারা বর্ষণ করে। এই সংবাদ আগুনের মতো সারা ঢাকা শহরে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন এলাকা থেকে ছাত্র এবং ঢাকার জনসাধারণও এই গুণ্ডামী বন্ধ করার জন্যে ইঞ্জিনীয়ারিং হোস্টেলে সমবেত হন। শুধু তাই নয়, তাঁরা এর প্রতিকার দাবী করার জন্যে একটি মিছিল করে সেক্রেটারিয়েটের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এই মিছিলটি শুধু ছাত্র মিছিল ছিলো না। এতে ঢাকা শহরের বিভিন্ন অংশের এবং বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকরাও বিপুল সংখ্যায় যোগদান করেছিলেন। বস্তুতঃ বাংলা ভাষার দাবীতে এ জাতীয় মিছিল এই সর্বপ্রথম।[৩]

ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ ইত্যাদি পার হয়ে মিছিলটি প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী আবদুল হামিদের বাসভবনে উপস্থিত হয়। লুঙ্গী পরিহিত অবস্থায় মন্ত্রী মহোদয় তাড়াতাড়ি সমবেত ছাত্র-জনতার সাথে সাক্ষাৎ করেন।[৪]

গুণ্ডামীর প্রতিকারের জন্যে তাঁর কাছে দাবী জানানো হয়। এ ছাড়া তাঁকে ডাকটিকিট, মনি অর্ডার ফর্ম ইত্যাদি থেকে বাংলা ভাষা বর্জন সম্পর্কে

বলা হয় এবং উর্দুর সাথে বাংলাও যাতে এসব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে তাঁর কাছে সেই মর্মে দাবী জানানো হয়। রাষ্ট্রভাষা নিয়েও মন্ত্রীর সাথে সকলের ভয়ানক তর্কবিতর্ক চলে এবং তার পর বিক্ষোভকারীরা মন্ত্রীকে তাঁদের সাথে সেক্রেটারিয়েটে যেতে বলেন। তিনি সেই লুঙ্গী পরিহিত অবস্থাতেই মিছিলের সাথে সেক্রেটারিয়েটে যেতে বাধ্য হন। মিছিলটি মন্ত্রীর বাসভবনে অবস্থানকালে কিছুসংখ্যক বিক্ষোভকারী তাঁর বাগানের অনেক ফুল এবং গাছপালা নষ্ট করে দেয়।[৫]

সেক্রেটারিয়েটে সেদিন কৃষিমন্ত্রী মহম্মদ আফজল ব্যতীত অন্যসব মন্ত্রীই অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁদেরকে সে সময় ১৪ই ও ১৫ই ডিসেম্বরে আহূত সারা ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সর্বশেষ অধিবেশনে যোগদানের জন্যে করাচী যেতে হয়েছিলো।[৬]

মিছিল গন্তব্যস্থলে পৌছানোর পূর্বেই সেক্রেটারিয়েটের সমস্ত গেট ভেতর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও গেটের কাছে জনতা ছত্রভঙ্গ না হয়ে কোনো একটি উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করতে থাকে। এমন সময় আবদুল গণি রোড দিয়ে একটি গাড়িকে আসতে দেখে একজন সেটিকে থামায় এবং তার উপর দাঁড়িয়ে দেওয়াল ডিঙিয়ে সেক্রেটারিয়েটের মধ্যে প্রবেশ করে দ্রুতগতিতে বড় গেটটি ভেতর থেকে খুলে দেয়। এর ফলে মিছিলের জনতাকে আর গেটের বাইরে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। দলে দলে তারা সেক্রেটারিয়েটের ভেতরে প্রবেশ করে।[৭]

আবদুল হামিদ এবং সৈয়দ আফজলের অফিসের সামনে মিছিলটি উপস্থিত হলে কৃষি দফতরের সেক্রেটারী কাদরী পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে ছাত্রদেরকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে মন্ত্রী সৈয়দ আফজলকে পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি তাতে সম্মত না হয়ে ছাত্রদের সাথে আলাপ করে তাদেরকে বুঝিয়ে নিজের বক্তব্য বলার সিদ্ধান্ত নেন।[৮]

সৈয়দ আফজল দোতলা থেকে নিচে নেমে এসে ছাত্রদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে বাংলা ভাষা তিনিও চান, কাজেই ছাত্রদের সাথে তাঁর কোনো বিরোধ নাই। আবদুল হামিদও সমবেত ছাত্র-কর্মচারীদের সম্বোধন করে বাংলা ভাষার দাবী সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দেন। অল্পক্ষণ পর তদানীন্তন চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদকে সেখানে জোরপূর্বক হাজির করা হয় এবং তিনিও বাংলা ভাষার যথাযোগ্য স্বীকৃতির জন্যে চেষ্টা করবেন বলে ছাত্র-জনতার কাছে প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন।[৯] কিন্তু এসব সত্ত্বেও

উত্তেজিত জনতা শান্ত হলো না। শুধু তাই নয়, এ সময় তারা মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অপমানসূচক ধ্বনি দিতে থাকে এবং এক পর্যায়ে সৈয়দ আফজলের দাড়ি ধরেও আকর্ষণ করে।[১০] এ ছাড়া তারা উভয় মন্ত্রীকেই বাংলা ভাষার দাবী সমর্থন করবেন এবং সে কাজে ব্যর্থ হলে মন্ত্রীত্ব-পদে ইস্তাফা দেবেন, এই-মর্মে একটি লিখিত প্রতিশ্রুতিপত্রে স্বাক্ষর দান করতে বাধ্য করে।[১১]

দুপুরের দিকে মিছিলটি সেক্রেটারিয়েটে ঢোকে কিন্তু চেঁচামেচি তর্কবিতর্কের মধ্যে দিয়ে বিকেল প্রায় চারটে হয়ে এলো। ছাত্রদের দাবী হলো গুণ্ডারা ছাত্রদের উপর কি অত্যাচার করেছে সেটা মন্ত্রী মহোদয়কে নিজে গিয়ে দেখে এসে তার উপযুক্ত প্রতিকার করতে হবে। অবশেষে একজন প্রস্তাব করলো যে মিছিলটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দিকে যাবে এবং মন্ত্রী আফজলকে তাদের সাথে যেতে হবে। শুধু তাই নয়, মন্ত্রী মহোদয়কে সেই মিছিল পরিচালনা করতে হবে। সৈয়দ আফজল এ প্রস্তাবের বিরোধিতা না করে বাধ্য হয়ে মিছিলে শরীক হতে সম্মত হন এবং পায়ে হেঁটে শেষ পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হোস্টেলে পৌঁছান। তিনি হোস্টেলের ভিতরে ঢুকে সব কিছু দেখে শুনে ছাত্রদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে তার উপযুক্ত প্রতিবিধানের প্রতিশ্রুতি দেন।[১২]

কিন্তু ছাত্রেরা তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে দাবী করলেন যে তিনি যে রাষ্ট্রভাষা বাংলা চান সেটা আবার তাঁকে লিখিতভাবে স্বীকার করতে হবে। একথায় মন্ত্রী কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করার পর অবশেষে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে তিনিও চান একথা লিখে দিতে বাধ্য হন।[১৩]

এর পর মহম্মদ আফজল সহ মিছিলটি পলাশী ব্যারাকের দিকে যায় এবং মগরেবের নামাজের পর সেখানে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে অনেকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেগুলিতে গুণ্ডামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং তাদের শাস্তি দাবী ছাড়াও বাংলা ভাষা তার যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করা হয়।[১৪]

গুণ্ডারা যে সমস্ত গাড়িগুলিতে চড়ে এসেছিলো সেগুলির নম্বর পূর্বেই রাখা হয়েছিলো। মন্ত্রী সেই গাড়ি এবং তাদের ড্রাইভারদেরকে হাজতে আটক করার জন্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রহমতুল্লাহ এবং ডি. আই. জি. ওবায়দুল্লাকে সভাস্থলেই আদেশ দেন।[১৫]

সেদিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঢাকা শহরে প্রবল উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে। এ পর্যন্ত আশঙ্কা করা হয় যে উর্দু ও বাংলা সমর্থকদের মধ্যে হয়তো

ছোরাছুরি নিয়ে দারুণ মারপিট হতে পারে। অবস্থা আয়ত্বে আনার উদ্দেশ্যে মন্ত্রী সৈয়দ আফজল শহরের বিভিন্ন এলাকা ঘোরার প্রস্তাব করেন এবং ফরিদ আহমদ ও অন্যান্য কয়েকজনকে নিয়ে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ঢাকার কতকগুলি এলাকা পরিদর্শন করেন। এ সময় সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের মধ্যে একমাত্র কলকাতার দৈনিক স্টেট্সম্যানের বিশেষ প্রতিনিধি আবদুল ওয়াহাব তাঁদের সাথে ছিলেন।[১৬]

সেক্রেটারিয়েট কর্মচারীরা যে এ ধরনের কোনো মিছিল তৈরী করে সংগঠিতভাবে নিজেদেরই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে পারে এটা অনেকাংশে অবিশ্বাস্য মনে হয়। কিন্তু তখনকার দিনে তাদের জীবন এবং মানসিক অবস্থার কথা স্মরণ করলে এ সব-কিছুকেই সম্ভব মনে হবে।

উপরে বর্ণিত ঘটনার কিছু পূর্বে খুব সম্ভবতঃ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, প্রধান মন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের সরকারী বাসগৃহ 'বর্ধমান হাউসে' সেক্রেটারিয়েট কর্মচারীদের একটি বিক্ষুব্ধ মিছিল প্রবেশ করে। নীলক্ষেত ব্যারাকে তখন পানির দারুণ অভাব। তা ছাড়া দূষিত জল নিষ্কাশন, আবর্জনা পরিষ্কার ইত্যাদির কোনো ব্যবস্থা সেখানে না থাকায় নীলক্ষেতে এক দারুণ অস্বাস্থ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। নীলক্ষেতে বসবাসকারী সেক্রেটারিয়েট কর্মচারীরা এ সবের প্রতিবাদে একদিন সকালের দিকে প্রধান মন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও করেন। তাঁদের সকলের হাতে ছিলো একটা করে বদনা, গাড়ু অথবা ঐ জাতীয় একটা কিছু। তাঁরা সেগুলি হাতে নিয়েই চীৎকার করে তাঁদের অবস্থার প্রতিকারের দাবী জানাতে থাকেন।[১৭]

চেঁচামেচির মধ্যে একজন জোরে চীৎকার করে বলেন যে তাঁদের দুরবস্থার আশু প্রতিকার না হলে নাজিমুদ্দীনকে তাঁরা 'আউঙ সান' করবেন। এই ঘটনার কিছুকাল পূর্বে জুলাই মাসে আততায়ীর হাতে বর্মার প্রধানমন্ত্রী আউঙ সান এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্মী নিহত হন। কিন্তু নাজিমুদ্দীন এসবের কিছুই জানতেন না অথবা ঠিক সেই সময় ব্যাপারটি তাঁর খেয়াল ছিলো না। তিনি তাঁর পার্শ্ববর্তী একজনকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আউঙ সান মানে কি?'[১৮]

কিছুক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর প্রতিকারের আশ্বাস পেয়ে নীলক্ষেত ব্যারাকের সেক্রেটারিয়েট কর্মচারীরা 'বর্ধমান হাউস' পরিত্যাগ করেন।

১২ই ডিসেম্বরের উপরোল্লিখিত ঘটনা সম্পর্কে পূর্ব বাঙলা সরকার সেদিন একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন।[১৯] তাতে বলা হয়:

> একটি ঘটনায় বিশ ব্যক্তি আহত, যার মধ্যে দুজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং অন্যদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, এই গুজব প্রচারিত

হওয়ার পর আজ শহরে কিছুটা উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে। জানা গেছে যে, সকালের দিকে কিছুসংখ্যক অজ্ঞাত ব্যক্তি একটি বাসে চড়ে প্রচার করে বেড়ায় যে, উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা উচিত। পলাশী ব্যারাকের লোকজন এবং আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রেরা এই ঘোষণায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং উভয়পক্ষে হাতাহাতির ফলে উপরোল্লিখিত ব্যক্তিরা আহত হয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়ার পর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সেই এলাকায় পাহারা মোতায়েন করা হয়। এই ঘটনার পর শহরে অনেক ভিত্তিহীন গুজব ছড়াতে থাকে এবং কেউ কেউ বলে যে দু-তিন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে। অপর একটি রিপোর্ট অনুসারে নাকি পুলিস গুলি ছুড়ে এবং জনতার উপর লাঠিচার্জ করে উপরোক্ত ব্যক্তিদের মৃত্যু ঘটায়।

এই সমস্ত মিথ্যা গুজবের ফলে শহরে ত্রাসের সঞ্চার হয় এবং বিকেলের দিকে একটি মিছিল সেক্রেটারিয়েটে গিয়ে সেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। উত্তেজনা সত্ত্বেও অবস্থাকে সুকৌশলে এবং সংযমের সাথে আয়ত্তে আনা হয়। কৃষিমন্ত্রী মাননীয় সৈয়দ আফজল সাহেব এবং শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় আবদুল হামিদ সাহেব বিক্ষোভকারীদের সাথে সাক্ষাৎ করে শৃঙ্খলা মেনে চলার জন্যে তাদের কাছে আবেদন জানান। জনাব আবদুল হামিদ জোর দিয়ে বলেন যে ভাষার প্রশ্ন নিয়ে তর্কের কোনো অবকাশ নেই। কারণ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ইচ্ছা অনুসারেই সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। শ্রোতাদের উদ্দেশ করে সরকারের চীফ সেক্রেটারী তাঁর বক্তৃতায় নোতুন রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা এবং আইন-কানুন মেনে চলার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেন। সকালের ঘটনার সাথে জড়িত অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণেরও তিনি প্রতিশ্রুতি দেন। বিক্ষোভকারীরা শান্তিপূর্ণভাবে বক্তৃতা শোনে এবং মন্ত্রীদের থেকে এই আশ্বাস লাভের পর সেখান থেকে চলে যায়। সকালের ঘটনাটির এবং বিশেষ করে সেই ঘটনার প্ররোচণা কারা যুগিয়েছে সে সম্পর্কে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রমাণ থেকে মনে হয় যে এই প্রদেশের মুসলমানদের মধ্যে ভাঙন ধরাবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের যে সমস্ত শত্রুরা অহরহ সজাগ আছে তারাই এই ঘটনা সৃষ্টির জন্যে দায়ী।

উপরোক্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তিটিতে সেদিনকার ঘটনাবলীর বিশেষ বিশেষ অংশ চাপা দেওয়া থেকে শুরু করে সাম্প্রদায়িক প্রচারণা পর্যন্ত সমস্ত কিছুই আছে।

জনতা শান্তভাবে চীফ সেক্রেটারী এবং মন্ত্রীদের বক্তৃতা শুনেছে এবং তার পর তারা শান্তভাবেই সেক্রেটারিয়েট ভবন পরিত্যাগ করে গেছে, এই কথা বলা হলেও বহু প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে সে কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলেই প্রমাণিত হয়। উপরন্তু বিজ্ঞপ্তিটির সর্বশেষ বাক্যে প্রদেশের মুসলমানদের মধ্যে ভাঙন ধরাবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের যে সমস্ত শত্রু অহরহ সজাগ আছে তারাই এই ঘটনা সৃষ্টির জন্যে দায়ী এই কথা বলে সূক্ষ্মভাবে হিন্দুদেরকে সমস্ত ঘটনার জন্যে দায়ী করার প্রচেষ্টার মধ্যে সরকারের সাম্প্রদায়িক নীতিই খুব সহজভাবে ধরা পড়ে। শুধু তাই নয়। পরবর্তী সময়ে ঘটনাটি সম্পর্কে কোনো সত্যিকার তদন্ত না করা এবং সেদিনের ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বক্তব্য থেকে একথাই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় যে ঘটনাটির সাথে সরকারী মহলের, বিশেষতঃ আমলা গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিলো।

১২ই ডিসেম্বর বিকেলে নঈমুদ্দীন আহমদ এবং শামসুদ্দীন আহমদ O. K. রেস্তোরাঁয়* চা খেয়ে সামনের রাস্তায় নামামাত্র একদল গুণ্ডা নঈমুদ্দীন আহমদকে আক্রমণ করে এবং তাঁর মাথায় লাঠির বাড়ি মারে। এর ফলে তাঁর মাথা থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। তাঁকে নিয়ে শামসুদ্দীন আহমদ তাড়াতাড়ি ফজলুল হক হল এবং সেখান থেকে মেডিকেল কলেজে নিয়ে যান। সেদিন বিকেলেই এই ঘটনার প্রতিবাদে ফজলুল হক হলে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।[২০]

নঈমুদ্দীন আহমদকে হাসপাতালে ভর্তি করা নিয়ে বেশ গণ্ডগোল হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রথমে নানা অজুহাতে তাঁকে সরাসরি ভর্তি করতে অসম্মত হলেও শেষে মন্টগোমারী সাহেবের প্রচেষ্টায় তেরো তারিখে সন্ধ্যার পর তাকে ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। সেদিন সন্ধ্যার সময় তাজউদ্দীন আহমদ ফজলুল হক হল থেকে নঈমুদ্দীন আহমদের জন্যে খাবার নিয়ে তাঁর ওয়ার্ডে উপস্থিত হলে সেখানে চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদ এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রহমতউল্লাহকে নঈমুদ্দীনের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। সেখানে দু'জন পুলিস সাবইন্সপেক্টর নঈমুদ্দীন আহমদের F. I. R. নিচ্ছিলেন। তাজউদ্দীন আহমদ চীফ সেক্রেটারীর সাথে সেখানে পূর্বদিনের গুণ্ডামী সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেন এবং আজিজ আহমদ গুণ্ডামী দমন করার ব্যাপারে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। কিন্তু এই আশ্বাস সত্ত্বেও সেদিন রায়সাহেব বাজারে একটি মিছিল পরিচালনাকালে মিটফোর্ড স্কুলের তিনজন ছাত্র গুণ্ডাদের আক্রমণে আহত হন।[২১]

১৩ই ডিসেম্বর সেক্রেটারিয়েট কর্মচারীরা পূর্ণ হরতাল পালন করেন এবং

---

* বর্তমান নাম মাইরেস্তোরা

সেদিন থেকে, পনেরো দিনের জন্যে ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। চকবাজারে সেদিন ঢাকার নবাব হাবিবুল্লাহ যে সভা আহ্বান করেছিলেন ১৪৪ ধারার জন্যে তা বাতিল হয়ে যায়।[২২] নবাব একটি প্রেস বিবৃতি মারফত বলেন যে পাকিস্তান অত্যন্ত সংকটময় অবস্থার মধ্যে আছে, কাজেই এসময়ে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের অর্থ বিপদ ডেকে আনা। ভাষার প্রশ্নে তিনি বলেন যে সংবিধান সভা জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারাই গঠিত কাজেই ভাষার প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার তার উপরই অর্পণ করা উচিত।[২৩]

১৩ই ডিসেম্বর সেক্রেটারিয়েটে পূর্ণ হরতাল পালিত হওয়া এবং অন্যান্য কতকগুলি কারণে সংবাদপত্রের মাধ্যমে ঢাকা শহরে একথা রাষ্ট্র হয় যে বহু সরকারী কর্মচারী রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে ভিন্ন ভিন্ন পক্ষ অবলম্বন করছেন। এ সম্পর্কে আলোচনার জন্যে ১৬ই তারিখে সেক্রেটারিয়েট এবং বিভিন্ন ডাইরেক্টরেটের সিনিয়র অফিসাররা একটি সভায় মিলিত হন। সেখানে সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে এ জাতীয় ভিত্তিহীন প্রচারণার নিন্দা করা হয়। তারা বলেন যে ভাষা প্রশ্ন অথবা অন্য কোনো রাজনৈতিক প্রশ্নের সাথে তাঁদের কোনো সম্পর্ক নেই। প্রদেশের রাষ্ট্রভাষা জনগণের দ্বারাই নির্ধারিত হবে এবং সরকারী কর্মচারীরা সেই সিদ্ধান্তকে অনুগতভাবে কাযকরী করবেন।[২৪]

ঐ দিনই মর্নিং নিউজে পূর্ব বাঙলা সরকারের ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন ডক্টর কুদরত-ই-খুদার সাথে ভাষার প্রশ্নে ১১ই ডিসেম্বর চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত একটি প্রেস সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রকাশিত হয়। তাতে কুদরত-ই-খুদা বলেন, 'কোনো জাতির জীবনে অস্বাভাবিক কোনো জিনিসকে চাপিয়ে দেওয়া চলে না এবং সেটা উচিতও নয়। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা।'

১৭ই ডিসেম্বর করাচীতে পাকিস্তান সংবিধান সভার নিয়মকানুন নির্ধারণ কমিটি সভার সরকারী ভাষা হিসাবে উর্দু ও ইংরেজীকে সমমর্যাদা দানের জন্য সুপারিশ করেন। তারা অবশ্য একথা উল্লেখ করেন যে, কোনো সদস্য উপরোক্ত দুই ভাষাতে যদি নিজেকে ব্যক্ত করতে না পারেন তাহলে তিনি নিজের প্রাদেশিক ভাষাতেই বক্তৃতা দিতে পারবেন। অবশ্য এর জন্যে তাঁকে সভাপতির অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে। কমিটি ঐদিন শুধু সংবিধান সভার নিয়মকানুন নির্ধারণ করলেও তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন যে বাজেট অধিবেশনের কয়েকদিন পূর্বে ঐ একই কমিটি গণপরিষদেরও নিয়ম কানুন নির্ধারণ করবেন।[২৫]

ডিসেম্বর মাসের নানা ঘটনার পর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ঢাকা শহরে রাষ্ট্র হয় যে ভাষা আন্দোলনের সাথে যুক্ত কর্মীদের বিরুদ্ধে সরকার গ্রেফতারী

পরোয়ানা জারী করেছেন। এই সংবাদের সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে নঈমুদ্দীন আহমদ, তাজউদ্দীন আহমদ, মহম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, শফিউল আজম এবং ইঞ্জিয়ারিং স্কুলের কিছু সংখ্যক ছাত্র ৮ই জানুয়ারি সন্ধ্যায় বর্ধমান হাউসে প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকারের সময় শিক্ষামন্ত্রী আবদুল হামিদ এবং শিক্ষা দফতরের সেক্রেটারী ফজলে আহমদ করিম ফজলীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।[২৬]

৮॥ উর্দু সমর্থকদের তাত্ত্বিক বক্তব্য

১৯৪৭-এর ডিসেম্বরে করাচীর শিক্ষা সম্মেলনেরপর প্রকাশিত মর্নিং নিউজের একটি সম্পাদকীয় এবং সিলেটের কিছুসংখ্যক শিক্ষাবিদ্, ডাক্তার, সংস্কৃতিসেবী প্রভৃতির একটি স্মারকলিপিতে উর্দু সমর্থকদের তাত্ত্বিক বক্তব্য মোটামুটি স্পষ্টভাবে উপস্থিত করা হয়। এ দুইটির উল্লেখ সরকার পক্ষ ও প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবীদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং উৎকণ্ঠার পরিচয় লাভের জন্যে প্রয়োজন।

মর্নিং নিউজ তাঁদের ১৭ই ডিসেম্বরের একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলেন : পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান প্রধান কথ্য ভাষা পুষ্তু, পাঞ্জাবী, ব্রাহমী ও সিন্ধী এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান কথ্য ভাষা বাংলা। প্রত্যেকটি গ্রুপই যদি নিজের ভাষাকে সরকারী ভাষা রূপে চালু করার জন্যে জোর দেয় তাহলে পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সহযোগিতা, ভাবের আদান-প্রদান এবং পারস্পরিক সম্পর্কের অবসান ঘটবে। যার সামান্য কিছু বুদ্ধি আছে সে কখনোই একথা বলতে পারে না যে একজন পাঠান অথবা পশ্চিম পাঞ্জাবী তার পরিবারের লোকজনের সাথে পাঞ্জাবীতে কথা না বলে উর্দুতে কথা বলবে। এই একই মন্তব্য সিন্ধী, বালুচ এবং বাঙালীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ঢাকায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের করাচীতে গৃহীত সিদ্ধান্তকে এতো খারাপভাবে ব্যাখ্যা করার অর্থ এ ছাড়া আর কিছুই নয়।

উপরোক্ত বক্তব্যের মূল লক্ষ্য প্রাদেশিক মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার এবং আবদুল হামিদ। কারণ তাঁরাই করাচী থেকে ফিরে এসে বিবৃতির মাধ্যমে সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহের যে ব্যাখ্যা দেন, তার সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা দফতরের ব্যাখার বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্য ছিলো না।

ইংরেজী ভাষা এবং তার ব্যবহার সম্পর্কে সম্পাদকীয়টিতে বলা হয়:

আমাদের পূর্বতন শাসকদের ভাষা হিসাবে ইংরেজী দেশের সমস্ত অংশের লোকের আলাপ-আলোচনার মাধ্যম রূপে ব্যবহৃত হয়। সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা এটা পূর্বেও ছিলো এবং এখনো পর্যন্ত আছে। এই ভাষাতেই দক্ষিণের লোক উত্তরের লোকের সাথে এবং পূর্বের লোক পশ্চিমের ভাইদের সাথে চিঠিপত্র বিনিময় করে। এখানেই শেষ নয়। একই ভাষাভাষী দুজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার সময় সাধারণতঃ ইংরেজীতেই কথা বলে। আমাদের সংবাদপত্র, আমাদের সাইন বোর্ড এবং আমাদের বিজ্ঞাপনসমূহ এখনো ইংরেজীতেই প্রকাশিত হয়। সর্বোপরি আমাদের নেতারা এখনো প্রেস কনফারেন্সে এবং প্রেসে বিবৃতি দেওয়ার সময় ইংরেজীতেই তা করে থাকেন। এই অবস্থা ততদিন পর্যন্ত বজায় থাকবে যতদিন না আমরা বিদেশী আমলাতন্ত্র জোরপূর্বক আমাদের গলা দিয়ে যে পশ্চিমী ভাষাকে পার করেছে তার পরিবর্তে নিজেদের এমন একটি ভাষাকে ব্যবহার করতে শিখবো যার মধ্যে আমাদের চিন্তা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিচয় থাকে।

উর্দুকে বাংলা ভাষাভাষীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া যে পাকিস্তানের আমলাতান্ত্রিক চক্রান্তের ফল, উর্দু ভাষা, যে পাকিস্তানের কোনো অংশের ভাষা নয়, একটি বিদেশী ভাষা, এবং উর্দুর মাধ্যমে বাঙালীদের 'চিন্তা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির' কোনো পরিচয়ই যে পাওয়া যায় না একথা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের কাছে যত স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হোক না কেন, উর্দু সমর্থকরা কিন্তু সেগুলিকেই তাঁদের দাবীর অন্যতম প্রধান যুক্তি হিসাবে উপস্থিত করতে সব সময়েই আগ্রহশীল ছিলেন।

কাজেই পূর্ব যুক্তির জের টেনে উর্দুর সপক্ষে মর্নিং নিউজ বলেন:

এ রকম একটা ভাষাই আমাদের হাতের কাছে আছে। সেটা হলো উর্দু, যাকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লোকেরা নাম দিয়েছিলেন হিন্দুস্থানী। উপমহাদেশের অর্ধেকের বেশী লোক এই ভাষায় কথা বলে এবং সাধারণভাবে সকলেই তা বোঝে। এর থেকেও বেশী এই যে, পোর্ট সাঈদ থেকে সাংহাই পর্যন্ত এই ভাষায় কথা বলা হয় এবং লোকে তা বোঝে···।
উর্দু একটি আন্তর্জাতিক ভাষার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এবং এটা হলো দুই ডোমিনিয়নের 'লিংগুয়া ইণ্ডিকা' যা আরবী এবং দেবনাগরী, এই দুই অক্ষরেই লেখা হয়। যদি তাঁরা ইংরেজীকে চালু রেখে তাকে হিন্দুস্থানী

এবং পাকিস্তানীদের চিন্তার উপর রাজত্ব করতে না দেন, তাহলে, উৎসাহী মাতৃভাষাওয়ালাদের হাতে সবকিছু ছেড়ে দিলে আন্তঃপ্রাদেশিক এবং আন্তঃডোমিনিয়ন সামাজিক, আধিমানসিক এবং বাণিজ্যিক লেনদেন এক অচল অবস্থায় এসে দাঁড়াবে।

এর পর পূর্ব বাঙলার অধিবাসীদের সংস্কৃতির বর্ণনা প্রসঙ্গে পত্রিকাটি মন্তব্য করেন :

পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের লোকদের সমস্যা দ্বিগুণ গুরুতর এবং গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক দাসত্ব যথেষ্ট খারাপ কিন্তু বুদ্ধিগত দাসত্বের থেকে হীনতম ও ও নিম্নতম দাসত্ব আর কিছু নেই। বাঙালী পণ্ডিতদের মতে মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙলাদেশ যে ভাষা লাভ করে, সেটাই হিন্দু মুসলমান কবি ও লেখকদের হাতে পুঁথি সাহিত্য হিসাবে বিকশিত হয়। ইংরেজদের আগমন এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দেওয়ানী দানের পর এ দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এমনভাবে ভেঙে পড়ে, যার ফলে এক শতাব্দীর স্বল্প পরিসরের মধ্যে শাসকেরা উপনীত হয় নিতান্ত দরিদ্র অবস্থায়। তাদের প্রভাবই যে শুধু বিনিষ্ট হলো তাই নয়, তারা আত্ম-বিশ্বাসও হারিয়ে ফেললো। ইংরেজী-জানা বুদ্ধিজীবীরা পাদ্রী এবং বৃটিশ আমলাদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে যে মিলের চাকা দ্রুততরভাবে ঘোরানোর কাজে লিপ্ত হলো, সেই মিলই তাদেরকে গুঁড়িয়ে দিলো। বাঙলাদেশের লোকের সাধারণ ভাষা ক্রমশঃ সংস্কৃত প্রভাবাচ্ছন্ন হলো এবং মুসলমানেরা 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যে সেই ভাষার বাক-বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করলো। এখানেই শেষ নয়। নিজের ঐতিহ্যের সাথে তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলো এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতার দিক দিয়েও সে হয়ে দাঁড়ালো দো-আঁশলা।

এই 'দো-আঁশলা' সংস্কৃতির হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে পূর্ব বাঙলার মুসলমানরা কিভাবে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারে সে সম্পর্কে মুরুব্বীয়ানার ভঙ্গীতে উপদেশ দেওয়ার প্রচেষ্টায় সম্পাদকীয়টিতে বলা হয় :

সেই পূর্ব অবস্থা ফিরে পাওয়ার একটা সুযোগ এখন তার সামনে উপস্থিত হয়েছে। নিজের মাতৃভাষা ভুলে যাওয়ার কথা কেউ তাকে বলছে না। করাচীতে তার যে সমস্ত শুভাকাঙ্খী মিলিত হয়েছিলেন, তাঁরা একটা দূরদর্শী পরামর্শ হিসাবে তাকে সমস্ত জড়তা মুছে ফেলে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে বলেছেন। ইন্দোনেশিয়াকে বাদ দিলে পূর্ব বাঙলাই

পৃথিবীর মধ্যে মুসলমানদের সব থেকে বড়ো একটা ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। ইসলামের প্রতি সেই হিসাবে তার একটা কর্তব্য আছে। এ কাজ তার পক্ষে একা বিচ্ছিন্নভাবে থেকে বাংলার রসাস্বাদনের দ্বারা সম্ভব নয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সিন্ধী, বালুচ, পাঞ্জাবী, পুশতু ভাষী প্রভৃতি নাগরিকদের মন তাকে প্রথমে বুঝতে হবে এবং সেই সাথে নিজের অসুবিধার কথাও তাদেরকে বোঝাতে হবে। সকলের বোধগম্য একটি সাধারণ ভাষা ব্যতীত একাজ কিভাবে করা সম্ভব? আজ ইংরেজী সেই কাজ করছে। কিন্তু কতদিন পর্যন্ত? পাকিস্তানের লোকেরা যদি সত্যিই মুসলমান মতে কিছু করতে চায় তাহলেএখন থেকেই তাদেরকে সে প্রস্তুতি নিতে হবে এবং নিজেদের রাষ্ট্রের জন্যে একটি ভাষা নির্বাচন করতে হবে।... বাংলাভাষায় ইসলাম এবং ইসলামী ইতিহাসের উপর কোনো বই-পুস্তক নেই বললেই চলে। আমরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে আজকের একজন বিক্ষুব্ধ যুবক আগামী দিনে তার সন্তানরা যাতে আরও ভালো মুসলমান হয় সেটাই চায়। যুবকেরা যাতে তাদের ইসলামী ঐতিহ্য সম্পর্কে গর্ববোধ করে সে ব্যবস্থা করতে হবে এবং নিজেদের দায়িত্ব যাতে সাহস ও আত্ম-বিশ্বাসের সাথে পালন করার জন্য প্রস্তুত হয়, তারও দিকে খেয়াল রাখতে হবে। তার পক্ষে আরবীতে লিখিত তথ্যের সাথে পরিচিত হওয়া খুব অসুবিধাজনক, ফারসী তরজমাও তার পক্ষে বিরক্তিকর হবে। অন্যপক্ষে ইসলাম বিষয়ক এক বিশাল সাহিত্য উর্দুতে রয়েছে। বাঙলাদেশের মুসলমানরা ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই উর্দু বলতে এবং বুঝতে পারে। তারা দিল্লী, আলীগড় অথবা লাখনৌ-এর লোকদের মতো চমৎকারভাবে উর্দুতে কথা বলতে না পারলেও প্রত্যেক মুসলমান শিশুই কোরাণের বর্ণমালার সাথে পরিচিত, কাজেই উর্দু শেখা তার পক্ষে সহজই হবে। করাচীর সিদ্ধান্তের তাৎপর্য এখানেই। এর মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানী মুসলমানদের মুক্তি এবং গৌরবময় ভবিষ্যৎ নিহিত।

উপরোদ্ধৃত সম্পাদকীয়টির মূল ব্যক্তব্য পূর্ব বাঙলার মুসলমানরা এতোদিন হিন্দু সংস্কৃতির আওতায় ছিলো এবং সেই আওতামুক্ত হয়ে নিজেদের সংস্কৃতি গঠন করতে হলে ইসলামী সংস্কৃতিই তার মূল অবলম্বন হওয়া উচিত। এবং ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্যে বাংলা ভাষা তো নয়ই এমনকি আরবী, ফারসীও যথেষ্ট নয়। তার জন্যে আমাদেরকে দ্বারস্থ হতে হবে উর্দুর, কারণ 'বাঙলা দেশের মুসলমানেরা ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই উর্দু বলতে

এবং বুঝতে পারে।' তা ছাড়া প্রত্যেক মুসলমান শিশু কোরাণের বর্ণমালার সাথে পরিচিত হওয়ার ফলে তাদের পক্ষে উর্দু শেখা কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। কাজেই, পূর্ব বাঙলার অধিবাসী, তোমরা উর্দুর জয়ধ্বনি করো!

পূর্ব বাঙলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের কাছে প্রেরিত স্মারকলিপিটিতে[১] সিলেটের কিছুসংখ্যক নাগরিক উর্দুর সমর্থনে যে যুক্তিতর্কের অবতারণা করেন তার সাথে মর্নিং নিউজের ব্যক্তব্যের কোনো মৌলিক তফাত নেই। কিন্তু তাঁদের বক্তব্যের সাম্প্রদায়িক ও মুৎসুদ্দি চরিত্র আরও স্পষ্টতর। বাংলা ভাষার দাবীতে যাঁরা আন্দোলন করছিলেন, তাঁদের প্রতি কটাক্ষ করে স্মারক লিপিটিতে বলা হয়:

> একদল লোক নিজেদেরকে বিরাট সাহিত্যিক, শিল্পী ও পণ্ডিত বলে জাহির করে উর্দুর বিরুদ্ধে দারুণ প্রচারণা শুরু করেছে। পূর্ব বাঙলার লোকেরা একটি জাতি, এই উদ্ভট ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা উর্দুকে জাতীয়তা-বিরোধী ও বিদেশী ভাষা হিসাবে বর্জন করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। সীমিত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেশপ্রেমের মুখোশ পরে তারা বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে চারিদিকে তোলপাড় আরম্ভ করেছে। জনমতের প্রতিনিধিত্ব করার ভাব দেখিয়ে তারা নিজেরাই বাংলার মতো এমন এক ভাষার দাবী তুলেছে, যে-ভাষার একটি মুসলিম রাষ্ট্রের জাতীয় ভাষার মর্যাদা লাভের মতো যোগ্যতা একেবারেই নেই। মুসলিম সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্য-বাহী উর্দু ভাষাকে বর্জন করার এই নির্লজ্জ প্রচেষ্টা যে শুধু ধ্বংসাত্মক তাই নয়,.তা পশ্চাদমুখী, নিন্দনীয় এবং সর্বোপরি সার্বজনীন ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জস্বরূপ।
>
> তারা যদি বাংলাকে একটি বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চালু করা এবং উর্দুকে ইংরেজীর জায়গায় রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলতো তাহলে সেটা বোঝা যেতো। কিন্তু বাংলার সমর্থকরা উর্দুকে পূর্ব বাঙলা থেকে তাড়িয়ে দিতে চায় এবং আমাদের সুচিন্তিত মতানুসারে সেটা পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের পক্ষে আত্মহত্যার শামিল।

তাঁদের এই ব্যক্তব্যের সমর্থনে স্মারকলিপির স্বাক্ষরকারীরা কয়েকটি বিশেষ যুক্তির অবতারণা করেন যথা:

> মুসলিম জাতির মহান স্রষ্টা স্যার সৈয়দ, হালী, ডক্টর ইকবাল ও অন্যান্যদের জাতীয় সাহিত্য থেকেই মুসলিম পুনর্জাগরণের প্রেরণা এসেছিলো। আমরা যদি জাতীয়তা-বিরোধী বলে উর্দুকে বর্জন করি, তাহলে আমরা

নিজেদের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করবো এবং নিজেদেরকেই অস্বীকার করবো। এই ধ্বংসাত্মক প্রবণতা আমাদের মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিকে সম্পূর্ণভাবে বিনিষ্ট এবং আমাদের পৃথক সত্বাকে ধ্বংস করবে। উর্দু এখনো সেই প্রেরণা উদ্দীপক শক্তি, যা এই বিশাল উপমহাদেশের দশ কোটি মুসলমানকে একতাবদ্ধ করতে পারে…। পবিত্র কোরাণ এবং অন্যান্য ইসলামী সাহিত্য থেকে প্রেরণাপ্রাপ্ত উর্দু ভাষাকে অবহেলা করে আমরা যদি প্রধানতঃ রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ, বেদ এবং অন্যান্য সংস্কৃত সাহিত্য থেকে প্রেরণাপ্রাপ্ত বাংলা ভাষার দিকে যাই, তাহলে আমরা আমাদের জাতীয় সত্বাকেই অস্বীকার করবো।

পৃথক সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা গঠিত ভারতের মুসলমানদের পৃথক জাতিত্বের উপর ভিত্তি করেই পাকিস্তানের ধারণার জন্ম। ভারতীয় মুসলমানদের জাতীয় ভাষা এবং ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়ক সাহিত্যে সমৃদ্ধ উর্দুই পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার জন্যে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ভাষা।

এই যুক্তির পর স্মারকলিপিটিতে বলা হয় যে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষে যারা ওকালতী করছেন তাদের মতের সাথে জনসাধারণের মতের কোনো মিল নেই। উপরন্তু উর্দুর দাবী যাঁরা করেছেন তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে জনমতের প্রতিনিধি। সিলেট জেলা মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন, শর্ষিনায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক জমিয়তে উলামায়ে ইস্‌লামের কনফারেন্স, '২০ লক্ষ সিলেটবাসীর মুখপত্র যুগভেরী', পূর্ব বাঙলার একমাত্র মুসলিম সাপ্তাহিক 'আসাম হেরাল্ড', আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর জিয়াউদ্দীন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফজলুর রহমান প্রভৃতির উর্দু সমর্থনের কথাও তাঁরা উল্লেখ করেন।

তাঁদের মতে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা না করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করলে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ঐক্যসূত্র বিচ্ছিন্ন হবে এবং তার ফলে পাকিস্তানী জাতীয়তা ধ্বংস হয়ে যাবে। এ ছাড়া তাঁরা বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ-নজরুল ইসলামের বাংলা ভাষায় 'প্রাদেশিক দেশপ্রেম' প্রচার করা যায় কিন্তু কোনো সামরিক কাজকর্ম সে ভাষার মাধ্যমে সম্ভব নয়। বাংলা ভাষা বর-কনের আলাপের উপযোগী হতে পারে কিন্তু তার মাধ্যমে বীরত্বব্যঞ্জক কিছু ব্যক্ত করা চলে না। বাংলার তুলনায় উর্দু একটা বীর্যপূর্ণ ভাষা এবং তার চরিত্রে পুরুষত্ব আছে!

উপরে উদ্ধৃত এবং আলোচিত স্মারকলিপিটির স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে

নিম্নলিখিত কয়েকজন উল্লেখযোগ্য :

আসাম সরকারের ভূতপূর্ব মন্ত্রী মুদাব্বির হোসেন; নজমুল হোসেন, সভাপতি মুসলিম সাহিত্য সংসদ; শামসুজ্জামান চৌধুরী, দর্শনের সিনিয়র অধ্যাপক; আবদুল হাই, দর্শনের অধ্যাপক; মিস বাহুল বার চৌধুরী; খায়রুন্নেসা খানম; মৌলানা রাজিউর রহমান, সম্পাদক আসাম হেরাল্ড এবং যুগভেরী।

৯॥ ওয়ার্কার্স ক্যাম্প ও রশিদ বই সমস্যা

দেশভাগের পর আবুল হাশিম বর্ধমানে থেকে গেলেন এবং শহীদ সুহরাওয়ার্দীও ঢাকা এলেন না। তার ফলে মুসলিম লীগের নাজিমুদ্দীন-বিরোধী বামপন্থী দলের কর্মীরা প্রায় ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লেন। আবুল হাশিম মুসলিম লীগের সভাপতি হিসাবে যখন নির্বাচন প্রার্থী হন তখন সুহরাওয়ার্দী তাঁকে সাহায্য করেননি। উপরন্তু ফজলুল হককেই প্রকারান্তরে সমর্থন করেছিলেন। এর ফলে তাঁর এবং আবুল হাশিমের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেশ ভালোভাবে দেখা দেয়। মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদ ঘোষণার পর আবুল হাশিম জুন মাসের দিকেই তিন মাসের ছুটিতে যান এবং তাঁর স্থানে হাবিবুল্লাহ বাহার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসাবে কাজ করতে থাকেন।

৫ই অগাস্ট, ১৯৪৭, পূর্ব বাঙলার নেতা নির্বাচনের সময় আবুল হাশিম সুহরাওয়ার্দীকে পার্টিগতভাবে কোনো সাহায্য করেননি এবং অনেকটা তার ফলেই তিনি ৩৯।৭৫ ভোটে নাজিমুদ্দীনের কাছে পরাজিত হন। পূর্ব বাঙলায় নোতুন সরকার স্থাপিত হওয়ার পর আবুল হাশিম, সুহরাওয়ার্দী, কেউ ঢাকাতে না থাকায় তাঁদের উপদলীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে নাজিমুদ্দীনরা যথেষ্ট তৎপর ও সক্রিয় হয়ে ওঠেন।[১]

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের পুরাতন কমিটিগুলিকে ভেঙে দিয়ে মুসলিম লীগ পুনর্গঠনের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। এ কাজের জন্যে যে সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয় তার সভাপতি মনোনীত হন মৌলানা আকরাম খান। তিনি ছাড়াও এই কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ইউসুফ আলি চৌধুরী (মোহন মিঞা), নূরুল আমীন, আবদুল মোত্তালেব মালেক প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এই প্রাদেশিক কমিটি ব্যতীত প্রত্যেক জেলাতে নয় জন সদস্য বিশিষ্ট এক একটি অস্থায়ী কমিটি গঠন করা হয় এবং

সেখানেও একজন করে চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন।[২]

'বামপন্থী' মুসলিম লীগ কর্মীরা যাতে নোতুন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাংগঠনিক কার্যে অংশ গ্রহণ করতে পারেন তার উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণের উদ্দেশ্যে শামসুল হক, কমরুদ্দীন আহমদ, শেখ মুজিবর রহমান, মুশতাক আহমদ প্রভৃতি যৌথভাবে ১৯৪৮-এর জানুয়ারিতে ঢাকা শহরে পুরাতন মুসলিম লীগ কর্মীদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। 'ওয়ার্কার্স ক্যাম্প' নামে অভিহিত এই সম্মেলন মুসলিম লীগের সাবেক অফিস ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে কয়েকদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়। 'ওয়ার্কার্স ক্যাম্প কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিলো না। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো মুসলিম লীগের বামপন্থীদের পক্ষে সাংগঠনিক কার্যে অংশ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা। এজন্যে এই সম্মেলনে কোনো কর্মকর্তা নির্বাচন করা হয়নি। মুসলিম লীগ যেহেতু সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান এজন্যে পূর্ব বর্ণিত গণতান্ত্রিক যুব লীগের কর্মীরা সাধারণভাবে এই সম্মেলনে যোগদান করেননি। তবে কমরুদ্দীন আহমদ, শামসুল হক প্রভৃতির মতো কেউ কেউ উভয় সম্মেলনেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন।

ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের সকল কর্মীই অবিভক্ত বাঙলায় শহীদ-হাশিম 'বামপন্থী' উপদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁদের ভয়ে আকরাম খান, নাজিমুদ্দীন, নূরুল আমীন প্রমুখ 'দক্ষিণপন্থী' উপদলীয় নেতারা রীতিমতো শঙ্কিত থাকতেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শহীদ সুহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাশিম উভয়েই পশ্চিম বাঙলায় থেকে যাওয়ার মুসলিম লীগ রাজনীতিতে আবার আকরাম খান এবং খাজা পরিবারের প্রভাব-প্রতিপত্তি স্থাপিত হয়। প্রায়-বিনষ্ট এই প্রভাব-প্রতিপত্তি আবার নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় আকরাম খান ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের কর্মীদেরকে রশিদ বই দিতে সরাসরি অস্বীকার করেন। পদ্ধতি হিসাবে ইতিপূর্বেই তাঁরা স্থির করেছিলেন যে বিভিন্ন সাংগঠনিক কমিটির সদস্য ব্যতীত অন্য কাউকে রশিদ বই দেবেন না। এ ছাড়া এই কমিটিগুলি গঠন করার সময়েও তাঁরা সবক্ষেত্রেই নিজেদের লোকদেরকে মনোনয়ন দান করেছিলেন।[৪]

কিন্তু তাঁদের এই মনোভাব সত্ত্বেও প্রায় একরকম জোর করেই ক্যাম্প কর্মীদের একটি প্রতিনিধিদল আকরাম খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই দলটিতে ছিলেন আতাউর রহমান, শামসুল হক, শেখ মুজিবর রহমান, মিসেস আনোয়ারা খাতুন, মোস্তাক আহমদ, কমরুদ্দীন আহমদ, সবুর খান, ফজলুল

কাদের চৌধুরী এবং আরও কয়েকজন।[৫] আকরাম খান এই প্রতিনিধি-দলটিকে বলেন যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগকে পূর্বের মতো এতো বড়ো আকারে গঠন করার কোনো প্রয়োজন নেই। এ ছাড়া তিনি ক্যাম্পের কর্মীদেরকে মুসলিম লীগ কর্মী হিসাবে বিবেচনা করতেই অস্বীকার করেন।[৬]

প্রাদেশিক সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি মৌলানা আকরাম খানের কাছ থেকে রশিদ বই পাওয়ার সরাসরি চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর কর্মীরা পাকিস্তান মুসলিম লীগের প্রধান অর্গানাইজার চৌধুরী খালিকুজ্জামানের কাছে এ ব্যাপারে সুপারিশের জন্যে পাঞ্জাব প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ভূতপূর্ব সভাপতি মিঞা ইফতিখারুদ্দীনকে অনুরোধ করেন। ইফতিখারুদ্দীন জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে ঢাকা সফরে এলে মুসলিম লীগ কর্মীদের সাথে এ ব্যাপারে তাঁর বিস্তৃত আলোচনা হয়। খালিকুজ্জামানের সাথে রশিদ বই সংক্রান্ত বিষয়ে আলাপ করতে তিনি সম্মত হন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান ফিরে যাওয়ার পর তাঁর কাছ থেকে এ ব্যাপারে কোনো সংবাদ পাওয়া যায়নি।[৭]

ফেব্রুয়ারি মাসে মিঞা ইফতিখারুদ্দীন দ্বিতীয়বার ঢাকা আসেন। এবারও তাঁর সাথে ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের কর্মীরা মুসলিম লীগের সাংগঠনিক কাজকর্ম এবং রশিদ বই সংক্রান্ত বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেন। এর পর পশ্চিম পাকিস্তান ফেরৎ গিয়ে ইফতিখারুদ্দীন খালিকুজ্জামানের সাথে রশিদ বই নিয়ে আলাপ করেন কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটি প্রাদেশিক সাংগঠনিক কমিটির আওতাভুক্ত এই অজুহাত দেখিয়ে খালিকুজ্জামান কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকৃত হন।[৮]

আকরাম খানকে রশিদ বই দেওয়ার ব্যাপার কোনোক্রমেই সম্মত করাতে সক্ষম না হয়ে অবশেষে কর্মীরা বুড়ীগঙ্গার অপর পারে জিঞ্জিরায় একটি সভা আহ্বান করেন। কিন্তু সরকারী অনুমতির অভাবে কোনো সভা সেখানে অনুষ্ঠিত হয়নি।[৯]

এর পর কর্মীরা খান সাহেব ওসমান আলীর সহায়তায় নারায়ণগঞ্জে একটি কনভেনশন আহ্বানের চেষ্টা করেন। খান সাহেবকে সভাপতি করে একটি সম্বর্ধনা কমিটিও গঠিত হয়। সভাটি নারায়ণগঞ্জের রহমতুল্লাহ ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে সভা আরম্ভের পূর্বেই পুলিশ এবং পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলের লোকজন এসে সভাস্থলে উপস্থিত হয় এবং তারা যাতে সেখানে সভা করতে না পারে তার ব্যবস্থা করে। রহমতুল্লাহ ইনস্টিটিউটে সভা করতে অক্ষম হয়ে কর্মীরা নারায়ণগঞ্জের পাইকপাড়া ক্লাবে সমবেত হন।[১০]

প্রাথমিক রশিদ বইয়ের প্রশ্নটি আলোচনার জন্যে চৌধুরী খালিকুজ্জমানের কাছে একটি প্রতিনিধিদল পাঠানোর প্রস্তাব এই সভাতে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসাবে আতাউর রহমান খান এবং মিসেস আনোয়ারা খাতুন মনোনীত হন। তৎকালে কর্মীদের নিজেদের কোনো সাংগঠনিক তহবিল না থাকার ফলে তারা প্রতিনিধিদলের যাতায়াতের ব্যয় বহনে সমর্থ ছিলো না। কিন্তু আতাউর রহমান এবং আনোয়ারা খাতুন নিজেরাই তাঁদের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতে সম্মত হলে তাঁদেরকেই প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে নির্বাচন করা হয়।[১১]

প্রতিনিধিদলটি করাচীতে চৌধুরী খালিকুজ্জামানের সাথে সাক্ষাৎ করেন কিন্তু মুসলিম লীগের সাংগঠনিক কাজকর্মে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে কর্মীদেরকে রশিদ বই দেওয়ার জন্যে আকরাম খানকে অনুরোধ করতে তিনি অস্বীকার করেন। ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের কর্মীরা সকলেই সরকারবিরোধী এবং সেই হিসাবে তাঁদেরকে মুসলিম লীগের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখতে দেওয়া চলে না এই মর্মেও খালিকুজ্জামান প্রতিনিধিদলটির কাছে মত প্রকাশ করেন।[১২]

মুসলিম লীগের প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় অর্গানাইজারদের এই মনোভাব এবং আচরণের ফলে মুসলিম লীগ কর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট হতাশার সঞ্চার হয়। তাঁরা অনেকে এর থেকে সিদ্ধান্ত করেন যে মুসলিম লীগের সদস্য হিসাবে তাঁদের পক্ষে তৎকালীন অবস্থায় রাজনীতি করা আর সম্ভব নয়। কাজেই তার জন্যে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন।

মুসলিম লীগ সাংগঠনিক কমিটির উপরোক্ত কার্যকলাপ এবং নতুন রাজনৈতিক সংগঠন গঠন প্রসঙ্গে তৎকালীন দৈনিক ইত্তেহাদ সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদ তাঁর আত্মস্মৃতিতে নিম্নলিখিত মন্তব্য ব্যক্ত করেছেন :

> সুতরাং পাকিস্তান হাসিলের সঙ্গে সঙ্গেই মুসলিম লীগের দরজা জনগণের মুখের উপর বন্ধ করিয়া দেওয়া শুধু রাজনৈতিক অপরাধ ছিল না, নৈতিক মর‍্যাল ও এথিক্যাল অপরাধও ছিল। তবু নেতারা শুধুমাত্র কোটারি স্বার্থ রক্ষার জন্য মুসলিম লীগকে পকেটস্থ করিলেন। এই কাজে তাঁরা প্রথম অসাধুতার আশ্রয় নেন বাঙলা বাটোয়ারা হইয়াছে এই অজুহাতে বাংলার মুসলিম লীগ ভাঙিয়া দিয়া। কাজটা করিলেন তাঁরা এমন বেহায়া বেশরমের মতো যে পাঞ্জাব ভাগ হওয়া সত্ত্বেও পাঞ্জাবের মুসলিম লীগ ভাঙিলেন না। ফলে পক্ষপাতিত্ব-দোষে বামাল গ্রেফতার হইলেন। দ্বিতীয় অসাধুতা করিলেন তাঁরা নিজেদের বাধ্য-অনুগত লোক দিয়া এড-হক কমিটি গঠন

করিয়া। তৃতীয় অসাধু কাজ করিলেন নয়া মুসলিম লীগ গঠনের জন্য প্রাইমারী মেম্বারশিপের রশিদ বই বগল-দাবা করিয়া। মুসলিম লীগ কর্মীদের পক্ষে জনাব আতাউর রহমান খাঁ ও বেগম আনওয়ারা খাতুন প্রথমে মওলানা আকরাম খাঁ ও পরে চৌধুরী খালেকুজ্জামানের কাছে দরবার করিয়াও রশিদ বই পান নাই। তাঁরা নাকি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, এখন তাঁরা আর বেশী মেম্বর করিতে চান না। তাঁদের যুক্তি ছিল এখন শুধু গঠনমূলক কাজ দরকার। হৈ হৈ করিলে তাতে বিঘ্ন সৃষ্টি হইবে। এসব কথা আমি কলিকাতা বসিয়া খবরের কাগজে পড়িয়াছিলাম। নিজের কাগজ 'ইত্তেহাদে' এই অদূরদর্শিতার কঠোর নিন্দা করিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, যে-সব দেশে একদলীয় শাসন চালু আছে, সেখানেও রুলিং পার্টির দরজা এমন করিয়া বন্ধ করা হয় নাই। লীগ-নেতৃত্বের এই মনোভাব ছিল অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক। কায়েদে আজমের জীবমানেই শাসক-গোষ্ঠী ও তাঁদের সমর্থকরা এই নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন দেখিয়া আমার মনে কম ধাক্কা লাগে নাই।[১৩]

কাজেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের উপরোক্ত আচরণের ফলে :

অগত্যা মুসলিম লীগ কর্মীরা মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে প্রথমে নারায়ণগঞ্জে ও পরে টাঙ্গাইলে কর্মী-সম্মেলনী করিয়া নেতাদের কাজের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং মুসলিম লীগের দরজা খুলিয়া দিতে দাবী করেন। নেতারা কর্ণপাত না করায় ১৯৪৯ সালে নিজেরাই মুসলিম লীগ গঠন করেন। সরকারী মুসলিম লীগ হইতে পার্থক্য দেখাইবার জন্য তাঁদের প্রতিষ্ঠানের নাম রাখিলেন : জনগণের (আওয়ামী) মুসলিম লীগ।[১৪]

১০ ॥ প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ্

অক্টোবর মাসে ফজলুল হক হলের সাহিত্য সভার পর তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগেই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ্ গঠিত হয়। সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের কাছে রশিদ বিল্ডিং নামে একটি বাড়ি ছিলো। সেটি এখন আর নেই, কিন্তু তখনকার সেই রসিদ বিল্ডিং-এর একটি কামরায় তমদ্দুন মজলিসের অফিস অবস্থিত ছিলো। সেখানেই তমদ্দুন মজলিস এবং মুসলিম ছাত্র লীগের অল্প কয়েকজন কর্মীর উপস্থিতিতে সংগ্রাম পরিষদটি গঠিত হয় এবং তমদ্দুন মজলিসের অন্যতম প্রধান সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

নুরুল হক ভূঞা তার আহ্বায়ক নির্বাচিত হন।[১]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মনি অর্ডার ফর্ম, ডাক টিকিট এবং মুদ্রায় শুধুমাত্র ইংরেজী ও উর্দু ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বাংলার ব্যবহার এগুলি থেকে বাদ দেওয়ার ফলে পূর্ব বাঙলার জনসাধারণ ও শিক্ষিত মহলে যথেষ্ট উদ্বেগ ও বিরুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি হয়। এই সময় পাকিস্তান সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা, আরবী হরফে বাংলা লেখা ইত্যাদির সপক্ষে সভাসমিতি ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে অনেক বিতর্কের অবতারণা করেন। বস্তুতঃ এই পর্যায়ে তিনিই ছিলেন সরকারের বাংলা-বিরোধী নীতির অন্যতম প্রধান মুখপাত্র।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ্ গঠিত হওয়ার পরই ফজলুর রহমান ঢাকা আসেন এবং আবুল কাসেমসহ পরিষদের আরও কয়েকজন সদস্য মওলা সাহেবের (ফজলুল হক) নাজিরাবাজারের বাসায় ১৯৪৮-এর ১লা ফেব্রুয়ারি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন।[২] এই সাক্ষাৎকারের সময় ফজলুর রহমানের সাথে সংগ্রাম পরিষদ্ পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার বিষয়-তালিকা থেকে বাংলা ভাষাকে বাদ দেওয়া, পাকিস্তানের মুদ্রা, ডাক টিকিট ইত্যাদিতে বাংলা ভাষা স্থান না পাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন।[৩] আলোচনা পরিশেষে তুমুল বিতর্কে পরিণত হয়।[৪] এই বিতর্ককালে অবশ্য ফজলুর রহমান বলেন যে উপরোক্ত কয়েকক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে বাদ দেওরার ব্যাপারটি একেবারেই ইচ্ছাকৃত নয়। নিতান্ত ভুলবশতঃই সেটা ঘটেছে। তিনি সে ভুল সংশোধনের আশ্বাসও প্রতিনিধিদলটিকে দান করেন।[৫]

এই সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেহাদ 'ভুলের পুনরাবৃত্তি' নামে একটি সম্পাদকীয়তে[৬] উল্লেখ করেন যে শুধু মুদ্রা, ডাক টিকিট ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার বিষয়-তালিকা থেকেই বাংলাকে বাদ দেওয়া হয় নাই। এগুলি ছাড়া পাকিস্তানের নৌ-বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রেও উর্দু এবং ইংরেজীতে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এর পর উক্ত সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> মিঃ ফজলুর রহমান হয়ত এগুলিকে ভুল বলিয়া চালাইবার প্রয়াস পাইবেন। কিন্তু সব কয়টি ক্ষেত্রেই বাংলা ভাষাকে "ভুলে" বাদ দেওয়া হইয়াছে, একথা কে বিশ্বাস করিবে? বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়ক ও কর্মকর্তাদের পক্ষে এতবার একই ভুল করা কি করিয়াই বা সম্ভব। নিতান্ত "ভুল"ও বারে বারে পুনরাবৃত্তি করিলে যে তাহাই "শুদ্ধ" হইয়া যায় সে খবর কি ফজলুর রহমান

সাহেবের জানা নাই? পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের মাতৃভাষা ও পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষার অস্তিত্বের কথা যাঁরা এইভাবে বার বার "ভুলিয়া" যাইতে পারেন, তাঁদের পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানকে একদিন ভুলিয়া যাওয়া বিচিত্র নয়।

এর পর রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের সামগ্রিক জীবনের সম্পর্কের বিষয়ে সম্পাদকীয়টিতে বলা হয়:

রাষ্ট্রভাষার সওয়ালটা শুধু রাজকার্যের মাধ্যমের সওয়াল নয়, এর সাথে রাষ্ট্রের জনগণের উন্নতি, অবনতি, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রশ্নও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এইরূপ একটি নাজুক প্রশ্ন লইয়া ছেলেখেলা চলে না। কিন্তু দুঃখের সহিত আমরা লক্ষ্য করিতেছি যে, সেই ছেলে-খেলাই যেন চলিতেছে। পাকিস্তানের মেজরিটির মাতৃভাষার বিরুদ্ধে যেন ব্যুরোক্র্যাটিক ষড়যন্ত্র চলিতেছে। নইলে অভিজ্ঞ ও দায়িত্বসম্পন্ন কর্ম-চারীদের পক্ষে এমন "ভুল" বার বার দুহরানো সম্ভব নয়। কিন্তু এই পুনরাবৃত্তি "ভুলই" হউক আর মতলবই হউক, এর পরিণতি রাষ্ট্রের পক্ষে সমান বিষময়। কারণ রাষ্ট্রভাষার মতো নাজুক প্রশ্নের বিচার করিতে গিয়া জনগণের সমষ্টিগত সুবিধা ও সেন্টিমেণ্টকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। সুদ্ধমাত্র জনগণের মত লইয়াই এই প্রশ্নের সুষ্ঠু মীমাংসা হইতে পারে। গায়ের জোরে বা চালাকি করিয়া পাঁচ কোটি লোকের ঘাড়ে একটা ভাষা চাপান যাইবে না। চাপাইতে গেলে তা একান্তই অস্বাভাবিক হইবে। বিংশ শতাব্দীর জটিল পরিবেশে জাতীয় ঐক্য ও রাষ্ট্রীয় সংহতি রক্ষার একমাত্র উপায় হইতেছে রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি অংশকে আত্মনিয়ন্ত্রণের সমান অধিকার দেওয়া।

ফজলুর রহমানের সাথে সাক্ষাতের পর ফেব্রুয়ারি মাসেই সংগ্রাম পরিষদ বাংলা ভাষার দাবী জ্ঞাপক একটি স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু করে এবং কয়েক হাজার স্বাক্ষরসহ সেটি সরকারের কাছে প্রেরিত হয়।[৭]

এর পূর্বে ১৯৪৮-এর ১১ই জানুয়ারি পাকিস্তান সরকারের যানবাহন ও যোগাযোগ মন্ত্রী আবদুর রব নিশতার সফরের উদ্দেশ্যে সিলেটে উপস্থিত হন। সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন এবং অফিস আদালতের ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষাকে ব্যবহার করার দাবী জানানোর জন্যে সিলেট মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি আবদুস সামাদের নেতৃত্বে একটি ছাত্র প্রতিনিধিদল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। একটি মহিলা প্রতিনিধিদলও সেই সময় আবদুর

রব নিশতারের সাথে সাক্ষাৎ করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার দাবী জানান।[৮]

এই সময় সিলেটের মুসলিম সমাজেও বাংলা ভাষার প্রশ্নে নানাপ্রকার বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সিলেট শহরে এই সময় তারিখবিহীন একটি প্রচারপত্রে মুসলমানদেরকে উদ্দেশ করে বলা হয়, 'আপনার দীনি ফরজ সর্বত্র সভা সমিতি করিয়া উর্দুর সমর্থনে জনমত গঠন করা ও উর্দু বিরোধীদের ফেরেববাজী হইতে মুসলিম জনসাধারণকে রক্ষা করা।[৯] সাপ্তাহিক 'নওবেলালে' এই প্রচারপত্রটির একটি প্রতিবাদও প্রকাশিত হয়।[১০] এর প্রায় এক মাস পর সিলেটের মুন্সীবাজার ইউনিয়নে জমিয়তে উলামায় ইসলামের একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় ভাষা প্রশ্নের উপর গৃহীত একটি প্রস্তাবে বলা হয় :

> পাকিস্তান অর্জনে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমস্ত পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৫/৬ অংশ বাংলা ভাষাভাষী। সুতরাং গণনীতির দিক দিয়া সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানবাসীর পক্ষে অল্প সময়ে বাংলা ভাষা শিক্ষা সহজ নহে বিধায় বিশেষ বিবেচনা স্থলে তথাকার রাষ্ট্রভাষা উর্দু ও পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষা বাংলা এবং পশ্চিমের দ্বিতীয় ভাষা বাংলা, তৃতীয় ভাষা ইংরেজী এবং পুবের দ্বিতীয় ভাষা উর্দু তৃতীয় ভাষা ইংরেজী হওয়া উচিত।

প্রস্তাবটিতে এ বিষয়ে পাকিস্তান সরকার ও গণ-পরিষদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।[১১]

১৯৪৮ সালে জানুয়ারির দ্বিতীয়ার্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব আর্টস এবং সায়েন্স এক যুক্ত বৈঠকে সিদ্ধান্ত করেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত সমস্ত স্কুল কলেজে নিম্নতম থেকে আই. এ. পর্যন্ত সকল ক্লাসেই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করা হবে। সংবাদপত্রের খবরে আরও জানা যায় যে ১৯৫০-৫১ সেশন থেকে এই প্রস্তাব কার্যকরী করা হবে বলে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন। এ বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে একটি পরিভাষা কমিটিও গঠন করা হয়।[১২]

এর পর ২রা ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর মাহমুদ হাসান সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বক্তৃতা দেওয়ার সময় ভাষা প্রসঙ্গে বলেন, 'একমাত্র মাতৃভাষা ছাড়া আর কোনো ভাষাই পাকিস্তানে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে না'।[১৩]

প্রথম দিকে ভাষা আন্দোলন কেবলমাত্র শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট মহলেই সীমাবদ্ধ

ছিলো কিন্তু এর পর তা ধীরে ধীরে অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিস্তার লাভ করতে শুরু করে। জানুয়ারি মাসেই পাবনার স্থানীয় সংবাদপত্র প্রতিনিধি সমিতির এক সভায় বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করার দাবী জানানো হয়। এ ছাড়া এই দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন গঠন করার জন্যেও তাঁরা একটি স্বতন্ত্র প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[১৪]

ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সিলেটের কয়েকজন বিশিষ্ট মহিলা পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের কাছে প্রেরিত একটি স্মারক-লিপিতে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানান। এতে যাঁরা স্বাক্ষর দান করেন তাঁদের মধ্যে মহিলা মুসলিম লীগের জেলা কমিটির সভানেত্রী বেগম জোবেদা খাতুন চৌধুরী, সহ-সভানেত্রী সৈয়েদা শাহেরবানু, সম্পাদিকা সৈয়েদা লুৎফুন্নেসা খাতুন, সৈয়েদা নজিবুন্নেসা খাতুন এবং সিলেট রাজকীয় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী রাবেয়া খাতুনের নাম উল্লেখযোগ্য।[১৫]

এই স্মারকলিপি প্রেরণের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর সিলেটের ইস্টার্ন হেরাল্ড পত্রিকায় ২৮শে ফেব্রুয়ারি একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে অন্যতম স্বাক্ষরকারিণী জোবেদা খাতুন এবং স্মারকলিপিটি সম্পর্কে কতকগুলি অশোভন ও বিরূপ উক্তি করা হয়। এই উক্তির প্রতিবাদে সাপ্তাহিক নওবেলালে ১১ই মার্চ স্মারকলিপির অন্যতম স্বাক্ষরদাত্রী সৈয়েদা নজিবুন্নেসা খাতুনের একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি বলেন যে নিজেদের ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত দাবী পেশ করার জন্যেই তাঁরা উপরোল্লিখিত স্মারক লিপি প্রধান মন্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং এ কাজ করায় পূর্ণ অধিকার তাঁদের আছে। তিনি আরও বলেন :

> যাহারা পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষী হইয়া মাতৃভাষার বিরুদ্ধাচরণ করেন তাহারা মাতৃভাষার বিশ্বাসঘাতক কু-পুত্র তুল্য। অনেকে আবার না বুঝিয়া, ধর্মের দোহাই শুনিয়া উর্দুর সমর্থন করেন। তাহাদের তত দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু যাহারা ধর্মের দোহাই দেন তাহাদের জিজ্ঞাসা করি যে উর্দু ভাষাভিজ্ঞ অপেক্ষা সিলেটের উর্দু অনভিজ্ঞ মুসলমানেরা ইসলাম ধর্মের অনুশাসন পালনে কোন্ অংশে হীন? বরং এ বিষয়ে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে সিলেটের মুসলমানদের তহজীব ও তমদ্দুন এক বিশিষ্ট স্থান লাভের অধিকারী বলিয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের বক্তব্য ছিল যে উর্দু ভাষাভাষী অধিক

সংখ্যক শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া পর্দানসীন মহিলাদের শিক্ষা ব্যবস্থা অসম্ভব ফলে অল্প দিনের মধ্যে অল্প শিক্ষিতা নারী জাতি অশিক্ষিতা হইয়া যাইবেন এবং স্বামী পুত্রের সহযোগিতা করিতে পারিবেন না। রাষ্ট্রভাষা যদি বাংলার পরিবর্তে উর্দু হয়, তবে আমাদের মতো অল্প শিক্ষিতা নারীদের জন্য উর্দু শিক্ষার কি ব্যবস্থা হইবে, তাহা আমাদের ধারণাতীত।

মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষাকল্পে সিলেটের মহিলাদের এই প্রচেষ্টা খুবই উল্লেখযোগ্য। তাঁদের এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়ে তমদ্দুন মজলিসের সম্পাদক আবুল কাসেম মহিলা লীগের সভানেত্রী জোবেদা খাতুনের কাছে নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করেন :

আজ সত্যি আমরা অভূতপূর্ব আনন্দ এবং অশেষ গৌরব অনুভব করছি। সিলেটের পুরুষরা যা পারেননি তা আপনারা করেছেন। উর্দু সমর্থনে সিলেটের কোনো কোনো পত্রিকা যে জঘন্য প্রচার করছে আর সিলেটের কোনো কোনো পুরুষরা স্মারকলিপি দিয়ে যে কলঙ্কজনক অভিনয় করেছেন তা সত্যিই বেদনাদায়ক। কিন্তু আপনাদের প্রচেষ্টা দেখে মনে হচ্ছে আমাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই। আপনাদের প্রেরিত স্মারকলিপি আমাদের আশান্বিত করে তুলেছে। নিশতার সাহেবের সঙ্গে দেখা করেও আপনারা মাতৃভাষার প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। 'তমদ্দুন মজলিস' আজ আপনাদের অকৃত্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছে। আপনাদের প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হউক। আশা করি আপনাদের নিঃস্বার্থ কর্মচাঞ্চল্যে বাংলা ভাষা আন্দোলন আরো সক্রিয়—আরো প্রবল হয়ে উঠবে।[১৬]

২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮, পাকিস্তান গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশন আহূত হয়। এই অধিবেশনে যোগদান করার জন্যে পূর্ব বাঙলার প্রতিনিধি নূরুল আমীন, হাবিবুল্লাহ বাহার, গিয়াসুদ্দীন পাঠান প্রমুখ করাচী রওয়ানা হওয়ার পূর্বে আবুল কাসেম এবং তমদ্দুন মজলিস রাষ্ট্রভাষা সাবকমিটি ও মুসলিম ছাত্র লীগের এক প্রতিনিধিদল তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকালে তাঁরা পাকিস্তানের মুদ্রা, ডাক টিকিট, মনি অর্ডার ইত্যাদিতে বাংলা ভাষা বাদ দেওয়ার প্রতি গণ-পরিষদের উপরোল্লিখিত সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সদস্যবৃন্দ প্রতিনিধিদলটিকে এ সম্পর্কে ভুল সংশোধনের আশ্বাস দেন।[১৭]

ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে তমদ্দুন মজলিস একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলা ভাষার দাবীতে প্রথম সংগ্রাম পরিষদ্ তাদের উদ্যোগেই গঠিত হয়। আন্দোলনের সাংগঠনিক দিকটির প্রতি লক্ষ্য রাখার

ফলে ভাষা আন্দোলনকে সাংস্কৃতিক আলোচনাক্ষেত্র থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে উত্তীর্ণ করার ব্যাপারেও তাদের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য।

তমদ্দুন মজলিসের এই ভূমিকার জন্যে বাংলা ভাষা বিরোধী সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রগুলিতে সে সময় তাদের অনেক বিরূপ সমালোচনা হয়। এ কাগজগুলির মধ্যে 'মর্নিং নিউজ', 'পাসবান' এবং সিলেটের সাপ্তাহিক 'আসাম হেরাল্ড' ও 'যুগভেরী'র নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ভাষা আন্দোলন বিরোধী পত্রিকাগুলি এ ধরনের সমালোচনা করলেও সাপ্তাহিক 'ইনসাফ', 'জিন্দেগী' ও 'দেশের দাবী' এবং সিলেটের সাপ্তাহিক 'নওবেলাল' পুরোপুরিভাবে এই আন্দোলনকে সমর্থন করে।

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আজাদ পত্রিকায় বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে কিছু লেখা প্রকাশিত হয়। ১০ই জুলাই কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা' পত্রিকাতে 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক একটি পত্রে সেই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়। পত্রটি লেখেন হামিদা সেলিম (রহমান)। ইনি পরবর্তী সময়ে ১৯৪৮-এর মার্চ মাসে যশোর রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক হিসাবে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। পত্রটি নিম্নরূপ :

> বাঙালী হিসাবে যেমন আমরা সমগ্র বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের ভিতর দাবী করেছিলাম, তেমনি আজ বাঙলা দেশের ভাষা হিসাবেও বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে দাবী করব না কেন? পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রিয় 'আজাদে'র পৃষ্ঠায় বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষায় পরিণত করার বিরুদ্ধে যুক্তি দেখে খুবই দুঃখ হয়।...আমাদের বাঙালীর এতদিনের সাহিত্যকলা সবই কি আজ ভুলে যেতে হবে। কেমন করে আমরা ভুলে যাবো মাননীয় আকরাম খাঁয়ের লেখা কোরাণের তর্জমা, কেমন করে আমরা ভুলে যাবো তাঁর রচিত মোস্তফা চরিত, কেমন করে আমরা ভুলবো আমাদের নজরুলের গান? এই সাহিত্য কি আবার উর্দুতে তর্জমা হবে। শ্রদ্ধেয় আকরাম খাঁ কি আবার আমাদের জন্য তাঁর কলম উর্দুর গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ করবেন। পাকিস্তান জনগণের রাষ্ট্র। তাই তার ভাষা হবে জনগণের ভাষা। বাঙলার সাড়ে চার কোটি লোক যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষায় সাহিত্য রচনা করে যে ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করে সে ভাষা তাদের নিজস্ব ভাষা হবে না এও কি বিশ্বাস করতে হবে? স্বাধীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষার সাথে তাদের প্রাণের কোনো যোগই থাকবে না, এও কি সত্য হবে?

কিন্তু আজাদের এই বিরোধিতা তেমন বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। ইত্তেহাদের মতো জোরালোভাবে বাংলার দাবীকে স্বীকার এবং প্রচার না করলেও আজাদ অল্প দিনের মধ্যেই বাংলা ভাষার বিরোধিতা না করার সিদ্ধান্ত করে। এ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য :

১৯শে অগাস্ট, ১৯৪৭ সন। কলিকাতার মৌলালির আজাদ অফিসে জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেবের টেবিলে বসে নতুন পাওয়া স্বাধীনতার স্বাদ অনুভব করছিলাম। এমন সময় তাঁরই স্টাফের একজন এসে প্রশ্ন করলেন, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার বিষয়ে আমাদের মত কি হবে? ইত্তেহাদ তো বাঙলা ভাষার দিকে ঝুঁকে পড়ছে।' এডিটর সাহেব সামান্য কথা-বার্তার পর বললেন, '—দিন জানিয়ে যে আমাদেরও মত অনুরূপ; তবে একটু ধীরে ধীরে আগান।'[১৮]

আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীনের সতর্ক পদক্ষেপের উপদেশ থেকে বোঝা যায় যে বাংলা ভাষার বিরোধিতার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করলেও আজাদ ইত্তেহাদের মতো জোরালো ভূমিকা গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলো না।

বস্তুতঃ বাংলা ভাষার দাবী কিছুটা সমর্থন করলেও মার্চ মাসের ভাষা আন্দোলনের সময় আজাদ সর্বতোভাবে সরকারী পক্ষ অবলম্বন করে আন্দোলনের বিরোধিতা করে।

১১॥ কর্মী নির্যাতন

প্রথম পর্যায়ে বাংলা ভাষার আন্দোলন ছাত্র এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। কিন্তু একথাও সত্য যে বহু ছাত্র ও শিক্ষিত জনসাধারণ তৎকালে উর্দুর সপক্ষে ছিলেন। এই জাতীয় উর্দু সমর্থক এবং গুণ্ডাদের সহায়তায় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ ভাষা আন্দোলনের কর্মীদের উপর বহুবার হামলা করে। পুরাতন ঢাকার কতকগুলি এলাকায় সে সময় বাংলা সমর্থক ছাত্রদের প্রবেশ প্রায় অসম্ভব ছিল। রায়সাহেব বাজার থেকে এই সময় একটি উর্দু সমর্থক মিছিল বের হয়ে ঢাকা কলেজ পৌঁছায় এবং অন্য একটি অনুরূপ মিছিল ফজলুল হক হল থেকে শামসুল হুদার পরিচালনায় বের হয়ে ঢাকা কলেজ পৌঁছায় এবং কলেজ প্রাঙ্গণে (সিদ্দিক বাজারে) সমবেত হয়ে একটি সভা করে। সেই সভায় ভাষা আন্দোলনকে কুৎসিত ভাষায় নানাপ্রকার গালাগালি করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানানো হয়।[১]

এই সময় ঢাকা রেল স্টেশনের কাছে ভাষা আন্দোলনকারীদের একটি মিছিলের উপর গুণ্ডারা লাঠি চালায়। এই লাঠি চালানার ফলে কয়েকজন আহত হন।[২] এ ছাড়া সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল ইউনিয়নের তদানীন্তন সম্পাদক এবং তমদ্দুন মজলিসের কর্মী মোহাম্মদ সিদ্দিকুল্লা কসাইটুলীর বলিয়াদী প্রেসে একটি ইস্তাহার ছাপাতে গিয়ে গুণ্ডাদের হাতে লাঞ্ছিত হন এবং তাঁকে সেখানে আটক করা হয়। আটক অবস্থা থেকে তিনি একজনের সহায়তায় মুক্তি লাভ করে তাড়াতাড়ি সে এলাকা পরিত্যাগ করেন।[৩] ১৯৫২ সালের সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক কাজী গোলাম মাহবুবও এই সময় নাজিমুদ্দিন রোড়স্থ ঢাকা বেতার কেন্দ্রের কাছে বাংলা ভাষা বিরোধী গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হন।[৪] বস্তুতঃ এ ধরনের গুণ্ডামী এবং ছাত্র নির্যাতনের উদাহরণ ছিল অসংখ্য।

ফরিদ আহমদ ভাষা আন্দোলনের এই পর্যায়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা কালে একাধারে আইনের ছাত্র হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি এবং ঢাকা সরকারী কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন। সরকারী কর্মচারী হিসাবে আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ৬ই জানুয়ারি, ১৯৪৮-এ প্রাদেশিক চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদ সেক্রেটারিয়েটে নিজের অফিসে ফরিদ আহমদকে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে বলেন। আজিজ আহমদ এই সাক্ষাৎকারের সময় ফরিদ আহমদকে বলেন যে সরকারী কর্মচারী হিসাবে তিনি চাকরির নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করে সক্রিয় রাজনীতির সাথে জড়িত হয়েছেন। এজন্যে তিনি তাঁকে প্রথমে বরখাস্ত করবেন ভেবেছিলেন কিন্তু পরে অল্প বয়সের কথা বিবেচনা করে প্রথম বারের মতো তিনি তাঁকে সাবধান করে দেওয়াই স্থির করেছেন। ফরিদ আহমদ উত্তরে তাঁকে বলেন যে কর্তব্য সম্পর্কে তিনি নিজের ধারণা অনুসারেই কাজ করেছেন কাজেই এ ব্যাপারে তিনি মোটেই অনুতপ্ত নন।[৫]

ঐ সাক্ষাৎকারের পর ফরিদ আহমদ ৮ই জানুয়ারি, ১৯৪৮, অফিসে গিয়ে বাংলাকে কেন্দ্রীয় পাবলিক সারভিস কমিশনের ভাষা হিসাবে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে চাকরিতে ইস্তাফা দেন। এই প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেহাদের সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদ একটি সম্পাদকীয় লেখেন।[৬] এখানে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৪৭ সালে ফরিদ আহমদের এই ভূমিকা সত্ত্বেও পরবর্তী মার্চ ১৯৪৮ এবং ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সাথে তাঁর কোনো যোগাযোগই আর থাকেনি।

বাংলা ভাষার সপক্ষে ইস্তাহার বিলি করা, সভাসমিতি করা, বিবৃতি দেওয়া ইত্যাদির মারফতে জনমত গঠন চেষ্টার ফলে ঢাকার এক শ্রেণীর লোক এই সময় তমদ্দুন মজলিসের বিরুদ্ধে ভয়ানক ক্রুদ্ধ এবং উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ফলে তারা রশিদ বিল্ডিং-এ অবস্থিত তমদ্দুন মজলিস ও সংগ্রাম পরিষদের অফিসে প্রবেশ করে আসবাবপত্র ভেঙে চুরমার করে এবং কাগজপত্রসহ অন্যান্য জিনিসপত্র লুটপাট করে চলে যায়।[৭] রশিদ বিল্ডিং-এর অফিস এইভাবে বিনষ্ট হওয়ার পর সংগ্রাম পরিষদের অফিস স্থানান্তরিত হয় ফজলুল হক ছাত্রাবাসে।[৮]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ প্রথম রাজনৈতিক সংগ্রাম

১ ॥ গণ-পরিষদে ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব

২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮, পাকিস্তান গণ-পরিষদের অধিবেশন শুরু হয়। এই অধিবেশনে বিরোধী দল দুটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রথম প্রস্তাবটিতে বৎসরে অন্ততঃ একবার ঢাকায় পাকিস্তান গণ-পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানের দাবী জানানো হয়। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি ছিলো ভাষা বিষয়ক। এটিতে উর্দু এবং ইংরেজীর সাথে বাংলাকেও গণ-পরিষদের অন্যতম ভাষা হিসাবে ব্যবহার করার দাবী উত্থাপন করা হয়।[১] প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন পূর্ব বাংলার প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। খুব সম্ভবতঃ গণ-পরিষদের কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাবটি পেশ করা হয়নি। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ব্যক্তিগতভাবেই তা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লেখকের কাছে ১৯শে জুলাই, ১৯৬৮তে লিখিত একটি পত্রে বলেন :

> "বাংলা ভাষা" আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাষা হইক ইহাই ছিল আমার প্রস্তাব। ইহা আমার পার্টি প্রস্তাব ছিল বলে মনে হচ্ছে না।

কিন্তু ব্যক্তিগত হলেও কংগ্রেস দলের সমস্ত সদস্য এই প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং কয়েকজন এর সপক্ষে বক্তৃতা দেন।

প্রথম সংশোধনী প্রস্তাবটি ২৪শে তারিখে আলোচিত হয় এবং তমিজুদ্দীন খান সেটির বিরোধিতা করার পর পরিষদ কর্তৃক তা বাতিল হয়ে যায়। ভাষা বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাবটি আলোচিত হয় অধিবেশনের তৃতীয় দিন, ২৫শে ফেব্রুয়ারিতে। এই আলোচনাকালে গণ-পরিষদে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক উত্থাপিত এই প্রস্তাবটির বিরোধিতা করে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান বলেন :

> এখানে এ প্রশ্নটা তোলাই ভুল হয়েছে। এটা আমাদের জন্যে একটি জীবনমরণ সমস্যা। আমি অত্যন্ত তীব্রভাবে এই সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধিতা করি এবং আশা করি যে এ ধরনের একটি সংশোধনী প্রস্তাবকে পরিষদ অগ্রাহ্য করবেন।[২]

শুধু তাই নয়। প্রস্তাব উত্থাপনকারীদের উদ্দেশ্যের সততার প্রতি কটাক্ষ-পাত করে তিনি আরও বলেন :

প্রথমে এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নির্দোষ বলিয়া আমি ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু বর্তমানে মনে হয় পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা এবং একটি সাধারণ ভাষার ঐক্যসূত্র স্থাপনের প্রচেষ্টা হইতে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।[৩]

লিয়াকত আলী খানের এই সাম্প্রদায়িক বক্তব্য সম্ভব হয়েছিলো প্রধানতঃ এই কারণে যে পরিষদে মুসলমান সদস্যরা সকলেই ছিলেন সরকারী মুসলিম লীগ দলভুক্ত এবং তাঁরা দলগতভাবে বাঙালী অবাঙালী নির্বিশেষ সমস্বরে প্রস্তাবটির নিন্দা এবং বিরোধিতা করেছিলেন। অন্য পক্ষে প্রস্তাবটি যাঁরা উত্থাপন এবং তার সমর্থনে বক্তৃতা করেন তাঁরা সকলেই ছিলেন হিন্দু এবং কংগ্রেস দলভুক্ত।

গণ-পরিষদে কংগ্রেস দলের সেক্রেটারী রাজকুমার চক্রবর্তী সংশোধনী প্রস্তাবটির সমর্থনে বলেন :

উর্দু পাকিস্তানের কোনো প্রদেশেরই কথ্য ভাষা নয়। তা হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের উপরতলার কিছুসংখ্যক মানুষের ভাষা। পূর্ব বাঙলা এমনিতেই কেন্দ্রীয় রাজধানী করাচী থেকে অনেক দূরে অবস্থিত, তার উপর এখন তাদের ঘাড়ে একটা ভাষাও আবার চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। একে গণতন্ত্র বলে না। আসলে এ হলো অন্যান্যদের উপর উচ্চশ্রেণীর আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা। বাংলাকে আমরা দুই অংশের সাধারণ ভাষা করার জন্যে কোনো চাপ দিচ্ছি না। আমরা শুধু চাই পরিষদের সরকারী ভাষা হিসাবে বাংলার স্বীকৃতি। ইংরেজীকে যদি সে মর্যাদা দেওয়া হয় তাহলে বাংলা ভাষাও সে মর্যাদার অধিকারী।[৪]

মোহাজের এবং পুনর্বাসন মন্ত্রী গজনফর আলী খান[৫] প্রস্তাবটির বিরোধিতা করে বলেন :

পাকিস্তানে একটি সাধারণ ভাষা থাকবে সে ভাষা হচ্ছে উর্দু। আমি আশা করি যে অচিরেই সমস্ত পাকিস্তানী ভালভাবে উর্দু শিক্ষা করে উর্দুতে কথাবার্তা বলতে সক্ষম হবে।

উর্দু ভাষার সাথে ইসলামী সংস্কৃতির যোগ সম্পর্কে তিনি বলেন :

উর্দু কোনো প্রদেশের ভাষা নয়, তা হচ্ছে মুসলিম সংস্কৃতির ভাষা। এবং উর্দু ভাষাই হচ্ছে মুসলিম সংস্কৃতি।

পরিষদের কংগ্রেস দলভুক্ত হিন্দু সদস্যদের প্রতি কটাক্ষপাত করে তিনি বলেন :

বাঙলা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় এই বিতর্কের তাৎপর্য যে উপলব্ধি করে এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন এতে আমি খুশী হয়েছি।

গজনফর আলী খানের এই শেষোক্ত বক্তব্যের ভিত্তি হচ্ছে বিতর্ককালে পূর্ব বাঙলার মুসলিম লীগ দলভুক্ত সদস্যদের আচরণ এবং বক্তৃতা। পূর্ব বাঙলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন সংশোধনী প্রস্তাবটির বিরোধিতা করতে গিয়ে বলেন :

পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসীরই এই মনোভাব যে একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।[৬]

খাজা নাজিমুদ্দীন ছাড়া গণ-পরিষদের সহ-সভাপতি তমিজুদ্দিন খানও ভাষা সংক্রান্ত সংশোধনী প্রস্তাবটির বিরোধিতা করে বক্তৃতা দেন।[৭]

২ ॥ সংবাদপত্রের সমালোচনা

প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের উপরোক্ত বক্তৃতা প্রসঙ্গে ২৭শে ফেব্রুয়ারি 'বাংলা ভাষা ও পাকিস্তান' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে দৈনিক আজাদ মন্তব্য করেন :

খাওয়াজা সাহেব কবে রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের গণভোট গ্রহণ করিলেন, তাহা আমরা জানি না। আমাদের মতে, তাঁর উপরোক্ত উক্তি মোটেই সত্য নয়। আমরা বিশ্বাস করি গণভোট গ্রহণ করিলে বাংলা ভাষার পক্ষে শতকরা ৯৯ ভোটের বড় কম হইবে না। এ অবস্থায় এমন গুরুতর ব্যাপারে তিনি (খাওয়াজা নাজিমুদ্দীন) এইরূপ একটি দায়িত্বহীন উক্তি করিয়া শুধু পূর্ব পাকিস্তানের মৌলিক স্বার্থেরই ক্ষতি করেন নাই, এদেশবাসীর পক্ষে আপন প্রতিনিধিত্বের অধিকারের মর্যাদাকেও ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের মৌলিক স্বার্থকে এভাবে বিকাইয়া দেওয়া কি এতই সহজ ?

ঐ একই দিনে দৈনিক ইত্তেহাদ 'অবিশ্বাস্য' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয়তে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের বক্তব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন :

এমন একটি নির্দোষ প্রস্তাব এবং যে প্রস্তাবের সহিত পাকিস্তানের তিন-চতুর্থাংশ নাগরিকের মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন জড়িত তাহাকে বিভেদ সৃষ্টিকারী প্রস্তাব অভিহিত করাতে এ প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করার পথ খোলাসা হইয়াছে বটে কিন্তু ন্যায় ও যুক্তির দরওয়াজা বন্ধ করা হইয়াছে।[৯]

এই সময় 'ইত্তেহাদ' এবং 'আজাদ' পত্রিকা কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হতো। এ ছাড়া 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'যুগান্তর', 'স্বাধীনতা' ইত্যাদিতে ভাষা সংক্রান্ত বিষয়ে যে সব সংবাদ ও সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয় সেগুলি পূর্ব বাঙলার সরকারী মহলে যথেষ্ট বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এ ছাড়াও অন্যান্য কারণে সংবাদপত্রগুলির কিছু কিছু মন্তব্য উল্লেখযোগ্য।

২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮, আনন্দবাজার পত্রিকা 'পাকিস্তানের গণতন্ত্র' শীর্ষক নিম্নোক্ত দীর্ঘ সম্পাদকীয়টি প্রকাশ করেন :

> পাকিস্তান গণ-পরিষদের অধিবেশনের প্রারম্ভ হইতে এ পর্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে পাকিস্তানী গণতন্ত্রের পরিচয় বিশেষ করিয়াই পাওয়া যাইতেছে। পাকিস্তানের প্রধানতম অংশরূপে পূর্ব বঙ্গের এবং বিশেষ করিয়া পাকিস্তানী অধিবাসী হিন্দু, শিখ মাইনরিটির পক্ষে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। গণ-পরিষদের পরিচালনার বিধান রচনার জন্য আলোচ্য ৭০টি প্রস্তাবের মধ্যে ৬৮টি মাত্র ৮০ মিনিটের মধ্যে প্রায় বিনা আলোচনাতেই গৃহীত হইয়াছে। মাত্র দুইটি উল্লেখযোগ্য সংশোধনী প্রস্তাব উঠিয়াছিল কিন্তু সে সংশোধন প্রস্তাব রূঢ় অবজ্ঞায় উপেক্ষিত হইয়াছে। সংশোধন প্রস্তাবের মধ্যে প্রধান দুইটি প্রস্তাবই পূর্ব বঙ্গের পক্ষ হইতে উত্থাপিত ; প্রথম প্রস্তাবে অনুরোধ করা হইয়াছিল যে বৎসরে অন্ততঃ একবার পূর্ব বঙ্গে ঢাকায় পাকিস্তান পরিষদের অধিবেশন হউক। প্রস্তাবটি হিন্দু সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত এবং মুসলমান সদস্য কর্তৃক সমর্থিত। কিন্তু মিঃ জিন্নার কৌশলে পূর্ব বঙ্গের অন্যতম সদস্য মিঃ তমিজুদ্দিনকে ইহার প্রতিকূলতা করিতে হইয়াছে। ইহার পরদিন গণ-পরিষদে ভাষা সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। গণ-পরিষদের পরিচালনার বিধান যাঁহারা রচনা করিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে পাকিস্তান গণ-পরিষদের আলোচনায় ইংরাজী বা উর্দু ছাড়া আর কোনো ভাষা ব্যবহৃত হইতে পারিবে না। পূর্ববঙ্গের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত যে সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহা অখণ্ডনীয়। সমগ্র পাকিস্তানের ৬ কোটি ৯০ লক্ষ লোকের মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ লোকেরই ভাষা বাংলা। সুতরাং পাকিস্তানের গণ-পরিষদের আলোচনায় বাংলাকে স্থানদান তো করিতেই হইবে, বাংলাকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত দত্তের যুক্তি খণ্ডন করিবার উপায় ছিল না। সেইজন্য উর্দুপন্থী পাকিস্তানীরা

ইহার উপর কল্পিত উদ্দেশ্য আরোপ করিয়া ইহাকে হেয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের সুবিজ্ঞ বিবেচনায় ইহা মুসলমানদের মধ্যে ভেদ ঘটাইবার চেষ্টা। পূর্ববঙ্গের অধিবাসীরা বাংলাভাষী খাঁটি বাঙালী। পাকিস্তানের লোকসংখ্যায় তাঁহারাই সর্বাধিক। এই অবস্থায় তাঁহাদের প্রতিনিধিরা যদি তাঁহাদের মাতৃভাষাকে পাকিস্তান রাষ্ট্রে ও উহার গণ-পরিষদে সম্মানের সহিত বসাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকই হইয়াছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধিদিগের এই স্বাভাবিক ও সঙ্গত দাবী স্বীকার করিয়া লওয়া দূরে থাকুক, পাকিস্তানের অধিনায়ক ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণ ইহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন এবং অবজ্ঞার সহিত ইহা প্রত্যাখান করিয়াছেন।

পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধিদের উপর অসদুদ্দেশ্য আরোপ ছাড়া পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ আপনাদের এই অসঙ্গত আচরণের সমর্থনে আর একটি যুক্তি দিয়াছেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ লিয়াকত আলী ঘোষণা করিয়াছেন যে পাকিস্তান 'মুসলিম রাষ্ট্র' অতএব ইহার রাষ্ট্রভাষা বা গণ-পরিষদের আলোচনার ভাষা 'মুসলিম রাষ্ট্রের ভাষা' ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না; মিঃ লিয়াকত আলীর মতে উর্দু ই হইল মুসলিম রাষ্ট্রভাষা। ভাষারও যে ধর্মভেদ ও সম্প্রদায় ভেদ আছে এরূপ কিম্ভূত-কিমাকার যুক্তি এ পর্যন্ত কদাচিং শোনা গিয়াছে; বিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে রাষ্ট্রকে ধর্মের দ্বারা চিহ্নিত করিবার চেষ্টাই বাতুলতা। তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া পাকিস্তানের প্রধামমন্ত্রী ভাষার উপর পর্যন্ত ধর্মের শীলমোহর লাগাইয়া দিতে চাহিতেছেন। ভাষার পরিচয় স্থান হিসাবেই হইয়া থাকে ও স্থান হিসাবেই ভাষার প্রাধান্য ঘটিয়া থাকে। ইহার সহিত ধর্মের সম্বন্ধ কোথা হইতে আসিল? "মুসলমান রাষ্ট্র" হইলেই তাহার ভাষা উর্দু হইবে কেন? তুরস্ক, আরব, পারস্য আফগানিস্তান মুসলমান-প্রধান এবং মুসলমান শাসিত রাষ্ট্র। তাহারা কি উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিয়াছে, না প্রত্যেকের দেশীয় ভাষাকেই সেই মর্যাদা দিয়াছে? এই পুরাতন মুসলমান শাসিত রাষ্ট্রসমূহ যদি স্ব স্ব দেশীয় ভাষাকেই গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারে তাহা হইলে হঠাং রাষ্ট্র পাকিস্তানই বা তাহা অগ্রাহ্য করিয়া একটি কৃত্রিম ভাষাকে সকলের উপর চাপাইতে চাহিতেছে কেন? বাংলাকে অগ্রাহ্য করিয়া উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে চালাইবার চেষ্টা কতদূর অসঙ্গত, অস্বাভাবিক ও গণতন্ত্র-বিরোধী একটু

বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রদেশ ৫টি: পূর্ব বাঙলা, পশ্চিম পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান; ইহার মধ্যে পূর্ব বাঙলার ভাষা বাংলা, পশ্চিম পাঞ্জাবের ভাষা পাঞ্জাবী, সীমান্ত প্রদেশের ভাষা পুষ্‌তু, সিন্ধু প্রদেশের ভাষা সিন্ধী ও বেলুচিস্তানের ভাষা বেলুচি। ইহার মধ্যে একটিও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবার সৌভাগ্য লাভ করিল না। কিন্তু যাহা পাকিস্তানের কোনো প্রদেশেরই ভাষা নহে তাহাকেই সকলের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইল। ইহা যদি জবরদস্তি না হয় তাহা হইলে জবরদস্তি আর কাহাকে বলে? নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে পূর্ব বাঙলার মুসলমান সদস্যগণ এই জবরদস্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। মৌলানা আকরাম খাঁ একদিন শাসাইয়াছিলেন যে বাংলা ভাষার দাবী অগ্রাহ্য হইলে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করিবেন। কিন্তু পাকিস্তানের গণ-পরিষদের অধিবেশনে তাঁহাকে বাক্যস্ফুট করিতে দেখিলাম না। মিঃ লিয়াকত আলি খাঁ মহাশয়ের উক্তির প্রত্যুত্তরে একথা তিনি বলিলেন না যে মুসলমানী ভাষা বলিয়া যদি কোনো ভাষার কল্পনাই করিতে হয় এবং তাহাকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে হয়, তাহা হইলে পাকিস্তানের অধিকাংশ মুসলমান যে ভাষায় কথা কহে এবং যে ভাষা তাহাদের দানে সমৃদ্ধ সেই ভাষারই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পাওয়া উচিত। কিন্তু মিঃ জিন্নার তর্জনের সম্মুখে সে কথা বোধ হয় কাহার বলিবার উপায় ছিল না। চক্ষের উপর এই ব্যাপার দেখিয়াও পূর্ববঙ্গের জনসাধারণ ও পূর্ববঙ্গ আইনসভার সদস্যগণ যদি সতর্ক না হন, তা হইলে পাকিস্তানের প্রধানতম অংশ হইয়াও অচিরে পূর্ববঙ্গকে পশ্চিম পাকিস্তানের অনুগ্রহজীবীর পর্যায়ে নামিয়া দাঁড়াইতে হইবে। পাকিস্তানকে মুসলিম রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিয়া পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মহাশয় হিন্দু ও শিখ মাইনরিটির অবস্থা তো শোচনীয় করিয়া তুলিলেন। কিন্তু এই হুমকির শাসন চলিতে থাকিলে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পূর্ব বাঙলার সকলের অবস্থাই অনুকম্পার যোগ্য হইয়া উঠিবে।

কায়েদে আজম মহম্মদ আলী জিন্নাহ, প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ও মুসলিম লীগের অন্যান্য সদস্যদের ভূমিকা এবং পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থার সমালোচনা ও পর্যালোচনা প্রসঙ্গে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ২৭শে ফেব্রুয়ারি যে সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশ করেন সেটিও অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এই প্রবন্ধতে পত্রিকাটি বলেন:

পাকিস্তানের বিধান পরিষদে মিঃ লিয়াকত আলী খানের উক্তিতে বাঙলাদেশে এবং তার বাইরে অনেকে আঘাত পেতে পারেন কিন্তু আমরা যে বিরাট কোনো আঘাত পাইনি একথা স্বীকার করি। নিজের মনের কথা প্রকাশকালে এতো চমৎকার অকপটতার পরিচয় দানের জন্যে আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। অমুসলমানরা এখন নিশ্চিতভাবে বুঝে নিবে তাদের আসল অবস্থা কি। ভবিষ্যতে পাকিস্তানে কি অবস্থার সৃষ্টি হবে এ সম্পর্কে মুসলমানরাও চিন্তা শুরু করবে। মিঃ লিয়াকত আলী খানের বক্তব্যের মধ্যে কোনো অপরিচ্ছন্নতা, দ্বিধা অথবা দ্ব্যর্থতা নেই। আমরা ধরে নিচ্ছি এ ক্ষেত্রে তিনি লীগ নেতৃত্বের সুবিবেচিত নীতিই অনুসরণ করেছেন। বুধবারে পাকিস্তান বিধান পরিষদে কার্য নির্বাহ সংক্রান্ত আইনের খসড়া নিয়ে বিতর্ক চলছিলো। সরকারের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয় যে প্রত্যেক সদস্যকে হয় উর্দু নয় ইংরেজীতে পরিষদকে সম্বোধন করতে হবে। বিরোধী কংগ্রেসদল কর্তৃক এই প্রস্তাব সংশোধনের জন্য একটি পাল্টা প্রস্তাবে উর্দু ও ইংরেজীর সাথে বাংলাকেও পরিষদের সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করার অনুরোধ জানানো হয়। সংশোধনী প্রস্তাবটি যিনি পেশ করেছিলেন তিনি একথা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন যে প্রাদেশিকতার বশবর্তী হয়ে তিনি প্রস্তাবটি উত্থাপন করেননি, করেছিলেন এজন্যে যে পাকিস্তানের জনসংখ্যার বিপুল অধিকাংশের কথ্য ভাষা বাংলা এই কারণে তাকে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দেওয়াই কর্তব্য। মিঃ লিয়াকত আলী খান তাঁর আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সংশোধনী প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন যে পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র। প্রত্যেক মুসলিম রাষ্ট্রের একটি মুসলিম ভাষা থাকা দরকার এবং উর্দু হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম ভাষা। বাঙলাদেশের মুসলমানরা এই বিস্ময়কর বক্তব্যকে মনে মনে কিভাবে গ্রহণ করেছেন আমরা জানি না কিন্তু সে যাই হোক সংশোধনী প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে গেছে। পাকিস্তানের পূর্ব সুবার দায়িত্বপ্রাপ্ত খাজা নাজিমুদ্দীনও মনে করলেন যে বিতর্ককালে তাঁরও আবার কিছু একটা বলা দরকার। কাজেই পরিষদকে তিনি বললেন—কার অথরিটিতে সেকথা জিজ্ঞেস করার অধিকার আমাদের নেই—যে পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ লোকের মত হচ্ছে এই যে উর্দুই একমাত্র ভাষা যা পাকিস্তানের সাধারণ ভাষা হিসাবে গৃহীত হতে পারে। তিনি আরও বলেন যে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার পেছনে কোনোই

যুক্তি নেই। কাজেই খাজা নাজিমুদ্দিনের মতানুসারে পাকিস্তানের অর্থ হলো এই যে প্রতেক বাঙালী বাড়িতে, প্রতেক বাঙালী স্কুলে এবং প্রত্যেক বাঙালী আইন আদালতে প্রত্যেককে বাংলা বর্জন করে উর্দুতে কথা বলতে হবে। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রের প্রতিটি বিভাগের উচ্চ পর্যায়ের চাকুরিতে যে সমস্ত লোক বহাল হয়েছে তাদের সাথে প্রদেশের ভাষা, আচার-আচরণ, রীতিনীতি এবং ঐতিহ্যের কোনো সম্পর্ক নেই। শাসন-তান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে তারা অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে অনুপ্রবেশ করতে শুরু করেছে। এবার সাংস্কৃতিক আধিপত্যের মাধ্যমে নিজেদের পরিকল্পনাকে তারা এগিয়ে নিয়ে যাবে। পূর্ব বাঙলাকে দৃঢ় এবং নিশ্চিতভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বহীন অংশে পরিণত করতে হবে। করাচী এবং কিছু পরিমাণে লাহোর সমস্ত কিছুর উপর কর্তৃত্ব করবে এবং খাজা নাজিমুদ্দিন ও তাঁর বাংলাভাষী মন্ত্রীরা করাচী ও লাহোরের লোকজনের এজেন্ট হিসাবে কাজ করে যাবেন। পূর্ব বাঙলার অধিকাংশ মানুষ যদি তাই চান তাহলে তাই তারা পাবেন। কারণ তাঁরা যে ধরনের সরকারের যোগ্য হবেন সেই ধরনের সরকারই তাঁরা পাবেন কিন্তু এই পাকিস্তানের জন্যেই কি তাঁরা এত মাস ও বৎসর যাবৎ চীৎকার করে এসেছেন? এই কি সেই ইসলামী রাষ্ট্র যে সম্পর্কে এতদিন তাদেরকে অনেক রোমান্টিক কাহিনী বলা হয়েছে? পাকিস্তানের জন্য কি তা হলে তাদেরকে আজ নিজেদের মাতৃভাষা ও বহু যুগের পুরাতন সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন এবং সাধারণ লোককাহিনী, গান ও গাথার মাধ্যমে গঠিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সৌভ্রাতৃত্বের মহান ঐতিহ্যকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করতে হবে? এগুলির দ্বারা কায়েদে আজম মহম্মদ আলী জিন্নার উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হতে পারে। আমরা মিঃ লিয়াকত আলী খানের রাজকীয় ভারসাম্য ও ধীরতার প্রশংসা করি কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র কোনো সন্দেহ নেই যে আমাদের মুসলমান ভাইদের সামনে এক চরম বিপর্যয় উপস্থিত। মুসলমানদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার জন্যে অথবা আভ্যন্তরীণ বিপ্লব ঘটানোর উদ্দেশ্যে আমরা একথা বলছি না। আমরা একথা বলছি যাতে করে পূর্ব পাকিস্তানী মুসলমানরা পশ্চিমের সংকীর্ণ, ধর্মান্ধ এবং পরমত-অসহিষ্ণু জাতীয়তাবাদের খপ্পরে পতিত না হন। ভারতীয় ইউনিয়নে সকল নাগরিককে একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় তত্ত্বের প্রতি দৃঢ় আনুগত্য প্রকাশ করতে বলা যেমন বিপজ্জনক এবং অর্থহীন তেমনি পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসনকর্তারা সেই-

রাষ্ট্রের সকল মুসলমানকে একটি নির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয় জীবন ব্যবস্থা বরাদ্দ করলে সেটাও হবে অনুরূপভাবে বিপজ্জনক এবং অর্থহীন। বহু শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষের ইতিহাস এমন এক পথে বিকাশ লাভ করেছে যার যথার্থ তুলনা অন্য দেশের ইতিহাসের মধ্যে খুঁজলে সে প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য। একথা বলার অর্থ প্রাদেশিক ঈর্ষা, এলাকাগত স্বাতন্ত্র্য অথবা সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার ইন্ধন যোগানো নয়। বাংলাভাষী সংখ্যাগুরুসহ অন্যান্য সকল মানুষের উপর পাকিস্তান যখন উর্দু চাপিয়ে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তখন তার ফলে যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে তাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে না পারলে বাঙালী মুসলমানরা পাকিস্তানের মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই অবস্থায় আমরা অসহায় এবং হতভাগ্য অমুসলমানদের সম্পর্কে কি বলবো? তাদের দাবী-দাওয়া ইচ্ছাকৃতভাবে প্রত্যাখ্যাত, ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ নিন্দা সহকারে অগ্রাহ্য এবং ক্ষীণ-কণ্ঠ প্রতিবাদ ধর্মান্ধ পাকিস্তানীদের প্রচণ্ড চীৎকারে নিমজ্জিত! দৃঢ় ও কঠোরভাবে বিবেকের তোয়াক্কা না রেখে তাদেরকে শুধু যে একটি সম্পূর্ণ বিদেশী ভাষার দাসত্ব করতে বলা হচ্ছে তাই নয়, ইসলামী রাষ্ট্র এবং কোরাণ ও শরিয়তের নির্দেশ অনুযায়ী যে আইন গঠিত হবে তার প্রতিও তাদেরকে আনুগত্য প্রকাশ করতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। করাচীতে তাদের কণ্ঠস্বর অরণ্যে রোদনেরই মতো। নিজেদের পিতৃপুরুষের দেশ পূর্ব বাঙলাতেও তাদের অবস্থা বিদেশী বহিরাগত এবং অনধিকার প্রবেশকারী অপেক্ষা ভাল নয়। ভারতবর্ষ বিভাগের সময় এবং তার পূর্বেও ইসলামী রাষ্ট্রের উপর জোর দেওয়াকে কেউ কোনো গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু সময় কিছুটা অতিবাহিত হওয়ার পর এ সম্পর্কে এখন আর আত্মপ্রসাদের কোনো স্থান নেই। কায়েদে আজম জিন্না যখন ইসলামের কথা বলেন তখন তিনি বুঝে-সুঝেই সেকথা বলেন। মিঃ লিয়াকত আলী খান দেখিয়ে দিয়েছেন যে ইসলামী রাষ্ট্র কি ধরনের হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে অমুসলমান সংখ্যালঘুদের অধিকার ও স্বার্থ সংক্রান্ত বহু আলোচিত নিরাপত্তার কথা অর্থহীন এবং তুচ্ছ বাগাড়ম্বর মাত্র। মিঃ লিয়াকত আলী খানের বক্তব্যের সরল অর্থ এই যে তারা যদি ইসলামী প্রভুত্ব এবং তার আনুসঙ্গিক সবকিছুর সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে না পারে তাহলে তাদের স্থান হবে রাষ্ট্রের বাইরে। কায়েদে আজম জিন্নাহ, মুসলিম লীগের সর্বোচ্চ কাউন্সিল এবং পূর্ব পাকিস্তান সুবায় মিঃ জিন্নার ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের এই কি আসল অভিপ্রায়?

আমরা একথা জানতে চাই। দেশের অবস্থা আজ কোথায় দাঁড়িয়েছে এ নিয়ে বাংলাদেশের হিন্দু মুসলমানরা নিশ্চয়ই একইভাবে চিন্তা করছেন।

১৯৪৮ সালের এই সময়ে কোনো দৈনিক পত্রিকা ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতো না। যে কয়টি সাপ্তাহিক পত্রিকা তখন প্রকাশিত হতো তার মধ্যে সিলেটের 'নওবেলাল' ছিলো সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই পত্রিকাটিতে ৪ঠা মার্চ তারিখে পাকিস্তান গণ-পরিসদের ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব এবং তার সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্তের উপর 'রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশ করা হয়। রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নের সাথে পূর্ব বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনের ও সাংঘাতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের যোগসূত্রের কথা উল্লেখ করে তাতে বলা হয়:

পাকিস্তান লাভ করিবার পূর্বে পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের ধারণা ছিল যে তাহাদের সংস্কৃতি, তহজিব, তমদ্দুন সকল অবস্থায়ই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের এলাকাধীন বিভিন্ন প্রদেশের অধিকাংশ বাসিন্দা মুসলমান গতিকে, তাহাদের মধ্যে মজহাবী একতা ছাড়া ভাষাগত বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশে নানাবিধ পার্থক্য রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যদি এক ভাষার অধিপত্যে অন্য ভাষার প্রসার সংকুচিত হয় অথবা অন্য প্রদেশের সংহতি নষ্ট হইবার সূচনা দেখা যায় তাহা হইলে যে প্রদেশের ভাষার মর্যাদার হানি হইয়াছে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের তুলনা করে পত্রিকাটি বলেন:

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের আমলেও গভর্নমেণ্টের কারেন্সী নোটেও বাংলা ভাষার স্থান ছিল। পাকিস্তান সরকার বাংলাকে তুলিয়া ফেলিয়াছেন। পাকিস্তান সরকারের মনি অর্ডারের ফরম, ডাক টিকিট, পোস্ট কার্ড ইত্যাদিতে বাংলার স্থান নাই।

প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীর উক্তি সম্পর্কে নওবেলাল বলেন:

এই প্রস্তাবের প্রসঙ্গে পাকিস্তানের উজিরে আজম জনাব লিয়াকত আলী যে অসংলগ্ন কথার অবতারণা করিয়াছেন তাহাতে বাস্তবিকই মর্মাহত হইতে হয়। তিনি বলিয়াছেন পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র, তাই পাকিস্তানের ভাষা হইবে মুসলিমদের ভাষা উর্দু। এই সব অপরিণামদর্শী ভাষণের আলোচনাও এক দুঃখজনক ব্যাপার। তবে এই সব ঘোষণার প্রতিক্রিয়া যে মারাত্মক হইতে পারে সে সম্বন্ধে আমরা জনাব লিয়াকত আলী খানকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

খাজা নাজিমুদ্দিনের উক্তির সমালোচনা প্রসঙ্গে এতে বলা হয়:

এই প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের জনমতের উল্লেখ করিতে যাইয়া জনাব নাজিমুদ্দিন ও তমিমুদ্দিন খান যে সব অপ্রত্যাশিত মন্তব্য করিয়াছেন তার জন্য নিশ্চয়ই তাহাদিগকে একদিন পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে। খাজা সাহেবের পারিবারিক ভাষা উর্দুকে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ তাহাদের সাধারণ ভাষারূপে গ্রহণ করিতে চায় এই তথ্য কোথায় আবিষ্কার করিলেন?

গণ-পরিষদের মুসলিম লীগ দলীয় বাঙালী সদস্যদের উদ্দেশ্যে পত্রিকাটি বলেন:

এইভাবে আপনার মাতৃভাষার মূলে যাহারা কুঠারাঘাত করিতেছেন, তাহারা কি একবার ভাবিয়াও দেখেন নাই যে ভাষার ভিতর দিয়াই জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, আদর্শ প্রভৃতি রূপ পাইয়া থাকে। ভাষা সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ না করিলে জাতির মেরুদণ্ড গঠিত হইয়া উঠিতে পারে না। কোনো এক বিশেষ প্রভাবে পড়িয়া তাঁহারা হয়ত আপনাদের অস্তিত্বের বিলোপ করিতে পারেন, তবে পূর্ব পাকিস্তানের চারি কোটি চল্লিশ লক্ষ লোক কিছুতেই তাহাদিগকে ক্ষমা করিবে না। কিছুতেই তাহারা তাহাদের মাতৃভাষা বাংলার অবমাননা সহ্য করিবে না। তাই ইতিমধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ধর্মঘট করিয়াছে এবং মিছিল সহকারে সর্বত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছে। কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণই নহে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে। এই গণবিক্ষোভ যখন পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করিবে তখন এইসব নেতাদের আসনও টলটলায়মান হইয়া পড়িবে।

সর্বশেষে পাকিস্তানের শান্তি এবং ঐক্য বজায় রাখার আবেদন জানিয়ে সম্পাদকীয়টিতে বলা হয়:

তাই পূর্বাহ্নেই আমরা কর্তৃপক্ষ মহলকে অনুরোধ করিতেছি যদি পাকিস্তানের সংহতি, ঐক্য ও সর্বোপরি শান্তি বজায় রাখিবার জন্য তাঁহাদের মনে এতটুকু আগ্রহ থাকে তাহা হইলে অনতিবিলম্বে তাঁহাদের কর্মের সংশোধন করুন। পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার মাধ্যমরূপে বাংলাকে গ্রহণ করুন। তাহা না হইলে স্বভাবতঃই পূর্ব পাকিস্তানবাসীর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইতে থাকিবে যে পূর্ব পাকিস্তানের উপর যুক্ত প্রদেশ ও পশ্চিম পাঞ্জাবের লোকের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বাংলাকে আস্তে আস্তে তার ন্যায্য আসন হইতে সরাইয়া ফেলা হইতেছে।

৩ ॥ সভা ও সাংগঠনিক উদ্যোগ

বাংলা ভাষাকে গণ-পরিষদের অন্যতম ভাষা করার দাবী অগ্রাহ্য হওয়ার সংবাদ ঢাকায় প্রকাশিত হওয়ামাত্র ছাত্র, রাজনীতিক ও শিক্ষিত মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। উর্দুকে পূর্ব বাঙলার অধিকাংশ লোক রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী, খাজা নাজিমুদ্দিনের এই উক্তিকে তাঁরা সকলে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে বর্ণনা করেন। তাঁরা অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করিতে থাকেন যে গণ-পরিষদের মুসলিম লীগ দলীয় বাঙালী সদস্যেরা কোন্ হিসাবে বাংলা ভাষাকে পরিষদের অন্যতম ভাষা করার বিরুদ্ধে ভোট দিলেন।[১]

গণ-পরিষদের বাংলা বিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ২৬শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার ছাত্র সম্প্রদায় ধর্মঘট পালন করেন। ঐদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং স্কুলের ছাত্রেরা ক্লাস বর্জনের পর একটি মিছিল বের করে বাংলা ভাষার সমর্থনে নানা প্রকার শ্লোগান দিতে দিতে রমনা এলাকা প্রদক্ষিণ করে। এই মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে শেষ হওয়ার পর বিকেলের দিকে সেখানে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং তমদ্দুন মজলিসের সম্পাদক আবুল কাসেম। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের আহ্বায়ক নঈমুদ্দীন আহমদ, ফজলুল হক হল ইউনিয়নের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ তোয়াহা এবং অধ্যাপক আবুল কাসেম গণ-পরিষদের সিদ্ধান্ত এবং সেই প্রসঙ্গে গণ-পরিষদের মুসলিম লীগদলভুক্ত বাঙালী সদস্যদের আচরণ এবং উক্তিসমূহের তীব্র নিন্দা করে বক্তৃতা দান করেন।[২]

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ছাত্রসভায় পূর্ব বাঙালার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের বক্তৃতার তীব্র প্রতিবাদ করে, বাংলা ভাষাকে গণ-পরিষদের অন্যতম সরকারী ভাষা করার উদ্দেশ্যে একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনার জন্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে অভিনন্দন জানিয়ে এবং এ সম্পর্কে পূর্ব বাঙলার মুসলমান সদস্যদের মনোভাব ও ঢাকা বেতারের মিথ্যা ও পক্ষপাতমূলক সংবাদ প্রচারের বিরুদ্ধে সর্বসম্মতিক্রমে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৩] 'পূর্ব পাকিস্তান প্রতিবাদ দিবস' পালন করতে ছাত্র সমাজকে আহ্বান জানানোর জন্যে তমদ্দুন মজলিসের রাষ্ট্রভাষা সাব-কমিটিকে অনুরোধ জানিয়ে এই সভায় একটি পৃথক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।[৪]

গণ-পরিষদের সিদ্ধান্ত এবং পাকিস্তান মুসলিম লীগের বাংলা বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন গঠন করার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ, বিভিন্ন ছাত্রাবাস এবং তমদ্দুন মজলিসের যৌথ উদ্যোগে ২রা মার্চ ফজলুল হক হলে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের একটি সভা আহ্বান করা

হয়।[৫] যাঁরা এই সভায় উপস্থিত হন এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে কমরুদ্দীন আহমদ, রনেশ দাশগুপ্ত, আজিজ আহমদ, অজিত গুহ, আবুল কাসেম, সরদার ফজলুল করিম, শামসুদ্দীন আহমদ, কাজী গোলাম মহবুব, নঈমুদ্দীন আহমদ, তফজ্জল আলী, আলী আহমেদ, মহীউদ্দিন, আনোয়ারা খাতুন, শামসুল আলম, শওকত আলী, আউয়াল, মহম্মদ তোয়াহা, অলী আহাদ, শামসুল হক, শহীদুল্লাহ কায়সার, লিলি খান, তাজউদ্দিন আহমদ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।[৬] এই সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরুদ্দীন আহমদ।[৭]

ভাষা আন্দোলনকে সুষ্ঠু সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার জন্যে এই সভায় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' নামে একটি সর্বদলীয় পরিষদ্ গঠিত হয় এবং গণআজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক যুগ লীগ, তমদ্দুন মজলিস, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক মুসলিম হল ইত্যাদি ছাত্রাবাস ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ এদের প্রত্যেকটি থেকে দু'জন করে প্রতিনিধি তার সদস্য হিসাবে মনোনীত হন। সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক হিসাবে মনোনীত হন শামসুল আলম।[৮]

এই সভায় সংগ্রাম কমিটির সদস্যদের নাম আলোচনাকালে আবুল কাসেম অজিত গুহের নাম সদস্য হিসাবে রাখার বিরোধিতা করে বলেন অজিতবাবু হিন্দু কাজেই তাঁর অন্তর্ভুক্তি আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। অজিত গুহ এর প্রতিবাদ করে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দেন এবং বলেন যে আন্দোলনের তাতে কোনো অসুবিধা হবে না বরং সুবিধাই হবে। কারণ ভাষা আন্দোলন একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং তাতে কোনো সাম্প্রদায়িক বিবেচনা স্থান পাওয়া উচিত নয়।[৯]

অজিত গুহ প্রগতিশীল লেখক সংঘের প্রতিনিধি হিসাবে এই সভায় যোগদান করেন। অজিত গুহের মতে আবুল কাসেম সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের অবতারণা করলেও তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিলো প্রগতিশীল লেখক সংঘকে সংগ্রাম কমিটির সাথে বাদ দেওয়া। শেষ পর্যন্ত অজিত গুহকে সংগ্রাম কমিটির সদস্য করা হয়নি।[১০] বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে একটি প্রস্তাব গ্রহণের পর সভায় পাকিস্তান গণ-পরিষদের সরকারী ভাষার তালিকা থেকে বাংলা ভাষাকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদ হিসাবে ১১ই মার্চ সমগ্র পূর্ব বাঙলায় সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়ে অপর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।[১১]

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের যে সাব-কমিটি গঠিত হয় তার কয়েকটি বৈঠকে ১১ তারিখের ধর্মঘট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই

সাব-কমিটির দুই বৈঠক পর পর ৪ঠা এবং ৫ই মার্চ বিকেল পাঁচটায় ফজলুল হক হলে অনুষ্ঠিত হয়।[১২]

১১ই মার্চের সাধারণ ধর্মঘটকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে দলিউর রহমান এবং মুখলেসুর রহমানের প্ররোচনায় ঢাকা ইণ্টার মিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ নানাপ্রকার গণ্ডগোল সৃষ্টির চেষ্টা করেন। তাঁদের উদ্যোগে ৭ই মার্চ কলেজ প্রাঙ্গণে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে কলেজের অধ্যক্ষও বক্তৃতা দান করেন।[১৩]

৪॥ সিলেটে প্রতিক্রিয়াশীলদের হামলা

৮ই মার্চ সিলেট তমদ্দুন মজলিস এবং সিলেট জেলা মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে সিলেটের গোবিন্দ পার্কে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল নাজিমুদ্দীন পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলাকে গ্রহণ করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া এবং অবিলম্বে তাঁর এই প্রতিশ্রুতিকে কার্যে পরিণত করার দাবী জানানো। সভাটিতে সভাপতিত্ব করেন আসাম প্রদেশিক মুসলিম লীগের প্রাক্তন সম্পাদক মাহমুদ আলী। সভার কাজ শুরু হওয়ার ঠিক পরেই কয়েকজন 'লোক উর্দু পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হোক' এই বলে চীৎকার করে ওঠে। পর মুহূর্তেই দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে একজন সভাপতির চেয়ার দখল করে তাতে বসে পড়ে এবং আবদুল বারী (ধলা) নামে গুণ্ডা প্রকৃতির এক ব্যক্তি টেবিলের উপর চড়ে আবোল-তাবোল বক্তৃতা শুরু করে। এইভাবে আবদুল বারী এবং তার অন্যান্য সহযোগী গুণ্ডারা সভায় বাংলা ভাষার সমর্থকদেরকে বক্তৃতাদানে বাধা দিতে থাকে। শুধু তাই নয়। তারা সেই সাথে সভাপতি মাহমুদ আলী, নওবেলালের প্রধান সম্পাদক মোহাম্মদ আজরফ, পাকিস্তান মুসলিম লীগের সদস্য ও সিলেট তমদ্দুন মজলিসের সম্পাদক দেওয়ান ওহিদুর রেজা এবং সিলেট জেলা মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি মোহাম্মদ আবদুস সামাদকে লক্ষ্য করে ইট পাটকেল ছোঁড়ে এবং কয়েকজন ছাত্রকে প্রহার করে। এর পর তারা অধিকতর উগ্র মূর্তি ধারণ করে টেবিল চেয়ারে লাথি মারতে থাকে এবং একজন পাকিস্তানের পতাকা পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলে। গুণ্ডাদের এই আচারণে সমবেত জনসাধারণ খুব ক্রুদ্ধ এবং বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে তাদেরকে পাল্টা আক্রমণে উদ্যত হয়। পুলিস

উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও হাঙ্গামা আয়ত্তে আনা অসম্ভব হয়ে পড়লে সভাপতি তাড়াতাড়ি কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণের পর সভা ভঙ্গ করে দেন।

মূল সভা ভেঙে দেওয়ার পর উপরোল্লিখিত আবদুল বারীর সভাপতিত্বে অন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সিলেট মুসলিম লীগের নেতা আজমল আলী বক্তৃতার মাধ্যমে নানা মিথ্যা প্ররোচনার দ্বারা কিছু লোককে এমন উত্তেজিত করে তোলেন যে তারা গোবিন্দ পার্কের বাইরে এসে তমদ্দুন মজলিসের সদস্য এবং মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের নেতা মকসুদ আহমদকে অমানুষিকভাবে প্রহার করে। এই প্রহারের ফলে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়েন।[১]

এই ঘটনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে উপরোল্লিখিত সভাটির আহ্বায়কদ্বয়, সিলেট তমদ্দুন মজলিশের সম্পাদক দেওয়ান অহিদুর রেজা এবং সিলেট জেলা মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি মোহাম্মদ আবদুস সামাদ একটি বিবৃতিতে বলেন :

> আমরা আজাদ পাকিস্তানে প্রত্যেকের মতামত প্রকাশ করার সুযোগ দান করিবার জন্য বহু যুগের দাসত্বের অবসান ঘটাইয়াছি। তাহা প্রমাণ করার সময় আসিয়াছে। কিন্তু আজ আমরা সিলেটবাসী অরাজকতার দৌরাত্ম্য আর কতদূর সহ্য করিব। তাই আমাদের নিবেদন, আপনারা ব্যক্তি স্বাধীনতাকে কোণঠাসা করিয়া অরাজকতাকে আর কত প্রশ্রয় দিবেন? আজ আমাদের জাতীয় সম্মান লাঞ্ছিত ও অপমানিত [২]

এ প্রসঙ্গে বিবৃতিটিতে তাঁরা আরও বলেন :

> সিলেটে গুণ্ডামির নগ্নরূপ বহুদিন হইতে সিলেটবাসী জনসাধারণের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। জনাব নিশতার সাহেব যখন সিলেট পরিদর্শনে আসেন তখন আমরা গুণ্ডামীর বেপরোয়া নমুনা লক্ষ্য করিয়াছি—পাকিস্তান সরকার এই অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিকার করেন নাই। তাই দিন দিন গুণ্ডাপ্রভাব জনমতকে ও ব্যক্তি স্বাধীনতাকে ভয় দেখাইয়া গোলমাল সৃষ্টি করে ও অভদ্র ব্যবহার দ্বারা কণ্ঠরোধ করিতে চায়। আমরা ইহার আশু প্রতিকার দাবী করিতেছি।

গোবিন্দ পার্কের ৮ই মার্চের এই ঘটনার প্রতিবাদে সিলেট জেলা মুসলিম মহিলা লীগ ১০ই মার্চ আর একটি সভা আহ্বান করেন। এই সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্যে সিলেটের বিক্ষুব্ধ নাগরিকরা যখন দলে দলে গোবিন্দ পার্কে সমবেত হচ্ছিলেন ঠিক সেই সময়ে সিলেটের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এম. ইসলাম চৌধুরী একটি আদেশ জারী করে সমগ্র সিলেট জেলায় উর্দু

বাংলার প্রশ্নে সভা শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান দুই মাসের জন্যে নিষিদ্ধ করেন।[৩]

সিলেটের এই সকল ঘটনাবলী সম্পর্কে 'নাগরিক অধিকার' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে নওবেলাল বলেন :

যাহারা রাষ্ট্রের কল্যাণ চায় অথবা রাষ্ট্রের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতেও প্রস্তুত যদি কোনো রাষ্ট্রপতির কোনো অবৈধ আচরণে বিরক্ত হইয়া সাধারণ সভায় অথবা প্রেসের মারফতে তাহাদের মত ব্যক্ত করিতে চায় কোনো স্বাধীন দেশেই তাহাদের মতামতকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলা হয় না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আমাদের সিলেটে কোনো পদস্থ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো টুশব্দ করিলেই একদল উগ্রপন্থী সাম্প্রদায়িক মতাবলম্বী লোক মারমুখী হইয়া উঠে। ন্যায়, সত্য ও রাজনৈতিক নীতির দিক দিয়া তাহাদের এই সকল কার্য যে নিতান্ত গর্হিত তাহা পুনর্বার বলিবার কোনো প্রয়োজন নাই।[৪]

এর পর সম্পাদকীয়টিতে বলা হয় :

এই সব অনাচারের মূল বিশ্লেষণ করিলে সহজেই ধরা পড়িবে যে একদল প্রতিক্রিয়াশীল লোকের ষড়যন্ত্রের ফলেই এই সব দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইতেছে। রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য কোনো বিজ্ঞানসম্মত ও প্রগতিশীল প্রস্তাব উত্থাপন করিলেই ইহারা প্রগতিশীল লোককে রাষ্ট্রশত্রুরূপে প্রচার করিতে আরম্ভ করে এবং যে কোনো উপায়ে তাহাদের কণ্ঠরোধ করিবার প্রয়াস পায়। এই ফ্যাসিস্ট দলের প্রভাবে ও প্ররোচনাতেই সিলেটে নানাবিধ অনাচারের অনুষ্ঠান চলিতেছে। আমরা এদিকে পাকিস্তান সরকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বাংলা ভাষা আন্দোলনে সিলেটের জনসাধারণের মধ্যে সক্রিয় রাজনৈতিক প্রতিরোধের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম থেকেই ছাত্র, সাংবাদিক, মহিলাকর্মী এবং জনসাধারণ দৃঢ়ভাবে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন এবং ভাষা সংক্রান্ত সর্বপ্রকার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের পুরোভাগে তাঁরা অবস্থিত থাকেন। তাঁদের এই প্রতিরোধের আর একটি উদাহরণ ১১ই মার্চ তারিখে ভাষা প্রশ্নের উপর সিলেটের আঠারোজন অত্যন্ত বিশিষ্ট নাগরিকের এক দীর্ঘ বিবৃতি।[৫] এই বিবৃতিটিতে তাঁরা ঘোষণা করেন :

পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা করিবার জন্য যদি জেহাদ করিতে হয় তাহা হইলে আমরাই সর্বাগ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িব। পাকিস্তানের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রদেশের তামুদ্দুনিক প্রগতি যাহাতে নষ্ট না হয় তার জন্যই বাংলা বা সিন্ধী প্রভৃতি ভাষার যথাযোগ্য স্থান দিতে আমরা বদ্ধপরিকর।

উর্দু সমর্থকদের প্রচারণা সতর্কে তাঁরা বলেন :

পূর্ব পাকিস্তানে যাঁহারা উর্দুর সমর্থক এই সুযোগে তাঁহারা বাংলার সমর্থনকারীদের বিরুদ্ধে নানাবিধ মিথ্যা প্রপোগাণ্ডা শুরু করিয়া জনমতকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের মুখে প্রায়ই শুনা যায় যাহারা বাংলা ভাষার সমর্থক তাহারা পাকিস্তানের সংহতি নষ্ট করিতে চায়। তাঁহারা পাকিস্তানের ঘোর শত্রু। তাঁহারা প্রায় সর্বত্রই প্রচার করিতেছেন উর্দু আমাদের মজহাবী ভাষা, উর্দুর বিরুদ্ধে কথা বলা ধর্মদ্রোহিতারই নামান্তর।

এর পরে সর্বশেষে জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তাঁরা বলেন :

আমরা পূর্ব পাকিস্তানবাসী জনসাধারণকে বাংলার ন্যায্য মর্যাদা আদায় করিতে আহ্বান জানাইতেছি। মনি অর্ডার ফর্ম ইত্যাদিতে বাংলার কোন স্থান না দিয়া কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার যে ভুল করিয়াছেন তাহা অনতিবিলম্বে সংশোধিত করিতে হইবে। বাংলাকে উর্দু এবং ইংরাজীর সাথে পাকিস্তান পার্লামেন্টের বিতর্কের অন্যতম ভাষারূপে গ্রহণ করিতে হইবে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষাগুলিতে বাংলা ভাষাকে অন্যতম ভাষারূপে স্থান দিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানের অফিস আদালতের ভাষারূপে বাংলাকে স্বীকার করিতে হইবে, পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার মাধ্যম ও রাষ্ট্রভাষারূপে এখনই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা না হইলে পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিক, তমুদ্দুনিক, কৃষ্টিগত ও সরকারী চাকুরিক্ষেত্রে বহু দূর পিছাইয়া পড়িবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের নিকট এই আয়াসলব্ধ আজাদী অর্থহীন হইয়া পড়িবে। কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের ধামাচাপা নীতির ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে ক্রমশঃ নানাবিধ সন্দেহের সৃষ্টি হইতেছে। ইহাকে দূর না করিলে পাকিস্তানের সংহতি নষ্ট হইতে পারে।

ঐ একই দিনের নওবেলালে উর্দুর সমর্থনে মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য আজমল আলী চৌধুরী একটি বিবৃতিতে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সমালোচনা এবং খাজা নাজিমুদ্দীনের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন :

মিঃ দত্ত (ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত) সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করিবার সময় হয়ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে ভারতীয় রাষ্ট্রের গণ-পরিষদের ভাষারূপে দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হিন্দুস্থানী ভাষা গ্রহণ করা হইয়াছে। সেই হিন্দুস্থানী ভাষা গ্রহণ করার সময় সংখ্যা-গরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘিষ্ঠদের কোনো প্রশ্নই উঠে নাই। হিন্দুস্থানীকে প্রাধান্য দিবার প্রধানতম কারণ এই যে হিন্দুস্থানীর,

সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতি ও হিন্দু ঐতিহ্যের যোগসূত্র বর্তমান। দেবনাগরী লিপির এখন মরণদশা উপস্থিত এবং অত্যন্ত সীমাবদ্ধ অঞ্চলে এই লিপির প্রচলন রহিয়াছে।[১] ভারতীয় পরিষদে গৃহীত হিন্দুস্থানী কাহারও কথ্য ভাষা নহে। অপরদিকে ভারতের সাধারণ ভাষারূপে উর্দুর দাবী স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রুর মতো লোকও স্বীকার করিয়াছেন। উর্দুকে ভারতীয় রাষ্ট্র অস্পৃশ্য জ্ঞানে ত্যাগ করার একমাত্র কারণ এই যে উর্দুর মাঝে ইসলামী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের গন্ধ রহিয়াছে। ভারতের সর্বত্র এক ভাষার মাধ্যমে যখন একতা সৃষ্টির প্রয়োজন হইল তখন ভারতীয় ডোমিনিয়নের অন্তর্গত বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক তাহাদের সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা ভুলিয়া গেল। অথচ সেই একই যুক্তি বলে উর্দুকে যখন পাকিস্তানের সাধারণ ভাষারূপে গ্রহণ করার দাবী উঠিল তখন ইহাকে মহা ভুল বলিয়া আখ্যা দিলেন।

আজমল আলী তাঁর বিবৃতিতে পরিশেষে বলেন :

পাকিস্তানের সংহতি ও সংস্কৃতিগত ঐক্য বজায় রাখিবার জন্য পাকিস্তান গণ-পরিষদে ইংরেজীর পরেই উর্দুকে ন্যায়সঙ্গত ভাবেই স্থান দেওয়া হইয়াছে। আমি পাক-গণ-পরিষদে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত আলোচনায় সাহসের সহিত তাঁহাদের অভিমত ব্যক্ত করার জন্য জনাব লিয়াকত আলী খান ও জনাব খাজা নাজিমুদ্দীনকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

আজমল আলী তাঁর বিবৃতিতে যে সব যুক্তির অবতারণা করেছেন সেগুলি শুধু তাঁর নিজস্ব নয়। বেশ কিছু সংখ্যক মুৎসুদ্দীস্থানীয় উর্দু সমর্থকদের মতবাদকেই তিনি তাঁর বিবৃতিটিতে ব্যক্ত করেছেন। ১১ই মার্চের ঐ একই সাপ্তাহিকে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের প্রাক্তন সদস্য মতসির আলীও আরবী এবং উর্দুর সপক্ষে একই ধরনের একটি বিবৃতি প্রচার করেন।

৫ ॥ ১১ই মার্চের সাধারণ ধর্মঘট

১০ই মার্চ রাত্রে ফজলুল হক হলে রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের একটি সভা বসে। এই সভায় পরদিনের ধর্মঘটের বিস্তারিত কর্মসূচী সম্পর্কে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[২] তখন পর্যন্ত ১১ই মার্চ ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়নি কিন্তু পরদিন সে-রকম কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হলে কর্মপন্থা কি হবে সে সম্পর্কে সভাটিতে আলোচনা হয়। এই আলোচনাকালে শামসুল

হক ১৪৪ ধারা জারী হলে তা ভঙ্গ না করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু অলি আহাদ, আবদুল ওদুদ প্রভৃতি ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে মত দেন।[২] এ সম্পর্কে কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত এই সভায় গৃহীত হয়নি। সরকার কর্তৃক শহরে ১৪৪ ধারা জারী না করায় ফলে এ সিদ্ধান্তের গুরুত্বও খুব বেশী ছিলো না। কাজেই মূল আলোচনা পরদিনের পিকেটিং সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যেই মোটামুটিভাবে সীমাবদ্ধ থাকে।[৩]

১১ই মার্চের সাধারণ ধর্মঘটকে সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে ব্যাপকভাবে পরদিন পিকেটিং করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কোন্ কোন্ জায়গায় কোন্ সময়ে পিকেটিং শুরু করা দরকার এবং কে কোন্ জায়গায় থেকে সেই পিকেটিং পরিচালনা করবে এই সভায় সেটা মোটামুটিভাবে স্থির করা হয়।[৪] ইডেন বিল্ডিং-এর প্রথম ও দ্বিতীয় গেট, রমনা পোস্ট অফিস, পলাশী ও নীলক্ষেত ব্যারাক, জেলা আদালত, হাই কোর্ট, রেলওয়ে ওয়ার্কশপ ইত্যাদি স্থানে বিশেষ পিকেটিং-এর ব্যবস্থা করা হয়। রেলওয়ে ওয়ার্কশপের পিকেটিং-এর জন্যে তিনটি পয়েণ্ট ঠিক করা হয়—রেলওয়ে হাসপাতালের সামনে ও পাশে দুই রেলওয়ে ক্রসিং-এ এবং আবদুল গণি রোডের দিক থেকে ওয়ার্কশপে প্রবেশের পথে। পিকেটিং চলাকালে কেউ কেউ গ্রেফতার হলে তাদের স্থান যাতে অন্যেরা নিতে পারে তার ব্যবস্থাও ঠিক হয়। এটা করা হয় এজন্যে যাতে একদল গ্রেফতার হওয়ার পর লোকের অভাবে পিকেটিং বন্ধ হয়ে না যায়।[৫]

১৯৪৮ সালের আন্দোলনের সময় সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের বিশেষ কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকেনি। নেতৃস্থানীয় ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র হলের সহ-সভাপতি নজরুল ইসলাম এবং শামসুল আলম ব্যতীত অন্য কাউকে আন্দোলনে বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করতেও দেখা যায়নি। ফজলুল হক হল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং মেডিকেল কলেজই এ ব্যাপারে বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলো।[৬]

১১ই মার্চ খুব ভোর হতেই ছাত্রেরা পিকেটিং-এর জন্যে বিভিন্ন হল থেকে বেরিয়ে পড়েন। রেলওয়ে ওয়ার্কশপে কাজ শুরু হতো ভোর পাঁচটা থেকে। কাজেই ছাত্ররা তার পূর্বেই নির্ধারিত তিনটি পয়েণ্টে পিকেটিং-এর জন্যে উপস্থিত হন। এ ছাড়া যে-যে এলাকায় যখন অফিস বসার কথা অথবা অফিসের জন্যে লোকজনের ঘর থেকে বের হওয়ার কথা (যেমন নীলক্ষেত ও পলাশী ব্যারাক) সেখানেও ছাত্ররা সময়মতো উপস্থিত হয়েছিলেন।[৭]

কিছু নেতৃস্থানীয় লোকজন সেদিন গ্রেফতার হয়ে জনপ্রিয়তা অর্জনের সিদ্ধান্ত পূর্বেই নিয়ে বসেছিলেন এবং তাঁদের এই মনোভাবের কথা অনেকেরই জানা ছিলো। কাজেই কর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ ঐ ধরনের নেতাদের কাছাকাছি পিকেটিং-এর সময় না থাকার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ তাঁদের কাছে থাকলে গ্রেফতারের সম্ভাবনা বেশী থাকতো এবং তার ফলে অধিক সংখ্যক কর্মী গ্রেফতার হয়ে গেলে ধর্মঘট বানচাল হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেতো।[৮]

১১ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় এবং শহরের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পূর্ণ ধর্মঘট হয়েছিলো কিন্তু সকালের দিকে বিশ্ববিদ্যালয় অথবা অন্য কোনো জায়গায় কোনো সভা অথবা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়নি। এর কারণ সাধারণ ধর্মঘটকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর সিদ্ধান্তের ফলে সকালের দিকে ছাত্রেরা পিকেটিং-এর উদ্দেশ্যে শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন।

সেদিন সকালের দিকে রমনা ডাকঘরের সামনে যে সমস্ত ছাত্ররা পিকেটিং-এর জন্যে গিয়েছিলেন পুলিশ তাঁদেরকে গ্রেফতার করে সামনের একটি গাছতলায় ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে। দলটিতে ছাত্রদের সংখ্যা ছিলো তেরো-চৌদ্দ। পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট গফুরও তখন রমনা ডাকঘরের সামনে উপস্থিত ছিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে মহম্মদ তোয়াহা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে তাঁকে উদ্দেশ্য করে গফুর বলেন, 'দেখেন এরা কিভাবে পিকেটিং করছে'। এর জবাবে তোয়াহা তাঁকে বলেন যে স্ট্রাইকের সময় পিকেটিং হবেই, সেটা খুব স্বাভাবিক। এই নিয়ে গফুরের সাথে মহম্মদ তোয়াহার তর্কাতর্কি চলাকালে সেখানে তাজউদ্দিন আহমদ এবং সরদার ফজলুল করিম উপস্থিত হন। তাঁরা মহম্মদ তোয়াহার সাথে সামান্য কথাবার্তার পর রমনা ডাকঘর এলাকা পরিত্যাগ করেন। গফুরের সাথে ছাত্রদের বিশেষ করে তোয়াহার তর্কাতর্কি কিছুক্ষণ চলে এবং পরিশেষে বাড়াবাড়ি করলে কঠিন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি ছাত্রদেরকে হুমকি দেখানোর চেষ্টা করেন।[৯]

হাই কোর্টের গেটের সামনে কিছু সংখ্যক ছাত্র পিকেটিং শুরু করে এবং উকিলদেরকে সেদিনের মতো আদালতের কাজ বন্ধ রাখার জন্যে অনুরোধ এবং চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। এই সময়ে উকিলরা ছাত্রদের সাথে নানা বাদপ্রতিবাদে প্রবৃত্ত হন এবং আদালতে উপস্থিত না হলে তাঁদের মক্কেলদের কত ক্ষতি হবে সেকথা ছাত্রদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। এই প্রসঙ্গে ফজলুল হক অমৃতবাজার পত্রিকার একজন প্রতিনিধির কাছে এক মৌখিক

বিবৃতিতে বলেন :

> বেলা ১০-৩০ মিনিটের সময় আমি হাই কোর্টের গেটের সামনে উপস্থিত হই কিন্তু ছাত্রেরা সেখানে পিকেটিং করতে থাকার ফলে ভিতরে ঢুকতে অসমর্থ হই। ছাত্রদেরকে আমি বলি যে আমার প্রায় আটটি কেস কোর্টে আছে এবং আমার অনুপস্থিতিতে আমার মক্কেলরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু তাদেরকে এ ব্যাপারে কিছুতেই রাজী করাতে সক্ষম না হয়ে অবশেষে আমি বাড়ির দিকে রওয়ানা হই।[১০]

এই ঘটনাকালে পূর্ব বাঙলার তৎকালীন জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং আইয়ুব খান একটি পরিদর্শনের কাজ শেষ করে হাই কোর্ট প্রাঙ্গণে অবস্থিত সদ্য স্থাপিত বিভাগীয় সামরিক হেড কোয়ার্টারে যাওয়ার সময়ে ফজলুল হক এবং ছাত্রদের এই আলোচনা ও বিতর্ক লক্ষ্য করেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর 'প্রভু নয় বন্ধু' নামক পুস্তকে এই ঘটনার মিথ্যা, বিকৃত ও বাহাদুরীপূর্ণ এক বর্ণনা দেন। বর্ণনাটি নিম্নরূপ :

> আমার মনে আছে একদিন একটি পরিদর্শনের কাজ শেষ করে আমি হাই-কোর্ট ফেরত যাচ্ছিলাম। আমি দেখলাম ফজলুল হক আদালতের কাজে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ছাত্রদেরকে মাটির উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে বলছিলেন। আমি গাড়ির ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কি জন্য ঐসব করা হচ্ছিলো। ফজলুল হক আমাকে দেখেছিলেন এবং দেখার পর আমাকে তাঁর রীতিমতো ভীতিপ্রদ মনে হওয়ায় তিনি শান্তভাবে ছাত্রদেরকে সে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।[১১]

শুধু ফজলুল হকই নয়, অন্যান্য অনেক উকিলরাও এই সময় তাঁদেরকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্যে ছাত্রদের সাথে আলোচনা এবং বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তাতেও কোনো ফল হয় না। এর পর ছাত্রদের উপর পুলিশ লাঠি চার্জ করলে উকিলরা তার প্রতিবাদে আদালত সেদিনের মতো বর্জন করার সিদ্ধান্ত নেন।[১২]

ছাত্রেরা শুধু হাই কোর্টের সামনে নয়, সেক্রেটারিয়েটের সামনেও অফিস বর্জন করার জন্যে শ্লোগান দিতে থাকেন এবং পিকেটিং অব্যাহত রাখেন। পিকেটিং চলাকালে সেখানেও ছাত্রদের উপর লাঠি চার্জ করা হয়। অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাৎকারের সময় ফজলুল হক এই প্রসঙ্গে বলেন :

> হাই কোর্ট থেকে বাড়ি ফেরার পথে সেক্রেটারিয়েটের কাছে আমি একদল ছাত্রকে দেখি। আমি তাদেরকে নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করি এবং

তাদেরকে বাড়ি ফেরত যেতে অনুরোধ করি। এই সময় হঠাৎ একদল ছাত্রকে পুলিশ ধাওয়া করায় তারা দৌড়ে এসে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানে হাজির হয়। আমি দেখলাম একদল পুলিশ আমার চতুর্দিকে যে ছাত্রেরা জড়ো হয়েছিলো তাদেরকে মারপিট করতে শুরু করলো। লাঠির একটা বাড়ি আমারও হাঁটুর উপর পড়ায় আমি খুব যন্ত্রণা অনুভব করি। এর পর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে আমি ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ করিয়ে নিই। তবে আমার আঘাত তেমন গুরুতর ছিলো না।[১৩]

১১ই মার্চ সকালের এই পিকেটিং-এর সময়ে ছাত্রেরা সেক্রেটারিয়েটের তোপখানা এবং আবদুল গণি রোডস্থ উভয় গেটের সামনেই সমবেত হয়েছিলেন। শামসুল হক, শেখ মুজিবর রহমান, অলি আহাদ প্রভৃতি কয়েকজন পিকেটিং করেন প্রথম গেটে (আবদুল গণি রোড)। দ্বিতীয় গেটে (তোপখানা রোড) পিকেটিং করেন কাজী গোলাম মাহবুব, শওকত আলী, বরকত এবং অন্য দুই জন। পিকেটিং চলাকালে শামসুল হকের সাথে পুলিশের অনেক তর্কবিতর্ক হয়।[১৪]

দ্বিতীয় গেটের সামনে শওকত আলীরা পিকেটিং শুরু করার পর কিছুসংখ্যক সেক্রেটারিয়েট কর্মচারী সামনের গেট দিয়ে না ঢুকে পাশের একটা মসজিদের সাথে সংলগ্ন পাচিলের ফাঁক দিয়ে সেক্রেটারিয়েটের মধ্যে ঢুকতে শুরু করে। তখন দুজনকে সেখানে পিকেটিং-এর জন্যে মোতায়েন করা হয়। পিকেটিং চলা কালে দ্বিতীয় গেটে সার্জেন্ট রবার্টসন প্রথমে হাজির হন। ছাত্রদের সাথে কিছুক্ষণ আলাপ করার পর তিনি অন্যত্র চলে যান। তারপর সেখানে উপস্থিত হন সিটি পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট চ্যাথাম, ইন্সপেক্টর জেনারেল জাকির হোসেন এবং তাঁর ডেপুটি ওবায়দুল্লাহ। তাঁরা তিনজনে প্রথমে সেক্রেটারিয়েটের মধ্যে ঢোকেন। সে সময় তাঁদেরকে কেউ বাধা দান করেনি। তার মিনিট পাঁচেক পর তাঁরা তিন জনেই আবার বের হয়ে এসে নিজেদের গাড়ি ভিতরে নিয়ে যাবার হুকুম দেন। সে সময় শওকত আলী, কাজী গোলাম মাহবুব প্রভৃতি তাঁদেরকে বাধা দেন এবং গাড়ি ভিতরে যাতে কোনোমতে না নিয়ে যাওয়া যায় তার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। এই অবস্থায় পুলিশ সুপার চ্যাথাম কাজী গোলাম মাহবুব ও বরকতকে উদ্দেশ করে বলেন যে তাঁদের দুজনকেই গ্রেপ্তার করা হলো। এর পর শওকত আলী গাড়ির সামনে পা লম্বা করে সোজা মাটিতে শুয়ে পড়ে গাড়িটির পথ রোধ করেন। তখন জাকির হোসেন 'তোমাকেও গ্রেফতার করা হলো' এই বলে শওকত আলীর একটি হাত ধরে

ফেলেন। শওকত আলী তখন অন্য হাতটি দিয়ে গাড়ির সাদা চকচকে বাম্পারটিকে ধরেন এবং গাড়ির অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে তিনিও মাটির উপর হেঁচড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেন। সেই সাথে জাকির হোসেনকেও তিনি টানতে টানতে সাথে নিয়ে যান এবং প্রচুর গালাগালি বর্ষণ করতে থাকেন।[১৫]

এর পর শওকত আলী কাজী গোলাম মাহবুব প্রভৃতিকে ওয়ায়েজ ঘাট কোতোয়ালীতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তখন শামসুল হক, শেখ মুজিবর রহমান, অলি আহাদ এবং অন্যান্য অনেককে ইতিপূর্বেই গ্রেফতার করে আনা হয়েছিলো। কিছুক্ষণ পর থানার ও. সি. সকলকে জিজ্ঞেস করলো শওকত আলী এবং কাজী গোলাম মাহবুব কে? এই বিশেষ খোঁজের কারণ হলো এই যে জাকির হোসেন তাঁদের দুজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে কোতোয়ালীতে ফোন করেছিলেন। তাঁরা উভয়েই অভিযোগ অস্বীকার করা সত্ত্বেও তাঁদেরকে বলা হয় যে তাঁদের বিরুদ্ধে বিশেষ ও নির্দিষ্ট অভিযোগ আছে। কাজেই সেই অনুসারে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। কোতোয়ালীতে খাওয়া দাওয়ার পর বেলা প্রায় চারটের দিকে শামসুল হক, মুজিবর রহমান, কাজী গোলাম মাহবুব, শওকত আলী প্রভৃতি বহু কর্মীকে ঢাকা জেলখানায় স্থানান্তরিত করা হয়।[১৬]

সকালের দিকে ছাত্রদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ ইত্যাদির প্রতিবাদে বিকেল দুটো আড়াইটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের আহ্বায়ক নঈমুদ্দীন আহমদ। এই সভায় বক্তারা উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দেন এবং একটি প্রস্তাবে ছাত্রদের উপর সেদিনকার পুলিশী জুলুমের কঠোর সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেন। এ ছাড়া অন্য একটি প্রস্তাবে তাঁরা পাকিস্তান সংবিধান সভার যে সকল পূর্ববঙ্গীয় সদস্য বাঙালীদের স্বার্থ রক্ষা করতে অক্ষম হন তাঁদের পদত্যাগও দাবী করেন।[১৭]

বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সভাশেষে ছাত্রেরা প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের সাথে সাক্ষাতের জন্যে মিছিল সহকারে কার্জন হল হয়ে হাই কোর্টের সামনে উপস্থিত হলে পুলিশ আবার তাদেরকে বাধা দান করে। প্রথমে স্থির করা হয়েছিলো বিকেলেও সকালের মতো সেক্রেটারিয়েটের তোপখানা গেট পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা হবে। কিন্তু পুলিশের কাছ থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে মিছিলটি উত্তরে আবদুল গণি রোডের দিকে অগ্রসর হয়। মিছিল ইতিমধ্যে খুব বড় আকার ধারণ করে এবং তাকে সরাসরি বাধা দেওয়ার চেষ্টা না করে

পুলিশেরা অন্য গেট দিয়ে সেক্রেটারিয়েটের মধ্যে প্রবেশ করে ছাত্রদেরকে উত্তর দিকের গেটের সামনে বাধা দেওয়ার ব্যবস্থা নেয়। মিছিলটি কিন্তু উত্তরের গেটে পৌঁছবার পূর্বেই গেট ভেতর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়।[১৮]

ছাত্রেরা সেক্রেটারিয়েটের গেটের সামনে উপস্থিত হয়ে ভেতরে ঢোকার জন্যে দাবী জানাতে থাকলে এক সময় পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট গফুর গেটের তালা খুলে তাঁর পুলিশ বাহিনী নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন এবং ছাত্রদেরকে তাড়া করে মার দেওয়ার জন্যে পুলিশদের উদ্দেশ্যে চীৎকার করে তাঁর আদেশনামা জারী করেন। এর পর পুলিস এলোপাথাড়িভাবে ছাত্রদেরকে মার-পিট শুরু করে। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য মহম্মদ তোয়াহার হাতে এই সময় একটি সাইকেল ছিলো। সেই অবস্থাতেই পুলিশ তাঁকে লাঠি চার্জ করতে থাকে এবং বন্দুকের বাঁট দিয়ে তাঁকে আঘাত করে। এর পর তিনি তাদেরকে আক্রমণ করে তিনজনের হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নেন। বন্দুকের বেল্টগুলি ধরে টান দেওয়ার ফলেই সেগুলি সহজে তাঁর হাতে চলে আসে। তখন বেশ কিছুসংখ্যক পুলিশ বন্দুকগুলি উদ্ধার করার জন্যে তাঁকে ঘিরে ফেলে। অল্পক্ষণ পরই তিনি আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যান।[১৯] এবং পুলিশ সুপার গফুর দৌড়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে বন্দুক বেহাত হওয়ার জন্য কয়েকজন পুলিশকে দু'তিন বাড়ি হাণ্টার মারেন। এর পর মহম্মদ তোয়াহার হাত থেকে বন্দুকগুলি তারা কেড়ে নেয়।[২০]

পুলিশের এই লাঠি চার্জের ফলে অনেক ছাত্র আহত হন এবং অল্পক্ষণ পরেই তাঁরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন। এর পর ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ ওবায়দুল্লাহ তোয়াহাকে ধরে সেক্রেটারিয়েটের মধ্যে নিয়ে যান।[২১] এবং সেখানে বেশ কিছুক্ষণ তাঁকে বসিয়ে রাখেন। সেই সময় ওবায়দুল্লাহ প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনকে টেলিফোনে জিজ্ঞেস করেন মহম্মদ তোয়াহাকে গ্রেফতার করা হবে কিনা। জবাবে খুব সম্ভবতঃ আহত অবস্থায় তাকে গ্রেফতারের বিরুদ্ধে মত দেওয়ায় একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে সেক্রেটারিয়েট থেকে তারা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যে পাঠায় এবং সেখানে তাঁকে কয়েকদিন থাকতে হয়।[২২]

১১ই মার্চের এই ঘটনাবলী সম্পর্কে পূর্ববঙ্গ সরকারের একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়ঃ

বাংলাকে কেন্দ্রের সরকারী ভাষা না করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ১১ই মার্চ আহূত সাধারণ ধর্মঘটকে কার্যকর করার জন্যে

আজ ঢাকাতে কিছু সংখ্যক অন্তর্ঘাতক এবং একদল ছাত্র ধর্মঘট পালন করার চেষ্টা করে। শহরের সমস্ত মুসলিম এলাকা এবং অধিকাংশ অমুসলিম এলাকাগুলি ধর্মঘট পালন করতে অসম্মত হয়। শুধুমাত্র কিছু কিছু হিন্দু দোকানপাট বন্ধ থাকে। শহরের এবং আদালতের কাজকর্ম সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিলো। রমনা এলাকায় অবশ্য ধর্মঘটকারীরা কিছু কিছু অফিসের লোকদেরকে কাজে যোগদানে বাধা দেয়। পিকেটিং করার উদ্দেশ্যে ছাত্রদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটি দল সেক্রেটারিয়েট, হাই কোর্ট এবং অন্য কতকগুলি অফিসের সম্মুখে সমবেত হয়। এদের মধ্যে অনেককে শান্তভাবে স্থান ত্যাগ করতে সম্মত করা গেলেও অন্যান্যেরা আক্রমণোদ্যত হয়ে সেখানে অবস্থিত পুলিশ ও অফিস যোগদানে ইচ্ছুক কিছুসংখ্যক লোকজনের উপর ইঁটপাটকেল ছোড়ে এবং অন্যান্য হিংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু করে। এর ফলে পুলিশ লাঠি চার্জ করতে বাধ্য হয় এবং ৬৫ জনকে গ্রেফতার করে। এক সময় দুবার বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ পর্যন্ত করতে হয়। বিক্ষোভ প্রদর্শন ও পুলিশ তৎপরতার ফলে মোট চৌদ্দ ব্যক্তি আহত হন এবং তাঁদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এঁদের মধ্যে কেউই গুরুতরভাবে অথবা গুলির আঘাতে আহত হননি। থানাতল্লাসীর ফলে যে সমস্ত প্রমাণাদি এখন সরকারের হস্তগত হয়েছে তার থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে হতবুদ্ধিতা সৃষ্টি করে পাকিস্তানকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে একটা গভীর ষড়যন্ত্র চলছে।[২৩]

১১ই মার্চ কেবলমাত্র কিছুসংখ্যক অমুসলমানদের দোকান বন্ধ ছিলো এবং ভাষা আন্দোলনের উদ্দেশ্য মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ও পাকিস্তানকে খর্ব করা এই বক্তব্যের মাধ্যমে প্রেস বিজ্ঞপ্তিটিতে সমগ্র আন্দোলনের একটা সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রচেষ্টা সহজেই লক্ষণীয়। এই প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক 'নওবেলালের' ঢাকাস্থ প্রতিনিধি প্রেরিত একটি চিঠিতে[২৪] বলা হয়:

১১ই মার্চের এত বড় ঘটনার পর পূর্ব বঙ্গ সরকার যে প্রেস নোট বাহির করেন তাহা পড়িলেই বুঝা যায় প্রকৃত সংবাদকে ব্ল্যাক আউট করার জন্য সরকার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রেসনোটে বলা হয় মাত্র কতিপয় বিভেদ-সৃষ্টিকারী রাষ্ট্রের দুশমন এই ধর্মঘটে যোগ দিয়াছিল। শহরের সমগ্র মুসলিম এলাকা ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে অর্থাৎ সরকারের মতে মুষ্টিমেয় কম্যুনিস্ট এবং কতিপয় হিন্দু ধর্মঘটে অংশ নিয়াছিল। অথচ

কে না জানে ধর্মঘটকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য ঢাকার প্রত্যেকটি মুসলমান ছাত্র পুলিসের গুলি ব্যায়নেট ও লাঠির সম্মুখে বুক পাতিয়া দিয়াছিল। অথচ সরকারের মতে মুসলমানরা এই আন্দোলনে যোগ দেয় নাই। প্রচারণার কি অপূর্ব নমুনা!

১১ই মার্চের ধর্মঘটের দিনে ধর্মঘটী ছাত্রদের পিছনে একদল গুণ্ডাকে লেলিয়ে দেওয়া হয় এবং তারা অনেকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় এবং কয়েকটি অফিসের সামনে পিকেটিংরত ছাত্রদেরকে ভয় দেখাতে থাকে। এদেরই একাংশ পরে শহরের একটি পুস্তকের দোকান লুঠ করে। অপর এক অংশ ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ প্রাঙ্গণে পিকেটিংরত ছাত্রদের উপর হামলা চালায়। কিন্তু তারা শুধু ছাত্রদেরকে আক্রমণ করেই ক্ষান্ত না হয়ে কলেজের অধ্যাপক আহসান হাবীবকেও আঘাত করে।[২৫]

সেদিনের ধর্মঘটে ছাত্রদের সাথে বেশ কিছুসংখ্যক সেক্রেটারিয়েট এবং রেল কর্মচারীও যোগদান করেন এবং তার ফলে ঢাকাতে কিছুক্ষণের জন্যে অত্যন্ত আংশিক রেল ধর্মঘটও হয়।[২৬] রেলওয়ে ওয়ার্কসপে ধর্মঘটের জন্যে পিকেটিং করার সময় ছাত্রদের সাথে একবার পুলিশের সংঘর্ষ ঘটে এবং সে সময় কয়েকজন ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়।[২৭]

১১ই মার্চের ধর্মঘট শুধুমাত্র ঢাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। পূর্ব বাঙলার প্রায় সর্বত্র ঐদিন ছাত্রেরা পূর্ণ ধর্মঘট পালন করেন। রাজশাহীতে সরকারী কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধতার জন্যে ছাত্রদের মধ্যে কিছু বিক্ষোভ এবং উত্তেজনার সৃষ্টি হয় কিন্তু পূর্ণ হরতাল পালন করার পর তাঁরা ভুবনমোহন পার্কে ভাষার দাবীতে একটি সভার অনুষ্ঠান এবং 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান চিহ্নিত ব্যাজ বিক্রি করেন।[২৮] ঢাকা ব্যতীত অন্যান্য জায়গায় মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে এই ধর্মঘট পালিত হলেও যশোর ছিলো সেদিনের আর একটি ব্যতিক্রম।

যশোর রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন আলমগীর সিদ্দিকী এবং হামিদা সেলিম (রহমান)। সভাপতি ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি ডক্টর জীবনরতন ধর। সদস্যদের মধ্যে হাবিবুর রহমান, অনন্ত মিত্র, মসিউর রহমান প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ১১ই মার্চ যশোরে মমিন গার্লস স্কুল ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যেকটি স্কুল ও কলেজে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। মুসলিম একাডেমী, সম্মিলনী (হিন্দু ছেলেদের স্কুল), জেলা স্কুল ইত্যাদিতে ধর্মঘটের পর মিছিল বের হয়। এই সময় মোমিন গার্লস স্কুলে ধর্মঘট না

হওয়ার সংবাদ পৌঁছালে সমগ্র মিছিলটি সেখানে উপস্থিত হয়ে ধর্মঘট করে বেরিয়ে আসার জন্যে ছাত্রীদেরকে আহ্বান করতে থাকে এবং তার ফলে দারুন উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ হরতালের সম্পূর্ণ বিপক্ষে ছিলেন এবং কিছু সংখ্যক ছাত্রীরাও সেই দলে ছিলো। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নোমানীর মেয়েও ছিলো ঐ দলভুক্ত এবং সে সক্রিয়ভাবে অন্য সকলকে ধর্মঘট করতে বাধা দিতে থাকে। এই সময় হামিদা সেলিম তাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেওয়াতে তার একটি দাঁত ভেঙে যায় এবং তার ফলে উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পায়। শেষ পর্যন্ত মোমিন গার্লস স্কুলের মেয়েরাও ধর্মঘটে যোগদান করে।

এর পর সমগ্র মিছিলটি যশোর কলেকটরেটের সামনে উপস্থিত হয় এবং 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিতে থাকে। এই সময় এক পর্যায়ে পুলিশ তাদেরকে বাধা দিতে শুরু করলে কিছুসংখ্যক ছাত্র উত্তেজিত হয়ে উঠে ডাবের খোশা ইত্যাদি পুলিশের দিকে ছুড়তে থাকে। এর ফলে পুলিশের মধ্যেও উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং প্রথমে তারা লাঠি চালায় ও পরে ভয় দেখানোর জন্যে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে। এর পরই ছাত্র মিছিলটি একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

এই ঘটনার প্রতিবাদে সেদিন বিকেলের দিকে যশোরে সমস্ত দোকান-পাট বন্ধ হয়ে যায়, পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয় এবং শহরে দারুণ সরকার-বিরোধী উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে। সংগ্রাম পরিষদের এক গোপন বৈঠকে সেদিন সন্ধ্যাতেই অনির্দিষ্টকালের জন্যে ছাত্র ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ অবশ্য অবস্থার অবনতি লক্ষ্য করে এর পর নিজেরাই কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ করে দেন।[২৯]

৬॥ ১১ই মার্চের নির্যাতনের প্রতিবাদ

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের কনভেনার নঈমুদ্দীন আহমদ ১২ই মার্চ সংবাদপত্রে একটি বিবৃতির মাধ্যমে এগারো তারিখের সরকারী জুলুমের প্রতি-বাদ করেন। বিবৃতিটিতে বলা হয় যে দেশের শতকরা ৬৮ ভাগ মানুষের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন দমন করার জন্যে নাজিমুদ্দীন সরকার ফ্যাসিস্ট নীতি অবলম্বন করেছেন। নিরীহ ছাত্রদের উপর তাঁরা গুলি চালিয়ে-ছেন, লাঠি চার্জ করেছেন এবং তাদের অনেককে গ্রেফতার করেছেন। যে সমস্ত যুবক ও ছাত্রেরা বৃটিশ বেয়নেটের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে সরকার তাদের

উপর উৎপীড়ন করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। বিবৃতিটিতে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে এই সব দমনমূলক ব্যবস্থার মুখে ভীতসন্ত্রস্থ না হয়ে ছাত্রেরা বাংলাকে তাদের রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সক্ষম হবে। পূর্ব পাকিস্তানের সকল ছাত্রছাত্রীদেরকে ভাষা আন্দোলনে যোগদানের জন্যেও তিনি এই বিবৃতির মাধ্যমে আহ্বান জানান।[১]

নঈমুদ্দীন আহমদের এই বিবৃতিতে ১১ই মার্চের বিভিন্ন ঘটনাবলীতে আহত ও পুলিশ কর্তৃক ধৃত ছাত্রদের একটা হিসাবও দেওয়া হয়। সেই হিসাব মতো আহতের সংখ্যা—২০০; গুরুতরভাবে আহত—১৮; ধৃত—৯০০ (এদের মধ্যে অনেককে পরে ছেড়ে দেওয়া হয়) এবং জেলবন্দী—৬৯।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তান পরিবেশিত একটি সংবাদে জানা যায় যে ২১ই মার্চের সরকারী নির্যাতনের প্রতিবাদে পরদিন সকালের দিকে জগন্নাথ কলেজে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভা চলাকালে বেলা সাড়ে বারোটার দিকে প্রায় একশোজন লোক বাইরে থেকে এসে সভার লোকদের উপর ইটপাটকেল ছুড়তে শুরু করে। এর ফলে দলিউর রহমান নামে একজন ছাত্র আহত হয়। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান বি. দাশগুপ্ত গুণ্ডাদেরকে বাধাদান করতে গেলে তাঁর উপরেও তারা হামলা চালায়।[২]

এ ছাড়াও ১২ই মার্চ ঢাকাতে কতকগুলি বিক্ষিপ্ত অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। দুই ব্যক্তিকে কম্যুনিস্ট সন্দেহে লোহার রড দ্বারা আঘাত করা হয়। রমনা এলাকা মোটামুটিভাবে শান্ত থাকলেও সেক্রেটারিয়েটের সামনে অবাধ যাতায়াত সেদিন বন্ধ থাকে এবং সশস্ত্র প্রহরীরা সমস্ত এলাকাটিকে পাহারা দেয়।[৩] কিন্তু তা সত্ত্বেও ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার আশেপাশের এলাকায় মিছিল বের করে পুলিশী জুলুম ও বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।[৪]

১২ তারিখের সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি বিবৃতি মারফত ফজলুল হক পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার সকল সদস্যের প্রতি পদত্যাগের আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে পরিষদ্ কর্তৃক ১১ তারিখের ঘটনাবলীর বিরুদ্ধে তাঁদের ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা না হলে সরাসরি প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্যে ব্যবস্থাপক সভার সমস্ত সদস্যের পদত্যাগ করা উচিত। পুলিশ কর্তৃক নিরীহ ছাত্রদের উপর উৎপীড়নের প্রতিবাদে তিনিই সবপ্রথম তাঁর সদস্যপদ ত্যাগ করবেন বলেও এই বিবৃতিটিতে তিনি ঘোষণা করেন।[৫] কিন্তু প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা উপরোক্ত মর্মে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন না করা সত্ত্বেও ফজলুল হক সহ

ব্যবস্থাপক সভার কোনো সদস্যই ১৯৪৮ সালে পদত্যাগ করেননি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং শহরের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ১২ই মার্চ পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। ১১ই তারিখের পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত ধর্মঘট অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত হয় কারণ ঐদিনটি ছিলো পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ। ছাত্রেরা ধর্মঘটের পর সেদিন শ্লোগান দিতে দিতে শহরের বিভিন্ন এলাকা মিছিল সহকারে প্রদক্ষিণ করে।[৬]

১৩ই মার্চের একটি সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী কলকাতা থেকে প্রকাশিত অমৃতবাজার পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা এবং স্বাধীনতার আমদানী পূর্ব বাঙলায় নিষিদ্ধ করা হয়। এই আদেশ অনুসারে সেদিন তেজগাঁও বিমান বন্দরে উপরোক্ত সংবাদপত্রগুলির কপি পৌঁছালে পুলিশ তৎক্ষণাৎ সেগুলিকে হস্তগত এবং বাজেয়াপ্ত করে।[৭]

১৪ই মার্চ তারিখেও পূর্ব বাঙলার সর্বত্র ধর্মঘট পালন করা হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর ইত্যাদি শহরে ছাত্রেরা বিপুল উদ্দীপনার সাথে ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করে।[৮]

১৫ই মার্চ পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিলো। এই অধিবেশনে যোগদানের জন্যে প্রদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যেরা ঢাকাতে উপস্থিত হন এবং মুসলিম লীগ পরিষদ্ দলের একটি সভা ১৪ তারিখে বেলা ৩-৩০ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের বাসভবন 'বর্ধমান হাউসে' শুরু হয়। এই সভা চলাকালে সেখানে বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্র রাত্রি প্রায় নয়টা পর্যন্ত সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং ১১ তারিখে ধৃত ছাত্রদের মুক্তিদান এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানান। পার্লামেন্টোরী পার্টির এই সভায় ১১ই মার্চের ঘটনা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়।

৭॥ চুক্তি স্বাক্ষর পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশন

মুসলিম লীগ পার্লমেণ্টারী পার্টির অন্তর্ভুক্ত নাজিমুদ্দীন-বিরোধী উপদলে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সদস্য এই সময় ভাষা আন্দোলনের সুযোগে নাজিমুদ্দীনের সাথে আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে কিছু সুবিধা আদায়ের জন্যে কথাবার্তা চালাতে থাকেন।

১৪ তারিখে সকাল নয়টার দিকে মহম্মদ তোয়াহা এবং তাজউদ্দিন আহমদ

তফজ্জল আলীর বাসায় তাঁর সাথে দেখা করতে যান। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো নাজিমুদ্দীনের সাথে সংগ্রাম পরিষদের যে চুক্তির কথা আলোচিত হচ্ছিলো তার সম্পর্কে সরকার পক্ষের মনোভাব কি সেকথা জিজ্ঞেস করা। তফজ্জল আলী কিন্তু তাঁদেরকে দেখেই উৎসাহের সাথে ইংরাজীতে বলে ওঠেন, 'তোমরা দুজন মন্ত্রী এবং একজন রাষ্ট্রদূত পাচ্ছো।' একথা শুনে মহম্মদ তোয়াহা বিস্ময়ের সাথে তাঁকে বলেন, 'বলছেন কি? আমরা কি আন্দোলন করছি মন্ত্রী করার জন্যে? আমরা এখন জানতে এসেছি সংগ্রাম পরিষদের সাথে চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা কখন শুরু হবে।'[১]

তফজ্জল আলী এবং অন্য কয়েকজন যে মন্ত্রী হওয়ার জন্যে ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র করছিলেন সাধারণ কর্মীদের সে সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিলো না। কিন্তু এই ঘটনার পর তাঁরা স্পষ্টভাবে আন্দোলনে তাঁদের ভূমিকা উপলব্ধি করেন। ভাষা আন্দোলনের সাথে কিছু যোগাযোগ রক্ষা করে তাঁরা নাজি-মুদ্দীনকে একথা বোঝাচ্ছিলেন যে আন্দোলনের তাঁরাই প্রকৃত নেতা কাজেই তাঁদের সাথে একটা আপোষ মীমাংসা হলে আন্দোলন থামিয়ে দেওয়া যাবে।[২]

সেদিন সকালের ঘটনার পর কিছুসংখ্যক কর্মী নিয়ে তাজউদ্দিন আহমদ প্রভৃতি খাজা নসরুল্লাহর বাসভবন দিলখুশায় মহম্মদ আলীর সাথে এ ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনার জন্যে উপস্থিত হন। নেতাদের মধ্যে অন্যান্যেরাও সেখানে ছিলেন এবং তাঁরা সকলেই প্রতিশ্রুতি দেন যে ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে তাঁরা নাজিমুদ্দীনের সাথে কোনো আপোষের মধ্যে যাবেন না।[৩]

সেদিন অর্থাৎ ১৪ তারিখে সন্ধ্যা বেলায় ফজলুল হক হলে অনুষ্ঠিত সংগ্রাম কমিটির বৈঠকে মহম্মদ তোয়াহা এই বিষয়টির উল্লেখ করেন। আনোয়ারা খাতুন এম. এল. এ. সেই সময় আইনের ছাত্রী হিসেবে সংগ্রাম কমিটির সেই সভাতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সাথে তফজ্জল আলীদের যোগাযোগ ছিলো। তিনি বস্তুতঃপক্ষে তাঁদের গ্রুপেরই সদস্যা ছিলেন। সেজন্যে মহম্মদ তোয়াহা সেই সভাতে আনোয়ারা খাতুনকে বলেন যে পার্লামেণ্টারী পার্টির লোকজনের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় সংগ্রাম কমিটির সভায় তাঁর উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নয়। কাজেই তিনি যেন আর কমিটির কোনো বৈঠকে ভবিষ্যতে যোগ না দেন।[৪] পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভাতেও উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং পার্লামেণ্টারী পার্টির লোকজনের সুবিধাবাদীতার সাথে ভাষা আন্দোলনের সম্পর্ক ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে আনোয়ারা খাতুনকে আনুষ্ঠানিকভাবে সংগ্রাম কমিটি থেকে বহিষ্কার করা হয়।[৫]

১৪ই মার্চ সংগ্রাম কমিটির সভায় পরদিন সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মহম্মদ তোয়াহা এবং তাজউদ্দীন আহমদ এই সিদ্ধান্তের উপর বিশেষভাবে জোর দেন। ১৫ই মার্চ পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থাপক সভার সর্বপ্রথম অধিবেশন আহূত হয়েছিলো। সেদিক থেকে ধর্মঘটের সিদ্ধান্তটি ছিলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই সেই ধর্মঘটকে সফল করার জন্যে কর্মীরা সব রকম উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে কর্মীদেরকে টঙ্গী এবং কুমিটোলাতে রেল ধর্মঘটের জন্যে পাঠানো হয়। মেডিকেল কলেজের হাউস সার্জেন ডক্টর করিমকে দেওয়া হয় অ্যাম্বুলেন্সের দায়িত্ব। পুলিশী নির্যাতনের কথা চিন্তা করেই অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়া সেটিকে কর্মীদের যাতায়াতের কাজে ব্যবহার করার কথাও তাঁরা বিবেচনা করেন।[৬]

১৫ই মার্চ সকালের দিকে বৃষ্টি শুরু হয় এবং তার ফলে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মীরা হল এবং অন্যান্য জায়গা থেকে সময়মতো উপস্থিত হতে পারেননি। এই অবস্থা দেখে মহম্মদ তোয়াহা এবং তাজউদ্দীন প্রথমে হলের ছাত্রদের একত্রিত করেন এবং তারপর রমনা পোস্ট অফিস থেকে নীলক্ষেত ও পলাশী ব্যারাক পর্যন্ত বিভিন্ন পিকেটিং পোস্ট-এ কর্মীদেরকে মোতায়েন করেন। ডক্টর করিম এর পর তাঁর অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি এবং লোকজন নিয়ে জগন্নাথ হোস্টেল এবং আগা মসী লেনের মেসে গিয়ে সেখান থেকে কর্মীদের নিয়ে আসেন।[৭]

১৫ তারিখের ধর্মঘটে সেক্রেটারিয়েট এবং রমনা এলাকার অন্যান্য অফিসের বাঙালী কর্মচারীরা যোগদান করেন। বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে রেলকর্মচারীরাও ধর্মঘটে যোগ দেন। পিকেটারদেরকে দলে দলে বিভিন্ন এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় এবং বেলা প্রায় বারোটার সময় মেডিকেল হাসপাতালের গেটের সামনে পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ছাড়ে।[৮]

১৫ই মার্চ মহম্মদ আলী এবং খাজা নসরুল্লাহ সকাল আটটার দিকে কমরুদ্দীন আহমদের বাসায় উপস্থিত হয়ে তাঁকে বলেন যে নাজিমুদ্দীন সেদিন বেলা সাড়ে এগারোটার সময় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির সাথে ভাষা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছেন।[৯] এই খবর পাওয়ার পর সাড়ে দশটার সময় ফজলুল হক হলে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি জরুরী বৈঠক ডাকা হয়। সেই বৈঠকে নাজিমুদ্দীনের প্রস্তাবটি বিবেচনার পর সাক্ষাতের বিষয়ে তাঁরা একমত হন এবং প্রধান মন্ত্রীর সাথে তাঁদের আলোচনার ধারা সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলেন। চুক্তির শর্তগুলি আলোচনার জন্যে কমরুদ্দীন আহমদ যে প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করেন সেটিও এই বৈঠকে আলোচিত এবং মোটামুটি-

ভাবে অনুমোদিত হয়।[১০]

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কয়েকজন সদস্য প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের সাথে আলোচনার জন্যে পূর্ব নির্ধারিত ব্যবস্থা মতো 'বর্ধমান হাউসে' সাড়ে এগারোটার সময় উপস্থিত হন। এঁদের মধ্যে আবুল কাসেম, কমরুদ্দীন আহমদ, মহম্মদ তোয়াহা,[১১] নঈমুদ্দীন আহমদ, নজরুল ইসলাম, আজিজ আহমদ, আবদুর রহমান চৌধুরী[১২] প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। নাজিমুদ্দীন প্রস্তাব করেন যে প্রাদেশিক সরকারের চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদ সেই আলোচনা-কালে উপস্থিত থাকবেন। কিন্তু সংগ্রাম পরিষদের সদস্যেরা তাতে সম্মত না হওয়ায় আজিজ আহমদকে বাদ দিয়েই আলোচনা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়। এর ঠিক পরই কিছুক্ষণের জন্যে খাজা নাজিমুদ্দীন অনুপস্থিত থাকেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত সেক্রেটারী খাজা নসরুল্লাহ সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের সাথে চা পান ও গল্প-গুজব করতে থাকেন। খুব সম্ভবতঃ চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদের সাথে তাড়াতাড়ি পরামর্শের প্রয়োজন বোধ করায় নাজিমুদ্দীনকে 'বর্ধমান হাউসে'র বাইরে অথবা টেলিফোনে আলাপের জন্য অন্য কোনো পৃথক ঘরে যেতে হয়। সেটাই তাঁর মধ্যবর্তী অনুপস্থিতির কারণ হিসাবে সংগ্রাম পরিষদের দুই-একজন সদস্য উল্লেখ করেন।[১৩]

প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সাথে সংগ্রাম পরিষদের এই আলোচনা বৈঠকে তুমুল বিতর্ক এবং উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সংগ্রাম পরিষদ্ চুক্তির যে শর্তগুলি পেশ করেন তার মধ্যে কতকগুলি স্বীকার করতে সম্মত হলেও অন্য কতকগুলির ক্ষেত্রে প্রথমে তিনি তাঁর সুস্পষ্ট অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। সংগ্রাম পরিষদকে তিনি বলেন যে বাংলাকে পূর্ব বাঙলার সরকারী ভাষা, আদালতের ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ঘোষণা করতে তাঁর কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে সুপারিশ করে পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থাপক সভায় কোনো প্রস্তাব উত্থাপন করতে তিনি কোনোক্রমেই রাজী নন। কারণ রাষ্ট্রভাষা কি হবে সেটা প্রাদেশিক পরিষদের দ্বারা নির্ধারিত হবে না। বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের এখতেয়ারভুক্ত এবং সংবিধান সভার মাধ্যমে তাঁরাই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক। ইত্তেহাদ, আনন্দবাজার পত্রিকা, স্বাধীনতা, অমৃতবাজার পত্রিকা, যুগান্তর ইত্যাদি কাগজের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার প্রসঙ্গে নাজিমুদ্দীন বলেন যে পত্রিকা-গুলি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে সুপারিশ করার ফলে তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে একথা ঠিক নয়। নিষেধাজ্ঞা জারীর মূল কারণ

উপরোক্ত পত্রিকাগুলির পাকিস্তান বিরোধী প্রচারণা।[১৪]

সংগ্রাম পরিষদের আর একটি দাবী ছিলো ভাষা আন্দোলনে জড়িত থাকার জন্যে কোনো সরকারী কর্মচারীকে শাস্তিদান বন্ধ করতে হবে। এ সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী বলেন যে শৃঙ্খলাভঙ্গকারী সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে রাষ্ট্রের কাজকর্ম শৃঙ্খলার সাথে চালনা করা সম্ভব হবে না। কাজেই কোনো সরকারী কর্মচারী সরকারবিরোধী বিক্ষোভে সক্রিয়ভাবে যোগদান করলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতীত উপায় নেই।[১৫] আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকেই সরকারীভাবে আন্দোলনকে রাষ্ট্রের শত্রুদের দ্বারা পরিচালিত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিলো। বস্তুতঃপক্ষে নাজিমুদ্দীন তার পূর্ব রাত্রেই একটি বেতার ভাষণে এই বক্তব্য প্রচার করেছিলেন। সংগ্রাম পরিষদ্ প্রধান মন্ত্রীকে বলেন যে সরকারী প্রেস নোট জারী করে প্রকাশ্যভাবে তাঁকে ভুল স্বীকার করতে হবে। এবং সেই সঙ্গে ঘোষণা করতে হবে যে আন্দোলন রাষ্ট্রশত্রুদের দ্বারা পরিচালিত হয়নি। এর জবাবে নাজিমুদ্দীন বলেন যে তিনি এ ব্যাপারে সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের কাছে ত্রুটি স্বীকার এবং দুঃখ প্রকাশ করতে পারেন কিন্তু প্রকাশ্যভাবে সেটা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।[১৬]

এই বৈঠকে বহুক্ষণ ধরে তর্কবিতর্ক চলে কিন্তু সংগ্রাম পরিষদের সদস্যেরা তাঁদের দাবীতে অনমনীয় থাকার ফলে নাজিমুদ্দীন শেষ পর্যন্ত তাঁদের সব কটি দাবীই মেনে নিতে বাধ্য হন। শুধু তাই নয়। আট দফা চুক্তিটির শেষ দফাটি তিনি স্বহস্তে লেখেন।[১৭] কারণ সেটি প্রথম খসড়ার মধ্যে ছিলো না। ক্ষমা প্রার্থনা করে বিশেষ প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারী করতে তিনি অস্বীকার করার পর অষ্টম দফাটি নোতুনভাবে লিখিত হয়।

সর্বসম্মত চুক্তিটির বিবরণ নিম্নরূপ :

১। ২৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮, হইতে বাংলা ভাষার প্রশ্নে যাঁহাদিগকে গ্রেফতার করা হইয়াছে তাঁহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দান করা হইবে।

২। পুলিশ কর্তৃক অত্যাচারের অভিযোগ সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং তদন্ত করিয়া এক মাসের মধ্যে এবিষয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করিবেন।

৩। ১৯৪৮-এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব বাঙলা সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারী আলোচনার জন্যে যে দিন নির্ধারিত হইয়াছে সেইদিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার এবং তাহাকে পাকিস্তান গণ-পরিষদে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষাদিতে উর্দুর সমমর্যাদা দানের জন্যে একটি

বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন ক. হইবে।

৪। এপ্রিল মাসে ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে যে প্রদেশের সরকারী ভাষা হিসাবে ইংরেজী উঠিয়া যাওয়ার পরই বাংলা তাহার স্থলে সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃত হইবে। ইহা ছাড়া শিক্ষার মাধ্যমও হইবে বাংলা। তবে সাধারণভাবে স্কুল কলেজগুলিতে অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দান করা হইবে।

৫। আন্দোলনে যাঁহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের কাহারো বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না।

৬। সংবাদপত্রের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইবে।

৭। ২৯শে ফেব্রুয়ারি হইতে পূর্ব বাঙলার যে সকল স্থানে ভাষা আন্দোলনের জন্য ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে সেখান হইতে তাহা প্রত্যাহার করা হইবে।

৮। সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনার পর আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে এই আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই।[১৮]

চুক্তিপত্রটি স্বাক্ষরিত হওয়ার পূর্বে আবুল কাসেম, কমরুদ্দীন আহমদ প্রভৃতি জেলখানায় উপস্থিত হয়ে ভাষা আন্দোলনে বন্দীদেরকে চুক্তিপত্রটি দেখান। শামসুল হক, মুজিবর রহমান, অলি আহাদ, শওকত আলী, কাজী গোলাম মাহবুব প্রভৃতি চুক্তির শর্তগুলি দেখার পর তার প্রতি তাঁদের সমর্থন ও অনুমোদন জ্ঞাপন করেন। এর পর সংগ্রাম পরিষদের সদস্যেরা আবার 'বর্ধমান হাউসে' ফিরে আসেন এবং সরকারের পক্ষে প্রধান মন্ত্রী নাজিমুদ্দীন এবং সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে কমরুদ্দীন আহমদ চুক্তিপত্রটিতে স্বাক্ষর দেন।[১৯]

দুপুর একটায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সেদিন একটি সাধারণ সভার পর ছাত্রেরা মিছিল সহকারে সেখান থেকে বের হয়ে পরিষদ্ ভবনের সামনে উপস্থিত হয়। পরিষদ্ ভবনের উল্টো দিকেই ছিলো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের এলাকা। ছাত্রেরা প্রধানতঃ সেখানেই একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন।[২০]

এই সময় পর্যন্ত চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার সংবাদ সাধারণভাবে প্রচার করা হয়নি। কিন্তু ছাত্র জনতার ক্রমবর্ধিত উত্তেজনা লক্ষ্য করে আবুল কাসেম তাদেরকে শান্ত করার চেষ্টায় চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেন। এর সাথে সাথেই চতুর্দিক থেকে সকলে তাঁকে ঘেরাও করে গালাগালি বর্ষণ করতে থাকলে তিনি চুক্তির শর্তগুলি তাদেরকে চীৎকার করে শোনাবার চেষ্টা করেন।

কিন্তু নাজিমুদ্দীনের সাথে চুক্তি সম্পাদনের কথায় সকলে এতো বেশী উত্তেজিত হয়ে ওঠে যে আবুল কাসেমের কথায় কর্ণপাত না করে তারা তাঁর বিরুদ্ধেও দারুণভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় তোয়াহা প্রভৃতি কয়েকজন সেখানে তাড়াতাড়ি উপস্থিত হয়ে তাদেরকে শান্ত করার জন্যে বলেন যে চুক্তিটি চূড়ান্ত কিছুই নয়। সেটাকে কেন্দ্র করে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে মাত্র। সরকার যদি তাঁদের ভাষা বিষয়ক দাবী স্বীকার করতে অস্বীকার করে তাহলে আন্দোলন তাঁরা চালিয়ে যাবেন।[২১] এই ঘোষণার পর জনতা তাঁদের প্রতি শান্তভাব ধারণ করলেও বিক্ষোভ প্রদর্শন থেকে বিরত হলো না। তারা দাবী করতে থাকলো যে স্বয়ং নাজিমুদ্দীনের কাছ থেকে তারা চুক্তি সম্পর্কে শুনতে চায়। কিন্তু নাজিমুদ্দীন তাদের সামনে উপস্থিত না হওয়ায় বিক্ষোভ তাদের অব্যাহত থাকলো।[২২] আন্দোলনকে অব্যাহত রাখার জন্যে ঘটনাস্থলেই সংগ্রাম কমিটির নেতাদেরকে পরদিন ১৬ই মার্চ পুনরায় সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানাতে হয়।[২৩]

৮ ॥ পরিষদের অভ্যন্তরে

পরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার পূর্বেই পরিষদ্ ভবনের সামনে ছাত্রেরা একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন। অধিবেশনের শুরুতেই আবদুল করিম এবং নজমুল হক বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিষদের স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন। তাঁদের উভয়ের নামই মুসলিম লীগ পার্লামেন্টোরী পার্টির পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়।[১]

পরিষদের অন্য কাজ শুরু হওয়ার পূর্বে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাইরে ছাত্রদের উপর কোনো অত্যাচার হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে জানতে চান। এরপর প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়ের এক প্রশ্নের জবাবে প্রধান মন্ত্রী নাজিমুদ্দীন বলেন যে সংগ্রাম পরিষদের সাথে বৈঠকে ব্যস্ত থাকার ফলে পরিষদ্ ভবনে উপস্থিত হতে তাঁর বিলম্ব ঘটেছে। সরকার এবং সংগ্রাম কমিটির মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর তিনি বন্দীদের মুক্তির জন্যে আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন যে সংগ্রাম পরিষদের সাথে তাঁর এই মর্মে কথাবার্তা হয় যে চুক্তি সম্পাদনের পর তারা সেক্রেটারিয়েট এবং পরিষদ্ ভবনের দিকে আর আসবে না। তাই চুক্তি সত্ত্বেও তারা আবার পরিষদ্ ভবনের সামনে উপস্থিত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করায় তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। নাজিমুদ্দীন বলেন

যে চুক্তি অনুসারে তিনি সেক্রেটারিয়েট এবং পরিষদ্ ভবন ছাড়া অন্য সব জায়গা থেকে পুলিস প্রত্যাহার করেছেন। তবে পরিষদ্ ভবনের সামনে ঠিক সেই মুহূর্তে কি ঘটছে সে সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। প্রধান মন্ত্রীর এই প্রাথমিক বিবৃতির পর প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় তার কাছে জানতে চান যে ১১ই মার্চের ঘটনা সম্পর্কে তিনি পরিষদে সেদিন কোনো বিবৃতি দান করবেন কিনা। এর জবাবে নাজিমুদ্দীন বলেন যে সে সম্পর্কে আলোচনা পার্লমেণ্টারী পার্টিতে হয়ে গিয়েছে এবং তার উপর বিবৃতিও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। কাজেই তা নিয়ে অধিক আলোচনা তিনি ভালো মনে করেন না।[২]

এই সময় প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়, মনোরঞ্জন ধর প্রভৃতি বাইরে ছাত্রদের উপর কোনো পুলিসী অত্যাচার হচ্ছে কিনা সেটা দেখে আসার জন্যে চাপ দিতে থাকেন এবং তার ফলে পরিষদের ভেতরে দারুণ গণ্ডগোল ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু স্পীকার সকলকে শান্ত হয়ে প্রধান মন্ত্রীর বক্তব্য শোনার জন্যে অনুরোধ করায় অবস্থা অনেকখানি স্বাভাবিক হয়ে আসে এবং নাজিমুদ্দীন সংগ্রাম কমিটির সাথে আলোচনা সম্পর্কে পরিষদের সামনে নিম্নলিখিত রিপোর্ট পেশ করেন :

> যে সমস্ত দলগুলি এই আন্দোলন শুরু করেছে তাদেরকে নিয়ে গঠিত সংগ্রাম কমিটির সাথে সকাল থেকে আমি আলোচনা করছিলাম। আলোচনার ফলে আমাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়। এর পর তাদেরকে জেলখানায় গিয়ে যারা যেখানে আছে তাদের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয়। তারা সেখান থেকে ফিরে আসার পর চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। যারা জেলে আছে তাদের সকলের মুক্তির জন্যে আমি আদেশ দিয়েছি। তারা আমাকে সমস্ত পুলিশ প্রত্যাহার করতে বলেছে। আমি পরিষদ্ ভবন এবং সেক্রেটারিয়েট ব্যতীত অন্য সব জায়গা থেকে পুলিশ প্রত্যাহার করতে বলেছি। পুলিশ প্রত্যাহারের ব্যাপারে তাদেরকে আমি আশ্বাস দিয়েছি এবং সেই মর্মে আদেশও দেওয়া হয়েছে। কাজেই পরিষদের সামনে তাদের আর আসা উচিত নয়। পরিষদের সামনে ছাড়া তারা যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারে। তারা রমনা অথবা অন্য যে কোনো জায়গায় যেতে পারে। কি ঘটছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তারা এখানে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে কেন? আমার কাছেই চুক্তির একটি কপি আছে। সেক্রেটারিয়েট এবং পরিষদের সামনে ছাড়া অন্য সব জায়গা থেকে পুলিশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে সংগ্রাম কমিটিকে তারা বর্জন করেছে। এ ছাড়া আর কি হতে পারে আমি কিছুই জানি না।[৩]

প্রধান মন্ত্রী এই পর্যন্ত বলার পর পরিষদে আবার হট্টগোল শুরু হয়। তখন তিনি আটদফা চুক্তিটি সম্পূর্ণ পাঠ করে তাঁদেরকে শোনান।[৪]

এর পর ডক্টর মালেক পুলিশ প্রত্যাহার সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রীর বক্তব্যের উল্লেখ করে বলেন যে তাঁর আশ্বাস সত্ত্বেও তিনি নিজে দেখে এসেছেন যে পুলিশের স্থানে মিলিটারী মোতায়েন করা হয়েছে। এর উত্তরে নাজিমুদ্দীন বলেন যে মিলিটারী প্রথম থেকেই সেখানে মোতায়েন করা ছিলো এবং পুলিশ অন্যান্য জায়গা থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। এ ছাড়া কাউকে আর গ্রেপ্তার করা অথবা কারো কাজে বাধাও দেওয়া হয়নি। তাদের সাথে এই ব্যবস্থা হয়েছিলো যে তারা পরিষদ্ ভবন এবং সেক্রেটারিয়েট ছাড়া অন্য যে কোনো জায়গাতেই অবাধ ঘোরাফেরা করতে পারবে।[৫]

প্রধান মন্ত্রীর বক্তব্য শেষ হওয়ার পূর্বেই পরিষদে আবার তুমুল হট্টগোল শুরু হয় এবং অনেকেই প্রধান মন্ত্রীকে বাইরে গিয়ে সচক্ষে অবস্থা দেখে আসার জন্যে দাবী জানাতে থাকেন।

এই গণ্ডগোল চলাকালে মহম্মদ আলী বলেন যে নিশ্চয়ই নোতুন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা এখানে আসতে চায় কারণ এটাই একমাত্র জায়গা যেখানে জনসাধারণ তাদের দাবী পেশ করতে পারে। কাজেই পরিষদের উচিত ব্যাপারটিকে ভালোভাবে বিবেচনা করা। প্রধান মন্ত্রী নিজে বাইরে গিয়ে স্বচক্ষে অবস্থা দেখে আসুন তা তিনি চান না। তিনি চান যে পরিষদের প্রতিনিধি হিসাবে প্রধানমন্ত্রী তাদের কাছ থেকে জানুন তারা কি চায় এবং তাদের অভিযোগগুলির মীমাংসা কিভাবে করা সম্ভব।[৬]

এই পর্যায়ে মসিউদ্দিন আহমদ বলেন যে পুলিস অফিসার গফুরের জন্যে সংগ্রাম কমিটির সাথে প্রধান মন্ত্রীর চুক্তি বাতিল হয়ে গেছে। গফুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঢুকে সেখানে মহিলা ছাত্রীদের উপর কাঁদুনে গ্যাস ছুড়েছে। কাজেই যে চুক্তি হয়েছিলো তা নষ্ট হয়ে গেছে এবং তার ফলেই বাইরে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটির জন্যে তিনি গফুরকে দায়ী করেন।[৭]

১৫ই মার্চ সকালের দিকে প্রধান মন্ত্রী ছাত্রদের উত্তেজনা এবং মনোবলের কথা চিন্তা করে পূর্ব বাঙলার অফিসার কমাণ্ডিং জেনারেল আয়ুব খানকে তলব করেন। আয়ুব খান হাজির হলে তাঁকে প্রধান মন্ত্রী পরিষদ্ ভবনের চতুর্দিকে ফৌজ মোতায়েন করে ছাত্রদের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে পরিষদ্ সদস্যদেরকে রক্ষা করার জন্যে অনুরোধ করেন।[৮] আয়ুব খান তাঁর রাজনৈতিক আত্মজীবনীতে বলেছেন যে প্রথমে তিনি প্রধান মন্ত্রীর এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করা স্থির করেছিলেন কিন্তু

নাজিমুদ্দীন তাঁকে মন্ত্রীত্ব সংকটের কথা বলায় তিনি অবশেষে সরকারের পতন রোধ করার উদ্দেশ্যে তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হন। এর পর মেজর পীরজাদার অধীনে একটি পদাতিক কোম্পানী পরিষদ্ ভবনের কাছাকাছি মোতায়েন করা হয়।[৯] ডক্টর মালেক এই কোম্পানীটিকে দেখেই পরিষদ্ ভবনের কাছে মিলিটারী অবস্থানের উল্লেখ করেন।

পরিষদের মধ্যে ফজলুল হক, আনোয়ারা খাতুন এবং অন্যান্যেরা প্রধান মন্ত্রীকে বাইরে গিয়ে অবস্থা সচক্ষে দেখে আসার জন্যে ক্রমাগত দাবী জানাতে থাকেন। এই সময় একবার অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় আনোয়ারা খাতুন বলেন :

> গত ১১ই মার্চ তারিখে যা হয়েছে, তা হয়েছে। আজ পুলিশ মেয়েদের গায়ে হাত দিয়েছে, গলা টিপে মেরেছে, তার প্রতিকার চাই। ঐ সমস্ত চোরামি এখানে চলবে না। আমরা চাই প্রধান মন্ত্রী সেখানে গিয়ে দেখে আসুন।[১০]

আনোয়ারা খাতুনকে সমর্থন করে শামসুদ্দীন আহমদ বলেন যে পুলিশ মেয়েদের গায়ে যখন হাত তুলেছে তখন এই মুহূর্তে সকলের পদত্যাগ করা উচিত।[১১]

এর পর স্পীকার বিকেল ৪-৫৫ মিনিট পর্যন্ত পরিষদ্ মুলতুবী ঘোষণা করেন।

পরিষদের কাজ আবার শুরু হলে মহম্মদ আলী নোতুনভাবে প্রস্তাব করেন যে ঘটনা যেহেতু পরিষদ্ ভবনের সামনে ঘটেছে সেজন্যে পরিষদের স্পীকারের উচিত পরিষদের কয়েকজন সদস্য এবং বিক্ষোভকারীদের মধ্যে কয়েকজনকে নিয়ে তাঁর নিজের কামরায় একটা বৈঠকে মিলিত হওয়া। এর দ্বারা তাদের সত্যকার অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে এবং বোঝা যাবে অভিযোগ-গুলির প্রতিবিধান করা কতদূর এবং কিভাবে সম্ভব।[১২]

মহম্মদ আলীর এই প্রস্তাব সম্পর্কে পরিষদের অভিমত জিজ্ঞাসা করলে হামিদুল হক চৌধুরী স্পীকারকে বলেন যে অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্যার একটা কিছু সমাধান হবে কারণ প্রধান মন্ত্রী পরিষদের বাইরে গিয়ে নিজে ছাত্র প্রতি-নিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। যে কয়েকজন ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদেরকেও ছেড়ে দেওয়া হবে।[১৩]

পরিষদের অভ্যন্তরে সদস্যদের চাপে এবং বাইরের ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভের ফলে নাজিমুদ্দীন পরিষদ্ কক্ষ ত্যাগ করে পরিষদ্ ভবনেই নিজের অফিসে সংগ্রাম পরিষদের কয়েকজনের সাথে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু এই আলোচনা

সত্ত্বেও বাইরের বিক্ষোভ শান্ত হয় না। তারা নাজিমুদ্দীন সরকার এবং পুলিশী জুলুমের বিরুদ্ধে এবং রাষ্ট্রভাষা বাংলার জন্যে নানাপ্রকার ধ্বনি উচ্চারণ করতে থাকেন এবং পরিষদ্ ভবনের এলাকা পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করে। এই বিক্ষোভ চলাকালে মাঝে মাঝে ফজলুল হক, মহম্মদ আলী, তফজ্জল আলী, নেলী সেনগুপ্তা, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, খাজা নসরুল্লাহ, আবদুল মালেক প্রভৃতি পরিষদ্ সদস্যেরা বাইরে এসে ছাত্র এবং অন্যান্য বিক্ষোভকারীদের সাথে কথা বলেন এবং বাংলা ভাষার দাবীর সপক্ষে মত প্রকাশ করেন।[১৪]

সন্ধ্যা পর্যন্ত বিক্ষোভকারীরা স্থান ত্যাগ না করায় আইয়ুব খান নিজে পরিষদ্ ভবনে উপস্থিত হন এবং ডি. আই. জি. ওবায়দুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেন তিনি ছাত্রদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পুলিশী ব্যবস্থা অবলম্বন করে তাদেরকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন না কেন। আইয়ুব খানের বর্ণনা অনুসারে এর উত্তরে ওবায়দুল্লাহ তাঁকে বলেন যে তিনি আদেশ করলে ওবায়দুল্লাহ সে কাজ করতে পারেন কিন্তু রাজনীতিবিদ্‌দের জন্যে ছাত্রদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে তিনি রাজী নন। এর কারণ জিজ্ঞেস করায় ওবায়দুল্লাল আইয়ুব খানকে বলেন তিনি ছাত্রদের মারপিট করে তাড়িয়ে দিলে তারা পরদিন তাঁর বিরুদ্ধে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে সমস্ত দোষ তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে। তারা নিজেরা এ ব্যাপারে কোনো দায়িত্বই গ্রহণ করবে না। কাজেই লিখিত আদেশ ছাড়া মৌখিক আদেশে ওবায়দুল্লাহ ছাত্রদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।[১৫]

এরপর আইয়ুব খান পরিষদের ভিতরে গিয়ে প্রধান মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বলেন যে সন্ধ্যে হয়ে আসছে এবং ছাত্রেরাও ক্রমশঃ তাঁদের কোম্পানীর নিকটবর্তী হচ্ছে। নাজিমুদ্দীন তখন জানতে চান কি উপায়ে সমস্যার সমাধান সম্ভব। আইয়ুব তখন তাঁকে পরিষদের অধিবেশন মুলতুবী করিয়ে দিয়ে বাড়ি চলে যেতে উপদেশ দেন। এতে নাজিমুদ্দীন বলেন যে তিনি একটা গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা তখনো পর্যন্ত শেষ করতে পারেননি কাজেই তাঁর পক্ষে তৎক্ষণাৎ বাড়ি যাওয়া সম্ভব নয়। একথা বলার ঠিক পরেই তিনি নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে আইয়ুব খানকে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে বলেন। পাঁচ মিনিট পর নাজিমুদ্দীন পরিষদের অধিবেশন সেদিনের মতো মুলতুবী রাখার ব্যবস্থা করে বাইরে এলে আইয়ুব খান মেজর পীরজাদাকে প্রধান মন্ত্রীর গাড়িটি পরিষদ্ ভবনের পেছন দিকে নিয়ে আসার জন্যে বলেন। এর পর আইয়ুব এবং পীরজাদা উভয়ে মিলে প্রধান মন্ত্রীকে জগন্নাথ হলের পুরাতন রান্নাঘরের

ভেতর দিয়ে পার করে গাড়ি চড়িয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেন।[১৬]

প্রধান মন্ত্রীকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে পরিষদ্ ভবনের বাইরে ছাত্রদের কাছে গিয়ে আইয়ুব খান বলেন যে 'পাখী উড়ে গেছে।' এই কথা শুনে সকলে উচ্চৈস্বরে হেসে ওঠে এবং আবহাওয়া অনেকখানি হাল্কা হয়ে যায়। এর পর ফজলুল হক এবং মহম্মদ আলী বাইরে এসে ছাত্রদের সাথে কথাবার্তা শুরু করলে আইয়ুব মহম্মদ আলীর কাঁধে টোকা দিয়ে তাঁকে বলেন, 'আপনি কি একটা বুলেট খাওয়ার অপেক্ষায় আছেন?' এতে মহম্মদ আলী রুষ্ট হয়ে আইয়ুবকে বলেন, 'আপনি অভদ্র ব্যবহার করছেন'। আইয়ুব খান এর পর মহম্মদ আলীকে রুঢ় ভাষায় বাড়ি ফেরত যেতে বলেন।[১৭]

সেদিন আইয়ুব খান মহম্মদ আলীর সাথে যে ব্যবহার করেছিলেন তার প্রতিবাদে মহম্মদ আলী তাঁর বিরুদ্ধে নাজিমুদ্দীনের কাছে নালিশ করেন। এর ফলে নাজিমুদ্দীন আইয়ুব খানকে ডেকে পাঠিয়ে মহম্মদ আলীর সাথে গণ্ডগোল মিটিয়ে নিতে বলেন। আইয়ুব খান লিখেছেন যে নাজিমুদ্দীন তাঁকে এক্ষেত্রেও মন্ত্রীত্ব সংকটের দোহাই দেন। মহম্মদ আলীকে এর পর 'বর্ধমান হাউসে' ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আইয়ুব খান তখন তাঁকে বলেন যে তিনি যা করেছেন তা নিতান্তই ঠাট্টাচ্ছলে কাজেই সেটাকে তাঁর গুরুত্ব দেওয়া উচিত হয়নি।[১৮]

৯ ॥ বন্দীমুক্তি ও পরবর্তী বিক্ষোভ

১৫ই মার্চ সন্ধ্যার দিকে ভাষা আন্দোলনে বন্দী ছাত্রদেরকে মুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে জেল গেটে হাজির করা হয়। সেই সময় তাঁদের মুক্তির জন্যে বহু লোক বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। জেল গেটে বন্দীদেরকে হাজির করার পর এক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। জাকির হোসেন শওকত আলী এবং কাজী গোলাম মাহবুবের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে অভিযোগ করায় তাদের বিরুদ্ধে ভাষা আন্দোলন ছাড়াও একটা স্বতন্ত্র মামলা দাঁড় করানো হয়েছিলো। কাজেই ভাষা আন্দোলনের বন্দীদের মধ্যে তারা গণ্য না হওয়ায়, বন্দীদের মুক্তির আদেশ আসেনি।[১] রণেশ দাশগুপ্তকে নিয়েও সেই একই সমস্যা দেখা দেয়।[২] অন্য সকলে যদি এঁদেরকে জেলে রেখে বেরিয়ে আসতে সম্মত হতেন তাহলে গণ্ডগোল হতো না। কিন্তু এই তিনজনকে বাদ দিয়ে একজনও জেল পরিত্যাগ করতে সম্মত না হওয়ায় দারুণ উত্তেজনা এবং হট্টগোলের সৃষ্টি হলো। প্রধান মন্ত্রীর

সাথে এ নিয়ে মহম্মদ তোয়াহা টেলিফোনে আলাপ করে অবস্থার গুরুত্ব তাঁকে বোঝানোর পর উপরোক্ত তিনজনসহ সকলেরই মুক্তির আদেশ দিতে তাঁরা বাধ্য হন।[৩] এর পরমুক্তি প্রাপ্ত কর্মীদেরকে একটি ট্রাকে চড়িয়ে শহরের মধ্যে ঘোরানোর পর ফজলুল হক হলে সেদিন সন্ধ্যা বেলাতেই তাঁদের জন্য একটি সম্বর্ধনারও আয়োজন করা হয়।[৪]

১৫ই মার্চ ফজলুল হক হল থেকে মুজিবর রহমান এবং শওকত আলী ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে গিয়ে সেখানেই রাত্রি যাপন করেন। পরদিন খুব সকালে তাঁরা আবার ফজলুল হক হলে ফেরত গিয়ে ছাত্রদেরকে একটি প্রতিবাদ সভার জন্যে একত্রিত করার চেষ্টা করতে থাকেন।

এই সভা পূর্ব দিনের পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে হলেও মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী পার্টির নাজিমুদ্দীন-বিরোধী উপদলের লোকেরা তার সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করেন। তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো মন্ত্রীসভাকে আন্দোলন ও বিক্ষোভের দ্বারা বিপর্যস্ত করে নিজেদের জন্যে কিছু বিশেষ সুবিধা আদায় করা। ১১ই তারিখে মুজিবর রহমান, শওকত আলী প্রভৃতিরা গ্রেফতার হওয়ার পর সেদিনই তফজ্জল আলী তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করে অনেক কান্নাকাটি করেন।[৫] এর কারণ ১৪ই তারিখে পরিষদের স্পীকার নির্বাচনের কথা ছিলো এবং তিনি ভেবেছিলেন মুসলিম লীগের ছাত্রকর্মীদেরকে দিয়ে নিজের সমর্থনে নাজিমুদ্দীনের উপর চাপ দিলে তাঁরা তফজ্জল আলীকেই শেষ পর্যন্ত স্পীকার পদে মনোনয়ন দিতে বাধ্য হবেন। পার্লামেণ্টারী পার্টির সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের গ্রেফতারের পর তাঁর সে আশা ব্যর্থ হয়।

১৪ই তারিখ সন্ধ্যায় বর্ধমান হাউসে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী পার্টির সভাতে পরদিন পরিষদে স্পীকার পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যে আবদুল করিম এবং তফজ্জল আলীর নাম প্রস্তাব করা হয়। তফজ্জল আলী সেই নির্বাচনে আবদুল করিমের কাছে ২০।২৫ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন।[৬] মহম্মদ আলীর নেতৃত্বাধীনে মুসলিম লীগের পার্লামেণ্টারী উপদলের সাথে নাজিমুদ্দীনের তখন পর্যন্ত কোনো চূড়ান্ত আপোষ সম্ভব হয়নি এবং তাকে সম্ভব করার জন্য ছাত্রদের সাহায্যে মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে তাঁরা নোতুনভাবে বিক্ষোভের ব্যবস্থা করেন।[৭] পূর্বদিনের পুলিশী জুলুমের ফলে সে কাজ সহজেই সম্ভব হয়েছিলো।

১৬ই মার্চ সকালে নয়টার দিকে ফজলুল হক হলে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি বৈঠকে পূর্বদিন প্রধান মন্ত্রীর সাথে সম্পাদিত চুক্তির কয়েকটি স্থান সংশোধনের পর দুপুরের দিকে সেই সংশোধনী প্রস্তাব সাধারণ ছাত্র-

সভায় পেশ করে তাঁদের অনুমোদন লাভেরও সিদ্ধান্ত হয়।[৮]

১৬ তারিখে সকালের দিকে নাজিমুদ্দীন তফজ্জল আলীর মাধ্যমে সংগ্রাম কমিটির কাছে জানতে চান যে চুক্তি সত্বেও আন্দোলন অব্যাহত আছে কেন? তিনি তো চুক্তি অনুসারে নিজের কর্তব্য সম্পাদন করেছেন কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর সংগ্রাম কমিটি কর্তৃক আন্দোলন প্রত্যাহারের যে 'অলিখিত চুক্তি' তাঁদের সাথে হয়েছিলো তাঁরা সে অনুসারে কাজ করছেন না কেন! তফজ্জল আলী ফজলুল হক হলে এসে সংগ্রাম কমিটির কমরুদ্দীন আহমদ, আবুল কাসেম, তাজউদ্দিন আহমদ প্রভৃতির সাথে এ নিয়ে আলাপ করেন। তাঁকে সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে নাজিমুদ্দীনকে বলতে বলা হয় যে আন্দোলনের উপর তাঁদের সম্পূর্ণ হাত নেই। আন্দোলন এখন এমন পর্যায়ে চলে গেছে যেখান থেকে সহজে তা হঠাৎ প্রত্যাহার করা কারো পক্ষেই সম্ভবপর নয়।[৯]

বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ সভার নির্ধারিত সময়ের কিছু পূর্বেই বেলা দেড়টার সময় শেখ মুজিবর রহমান কালো শেরওয়ানী এবং জিন্না টুপী পরিহিত হয়ে একটি হাতলবিহীন চেয়ারে সভাপতির আসন অধিকার করে বসেন।[১০] সেই সভায় তাঁর সভাপতিত্ব করার কোনো কথা ছিলো না। কারণ ঢাকার তৎকালীন ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে তাঁর ভূমিকা ছিলো নিতান্ত নগণ্য। কিন্তু এ সত্বেও তিনি নিজেই সেই সভায় সভাপতিত্ব করার সিদ্ধান্ত নেন। এবং নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সভাপতির-চেয়ার দখল করেন।[১১] সভার প্রথম দিকেই সকালে ফজলুল হক হলের বৈঠকে গৃহীত নিম্নলিখিত সংশোধনী প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়:

১। ঢাকা এবং অন্যান্য জেলায় পুলিশী বাড়াবাড়ি সম্পর্কে তদন্তের জন্য সংগ্রাম কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত এবং সরকারী ও বেসরকারী সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিতে হইবে।

২। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের সুপারিশ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণের উদ্দেশ্যে আলোচনার জন্য পূর্ব বাংলা পরিষদের অধিবেশন চলাকালে একটি বিশেষ দিন নির্ধারণ করিতে হইবে।

৩। সংবিধান সভা কর্তৃক তাঁহারা উপরোক্ত সংশোধনী প্রস্তাবগুলি অনুমোদন করাইতে অসমর্থ হইলে সংবিধান সভার এবং পূর্ব বাংলা মন্ত্রীসভার সদস্যদিগকে পদত্যাগ করিতে হইবে।

উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হওয়ার পর আলী আহমদের মাধ্যমে সেটি প্রধান মন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।[১৩] প্রস্তাব গ্রহণের পর

মুজিবর রহমান অন্য কাউকে বক্তৃতার সুযোগ না দিয়ে নিজেই বক্তৃতা শুরু করেন। সেই এলোপাথাড়ী বক্তৃতার সারমর্ম কিছুই ছিলো না।[১৪] অল্পক্ষণ এইভাবে বক্তৃতার পর তিনি অন্য কাউকে বক্তৃতার সুযোগ না দিয়ে হঠাৎ, 'চলো চলো অ্যাসেম্বলী চলো' বলে শ্লোগান দিয়ে সকলকে মিছিল সহকারে পরিষদ্ ভবনের দিকে যাওয়ার জন্যে আহ্বান জানান।[১৫] সেদিনকার পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী মিছিলের কোনো কথা ছিলো না। কিন্তু এই হঠাৎ-অদ্ভুত পরিস্থিতির পর মিছিলকে বন্ধ করা কারো পক্ষে সম্ভব হলো না। কাজেই ছাত্রেরা সরকার বিরোধী এবং বাংলা ভাষার সমর্থনে নানা প্রকার ধ্বনি দিতে দিতে পরিষদ্ ভবনের দিকে অগ্রসর হলো।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ এবং পরিষদ্ ভবনের নিকটবর্তী চৌমাথার কাছে মিছিলটি পৌছালে পুলিশ তাদেরকে বাধা দান করে। এর পর ছাত্রেরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তারের বেড়া পার হয়ে কলেজ এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং সেখানেই অবস্থান করে নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীত্বের পদত্যাগ দাবী এবং পুলিশী জুলুমের বিরুদ্ধে ধ্বনি দিতে থাকে।[১৬]

অধিবেশন চলাকালে বাইরে দারুন হট্টগোল হচ্ছিলো। এই সময় ভেতরে থেকে কোনো কোনো সদস্য মাঝে মাঝে বের হয়ে এসে ছাত্রদের কাছে মুখ দেখিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদের এই আচরণের কারণ ছিলো রাস্তায় নেমে ছাত্রদের হাতে যাতে মারধোর খেতে না হয় তার ব্যবস্থা করা। এই সময়ে হাতিয়ার মৌলানা আবদুল হাই একবার উপরের ব্যালকনীতে দাঁড়িয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে ছাত্রদেরকে উদ্দেশ করে বলেন, 'চালাও চালাও, আমরা আছি' ইত্যাদি।[১৭]

পরিষদ্ ভবনের পূর্ব গেটে এই সময়ে ছাত্রেরা গিয়ে কিছু সংখ্যক পরিষদ্ সদস্যকে মারপিট ও গালাগালি শুরু করে। এঁদের মধ্যে নাজিমুদ্দীন-বিরোধী উপদলীয় সদস্যেরাও কেউ কেউ ছিলেন। এই খবর শওকত আলী প্রভৃতির কাছে পৌছানোর পর পূর্ব গেটে এমন নোতুন কর্মীদেরকে মোতায়েন করা হয় যাঁরা তাঁদের সমর্থক পরিষদ্ সদস্যদেরকে চিনতেন।[১৮]

সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিষদ্ ভবনের সামনে ছাত্রদের এই বিক্ষোভ চলতে থাকলো এবং তাদের মধ্যে সেই এলাকা পরিত্যাগ করার কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। এর ফলে পরিষদ্ সদস্য থেকে শুরু করে স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার এবং মন্ত্রীসভার সদস্যেরা সকলে অধিবেশন শেষ হওয়ার তিন ঘণ্টা পর পর্যন্ত তাদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে থাকেন। এই পর্যায়ে হামিদুল হক চৌধুরী পরিষদ্ ভবনের

সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রহমতুল্লাহকে উদ্দেশ করে বলেন যে তাঁর উচিত ছাত্রদেরকে গুলি করা। হামিদুল হকের এই কথা শুনে শওকত আলী প্রত্যুত্তরে তাঁকে অত্যন্ত কঠিন 'লৌকিক' ভাষায় গালাগালি করে পরিষদ্ ভবনের বাইরে রাস্তায় বেরিয়ে আসতে বলেন।[১৯]

এইভাবে ছাত্রদের উত্তেজনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া এবং অবস্থা পুলিশের আয়ত্তের বাইরে যাওয়ার উপক্রম হলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রহমতুল্লাহ শামসুল হককে ডেকে বলেন যে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ছাত্রেরা যদি পরিষদ্ ভবন এলাকা পরিত্যাগ করে না যায় তাহলে তাদের উপর লাঠিচার্জ করা হবে। শামসুল হক তখন তাঁকে বলেন যে আরো কিছু বেশী সময় প্রয়োজন কারণ এত বিরাট জনতাকে বুঝিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সেখান থেকে সরানো সম্ভব নয়। শামসুল হক এই কথা বলার সাথে সাথেই পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করে এবং চতুর্দিকে দৌড়াদৌড়ি পড়ে যায়। গফুরের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী এর পর এলোপাথাড়ীভাবে লাঠিচার্জ, কাঁদুনে গ্যাস এবং বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ দিয়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্যে সর্বপ্রকার চেষ্টা চালায়। এর ফলে উনিশজন আহত হন কিন্তু তাঁদের মধ্যে শওকত আলীর অবস্থাই ছিলো সব থেকে গুরুতর।[২০]

লাঠিচার্জ শুরু হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্যদের মতো শওকত আলীও দৌড়াতে থাকেন। এ সময় তাঁর পেছনে একটি পাঞ্জাবী পুলিশও তাঁকে ধরার জন্যে তাঁর পিছনে পিছনে দৌড়াতে শুরু করে। সে শওকত আলীর খুব নিকটেই ছিলো এবং নিজের হাতের ডাণ্ডা দিয়ে তাঁর শরীরে মাঝে মাঝে আঘাত করছিলো। এইভাবে দৌড়তে দৌড়তে তিনি যখন মেডিকেল কলেজের গেটের (বর্তমান শহীদ মিনার) কাছে পৌঁছান তখন পুলিশটি তাঁর পুরো হাতের উপর খুব জোরে একটা লাঠির বাড়ি দেয় এবং তার ফলে শওকত আলী মূর্ছিত হয়ে মাটির উপর পড়ে যান। এ সময়ে পলাশী ব্যারাকের কর্মচারীরাও সব কাছাকাছি ছিলেন। তাঁরা 'নারায়ে তকবীর' ধ্বনি তুলে তাঁর দিকে এগিয়ে আসেন। পরে শওকত আলীকে সেখান থেকে তুলে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।[২১] পরিষদ্ ভবন ছাড়া মেডিকেল কলেজের গেটের সামনেও পুলিশ সেদিন কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে।[২২]

এর পর 'বলিয়াদী হাউসে' নাজিমুদ্দীন-বিরোধী উপদলীয় সদস্যদের একটি সভা বসে। সেখানে গিয়ে তাজউদ্দীন আহমদ এবং শামসুদ্দীন আহমদ শওকত আলীর উপর পুলিশী আক্রমণের বিষয়ে তাঁদেরকে বিস্তারিতভাবে খবর দেন।[২৩]

রাত্রি সাড়ে এগারোটা থেকে সংগ্রাম পরিষদের একটি বৈঠক শুরু হয় এবং

তা দুটো পর্যন্ত চলে। সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে পুলিশী জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ১৭ই মার্চ ধর্মঘট এবং সভা হবে, কিন্তু কোনো মিছিল বের হবে না।[২৪]

১৭ই মার্চ ঢাকার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্মঘট পালিত হয়। এরপর বেলা ১২-৩০ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নঈমুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র ফেডারেশনের কয়েকজন সদস্য সংগ্রাম কমিটিতে তাঁদের প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাব করায় সভাতে বেশ গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। সভাতে সেদিন যাঁরা বক্তৃতা দেন তাঁদের মধ্যে শামসুল হক অন্যতম। কায়েদে আজমের ঢাকা আগমন উপলক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে হরতাল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভা সেদিন শেষ হয় বেলা ২-৩০ মিনিটে।[২৫]

১৭ই মার্চ বিকেলে নঈমুদ্দীন আহমদকে সঙ্গে নিয়ে তাজউদ্দীন কমরুদ্দীন আহমদের বাসায় তাঁর সাথে দেখা করতে যান। কমরুদ্দীন আহমদ একটি সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে পূর্বদিন সিরাজগঞ্জ চলে যাওয়ায় তাঁর সাথে তাঁদের দেখা হয়নি। এর পর একটি রিক্সা চড়ে ফজলুল হক হলের দিকে ফেরত আসার পথে তাঁরা নাজিরাবাজারের ফুলতলা মেসের কাছাকাছি পৌঁছালে তিনটি বাসের মধ্যে সালেক, ইব্রাহিম প্রভৃতিকে তাঁরা তাদের দলবলসহ সেখানে দেখতে পান এবং তারাও তাঁদের দু'জনকে হঠাৎ ঐ অবস্থায় দেখে আক্রমণ করে। ঘটনাচক্রে মতি সর্দারও সেই সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে তাঁর সহায়তায় নঈমুদ্দীন আহমদরা গুণ্ডাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পান।[২৬]

পূর্ব বাঙলা পরিষদের তৃতীয় দিনের অধিবেশন শান্ত পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন প্রধান মন্ত্রী নাজিমুদ্দীন ঘোষণা করেন যে প্রাদেশিক সরকার তৎকালীন শিক্ষা নীতি পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং নোতুন নীতিকে চূড়ান্ত রূপ দানের জন্যে তাঁরা শিক্ষাবিদ্ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে উপযুক্তভাবে পরামর্শ করবেন। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে এক বৎসরের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্সকে বাতিল করে তাঁরা নোতুন অর্ডিন্যান্স প্রণয়ন করবেন।[২৭]

১৭ই তারিখে পরিষদের অধিবেশন চলাকালে মুসলিম লীগ দলীয় একজন সদস্য দাবী করেন যে পরিষদের কাজকর্ম বাংলা ভাষাতে চালানো উচিত। এর জবাবে স্পীকার আবদুল করিম বলেন যে ভাষার প্রশ্নটি পরিষদের দ্বারা নির্ধারিত হতে হবে। তবে তার পূর্বে সদস্যেরা নিজেদের ইচ্ছেমতো যে কোনো ভাষায় বক্তৃতা দান করতে পারবেন।[২৮]

১১ই মার্চের ছাত্র ধর্মঘটের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্যে যশোরে ১৪৪ ধারা জারী করা হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও আন্দোলন, বিক্ষোভ এবং তার সাথে প্রতিক্রিয়াশীলদের গুণ্ডামী সবকিছুই সেখানে অব্যাহত থাকে। শহরে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় বেশ কিছুসংখ্যক অবাঙালী মোহাজেরদের অবস্থানের ফলে অবস্থা আরও জটিল আকার ধারণ করে। ১৮ই মার্চ এই অবাঙালী মোহাজেররা ভাষা আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে এবং সন্ধ্যার দিকে রেলওয়ে স্টেশনে কিছু সংখ্যক নিরীহ লোকজনের উপর হামলা চালায়। এ বিষয়ে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনকে নিম্নলিখিত পত্র দেন:

> যশোর হইতে প্রাপ্ত বিভিন্ন রিপোর্ট এবং দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবৃতি হইতে ইহা স্পষ্ট যে ১১ই মার্চ অর্থাৎ যে দিন হইতে ছাত্রেরা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার উদ্দেশ্যে ধর্মঘট পালন করে সেই দিন হইতে যশোর শহরে ক্রমাগত অরাজকতা বিরাজ করিতেছে! ইহা ১৮ই মার্চ চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। খবরে প্রকাশ যে সেদিন বহুসংখ্যক অবাঙালী মুসলমান লাঠি এবং অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া শহরে প্রবেশ করে। পুলিশ তাহাদিগকে বাধা দান করিলেও তাহাদের মধ্যে কাউকে গ্রেফতার করে না অথবা যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র তাহাদের নিকট ছিলো তাহা কাড়িয়া নেয় না। ঐ একই দিনে বৈকাল প্রায় ছয়টার সময় তাহাদের একটি বিরাট দল রেলওয়ে স্টেশনে উপস্থিত হইয়া নির্বিচারে বহু লোককে আক্রমণ করে। ইহার ফলে ১৬ ব্যক্তি আহত হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশই অমুসলমান। আরও জানা গিয়াছে যে ঐ এলাকার লোকজনদের মধ্যে ত্রাস সঞ্চারের উদ্দেশ্যে এই সব কাজ অবাঙালী মুসলমানরাই করিয়াছে এবং তাহার ফলে বহু হিন্দু নারী ও শিশু শহর পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট একজন অবাঙালী মুসলমান। বাংলা ভাষা আন্দোলনের প্রতি তাঁহার কোনো সহানুভূতি নাই এবং সেই হিসাবে তিনি এই সংঘর্ষে একটি বিশেষ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন।
>
> অপরাধীদিগকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা উচিত। এ ব্যাপারে আপনার ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। যদি দেখিতে পাওয়া যায় যে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সত্যিই এই ঘটনার সহিত জড়িত তাহা হইলে তাঁহাকে অবিলম্বে বদলীর ব্যবস্থা করা উচিৎ।[২৯]

ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের এই পত্রটি তিনি নিজে ২১শে মার্চ পূর্ব বাংলা পরিষদে

পাঠ করে শোনান। প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে তদন্ত করেছেন কিনা এবং কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন সে বিষয়েও তিনি তাঁর কাছে জানতে চান।[৩০]

নাজিমুদ্দীন ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের এই প্রশ্নের জবাব দান কালে বলেন যে ১১ই তারিখ থেকে যশোরে অরাজকতা বিরাজ করার কথা বিরোধীদলের নেতা স্বীকার করেছেন। এই অরাজকতা কথা দূর করে সেখানে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে স্থানীয় অফিসাররা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তিনি আরও বলেন যে দুর্ভাগাবশতঃ ১৮ই তারিখে বিরাট সংখ্যক বিহারীরা যশোর শহরে প্রবেশ করে। পুলিশ ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাদেরকে সরিয়ে দেন এবং তারা চলে যায়। এর পর অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে রেলওয়ে স্টেশনের উপর তারা আক্রমণ করে বসে। এই লোকদের কেন গ্রেফতার করা হয় নি সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী তদন্তের আশ্বাস দেন। এ ছাড়া তিনি বলেন যে ১৮ তারিখের পর যশোরে কোনো ঘটনা ঘটেনি এবং অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্বাধীন। কিন্তু এসব সত্বেও তাঁকে একথা স্বীকার করতে হয় যে যশোর শহরে তখনো পর্যন্ত দারুণ ভয়ভীতি ও উত্তেজনা বিরাজ করছিলো। তিনি এই ভীতি ও উত্তেজনা দূর করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টারও আশ্বাস দেন।[৩১]

১৭ তারিখে রাত্রি নয়টার দিকে ফজলুল হক হলের হাউস টিউটর মাজহারুল হকের কামরায় সংগ্রাম কমিটির একটি বৈঠক বসে এবং তা প্রায় এগারোটা পর্যন্ত চলে।[৩২]

পরদিন সকাল নয়টায় মাজহারুল হকের কামরায় পুনরায় সংগ্রাম কমিটির বৈঠক বসে। তাতে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে কমিটির বক্তব্যের উপর একটি বিবৃতির খসড়া তৈরী করা হয়। এ ছাড়া সেই বৈঠকে কায়েদে আজমকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করার উদ্দেশ্যে একটি ছাত্র সম্বর্ধনা কমিটি গঠনেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেদিন বিকেলে ফজলুল হক হলে মহম্মদ তোয়াহার কামরায় তিনি এবং তাজউদ্দিন আহমদ ১৬ই মার্চের ঘটনাবলীর উপর একটি ব্যাখ্যামূলক বিবৃতির খসড়াও প্রস্তুত করেন।[৩৩]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ পূর্ব বাঙলায় কায়েদে আজম

১ ॥ মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী পার্টি

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে শহীদ সুহরাওয়ার্দী পূর্ব বাঙলা মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী পার্টির নেতা নির্বাচনে নাজিমুদ্দীনের কাছে পরাজিত হন।[১] এর পর নাজিমুদ্দীন যথারীতি ঢাকাতে পূর্ব বাঙলার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করে নিজের মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যদের নাম গভর্নরের কাছে পেশ করেন। এই মন্ত্রীসভাতে নাজিমুদ্দীন তাঁর উপদলের বাইরের কোনো মুসলিম লীগ সদস্যকে গ্রহণ করেননি। এর ফলে বিভাগ-পূর্ব কালের নাজিমুদ্দীন-বিরোধী সদস্যেরা নোতুন পরিস্থিতিতেও একটি উপদল হিসাবে কাজ করতে থাকেন। শুধু তাই নয়। তাঁরা নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীসভার পতন ঘটানোর জন্যে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা সত্বেও যথাসাধ্য চেষ্টা করে যান।

প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীন এই উপদলটিকে যে শুধু মন্ত্রীসভার আসন থেকেই বঞ্চিত করেছিলেন তা নয়। তিনি এবং মৌলানা আকরাম খান অন্যান্যদের সহযোগিতায় তাদেরকে ও তাদের সমর্থকদেরকে মুসলিম লীগ সংগঠনের বাইরে রাখতেও চেষ্টার ত্রুটি করেননি। ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের লোকজনদেরকে রশিদ বই দিতে অস্বীকৃতি এবং প্রদেশে ও জেলায় জেলায় নিজেদের ইচ্ছেমতো সাংগঠনিক কমিটি গঠন করাও তাঁদের এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

খাজা নাজিমুদ্দীনের সুহরাওয়ার্দী ভীতির মতো আকরাম খানের ছিলো ভাসানী ভীতি। তিনি মনে করতেন মৌলানা ভাসানী প্রাদেশিক মুসলিম লীগের মধ্যে এলে তাঁর সভাপতিত্ব রক্ষা করা দুঃসাধ্য হবে।[২] এই চিন্তা থেকে তিনি সিলেট জেলা মুসলিম লীগ এবং প্রাদেশিক মুসলিম লীগ উভয় ক্ষেত্রেই ইচ্ছেমতো ভাঙাচোরা এবং রদবদল করেন।[৩]

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটিকে ভেঙে দিয়ে সেই কমিটির পূর্ব বঙ্গীয় সদস্য এবং আসাম মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সিলেটীয় সদস্যদের নিয়ে একটি নোতুন পূর্ব বাঙলা মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির প্রথম এবং একমাত্র বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ঢাকাতে। সে সময় দেখা যায় যে প্রাদেশিক ওয়ার্কিং কমিটিতে মৌলানা ভাসানী, মাহমুদ আলী,

দেওয়ান মহম্মদ আজরফ, দেওয়ান আবদুল বাসেত প্রভৃতি সহ প্রায় আটজন সিলেটের প্রতিনিধিত্ব করেন। ওয়ার্কিং কমিটিতে এঁদের উপস্থিতি আকরম খানের পছন্দ না হওয়ায় তিনি সেই প্রাদেশিক কমিটিকে ভেঙে দেন। এর পর তিনি একটি নোতুন সাংগঠনিক কমিটি গঠন করেন যার মধ্যে পূর্বোল্লিখিত পুরাতন সদস্যদের একজনকেও না রেখে মুনাওয়ার আলীকে সিলেটের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত করা হয়।[৪]

এই নোতুন কমিটিতে আকরাম খান এবং মুনাওয়ার আলী ব্যতীত অন্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী, আবদুল্লাহেল বাকী, আহমদ হোসেন, আবদুল মোতালেব মালেক, নূরুল আমীন, আসাদউল্লাহ এবং ইউসুফ আলী চৌধুরী। আকরাম খান এই কমিটির চেয়ারম্যান এবং ইউসুফ আলী চৌধুরী ও আসাদউল্লাহ দুজনেই যৌথভাবে সেক্রেটারী মনোনীত হন। এই কমিটি গঠিত হয় কায়েদে আজমের পূর্ব বাঙলা সফরের পর।[৫]

সিলেট জেলা সাংগঠনিক কমিটির চেয়ারম্যান মনোনীত হন মাহমুদ আলী। ১৯৪৮-৪৯ সালের মধ্যে তাঁরা ব্যাপকভাবে মুসলিম লীগের সদস্য সংগ্রহ করেন। সিলেট লীগের এই উদ্যোগে আশঙ্কান্বিত হয়ে আকরাম খান বেআইনীভাবে কতকগুলি অপ্রাসঙ্গিক কারণ দেখিয়ে তাঁদের জেলা সাংগঠনিক কমিটিকেও ভেঙে দেন এবং মামুদ আলীকে বাদ দিয়ে নোতুন-ভাবে অন্য একটি কমিটি গঠন করেন।[৬]

নোতুন প্রাদেশিক সাংগঠনিক কমিটিতে সুহরাওয়ার্দী সমর্থক ডক্টর মালেক এবং আহমদ হোসেনকে রাখলেও জেলা সাংগঠনিক কমিটিগুলির উপর নিজেদের পূর্ণ কর্তৃত্ব রাখার ফলে মুসলিম লীগের দরজা পূর্ববর্তী সুহরাওয়ার্দী আবুল হাশিম সমর্থক উপদলীয় লোকদের জন্যে প্রায় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

আকরাম খানের সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক ইউসুফ আলী চৌধুরী পরবর্তী সময়ে স্বীকার করেন[৭] যে আকরাম খান সুহরাওয়ার্দী গ্রুপের লোক-জনদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দিয়ে তাঁদের প্রতি অবিচার করেছিলেন। কিন্তু তিনি আবার একথাও বলেন যে তাঁরা অর্থাৎ নাজিমুদ্দীন-আকরাম খান উপদলের লোকেরা, সে কাজ করেছিলেন অনেকটা প্রতিহিংসামূলকভাবে। সুহরাওয়ার্দী দেশভাগের পূর্বে যখন মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করেন তখন তিনি নিজেদের উপদলের বাইরে কাউকে তাতে স্থান দেননি। কাজেই পূর্ব বাঙলায় নোতুন মন্ত্রীসভা গঠনকালে নাজিমুদ্দীন সুহরাওয়ার্দী অনুসৃত পথ

ধরেই তাঁর নিজের উপদলের মধ্যে থেকেই মন্ত্রীসভার প্রতিটি সদস্য নির্বাচন করেছিলেন। আকরাম খানেরও এ ব্যাপারে উদ্বেগ কম ছিলো না। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের মধ্যে আবুল হাশিমের সাংগঠনিক দক্ষতা ও তৎপরতার ফলে আকরাম খান সংগঠনগতভাবে সম্পূর্ণভাবে কোণঠাসা হয়েছিলেন। মৌলানা ভাসানীকে পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগের সাংগঠনিক কাজের সাথে যুক্ত করে তিনি পূর্ব অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি হতে দিতে নিতান্তই নারাজ ছিলেন। কাজেই সে সম্ভাবনাকে রোধ করার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষেত্রে তিনি কোনো ত্রুটি রাখেননি।[৮]

মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী পার্টি এবং মুসলিম লীগ সংগঠনের মধ্যে এই উপদলীয় কার্যকলাপের প্রভাব থেকে ছাত্র রাজনীতি মুক্ত ছিলো না। দেশ ভাগের পূর্বে মুসলিম ছাত্র লীগের মধ্যে আবুল হাশিম ও নাজিমুদ্দীনের সমর্থকরা দুই উপদলে বিভক্ত ছিলেন। সে সময় সুহরাওয়ার্দীর থেকে আবুল হাশিমের প্রভাবই ছাত্রদের মধ্যে অনেক বেশী শক্তিশালী ছিলো। কিন্তু দেশভাগের পর আবুল হাশিম বর্ধমানে থেকে যাওয়ায় তাঁর সমর্থক ছাত্রদের একটি প্রভাবশালী অংশ সুহরাওয়ার্দী সমর্থক পূর্ব বাঙলা মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী উপদলের সাথে যুক্ত হয় এবং অন্য একটি অংশ বামপন্থী রাজনীতির সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথম দলের মধ্যে শেখ মুজিবর রহমান, শওকত আলী, নুরুদ্দীন আহমদ, সালেহ আহমদ, মোয়াজ্জেম হোসেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় দলের মধ্যে ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ, মহম্মদ তোয়াহা, অলী আহাদ প্রভৃতি। ছাত্রদের যে উপদলটি নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীসভাকে সমর্থন করতো তার মধ্যে শাহ আজিজুর রহমান, আনোয়ার হোসেন প্রমুখ ছিলেন নেতৃস্থানীয়।

ছাত্র লীগের উপরোল্লিখিত উপদলগুলির মধ্যে শেখ মুজিবর রহমানের উপদলের সাথেই মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী পার্টির সুহরাওয়ার্দী সমর্থক উপদলের সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সংযোগের ফলে তাঁরা একযোগে কিছু কিছু কাজ করেন। এবং তার ফলে পার্লামেণ্টারী উপদলটির সুবিধাবাদী রাজনীতির পথই প্রশস্ত হয়।[৯] খাদ্য আন্দোলন এবং ভাষা আন্দোলনের সময় অবশ্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী ছাত্রদের সাথে সাধারণভাবে মহম্মদ আলী, তফজ্জল আলী প্রমুখ উপদলীয় নেতাদের একটা কার্যকরী সম্পর্ক কিছুদিনের জন্যে স্থাপিত হয় এবং তাঁরা অনেকে তাঁদের উপদলীয় বৈঠকেও মাঝে মাঝে যোগদান করেন।[১০]

২০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭ বেলা ৩-৩০ মিনিটে 'বলিয়াদী হাউসে' পার্লামেণ্টারী উপদলের এই জাতীয় একটি বৈঠক হয়। এতে পার্লামেণ্টারী পার্টির বাইরের অনেক কর্মীও উপস্থিত থাকেন: মহম্মদ আলী, তফজ্জল আলী, ডক্টর মালেক প্রভৃতি ব্যবস্থাপক সভার ১৬ জন সদস্য ব্যতীত অন্য যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে কমরুদ্দীন আহমদ, তাজউদ্দীন আহমদ, শেখ মুজিবর রহমান, শওকত আলী, শামসুজ্জোহা, আসলাম, আবদুল আউয়াল, আজিজ আহমদ, মহিউদ্দীন আহমদ,* আতাউর রহমান খান, কফিলউদ্দীন চৌধুরী, কাদের সর্দার এবং মতি সর্দারের নাম উল্লেখযোগ্য।[১১]

পরদিন মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী পার্টির সভাতে খাদ্য সমস্যা, পাট সমস্যা, ইত্তেহাদ, মন্ত্রী ও পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী প্রভৃতিদের মাইনে ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার সিদ্ধান্ত হয়। নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীত্ব অপসারণের সম্ভাবনার প্রশ্নও এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং সেই প্রসঙ্গে বিকল্প মন্ত্রীত্ব যাঁর নেতৃত্বে গঠিত হবে কর্মীরা তাঁর নাম জানতে চান। পার্লামেণ্টারী পার্টির নেতারা এই প্রশ্নের জবাব পরবর্তী সোমবার অর্থাৎ ২২শে ডিসেম্বর সঠিকভাবে তাঁদেরকে জানাতে পারবেন এই মর্মে আশ্বাস দেন।[১২]

বৈঠকটি রাত্রি ৮টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এর পর একটি মোটরগাড়িতে চড়ে তাজউদ্দীন আহমদ, শওকত আলী, মুজিবর রহমান এবং মহিউদ্দীন পলাশী ব্যারাক, সলিমুল্লাহ হল, নীলক্ষেত ব্যারাক, ফজলুল হক হল, ইঞ্জিনিয়ারিং হোস্টেল এবং নিমতলী মেসে 'ইত্তেহাদ' কাগজ বিতরণ করেন।[১৩] 'ইত্তেহাদ' এই সময় নাজিমুদ্দীন বিরোধী উপদলটিকে সমর্থন এবং বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে পূর্ব বাঙলা মন্ত্রীসভার নিষ্ক্রিয়তার সমালোচনা করতো। এ জন্যে তখন ইত্তেহাদকে সরকারীভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে সময় লোক মারফৎ বড় বড় প্যাকেটে নিয়মিতভাবে ইত্তেহাদ ঢাকাতে আসতো এবং ছাত্রেরা তা মাঝে মাঝে বিতরণ করতেন।[১৪]

২১শে ডিসেম্বর সকালে নাজিমুদ্দীনের সভাপতিত্বে মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী পার্টির প্রথম বৈঠক বসে। এতে ১১৬ জনের মধ্যে মন্ত্রীসহ ৮০ জন সদস্য উপস্থিত থাকেন। স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচনের জন্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থাপক সভার বৈঠক আহ্বান করার জন্যে তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[১৫]

বিকেল ৪টা থেকে পার্লামেণ্টারী পার্টির দ্বিতীয় দফা বৈঠক শুরু হয় এবং

*বরিশালের মহিউদ্দীন আহমদ নয়।

সেই বৈঠক চলাকালে অসদস্য কিছুসংখ্যক ছাত্র, কর্মী এবং নেতারাও উপস্থিত থাকেন। এঁদের মধ্যে কমরুদ্দীন আহমদ, মুজিবর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদ শওকত আলী, অলী আহাদ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য: খাদ্য সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাকালে এই সময় মন্ত্রীত্ববিরোধী মনোভাব চরমভাবে ব্যক্ত হয়। কনট্রোল এবং কর্ডন প্রথা তুলে নেওয়ার জন্যে বিরোধীপক্ষীয়েরা দারুণ-ভাবে চাপ দিতে থাকেন এবং এ নিয়ে ভোটাভুটির কথাও ওঠে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের খাদ্য মন্ত্রীর আসন্ন সফর পর্যন্ত এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখাতে সকলে একমত হন।[১৬]

এর পরদিন সকাল ৯টায় উপদলীয় পরিষদ সদস্যেরা তফজ্জল আলীর জয়নাগ রোডস্থ বাসাতে নিজেদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্যে একটি আলোচনা সভায় মিলিত হন।[১৭] এই সভার সিদ্ধান্ত মতো ডক্টর মালেক শহীদ সুহরা-ওয়ার্দীকে ঢাকাতে এসে তাঁদের দলের নেতৃত্ব গ্রহণ এবং নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীসভাকে অপসারণের জন্যে আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্যে কলকাতা যান।[১৮]

ডক্টর মালেক সুহরাওয়ার্দীকে বলেন যে তিনি যদি পাকিস্তানে আসতে ইচ্ছে করেন তাহলে তখনই তার উপযুক্ত সময় কারণ তৎকালীন অবস্থা তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। সুহরাওয়ার্দী সমস্ত কথা শোনার পরও ঢাকা আসতে সম্মত হলেন না। তিনি ইতিপূর্বে পূর্ব বাঙলায় না আসার সিদ্ধান্ত নেওয়াই এর কারণ। সুহরাওয়ার্দীর সাথে এই আলোচনাকালে ডক্টর মালেকের সাথে নওগাঁয়ের পরিষদ সদস্য সিরাজুল ইসলামও উপস্থিত ছিলেন। উপদলীয় পার্লামেন্টারী পার্টির নেতৃত্বের প্রসঙ্গে সুহরাওয়ার্দী তাঁদের নিজেদের মধ্যেই একজনকে নেতা নির্বাচন করে নেওয়ার পরামর্শ দেন।[১৯]

কলকাতা থেকে ঘুরে এসে ডক্টর মালেক মহম্মদ আলী এবং তফজ্জল আলীকে সুহরাওয়ার্দীর সাথে তাঁর আলাপের বিষয়ে জানালে তাঁরা উভয়েই তাঁকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেন। পরে সিরাজুল ইসলামও ডক্টর মালেকের কথা সঠিক বলে তাঁদেরকে জানালে তাঁরা শেষ পর্যন্ত সুহরা-ওয়ার্দীর নেতৃত্ব সম্পর্কে আশা ত্যাগ করেন। মহম্মদ আলী এ ব্যাপারে ঢাকা থেকে সুহরাওয়ার্দীর সাথে টেলিফোনেও আলাপ করেছিলেন।[২০]

সুহরাওয়ার্দী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পর নেতা নির্বাচন উপদলটির পক্ষে এক বিরাট সমস্যার আকারে দেখা দিল। মহম্মদ আলী, শামসুদ্দীন আহমদ (কুষ্টিয়া) প্রভৃতির কথা বিবেচিত হলেও এঁদের মধ্যে কারো প্রতি সকলের তেমন আস্থা ছিলো না। পার্লামেন্টারী পার্টির মধ্যে তখন ফজলুল হকের

সমর্থক ছিলেন মাত্র চার পাঁচজন: কাজেই সেদিক থেকে তাঁকে নির্বাচন করারও অসুবিধে ছিলো।[২১]

সুহরাওয়ার্দীর ঢাকা না আসার সিদ্ধান্ত, নেতা নির্বাচনে অক্ষমতা ইত্যাদির পর পার্লামেণ্টারী উপদলটির নেতৃবৃন্দ নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীসভাকে অপসারণের চিন্তা বর্জন করে তার উপর চাপ দিয়ে একটা আপোষরফায় উপনীত হওয়ার জন্যে তৈরী হন এবং সর্বতোভাবে সেই চেষ্টা করতে থাকেন। ভাষা আন্দোলনকে তাঁরা এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহারের চেষ্টা করেন।

এর পর থেকে নাজিমুদ্দীনের বিরুদ্ধে উপদলীয় রাজনীতিতে সক্রিয় থাকলেও মহম্মদ আলী, তফজ্জল আলী প্রভৃতি নেতারা কায়েদে আজমের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকতেন এবং নাজিমুদ্দীনও তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে কায়েদে আজমের কাছে নিয়মিতভাবে অভিযোগ উপস্থিত করতেন। প্রথম পার্লামেণ্টারী পার্টির বৈঠকের পর তাদের বিরুদ্ধতার কথা জানিয়ে নাজিমুদ্দীন কায়েদে আজম এবং লিয়াকত আলীর সাথে ঢাকা থেকে টেলিফোনযোগে আলাপও করেন।[২২]

ভাষা আন্দোলন ভালোভাবে রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করার পূর্ব পর্যন্ত উপদলীয় নেতারা প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র এবং অন্যান্য কর্মীদের সাথে যোগাযোগের জন্যে মাঝে মাঝে সফর করতেন। এই উদ্দেশ্যে রাজশাহী কলেজের ছাত্রদের দ্বারা একবার আমন্ত্রিত হয়ে নঈমুদ্দীন আহমদ এবং তফজ্জল আলী ৩১শে জানুয়ারি সেখানে পৌঁছান। রাজশাহীতে ইতিপূর্বেই ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছিলো। কিন্তু মাহাত্মা গান্ধী হত্যার পর শোকসভা অনুষ্ঠানের জন্যে ১৪৪ ধারা তুলে নেওয়ায় তফজ্জল আলী এবং অন্যান্যেরা ভুবন-মোহন পার্কে একটি সভায় বক্তৃতা দিতে সমর্থ হন।[২৩]

এর পরই নরসিংদীতে পুরানো কিছু কৃষক কর্মীরা একটি সভার আয়োজন করেছিলেন এবং সেই সভায় মহম্মদ আলীর সভাপতিত্ব করার এবং ডক্টর মালেক, তফজ্জল আলী, কমরুদ্দীন আহমদ প্রমুখ কয়েকজনের বক্তৃতা দানের কথা ছিলো: নির্ধারিত দিনে সকাল দশটার সময় অর্থাৎ ট্রেন ছাড়ার কিছু পূর্বে মহম্মদ আলী নরসিংদী না যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে কমরুদ্দীন আহমদকে খবর দেন। এর কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে কায়েদে আজমের কাছে এই মর্মে অভিযোগ করা হয়েছে যে তাঁরা জমিদারী উচ্ছেদের জন্যে আন্দোলন করছেন এবং কায়েদে আজম এ জাতীয় কর্মসূচীকে রাষ্ট্রদ্রোহী বিবেচনা করায় তাঁর পক্ষে কৃষক সভাটিতে যাওয়া আর সম্ভব নয়।[২৪]

তফজ্জল আলী বলেন যে মহম্মদ আলীর সিদ্ধান্ত জানার পরও তিনি নরসিংদী যাওয়ার কর্মসূচী পরিবর্তন না করে পূর্ব কথামতো সেখানে যান এবং যথারীতি বক্তৃতা করেন।[২৫] কিন্তু কমরুদ্দীন আহমদ এ প্রসঙ্গে বলেন যে নরসিংদী পৌঁছাবার পূর্বে মহম্মদ আলীর মত পরিবর্তনের বিষয়ে তফজ্জল আলী কিছু জানতেন না। সেখানে উপস্থিত হয়েই তিনি তাঁর কাছে সেকথা জানতে পারেন এবং ভীতিবশতঃ সভায় কোনো বক্তৃতা দিতে অস্বীকার করেন।[২৬]

নাজিমুদ্দীন-বিরোধী উপদলটির মূল সমস্যা ছিলো এই যে রাজনীতিগতভাবে তাঁদের কোনো পৃথক সত্তা না থাকায় মুসলিম লীগ পরিত্যাগ করার কোনো ক্ষমতা তাঁদের ছিলো না। এবং মুসলিম লীগের মধ্যে নাজিমুদ্দীন কায়েদে আজমের প্রিয় পাত্র থাকায় উপদলীয় রাজনীতিতেও তাঁদের বিশেষ কোনো ভবিষ্যৎ তাঁরা দেখেননি। সুহরাওয়ার্দীর অবর্তমানে এই পরিস্থিতি রীতিমতো ঘোরালো আকার ধারণ করে। এই অবস্থাতে আপোষের পথকেই তাঁরা বেছে নেন এবং মন্ত্রীসভার স্থান লাভ এবং অন্যান্য উপযোগী চাকরির জন্যে নাজিমুদ্দীনের উপর উপদলীয় চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন।

ভাষা আন্দোলনের সময় তাঁরা নাজিমুদ্দীনকে ক্রমাগত বলেন যে আন্দোলন তাঁদের নেতৃত্বেই পরিচালিত হচ্ছে কাজেই তাদের সাথে একটা উপযুক্ত মীমাংসায় উপনীত না হলে আন্দোলন থামার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাঁদের এই দাবীকে নাজিমুদ্দীন কায়েদে আজমের কাছে মুসলিম লীগ ও রাষ্ট্রবিরোধী কাযকলাপ বলে প্রমাণের চেষ্টা করলেও পরিশেষে তিনিও তাদের সাথে একটা আপোষ রফা করে গণ্ডগোলের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করেন।

ভাষা আন্দোলন চলাকালে ১০ই মার্চ খাজা নসরুল্লাহর বাড়ি 'দিলখুশায়'* উভয়পক্ষের আপোষ মীমাংসার জন্যে একটি আলোচনা বৈঠক বসে। তাতে মন্ত্রীসভার পক্ষে উপস্থিত থাকেন নাজিমুদ্দীন একা। অন্যপক্ষে থাকেন মহম্মদ আলী, তফজ্জল আলী, এবং ডক্টর মালেক। এই বৈঠকে নাজিমুদ্দীনের সাথে উপদলীয় নেতাদের একটা মিটমাটের কথা হয়। কিন্তু নাজিমুদ্দীনকে তাঁরা বলেন যে আপোষ মীমাংসাকে পুরোপুরিভাবে কার্যকরী করতে হলে ছাত্রদেরকে

*বাড়িটি এখন ভেঙে ফেলা হয়েছে। বর্তমানে যে স্থানে ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট বিল্ডিং প্রাচী হোটেল ইত্যাদি আছে দিলখুশা সেখানেই অবস্থিত ছিলো। বাড়িটির সমগ্র কম্পাউণ্ডের নাম ছিলো মতিঝিল। বর্তমান মতিঝিল এলাকার নামের উৎপত্তি সেখান থেকে।

জেল থেকে মুক্তিদান এবং ভাষার দাবীকে স্বীকৃতি দিতে হবে। নাজিমুদ্দীন মোটামুটিভাবে তাতে সম্মত হলেও এ বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সেদিন সম্ভব হয়নি।[২৭]

এই আপোষ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতেই তফজ্জল আলী পরদিন সকালে তাঁর বাড়িতে তোয়াহা এবং তাজউদ্দীন আহমদকে বলেন যে তাঁরা অর্থাৎ ছাত্রেরা খুব সম্ভবতঃ দুইজন মন্ত্রী এবং এবং একজন রাষ্ট্রদূত পাচ্ছেন। তফজ্জল আলীর এই উক্তিতে ছাত্রদের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং তাঁরা সংগ্রাম পরিষদের থেকে আনোয়ারা খাতুন এম. এল. এ.-কে সেদিনই ফজলুল হক হলে অনুষ্ঠিত একটি সভায় বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেন এবং ১৫ই তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সভায় তা কাযকরী করেন। এ ছাড়া ১৩ তারিখেই তাঁরা বেশ কয়েকজন দিলখুশাতে গিয়ে পার্লামেণ্টারী নেতাদের আপোষ মীমাংসা এবং সুবিধাবাদীত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ছাত্রদের এই অবস্থা দেখে মহম্মদ আলী এবং অন্যান্য নেতারা তাঁদেরকে আশ্বাস দেন যে ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে তাঁরা নাজিমুদ্দীনের সাথে কোনো আপোষের মধ্যে যাবেন না।

নাজিমুদ্দীনের সাথে ১০ই মার্চের আলোচনা সত্ত্বেও উপদলীয় নেতারা তফজ্জল আলীকে স্পীকার পদে মনোনয়নের জন্যে পার্লামেণ্টারী পার্টিতে দাড় করাবার সিদ্ধান্ত নেন। ১৪ই মার্চ বিকেল ৩-৩০ মিনিটে 'বর্ধমান হাউসে' পার্লামেণ্টারী পার্টির সভা শুরু হলে সেখানে আবদুল করিম এবং তফজ্জল আলীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। আবদুল করিম প্রায় বিশ-পঁচিশ ভোটের ব্যবধানে তফজ্জল আলীকে পরাজিত করে পরদিন স্পীকার পদের নির্বাচনের জন্যে মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী পার্টি কর্তৃক মনোনীত হন।[২৮] সেদিনের সভায় ভাষা আন্দোলন সম্পর্কেও আলোচনা হয় এবং আলোচনা চলার সময় রাত্রি প্রায় ৯টা পর্যন্ত ছাত্রেরা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন।[২৯]

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, পার্লামেণ্টারী পার্টির মধ্যে উপদলীয় কার্যকলাপ ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে প্রাদেশিক সরকার পূর্ব বাঙলায় কায়েদে আজমের উপস্থিতি প্রয়োজনীয় মনে করেন এবং তাঁকে যথাশীঘ্র পূর্ব বাঙলা আগমনের জন্যে আমন্ত্রণ জানান। কিছুদিন থেকেই কায়েদে আজমের এই সফরের কথা আলোচিত হচ্ছিলো কিন্তু এবার তাড়াতাড়ি তার সঠিক তারিখ নির্ধারণ করে ১৯শে মার্চ তাঁর ঢাকা আগমনের কথা ঘোষণা করা হলো।

২॥ কায়েদে আজমের ঢাকা আগমন ও রেসকোর্সের বক্তৃতা

১৯শে মার্চ বিকেলে কায়েদে আজম তেজগাঁ বিমান বন্দরে পৌছান। হাজার হাজার লোক তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে বিমানবন্দরে সমবেত হয় এবং অসংখ্য লোক রেসকোর্সের ময়দান থেকে তেজগাঁ পর্যন্ত পথের দুই পাশে দুই পাশে তাঁর দর্শন লাভের উদ্দেশে অপেক্ষা করতে থাকে।

কিন্তু কায়েদে আজম রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে দেখে পার্শ্ববর্তী জনতা কোনো ধ্বনি দেয় না। ছাত্রদের অনেকের মধ্যে তাঁর এই সফরের বিষয়ে কিছুটা উৎসাহের অভাবও দেখা যায়। ভাষা আন্দোলনকালে পুলিশী অত্যাচারই তার প্রধান কারণ ছিলো।[১]

বিমান বন্দরের পথে এবং শহরের মধ্যে কায়েদে আজমের আগমন উপলক্ষ্যে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ এবং সিরাজউদ্দৌলা, মীরমদন, মোহনলাল প্রভৃতির নামে তোরণ প্রস্তুত করে সেগুলিকে নানাভাবে সুসজ্জিত করা হয়।[২] কিন্তু সেদিন বিকেলে দিকে বৃষ্টিপাতের ফলে সেগুলি অনেকাংশে নষ্ট হয়ে যায়। কায়েদে আজমের সম্মানে সন্ধ্যার পর শহরে বিস্তৃত আলোকসজ্জা এবং অধিক রাত্রি পর্যন্ত বাজি পোড়ানোর ব্যবস্থা হয়।[৩]

২১শে মার্চ ঢাকার নাগরিকেরা রেসকোর্সের ময়দানে কায়েদে আজমকে সমর্ধনা জ্ঞাপনের আয়োজন করেন। ৫-১৫ মিনিটে কায়েদে আজম উপস্থিত হওয়ার পর সম্বর্ধনা কমিটির সভাপতি নবাব হাবিবুল্লাহ একটি মানপত্র পাঠ করেন। এর পর কায়েদে আজমের বক্তৃতা শুরু হয়।[৪] প্রায় এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতার মধ্যে ভাষার প্রশ্ন এবং ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে [illegible] নানা বক্তব্য তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন।

ভাষা আন্দোলনের উদ্দেশ্য এবং আন্দোলনকারীদের চরিত্র সম্পর্কে শ্রোতৃমণ্ডলীকে সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন :

> কিন্তু আমি একথা আপনাদের বলতে চাই যে আমাদের মধ্যে নানা বিদেশী এজেন্সীর অর্থ সাহায্যপুষ্ট কিছু লোক আছে যারা আমাদের সংহতি বিনষ্ট করতে বদ্ধ-পরিকর। তাদের উদ্দেশ্য হলো পাকিস্তানকে ধ্বংস করা। আপনারা সাবধান হয়ে চলুন আমি তাই চাই; আমি চাই আপনারা সতর্ক থাকুন এবং আকর্ষণীয় শ্লোগান ও বুলির দ্বারা বিভ্রান্ত না হন। তারা বলছে যে পাকিস্তান ও পূর্ব বাঙলা সরকার সর্বতোভাবে আপনাদের ভাষাকে ধ্বংস করতে চায়। মানুষের পক্ষে এর থেকে বড় মিথ্যা ভাষণ আর কিছু হতে পারে না। সোজাসুজিভাবে আমি একথা আপনাদেরকে

বলতে চাই যে আপনাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক কমিউনিস্ট এবং বিদেশীদের সাহায্যপ্রাপ্ত এজেন্ট আছে এবং এদের সম্পর্কে সাবধান না হলে আপনারা বিপদগ্রস্থ হবেন। পূর্ব বাঙলাকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা তারা পরিত্যাগ করেনি এবং এখনো পর্যন্ত সেটাই তাদের লক্ষ্য।[৫]

পাকিস্তানে ভাষা-ভিত্তিক জাতীয়তার বিরোধিতা করতে গিয়ে তিনি বলেন :

পাকিস্তান এবং বিশেষ করে আপনাদের প্রদেশ এখনো পর্যন্ত যে সমস্ত বিপদের সম্মুখীন সে সম্পর্কে আবার আমি সুস্পষ্ট ভাষায় আপনাদের সাবধান করে দিতে চাই পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকে প্রতিহত করতে না পেরে, পরাজয়ের দ্বারা বাধাগ্রস্থ ও হতাশ হয়ে পাকিস্তানের শত্রুরা এখন পাকিস্তানী মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির দ্বারা রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার দিকে মনোযোগ দিয়েছে। প্রাদেশিকতার উস্কানী দানের মাধ্যমেই তাদের এই প্রচেষ্টাকে তারা অব্যাহত রেখেছে। যে পর্যন্ত না এই বিষকে আপনারা রাজনীতি থেকে বর্জন করছেন, সে পর্যন্ত আপনারা নিজেদেরকে একটা সত্যিকার জাতি হিসাবে গঠন করতে সক্ষম হবেন না। আমরা বাঙালী, পাঞ্জাবী সিন্ধী, বেলুচী, পাঠান ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না। ইউনিট হিসাবে সেগুলির অবশ্য একটা অস্তিত্ব আছে। কিন্তু আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি : চৌদ্দশো বছর পূর্বে আমাদেরকে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিলো আমরা কি তা ভুলে গেছি? আমার মতো আপনারা সকলেই এখানে বহিরাগত। বাংলা দেশের আদি অধিবাসী কারা? যারা এখন এদেশে বাস করছে তারা নয়। কাজেই 'আমরা বাঙালী বা সিন্ধী বা পাঠান বা পাঞ্জাবী' একথা বলার প্রয়োজন কি। না, আসলে আমরা সকলেই হলাম মুসলমান।[৬]

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন যে পূর্ব বাঙলার জনসাধারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত একথা অস্বীকার করে তিনি মন্তব্য করেন :

একথা আমি পূর্বেই বলেছি যে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ভাষার প্রশ্ন তোলা হয়েছে। আপনাদের প্রধানমন্ত্রীও একটি সদ্য প্রকাশিত বিবৃতিতে যথার্থভাবেই একথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর সরকার এদেশের শান্তি বিঘ্নিত করার জন্য রাজনৈতিক অন্তর্ঘাতক অথবা তাদের এজেন্টদের যে কোনো চেষ্টাকে কঠিনভাবে দমন করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় আমি খুশী হয়েছি। বাংলা এই প্রদেশের সরকারী ভাষা হবে কিনা সেটা এই

প্রদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই স্থির করবেন। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে যথাসময়ে এই প্রদেশের অধিবাসীদের ইচ্ছানুসারেই এই প্রশ্নের মীমাংসা হবে।[৬]

উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার যুক্তি দেওয়ার চেষ্টায় তিনি বলেন :

আমি সুস্পষ্ট ভাষায় আপনাদেরকে জানাতে চাই যে আপনাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিয়ে কোনো রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে এ কথার মধ্যে কোনো সত্যতা নেই। কিন্তু আপনারা, এই প্রদেশের অধিবাসীরাই, চূড়ান্তভাবে স্থির করবেন আপনাদের প্রদেশের ভাষা কি হবে। কিন্তু একথা আপনাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া দরকার যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোনো ভাষা নয়। এ ব্যাপারে যদি কেউ আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে তাহলে বুঝতে হবে সে হচ্ছে রাষ্ট্রের শত্রু। একটিমাত্র রাষ্ট্রভাষা ছাড়া কোনো জাতিই এক সূত্রে গ্রথিত হয়ে কার্যনির্বাহ করতে পারে না। অন্য দেশের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখুন। অতএব, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। কিন্তু আমি পূর্বেই বলেছি, এ প্রসঙ্গ পরে আসবে।[৮]

কায়েদে আজম জিন্নাহর উপরোক্ত বক্তব্যের অর্থ এই দাঁড়ায় যে পূর্ব বাংলার সরকারী ভাষা বাংলা হবে কিনা সে সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। বাংলা অথবা উর্দু যাই হোক সেটা তারা নিজেরাই স্থির করতে পারবে। কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা সম্পর্কে পূর্ব বাংলার মানুষকে কোনো স্বাধীনতা দেওয়া যেতে পারে না। শুধু তাই নয়, সে স্বাধীনতা যদি কেউ দাবী করে তাহলে সে নিশ্চিতভাবে রাষ্ট্রের শত্রু। কাজেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি বিচার করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার তিনি পূর্ব বাংলার, এমনকি সারা পাকিস্তানের জনসাধারণের উপর ছেড়ে না দিয়ে সে দায়িত্ব নিজেই ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করেছিলেন। এবং তাঁর সেই সিদ্ধান্তের কেউ বিরোধিতা করলে তাকে তিনি ধরে নিয়েছিলেন রাষ্ট্রদ্রোহীতা ও অন্তর্ঘাতী গৃহশত্রুতার শামিল বলে। এজন্যে উর্দু ভাষা সম্পর্কে উপরোক্ত বক্তব্যের পরই তিনি আবার ঘোষণা করেন :

আমি আবার আপনাদেরকে বলছি, রাষ্ট্রের দুষমনদের ফাঁদে পড়বেন না। দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনাদের মধ্যে ঘরোয়া শত্রুরা আছে এবং আমাকে দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে যে তারা বাইরের থেকে অর্থ সাহায্যপ্রাপ্ত মুসলমান। কিন্তু তারা একটা মস্ত ভুল করছে। আমরা ভবিষ্যতে অন্তর্ঘাতকদেরকে আর কিছুতেই সহ্য করবো না। আমরা আমাদের রাষ্ট্রে বিশ্বাসঘাতক

ঘরোয়া শত্রুদেরকে সহ্য করবো না। এসব যদি বন্ধ করা না হয় তাহলে আমি নিশ্চিত যে আপনাদের সরকার এবং পাকিস্তান সরকার এই বিষাক্ত শক্তিকে নির্দয়ভাবে দমন করার জন্য কঠিনতম ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।[৯]

এর পর পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতি সমর্থন করে বলেন যে মুসলীম লীগই শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও পাকিস্তান হাসিল করেছে কাজেই সকলেরই মুসলিম লীগে যোগদান করা উচিত। অন্য রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠাকে ধ্বংসাত্মক হিসাবে বর্ণনা করে মুসলীম লীগ বিরোধীদেরকে তিনি রাষ্ট্রের শত্রু হিসাবে চিত্রিত করেন। এই প্রসঙ্গে রেস কোর্সের বক্তৃতায় তিনি কতকগুলি শ্লোগান দেন :

মুসলিম লীগ আপনাদের হাতে একটি পবিত্র আমানতের মতো। এই পবিত্র আমানতকে আমাদের দেশের ও জনগণের কল্যাণের জিম্মাদার হিসাবে আমরা রক্ষা করবো, না রক্ষা করবো না? আমরা যা অর্জন করেছি তাকে ধ্বংস করা অথবা আমরা যা লাভ করেছি তা দখল করার উদ্দেশ্যে যাদের অতীত সন্দেহাতীত নয় এ জাতীয় লোকদের নেতৃত্বে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা রাজনৈতিক দল কি খাড়া করতে দেওয়া হবে? এই প্রশ্ন আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করছি। আপনারা কি পাকিস্তানে বিশ্বাস করেন? (হ্যাঁ, হ্যাঁ বলে চীৎকার) পাকিস্তান অর্জন করে কি আপনারা সুখী হয়েছেন? (হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলে চীৎকার) পূর্ব বাঙলা অথবা পাকিস্তানের অন্য কোনো অংশ ভারতীয় ইউনিয়নে চলে যাক এটা কি আপনারা চান? (না, না) আপনারা যদি পাকিস্তানের খেদমত করতে চান, যদি আপনারা পাকিস্তানকে গঠন করতে চান, যদি আপনারা পাকিস্তানের সংস্কার করতে চান তাহলে আমি বলবো যে প্রতিটি মুসলমানের সামনে একটিমাত্র সৎ পথই খোলা আছে—তা হলো মুসলিম লীগে যোগদান করে নিজের সাধ্যমতো পাকিস্তানের খেদমত করা। কোনো রকম বিদ্বেষ অথবা শুভেচ্ছার অভাবের জন্যে নয়, তাদের অতীত কার্যকলাপের জন্যেই ব্যাঙের ছাতার মতো যে পার্টিগুলি গজিয়ে উঠছে সেগুলিকে সন্দেহের চোখে দেখা হবে।[১০]

কায়েদে আজম জিন্নাহ খুব সম্ভবতঃ ঢাকা এবং যশোরের বাঙালী-অবাঙালী উত্তেজনা ও সংঘর্ষ এবং পার্লামেণ্টারী রাজনীতিকদের সুবিধাবাদীত্বের উল্লেখ করে তাঁর বক্তৃতার এক পর্যায়ে বলেন :

আমাকে জানানো হয়েছে যে এই প্রদেশের কোনো কোনো অংশে

অবাঙালী মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটা মনোভাব বর্তমান আছে। এই প্রদেশের এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে সে প্রশ্নকে কেন্দ্র করে কিছু উত্তেজনাও সৃষ্টি হয়েছে। এ সম্পর্কে আমি শুনেছি যে কিছুসংখ্যক রাজনৈতিক সুবিধাবাদীরা প্রশাসনকে বিব্রত করার উদ্দেশে ছাত্র সম্প্রদায়কে ব্যবহার করেছে।[১১]

কায়েদে আজমের বক্তৃতায় ভাষা সম্পর্কে তাঁর বিবিধ মন্তব্য এবং আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ঘন ঘন সতর্ক ও সাবধান বাণী উচ্চারণ করার সময় মাঝে মাঝে শ্রোতাদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিছু কিছু বিক্ষুব্ধ কথা বার্তা শোনা যায়।[১২] ময়দানের কোনো কোনো এলাকায় উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে একথা শোনার পর মৃদু 'না, না' ধ্বনিও উত্থিত হয়।[১৩] কিন্তু মোটামুটিভাবে সেই বিরাট জনসমুদ্র শান্তভাবেই কায়েদে আজমের বক্তৃতা শোনে।[১৪]

মুসলিম লীগ ও উর্দুর স্বপক্ষে মতামত ব্যক্ত করার ফলে ছাত্র সমাজ, এমনকি জনসাধারণেরও একাংশ কায়েদে আজমের বিরুদ্ধে কিছুটা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা আশা করেছিলো যে তিনি রাষ্ট্রপ্রধান এবং পাকিস্তানের অবিসংবাদী নেতা হিসাবে নাজিমুদ্দীন সরকারের আন্দোলনকালীন নির্যাতনমূলক কার্যকলাপকে সমর্থন করবেন না। কিন্তু কায়েদে আজম সে রকম কোনো নিরপেক্ষতা রক্ষা না করে সোজাসুজি আন্দোলনকারীদেরকে অন্তর্ঘাতক, রাষ্ট্রশত্রু, দেশদ্রোহী ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করে তাদের উপর অত্যাচারকে সমর্থন এবং ভবিষ্যতেও তাদেরকে কঠোরতম শাস্তি দানের কথা ঘোষণা করায় অনেকেই খোলাখুলিভাবে তাঁর সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয় কোনো কোনো স্থানে তাঁর সম্মানে নির্মিত গেট আংশিকভাবে ভেঙ্গে দিয়ে এবং তাঁর ছবি ছিঁড়ে তারা তাঁর বিবিধ মন্তব্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।[১৫]

প্রথম অবস্থায় মনে হয়েছিলো যে উর্দু সমর্থক ছাত্রেরা বিভিন্ন হলের মধ্যে কায়েদে আজমের বক্তৃতার সুযোগ নিয়ে হয়তো মারপিট ও গুণ্ডামী করতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে রকম কিছুই হয়নি। উপরন্তু বাংলা বিরোধী যে সমস্ত ছাত্রেরা পূর্বে অন্য ছাত্রদের বিছানা এবং অন্যান্য আসবাবপত্র পুড়িয়ে দিতো তাদের কয়েকজনের বিছানাপত্রই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাংলা সমর্থক ছাত্রেরা পুড়িয়ে ফেলে এবং তাদের কয়েকজনকে ধরে মারপিটও করে। এর কারণ কায়েদে আজমের বক্তৃতায় নাজিমুদ্দীন সরকারের সপক্ষে তাঁর বক্তব্য এবং উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দৃঢ় মনোভাব। রেস কোর্সের বক্তৃতার

পর ছাত্রদের মধ্যে কায়েদে আজমের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয় এবং তার ফলে বাংলার প্রতি সমর্থনও বৃদ্ধি পায়।[১৬]

৩ ॥ কায়েদে আজমের সমাবর্তন বক্তৃতা

২৪শে মার্চ সকালের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কায়েদে আজমের সম্মানে একটি বিশেষ সমাবর্তন উৎসবের আয়োজন করেন। আমন্ত্রণ গ্রহণ করার সময় বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য ডক্টর মাহমুদ হাসানকে কায়েদে আজম বলেন যে সময়ের অভাবে লিখিত বক্তৃতা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় কাজেই তিনি নিজের বক্তব্য ছাত্রদের সামনে মৌখিকভাবেই বলবেন।[১]

কার্জন হলে আয়োজিত এই সমাবেশ শৃঙ্খলা, কর্তব্য রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা বাস্তব অসুবিধা ইত্যাদির উল্লেখ করার পর কায়েদে আজম জিন্নাহ ভাষা আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে রাষ্ট্রশত্রুদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য আবার উপস্থিত করতে গিয়ে বলেন :

ইদানিং আপনাদের প্রদেশের উপর অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে আক্রমণ চালানো হচ্ছে। আমাদের শত্রুরা—দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে তাদের মধ্যে এখনো কিছু সংখ্যক মুসলমান আছে—পাকিস্তানকে দুর্বল করে এই প্রদেশকে পুনরায় ভারতীয় ডোমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে সক্রিয়ভাবে প্রাদেশিকতার উস্কানী দিতে নিযুক্ত হয়েছে। যারা এই খেলা শুরু করেছে তারা বোকার স্বর্গে বাস করছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও তারা তাদের চেষ্টা থেকে বিরত হবে না। এই রাষ্ট্রের মুসলমানদের সংহতিকে খর্ব করে জনগণকে আইন ভঙ্গ করতে প্ররোচিত করার জন্য প্রত্যহ মিথ্যা প্রচারণার বন্যা বইছে। আমি দুঃখের সাথে লক্ষ্য করেছি যে আপনাদের প্রধানমন্ত্রী পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার পরও আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ সাম্প্রতিক ভাষা বিতর্কের সাথে জড়িত হয়ে পড়েছেন। অন্যান্য উপায়ের মতো একটা প্রাদেশিকতার বিষয় এই প্রদেশের মধ্যে সযত্নে ঢুকিয়ে দেওয়ার একটা সূক্ষ্ম উপায়। এটা কি আপনাদের কাছে বিসদৃশ মনে হয় না যে ভারতীয় প্রেসের এক অংশ যাদের কাছে পাকিস্তানের নাম পর্যন্ত একটা অভিশাপের মতো, তারাই ভাষার বিতর্কের প্রশ্নে আপনাদের 'যথার্থ অধিকার' আদায়ের জন্য আজ উঠে পড়ে লেগে গেছে। এটা কি তাৎপর্যপূর্ণ নয় যে অতীতে যারা মুসলমানদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে অথবা আপনাদের আত্ম-

নিয়ন্ত্রণের মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে তারাই আজ আকস্মিকভাবে আপনাদের অধিকার রক্ষার নাম করে ভাষার প্রশ্নে আপনাদেরকে সরকারের বিরুদ্ধতা করার জন্যে উস্কানী দিচ্ছে। এই সব পঞ্চম বাহিনী সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি।[২]

এর ঠিক পরই রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে তিনি বলেন :

আমি রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে আমার বক্তব্য আবার বলছি। এই প্রদেশের সরকারী কাজের জন্য এই প্রদেশের লোকেরা নিজেদের ইচ্ছামতো যে কোনো ভাষা ব্যবহার করতে পারে। যথাসময়ে এবং এই প্রদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সুচিন্তিত মতামতের মাধ্যমে তাদের ইচ্ছানুসারেই এই প্রশ্নের মীমাংসা হবে। কিন্তু রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশের যোগাযোগের ভাষা হিসাবে একটি ভাষা থাকবে। এবং সে ভাষা হবে উর্দু, অন্য কোনো ভাষা নয়। কাজেই স্বাভাবিকভাবে রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু যা এই উপমহাদেশের লক্ষ লক্ষ মুসলমানের দ্বারা পুষ্ট হয়েছে, যা পাকিস্তানের এক থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সকলেই বোঝে এবং সর্বোপরি যার মধ্যে অন্য যে কোনো প্রাদেশিক ভাষার থেকে ইসলামী সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য বাস্তবরূপ লাভ করেছে এবং যে ভাষা অন্যান্য ইসলামী দেশগুলিতে ব্যবহৃত ভাষার সর্বাপেক্ষা কাছাকাছি।[৩]

কায়েদে আজমের বক্তৃতার এই পর্যায়ে অর্থাৎ 'উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে' এই ঘোষণামাত্র হলের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র 'না, না' বলে চীৎকার করতে থাকেন।[৪] কায়েদে আজম তাঁর সমাবর্তন বক্তৃতায় উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে একথা যে উল্লেখ করবেন সেটা ছাত্রেরা নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছিলেন। কাজেই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্যেও তাঁরা আগে থেকেই প্রস্তুত হয়েছিলেন। যাঁরা তাঁর বক্তব্যের বিরুদ্ধে চীৎকার করে প্রতিবাদ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আবদুল মতিন, এ. কে. এম. আহসান প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য।[৫]

প্রতিবাদের সময় কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ থাকার পর কায়েদে আজম তাঁর বক্তৃতা আবার শুরু করেন :

ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে উর্দুকে যে বিতাড়িত করা হয়েছে এমনকি উর্দু বর্ণমালার সরকারী ব্যবহারও যে সেখানে বন্ধ করা হয়েছে এটা সম্পূর্ণ তাৎপর্যহীন নয়। জনগণকে উত্তেজিত করার জন্য যারা ভাষার বিতর্ককে ব্যবহার করছে এসব ঘটনা তাদেরও অত্যন্ত ভালোভাবে জানা আছে।

আন্দোলনের কোনো যুক্তিই এক্ষেত্রে ছিলো না কিন্তু এটা স্বীকার করা তাদের মতলব হাসিলের পক্ষে সহায়ক হতো না। এই বিতর্ককে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য এই রাষ্ট্রের মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। বস্তুতঃ এ কাজের জন্য তারা খোলাখুলিভাবেই অবাঙালী মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের ঘৃণা উদ্রেকের যথেষ্ট চেষ্টা করছে। আপনাদের প্রধানমন্ত্রী করাচী থেকে ফিরে এসে ভাষা বিতর্কের উপর বিবৃতি মারফত এ প্রদেশের জনগণকে তাদের ইচ্ছানুসারে বাংলাকে সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহারের অধিকার দেওয়ার কথা বলার পর আন্দোলনের আর কোনো পথ খোলা নেই দেখে তারা তাদের কৌশল পরিবর্তন করলো। তারা এর পর বাংলাকে কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানালো এবং একটি মুসলিম রাষ্ট্রের সরকারী ভাষা হিসাবে উর্দুর স্বাভাবিক দাবী অনস্বীকার্য দেখে বাংলা এবং উর্দু দুই ভাষাকেই তারা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবী তুললো। এ সম্পর্কে কোনো ভুল করা চলবে না। এই রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশগুলি একত্রে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন একটিমাত্র রাষ্ট্রভাষা এবং আমার মতে একমাত্র উর্দুই হতে পারে সেই ভাষা।৬

রেস কোর্সের বক্তৃতা এবং এই একই সমাবর্তন বক্তৃতার প্রথম দিকেও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা কায়েদে আজম যেখানেই বলেছেন সেখানেই তিনি সেটাকে একটা ঘোষণার মতো প্রচার করেছেন। কিন্তু এই প্রথম তিনি উর্দুর উল্লেখ করতে গিয়ে অপেক্ষাকৃত মৃদু ভাষা প্রয়োগ করে বললেন, 'আমার মতে একমাত্র উর্দুই হতে পারে সেই ভাষা।' কায়েদে আজমের বক্তব্য এবং বাচনভঙ্গীর এই আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ সমাবর্তন সমাবেশে ছাত্রদের প্রতিবাদ। পুনর্বার প্রতিবাদের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কাতেই এই পরবর্তী পর্যায়ে তিনি উর্দুর দাবীকে নিজের ব্যক্তিগত অভিমত হিসাবে উপস্থিত করতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও রাষ্ট্রশত্রুদের উল্লেখ করে তিনি আবার বলেন:

রাষ্ট্রকে ধ্বংস এবং সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের দুষমন ও কিছুসংখ্যক সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদরা যে কৌশল গ্রহণ করেছে সে সম্পর্কে আপনাদেরকে সাবধান করার জন্যই আমি এ বিষয়ে এত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলাম। আপনাদের মধ্যে যারা জীবন শুরু করতে যাচ্ছেন তাদের এ জাতীয় লোকজন সম্পর্কে সাবধান থাকা প্রয়োজন।

যাদেরকে এখনো কিছুদিন পড়াশোনা করতে হবে তাদের উচিত কোনো রাজনৈতিক পার্টি অথবা স্বার্থপর রাজনীতিকের দ্বারা নিজেদের ব্যবহৃত না হতে দেওয়া।[৭]

এর পর ছাত্রদের উদ্দেশে আবার তিনি পর পর কতকগুলি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন :

প্রথমতঃ, আমাদের মধ্যে পঞ্চম বাহিনী সম্পর্কে সাবধান থাকুন। দ্বিতীয়তঃ, স্বার্থপর লোকদের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন কারণ তারা নিজেরা সাঁতার কাটার জন্য আপনাদেরকে ব্যবহার করতে ইচ্ছুক। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রের সত্যিকার নিঃস্বার্থ ও একনিষ্ঠ খাদেম, যারা সর্বতোভাবে জনগণকে সমর্থন করে এবং তাদের সেবা করতে ইচ্ছুক তাদেরকে চিনতে শেখা দরকার। চতুর্থতঃ, মুসলিম লীগ পার্টিকে শক্তিশালী করুন কারণ তা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত থেকে এক মহৎ ও গৌরবময় পাকিস্তান গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। পঞ্চমতঃ, মুসলিম লীগ পাকিস্তান অর্জন ও প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সেই পবিত্র আমানতের হেফাজতকারী হিসাবে পাকিস্তানকে গড়ে তোলা মুসলিম লীগেরই কর্তব্য। ষষ্ঠতঃ, আমাদের সংগ্রামের সময় যারা অনেকে নিজেদের কড়ে আঙুলটি পর্যন্ত নাড়েনি, এমনকি নানাভাবে আমাদের বিরুদ্ধতা করেছে এবং পদে পদে সবরকম বাধা বিপত্তি সৃষ্টি করেছে এবং যাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের শত্রু শিবিরে আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করেছে তারা এখন এগিয়ে এসে নানা আকর্ষণীয় শ্লোগান ও বুলি আওড়াতে পারে এবং আপনাদের সামনে নানাপ্রকার আদর্শ ও কর্মসূচী হাজির করতে পারে। কিন্তু তাদেরকে এখনো নিজেদের আন্তরিকতার প্রমাণ দিতে হবে এবং মনের মধ্যে কোনো সত্যিকার পরিবর্তন এসেছে কিনা সেটা প্রমাণ করার জন্য ব্যাঙের ছাতার মতো নোতুন নোতুন পার্টি গঠন না করে মুসলিম লীগকে সমর্থন এবং তাতে যোগদান করতে হবে।[৮]

৪ ॥ রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সাথে সাক্ষাৎকার

২৪শে মার্চ সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে কায়েদে আজম রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের একটি প্রতিনিধিদলকে সাক্ষাৎ দান করেন। এই সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয় চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদের বাসভবনে।[১] কায়েদে আজম তাঁর ঢাকা সফর-কালে সেখানেই অবস্থান করছিলেন। সেই বাড়িটি ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের

পর পূর্ব বাঙলার প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবন এবং আইয়ুব খানের শাসনকালে বহু সংস্কার ও সম্প্রসারণের পর প্রেসিডেন্টের সরকারী বাসভবনে পরিণত হয়।

এই সাক্ষাতের সময় কর্ম পরিষদের সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শামসুল হক, কমরুদ্দীন আহমদ, আবুল কাসেম, তাজউদ্দিন আহমদ, মহম্মদ তোয়াহা, আজিজ আহমদ, অলী আহাদ, নঈমুদ্দীন আহমদ, শামসুল আলম এবং নজরুল ইসলাম।[২]

আলোচনার প্রথমেই কায়েদে আজম রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সদস্যদেরকে বলেন যে নাজিমুদ্দীনের সাথে তাঁদের যে চুক্তি হয়েছে সেটাকে তিনি স্বীকার করেন না কারণ নাজিমুদ্দীনের থেকে জোরপূর্বক সেই চুক্তিতে সই আদায় করা হয়েছে। এর প্রমাণ হিসাবে তিনি বলেন যে আট দফা চুক্তির মধ্যে প্রত্যেকটি দফাতেই নাজিমুদ্দীনকে কি করতে হবে তাই বলা হয়েছে কিন্তু অন্য পক্ষের কর্তব্য সম্পর্কে কোনোই উল্লেখ নেই। চুক্তি কখনো একতরফা হয় না, সর্বতোভাবে তা একটা দ্বিপাক্ষিক ব্যাপার। কিন্তু আটদফা চুক্তি স্পষ্ট প্রমাণ করে যে তা এক পক্ষের সুবিধার জন্যে করা হয়েছে এবং চুক্তিতে স্বাক্ষর জোর-পূর্বকই আদায় করা কয়েছে। এবং সেই অনুসারে চুক্তিটি সম্পূর্ণভাবে অবৈধ এবং অগ্রাহ্য।[৩]

কর্ম পরিষদের সদস্যেরা সহৃদয়তাপূর্ণ মনোভাব নিয়েই কায়েদে আজমের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু গোড়াতেই তাঁর এই আক্রমণাত্মক কথায় তাঁদের মনে সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ফলে ঘরের আবহাওয়া সম্পূর্ণভাবে পাল্টে গেলো।[৪] এবং ভাষার প্রশ্ন নিয়ে সাধারণভাবে কায়েদে আজমের সাথে তাঁদের তর্কাতর্কি শুরু হয়ে পরিশেষে তা ঘোরতর ঝগড়ায় পরিণত হলো।[৫] প্রথমেই মহম্মদ তোয়াহা তাঁকে সরাসরি বলেন যে তাঁরা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চান। এর উত্তরে কায়েদে আজম বলেন যে তিনি তাঁদের কাছে রাজনীতি শিক্ষা করতে আসেননি।[৬]

কায়েদে আজমের প্রধান বক্তব্য ছিলো এই যে পাকিস্তানে একাধিক রাষ্ট্র-ভাষা হলে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিপন্ন হবে। তাছাড়া একাধিক রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নটিকে তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন বলেও বর্ণনা করেন।[৭] সেই পর্যায়ে মহম্মদ তোয়াহা তাঁকে বলেন যে কানাডা, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রভাষা আছে কাজেই প্রশ্নটি মোটেই নজিরবিহীন নয়। কায়েদে আজম কিন্তু ঐ সমস্ত দেশে একাধিক রাষ্ট্রভাষার কথা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেন।[৮] এতে তোয়াহা তাঁকে বলেন যে একাধিক রাষ্ট্রভাষার কথা

একটি ঐতিহাসিক সত্য কাজেই সেই সত্যকে তিনি কিভাবে অস্বীকার করতে পারেন। এর উত্তরে কায়েদে আজম উষ্মার সাথে বলেন যে তিনি ইতিহাস পাঠ করেছেন, তিনি এসব কথা জানেন।[৯] তার এই জবাব শুনে অলী আহাদ বলেন যে তিনিও ইতিহাস পড়েছেন এবং তিনি জানেন যে কায়েদে আজম ইতিহাসকে বিকৃত করছেন মাত্র। শুধু তাই নয়। এর পর অলী আহাদ কায়েদে আজমকে ব্যঙ্গ করে বলেন যে তিনি শুধু ইতিহাসই জানেন তা নয়, তিনি বস্তুতঃপক্ষে একথাও জানেন যে কায়েদে আজম পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল এবং ইংলণ্ডের রানীর কাছে তাঁর অপসারণের জন্যে তাঁরা আবেদন জানাতে পারেন।[১০]

অলি আহাদের উপরোক্ত কথায় কায়েদে আজম রীতিমতো ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং অলি আহাদ ও সংগ্রাম পরিষদের অন্যান্য সদস্যদেরকে উচ্চকণ্ঠে বকাবকি করতে থাকেন। এর ফলে ঘরের মধ্যে একটা দারুন হৈ চৈ পড়ে যায়।[১১] এই পর্যায়ে কায়েদে আজমের মিলিটারী সেক্রেটারী গণ্ডগোল আশঙ্কা করে কাছাকাছি জায়গা থেকে তাড়াতাড়ি এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন। কিন্তু পরে অবস্থা আশঙ্কাজনক কিছু নয় বুঝে তিনি আবার ভেতরের দিকে চলে যান।[১২] এই তর্কাতর্কির মধ্যে একবার ফতেমা জিন্নাহ চায়ের তদারক করার জন্যে ঘরের মধ্যে অল্পক্ষণের জন্যে আসেন।[১৩]

ইসলাম, রাষ্ট্রভাষা, শৃঙ্খলা ইত্যাদি সম্পর্কে নানা অপ্রীতিকর আলোচনার মধ্যে দিয়ে মগরেবের নামাজের সময় হয়ে এলো। শামসুল হক তখন কায়েদে আজমকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'এবার নামাজের সময় হয়েছে কাজেই কিছু-ক্ষণের জন্যে আলোচনা স্থগিত রাখা হোক'। শামসুল হকের এই কথায় কায়েদে আজম ভয়ানক বিরক্ত হয়ে ওঠেন। কারণ তিনি মনে করলেন যে তিনি নামাজ পড়েন না এটা জেনেই ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁকে বিব্রত এবং অপদস্থ করার জন্যেই নামাজের প্রস্তাব করা হয়েছে।[১৪] আসলে কিন্তু শামসুল হক সে সময় নিয়মিত নামাজ পড়তেন এবং সেই নিয়ম রক্ষার জন্যেই তিনি নামাজ পড়ার প্রস্তাব করেছিলেন। কায়েদে আজম এই প্রস্তাবে বাহ্যতঃ বিরক্তি বোধ করলেও তার বিরুদ্ধে কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত ছিলেন এবং নামাজের বিরতি দেওয়ার প্রশ্নটি সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন;[১৫] কিন্তু তাঁর এই এড়িয়ে যাওয়ার মনোভাব লক্ষ্য করে শামসুল হক দ্বিগুণ উৎসাহে নামাজের বিরতির কথা বার বার বলায় ঘরের মধ্যে এক দারুণ অপ্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব হয়।[১৬]

নানা উত্তেজনা সত্ত্বেও কায়েদে আজম এবং রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদের সদস্যদের মধ্যে বিতর্ক ৭-১৫ মিনিট পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।[১৭] শামসুল হকের নামাজ পড়ার প্রস্তাবের ফলে আলোচনার মধ্যে অন্ত জাতীয় জটিলতার সৃষ্টি না হলে তা হয়তো আরো কিছুক্ষণ স্থায়ী হতো।

এই সাক্ষাৎকারের সময় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের পক্ষ থেকে কায়েদে আজমের কাছে নিম্নলিখিত স্মারকলিপিটি পেশ করা হয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের একমাত্র মুসলমান যুবকদের লইয়া গঠিত এই কর্মপরিষদ্ মনে করেন যে, বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। কারণ প্রথমতঃ তাঁহারা মনে করেন যে, উহা পাকিস্তানের সমগ্র জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের ভাষা এবং পাকিস্তান জনগণের রাষ্ট্র হওয়ায় অধিকাংশ লোকের দাবী মানিয়া লওয়া উচিত।

দ্বিতীয়তঃ আধুনিক যুগে কোনো কোনো রাষ্ট্রে একাধিক ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নোক্ত কয়েকটি দেশের নাম করা যায়: বেলজিয়াম (ফ্লেমিং ও ফরাসী ভাষা), কানাডা (ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা), সুইজারল্যাণ্ড (ফরাসী, জার্মান ও ইতালীয় ভাষা), দক্ষিণ আফ্রিকা (ইংরেজী ও আফ্রিকানার ভাষা), মিসর (ফরাসী ও আরবী ভাষা)। এতদ্ব্যতীত সোভিয়েট রাশিয়া ১৭টি ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে।

তৃতীয়তঃ, এই ডোমিনিয়নের সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে একমাত্র বাংলা ভাষাই রাষ্ট্রভাষাই স্থান অধিকার করার পক্ষে উপযুক্ত। কারণ সম্পদের দিক বিবেচনায় এই ভাষাকে পৃথিবীর মধ্যে সপ্তম স্থান দেওয়া হয়েছে।

চতুর্থতঃ, আলাওয়াল, নজরুল ইসলাম, কায়কোবাদ, সৈয়দ এমদাদ আলী, ওয়াজেদ আলী, জসিমউদ্দিন ও আরো অনেক মুসলমান কবি ও সাহিত্যিক তাঁহাদের রচনাসম্ভার দ্বারা এই ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন।

পঞ্চমতঃ, বাংলার সুলতান হুসেন শাহ, সংস্কৃত ভাষার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও এই ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছিলেন এবং এই ভাষার শব্দ সম্পদের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ পারসিক ও আরবী ভাষা হইতে গৃহীত।

উপসংহারে আমরা বলিতে চাই যে, যে কোনো পূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশে প্রত্যেক নাগরিকের কয়েকটি মৌলিক অধিকার আছে। কাজেই যে পর্যন্ত না আমাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয় সে পর্যন্ত বাংলা ভাষার জন্য এই আন্দোলন চালাইয়া যাওয়া হইবে।[১৮]

কায়েদে আজমের কাছে প্রদত্ত এই স্মারকলিপিটিতে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার দাবী উপস্থিত করা হলেও তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রভাব সহজেই লক্ষণীয়। বাংলা ভাষার স্বীকৃতির সপক্ষে যুক্তিস্বরূপ তাঁরা কেবল কেবলমাত্র কয়েকজন মুসলমান কবি সাহিত্যিকের রচনার উল্লেখ করেছেন। তাঁরা আরও বলছেন যে মুসলমান সুলতান হুসেন শাহ বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এবং বাংলা ভাষার মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ শব্দই আরবী ফারসী। শতকরা ৫০ ভাগ না হলেও বাংলা ভাষাতে আরবী ফারসী শব্দ প্রচুর আছে, মুসলমান কবি সাহিত্যিকদের রচনায় বাংলা ভাষা যথেষ্ট সমৃদ্ধ এবং সুলতান হুসেন শাহ বাংলা ভাষার উন্নতির প্রাথমিক পর্যায়ে তার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, এ সবই সত্য। কিন্তু তবু বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার যৌক্তিকতা হিসাবে অন্যান্য বিবেচনার উপর গুরুত্ব না দিয়ে এগুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া এবং রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ্ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের 'একমাত্র মুসলমান যুবকদের দ্বারা গঠিত' এই কথার মাধ্যমে কর্মপরিষদের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বে যে সব ছাত্র এবং অছাত্র প্রতিষ্ঠানের নেতারা ছিলেন তাঁরা মাত্র কয়েকমাস পূর্বেও মুসলিম লীগ রাজনীতির সাথে ছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই তাঁরা সর্বপ্রথম একটি সত্যকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। ভাষা আন্দোলন মূলতঃ একটি অসাম্প্রদায়িক আন্দোলন হলেও রাতারাতি কর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হয়নি এবং সেটা সম্ভবও ছিলো না। সমস্যাটিকে সেইভাবে দেখা খুবই স্বাভাবিক। উপরন্তু কর্ম-পরিষদের মধ্যে আবুল কাসেমের মতো কয়েকজন প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন যাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিলো পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক। এই কারণে স্মারকলিপিটি সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবমুক্ত হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ আরবী ফারসী শব্দ, মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনা এবং হুসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতার উল্লেখ সরকার এবং প্রতিক্রিয়াশীল মহলের বাংলা বিরোধী প্রচারণাকে খণ্ডন করার জন্যেও কিছুটা প্রয়োজন হয়েছিলো। বাংলা ভাষার সাথে ইসলামের যে কোনো সম্পর্ক নেই, বস্তুতঃ সে ভাষা যে ইসলামী সংস্কৃতিবিরোধী এই প্রচারণায় বাংলা ভাষা বিরোধীরা অত্যন্ত মুখর হয়েছিলো। এর ফলেই হয়তো বাংলা ভাষার সাথে মুসলমানদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা স্মারকলিপিটিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়।

কর্মপরিষদ্ 'কেবলমাত্র মুসলমান' যুবকদের দ্বারা গঠিত এ বক্তব্যের চরিত্র

সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িক হলেও অন্যান্য যুক্তিগুলি সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষে অন্যান্য বহু যুক্তি ছিল যেগুলি গণতান্ত্রিক কর্মী ও নেতারা কায়েদে আজমের সামনে সরাসরি উপস্থিত করতে পারতেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সেটা করা থেকে বিরত থাকেন। এর ফলে তাঁরা সাম্প্রদায়িক যুক্তিকে সাম্প্রদায়িক যুক্তির দ্বারাই মোটামুটিভাবে খণ্ডন করার চেষ্টা করেন। তত্ত্বগতভাবে অন্য কোনো সুষ্ঠু বক্তব্য তাঁরা এই স্মারক-লিপিটির মধ্যে উপস্থিত করতে সক্ষম হননি।

৫ ॥ ছাত্র প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা

ঢাকা অবস্থানকালে প্রতিনিধিস্থানীয় ছাত্রদের সাথে সাক্ষাতের জন্যে কায়েদে আজম ইচ্ছে প্রকাশ করেন। সেই অনুসারে বিভিন্ন ছাত্রাবাসের প্রভোস্টদের মাধ্যমে ছাত্রাবাসগুলির সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদেরকে এই সাক্ষাৎকারের কথা বলা হয়। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়নের সহ-সভাপতিও এই সাক্ষাৎকারের জন্যে আমন্ত্রিত হন।[১] ২০শে মার্চ কায়েদে আজমের সাথে এই ছাত্রপ্রতিনিধিদলটি চীফ সেক্রেটারীর বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন।[২]

প্রত্যেকের সাথে পৃথকভাবে পরিচিত হওয়ার পর কায়েদে আজম সকলকে জিজ্ঞেস করেন সেই অবস্থায় তিনি ছাত্রদের জন্য কি করতে পারেন। মহম্মদ তোয়াহা এর জবাবে তাঁকে বলেন যে ইচ্ছে করলে তিনি একটি ছাত্র সমাবেশে বক্তৃতা দিতে পারেন। কায়েদে আজম বলেন এ বিষয়ে তিনি চিন্তা করে দেখবেন।[৩]

পনেরো-বিশ মিনিটকাল স্থায়ী এই সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে কোনো আলোচনা কোনো পক্ষ থেকেই উত্থান করা হয়নি। কায়েদে আজম ব্যক্তিগত-ভাবে প্রত্যেকের কুশল জিজ্ঞাসা করেন এবং অত্যন্ত মামুলী কিছু কথাবার্তার পর তিনি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ান।[৪] এই সময় মহম্মদ তোয়াহা তাঁর হাতে ইংরেজীতে লিখিত একটি স্মারকলিপি দিয়ে বলেন, 'ভাষা সমস্যার উপর এটি একটি স্মারকলিপি। আপনি এটি পড়ে দেখবেন।' কায়েদে আজম স্মারক-লিপিটি হাতে নিয়ে পাশের টেবিলে রেখে দেন কিন্তু সে বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেন না।[৪] এই স্মারকলিপিটিই রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের পক্ষ থেকে আবার তাঁর হাতে ২৪শে মার্চ তারিখে দেওয়া হয়।[৫]

ঘর ছেড়ে সকলে কিছুটা বাইরে আসার পর কায়েদে আজমের মিলিটারী সেক্রেটারী হঠাৎ দৌড়ে এসে মহম্মদ তোয়াহাকে বলেন যে অন্য সকলে চলে যাক কিন্তু তোয়াহা এবং নজরুল ইসলাম যেন তৎক্ষণাৎ কায়েদে আজমের সাথে আর একবার দেখা করেন। মিলিটারী সেক্রেটারীর এই কথা শুনে তাঁরা দুজনে ভেতরে গিয়ে দাঁড়াতে কায়েদে আজম তাঁদেরকে বললেন যে সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে একটা ভুল হয়ে গেছে। তিনি শুধু মুসলমান ছাত্রদের সাথে দেখা করতে চেয়েছিলেন, হিন্দু ছাত্রদের সাথে নয়।[৭]

প্রত্যেক ছাত্রাবাসের সহ-সভাপতি এবং সম্পাদককে কায়েদে আজমের সাথে সাক্ষাতের জন্যে আমন্ত্রণ করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ ছাত্রাবাসের দুইজন হিন্দু ছাত্র প্রতিনিধিও সেদিন অন্য ছাত্রদের সাথে গিয়েছিলেন। ছাত্রদের সাথে কায়েদে আজম যে সব বিষয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন সেগুলি তিনি হিন্দু ছাত্রদের সামনে আলোচনার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না এবং তার জন্যে সাক্ষাৎকারের সময় বিশেষ কোনো আলোচনা না করে অল্পক্ষণ পরেই সাক্ষাৎকার তিনি শেষ করে দেন।[৮]

মহম্মদ তোয়াহা কায়েদে আজমের কথা শুনে তাঁকে বলেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা বিভিন্ন ছাত্রাবাসে থাকে এবং বার্ষিক নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে। সেই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে হিন্দু ছাত্রদের জগন্নাথ ছাত্রাবাসের প্রতিনিধিরাও ছিলেন।[৯]

কায়েদে আজম তখন তোয়াহাকে বলেন যে সেই জাতীয় কোনো ছাত্র প্রতিনিধিদের সাথে তিনি আলোচনা করতে চাননি। তিনি চান মুসলিম ছাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের সাথে ছাত্র রাজনীতি বিষয়ে কিছু আলাপ আলোচনা করতে।[১০] তোয়াহা তখন তাঁকে বলেন যে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ সেই জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং তাদের প্রতিনিধিদের সাথে তিনি আলাপ করতে পারেন। এই কথায় কায়েদে আজম বলেন যে তাদের সাথেই আলোচনা করা দরকার। তোয়াহা তাঁকে জানান যে মুসলিম ছাত্র লীগ প্রকৃতপক্ষে দুইভাগে বিভক্ত। কায়েদে আজম তখন তোয়াহা এবং নজরুল ইসলামের ঠিকানা লিখে রাখেন এবং বলেন যে দুই অংশের ছাত্র সংগঠনের সাথেই তিনি সাক্ষাৎ করবেন।[১১]

শাহ আজিজুর রহমানরা সেই সময় নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ নামে একটি স্বতন্ত্র ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠন করেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটি মোটামুটিভাবে কলকাতা থেকে আগত বঙ্গীয় মুসলিম ছাত্র লীগের নাজিমুদ্দীন

সমর্থক উপদলীয় নেতৃত্বের আওতাভুক্ত ছিলো। সেই হিসাবে ঢাকার ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে তার বিশেষ কোনো প্রভাব ছিলো না। কিন্তু সে প্রভাব না থাকলেও পার্লামেন্টারী রাজনীতির সাথে তাদের যথেষ্ট যোগাযোগ ছিলো।

কায়েদে আজম এই ছাত্র প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাথে ২২শে মার্চ সাক্ষাৎ করেন। এই দলটিতে তখন শাহ আজিজুর রহমান ব্যতীত দেলাওয়ার হোসেন, লুৎফার রহমান, সুলতান হোসেন খান, আবদুল মালেক এবং মাজহারুল কুদ্দুসও উপস্থিত ছিলেন। কায়েদে আজম তাঁদের সাথে ছাত্র ঐক্য এবং অন্যান্য বিষয়ে আলাপ করেন এবং পুনরায় তাঁদের সাথে দেখা করবেন একথা জানান।[১২]

এর পর কায়েদে আজমের মিলিটারী সেক্রেটারী মহম্মদ তোয়াহাকে চিঠি দিয়ে জানান যে তিনি তাঁদের সাথে ২৩শে মার্চ সাক্ষাৎ করতে চান। চিঠিতে তোয়াহাকে অনুরোধ করা হয় তিনি যেন অন্য আর একজন ছাত্র প্রতিনিধিকে তাঁর সাথে নিয়ে আসেন।[১৩] সেই কথামতো তোয়াহা আলোচনার জন্যে মিলিটারী সেক্রেটারীর কাছে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের আহ্বায়ক নঈমুদ্দীন আহমদের নাম পাঠান।[১৪] শাহ আজিজুর রহমানও মহম্মদ তোয়াহার মতো মিলিটারী সেক্রেটারীর চিঠি পান এবং তাঁর দলভুক্ত মাজহারুল কুদ্দুসের নাম দেন।[১৫]

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ এবং নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের প্রতিনিধিদের সাথে কায়েদে আজমের এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ২৩শে মার্চ।[১৬]

এই আলোচনাকালে কায়েদে আজম ছাত্রদেরকে বলেন তার সারমর্ম এই যে তিনি মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে বিভেদের পরিবর্তে একতা চান। তিনি বলেন যে আল্লাহ যদি পাকিস্তানকে রক্ষা না করতেন তাহলে পাকিস্তানের জন্ম দিবসেই তার সমগ্র কাঠামো ভেঙে পড়তো। পাকিস্তান একটি শিশু রাষ্ট্র কাজেই তাকে রক্ষা করতে হলে আভ্যন্তরীণ ঐক্য সব থেকে বড়ো প্রয়োজন। রাষ্ট্র গঠন করার জন্য ছাত্রদেরকে সব রকম আন্দোলন ও সংগঠনের সামনে থাকতে হবে এবং সে কাজ তাদেরকে করতে হবে ঐক্যবদ্ধভাবে। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে প্রয়োজন দুই ছাত্রপ্রতিষ্ঠানকে ভেঙে একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমস্ত মুসলমান ছাত্রের একতাবদ্ধ হওয়া।[১৭]

কায়েদে আজমের উপরোক্ত বক্তব্য শোনার পর তোয়াহা এবং নঈমুদ্দীন তাঁকে বলেন যে ছাত্র ঐক্য তাঁরাও চান কিন্তু যে কোন ঐক্য প্রচেষ্টার পূর্বে

দেখা দরকার আগে যে সাংগঠনিক ঐক্য ছিলো তাতে ভাঙন ধরলো কি কারণে। সেটা জানলে দুটি ছাত্র প্রতিষ্ঠান কিভাবে সম্ভব হলো তাও পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাবে। এর জবাবে কায়েদে আজম তাঁদেরকে বলেন, ঠিক আছে তোমরা চিন্তা করো। আমি পরে আবার তোমাদের সাথে দেখা করবো।'[১৮]

এর পর ছাত্র প্রতিনিধিদেরকে কায়েদে আজম আলোচনার জন্যে আবার ডেকে পাঠান। এই সাক্ষাৎকার ঘটে ২৪শে মার্চ বিকেল ৫-৩০ মিনিট থেকে শুরু করে প্রায় এক ঘণ্টা।[১৯] ঐদিন শাহ আজিজের সাথে ছিলেন মাজহারুল কুদ্দুস কিন্তু মহম্মদ তোয়াহার সাথে নঈমুদ্দীনের পরিবর্তে ছিলেন বরিশালের আবদুর রহমান চৌধুরী। পূর্বে যে প্রবেশ পত্র দেওয়া হয়েছিলো তাতে তোয়াহা এবং নঈমুদ্দীনের নাম লেখা ছিলো। নঈমুদ্দীনের পরিবর্তে আবদুর রহমান চৌধুরী যে তোয়াহার সাথে যাবেন একথা পূর্বে তাঁদেরকে জানানো হয়নি। কাজেই আবদুর রহমান চৌধুরীর প্রবেশপত্রের জন্য কিছুক্ষণ বিলম্ব হয়।[২০]

এইবার কায়েদে আজম প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দুই দলের সাথে আলাপ করলেন। এবং পরে দুই দলকই একত্রিত করে নিয়ে বসলেন।[২১] তোয়াহা এবং আবদুর রহমান আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁকে বললেন যে নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের সংগঠন হিসাবে বিশেষ কোনো অস্তিত্বই নেই। এর নেতারা সকলেই বিভিন্ন অফিসে চাকরি করে। তাদের দলভুক্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম ছাত্র লীগের শেষ সভাপতি শামসুল হুদা চৌধুরী নিজে এখন রেডিও পাকিস্তানের কর্মচারী। অন্যদেরও সেই অবস্থা কাজেই ঐ সংগঠনের সত্যিকার কোনো অস্তিত্ব নেই। তোয়াহাদের এই যুক্তিকে খণ্ডন করার জন্য শাহ আজিজুর রহমানও তাঁদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করেন।[২২]

এই সমস্ত আলোচনার মধ্যে কায়েদে আজম এক পর্যায়ে বলে ওঠেন, নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ সংগঠন হিসাবে মৃত। তোমরা সকলে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগে যোগদান করে একত্রে একটা সংগঠন গড়ে তোলো। এরপর এই নোতুন সংগঠনকে আশীর্ব্বাদ জানিয়ে তিনি একটা বাণীও দেন। তাতে তিনি বলেন যে এই সংকটময় মুহূর্তে ঐক্যের প্রয়োজনই সব থেকে বেশী। এ ছাড়া তিনি উপস্থিত চারজন নেতাকে দিয়ে একটি ছোট ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নেন। তাতে বলা হয় যে তাঁরা সকলে মিলিতভাবে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের মধ্যে কাজ করে যাবেন।[২৩]

ছোট ঘোষণাটি স্বাক্ষরিত হয়ে গেলেও কায়েদে আজম নিজের বাণী সংবাদ পত্রের মাধ্যমে প্রচার করতে নিষেধ করেছিলেন। চূড়ান্তভাবে সমস্ত কিছু ঠিকঠাক করার পরই তিনি সেটাকে সংবাদপত্রে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন।[২৪]

কাগজটিতে স্বাক্ষর দেওয়ার পরও শাহ্ আজিজুর রহমান কায়েদে আজমকে বার বার বলতে থাকেন যে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের নেতা এবং কর্মীরা যদি কায়েদে আজমকে বিশ্রী ভাষায় গালাগালি করা বন্ধ রাখেন তাহলে সকলের সাথে মিলিতভাবে কাজ করে যেতে তাঁদের কোনো আপত্তি নেই। শাহ আজিজের এই বক্তব্যকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে অভিহিত করে তোয়াহা বলেন, 'আমাদের কায়েদে আজমকে কেউই বিশ্রী ভাষায় গালাগালি করছে না'। এইসব তর্কাতর্কির মুখে কায়েদে আজম ছাত্রদেরকে বলেন, 'তোমাদের কায়েদে আজমকে কেউ গালাগালি দিলে তিনি কিছুই মনে করবেন না।'[২৫]

ছাত্রদের সাথে কায়েদে আজমের ২৪শে তারিখের সাক্ষাৎকার এখানেই শেষ হয়। এর ঠিক পরেই তিনি রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের প্রতিনিধিদেরকে সাক্ষাৎ দান করেন।

কায়েদে আজম ২৫শে মার্চ চট্টগ্রাম যান এবং ২৭ তারিখে সেখান থেকে ঢাকা ফিরে আসেন। সেদিনই তিনি ছাত্রদেরকে বৈঠকের জন্যে আবার ডেকে পাঠান। শাহ আজিজুর রহমান, মাজহারুল কুদ্দুস, মহম্মদ তোয়াহা এবং আবদুর রহমান চৌধুরী এই চারজনই চীফ সেক্রেটারীর বাসভবনে নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হন।[২৬]

শাহ আজিজুর রহমান সেদিন তাঁর সাথে দৈনিক আজাদ এবং অন্যান্য পত্রিকার অনেকগুলি কপি নিয়ে গিয়েছিলেন।[২৭] শাহ আজিজ বলেন যে তাঁরা আজাদের যে কপিগুলি নিয়ে গিয়েছিলেন সেগুলিতে তাঁদের কার্যকলাপ সম্পর্কিত অনেক রিপোর্ট ছাপা হয়েছিলো এবং সেগুলি তাঁরা কায়েদে আজমকে দেখাতে চেয়েছিলেন।[২৮] তোয়াহা এবং আবদুর রহমান চৌধুরী কিন্তু বলেন যে আজাদের কপিগুলি শাহ আজিজেরা নিজেদের কার্যকলাপের রিপোর্ট দাখিল করার জন্যে নিয়ে যায়নি। তাঁরা সেগুলি নিয়ে গিয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ এবং তার নেতৃস্থানীয় কর্মীদের কমিউনিস্ট প্রমাণ করার জন্যে।[২৯]

কিছুদিন পূর্বেই ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে কলকাতাতে যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে একটি প্রতিনিধিদল যায়। তাতে তোয়াহারই নেতৃত্ব করার কথা ছিলো কিন্তু বিশেষ অসুবিধার জন্যে শেষ পর্যন্ত তাঁর পক্ষে সম্মেলনে যোগদান সম্ভব হয়নি।[৩০] তাঁর পরিবর্তে

আবদুর রহমান চৌধুরী দলটির নেতৃত্ব করেন।[৩১] শাহ আজিজেরা সম্মেলনে যোগদান করলেও তাদেরকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসাবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। সে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিলো আবদুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন গ্রুপটিকে।[৩২] সেই হিসাবে কলকাতার কাগজগুলিতে তাঁদের সম্পর্কে রিপোর্ট এবং তাঁদের ছবি ছাপা হয়েছিলো। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসও ঐ একই সময়ে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় এবং তার সাথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যুব সম্মেলনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। এজন্যে সাধারণভাবে সেই সম্মেলনকে এবং বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিদলকে আক্রমণ করে আজাদে অনেক কিছু ছাপা হয়। শাহ আজিজেরা কায়েদে আজমকে এই সমস্ত রিপোর্ট এবং ছবি দেখিয়ে তাঁর কাছে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ এবং তার নেতৃস্থানীয় কর্মীদেরকে কমিউনিস্ট এবং তাদের সাথে আঁতাতকারী বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত বিফল হয়নি।[৩৩]

২৭শে মার্চের এই সাক্ষাৎকারের সময় কায়েদে আজম প্রথমে শাহ আজিজুর রহমান এবং মাজহারুল কুদ্দুসকে আলোচনার জন্যে ভেতরে ডেকে নিয়ে যান। শাহ আজিজরা তাঁদের কাগজপত্রের বাণ্ডিলসহ কায়েদে আজমের সাথে বেশ কিছুক্ষণ অবস্থান ও আলোচনা করেন।[৩৪]

শাহ আজিজেরা কায়েদে আজমের সাথে আলাপ শেষ করে বাইরে আসার পর মহম্মদ তোয়াহা এবং আবদুর রহমান চৌধুরীকে ভেতরে ডাকা হয়। এবার কিন্তু কায়েদে আজম আর তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন না। তাঁর মিলিটারী সেক্রেটারী তাঁদের কাছে এসে বললেন, 'আপনারা ঐক্যবদ্ধ হতে না পারার জন্যে কায়েদে আজম দুঃখ প্রকাশ করেছেন'।[৩৫]

শাহ অজিজুর রহমান এবং মাজহারুল কুদ্দুস কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগকে কমিউনিস্ট প্রতিষ্ঠান হিসাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা এবং ২৫শে তারিখে রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের সাথে সাক্ষাৎকারের সময় কায়েদে আজমের সাথে তোয়াহা এবং অন্যান্যদের বিতর্ক এই দুই কারণে তিনি তোয়াহা এবং মুসলিম ছাত্র লীগের প্রতি নিজের মনোভাব পরিবর্তন করে মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের প্রচেষ্টা থেকে বিরত হন। মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী পার্টির কিছু লোকজন এবং লীগদলীয় অন্যান্য নেতাদেরও এ ব্যাপারে একটি সক্রিয় ভূমিকা ছিল।[৩৬]

এর পূর্বের সাক্ষাৎকারের সময় তিনি যে বাণী দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে সংবাদপত্রে কিছু প্রকাশ না করার জন্যে কায়েদে আজম অনুরোধ করেছিলেন,

কিন্তু আবদুর রহমান চৌধুরী সে অনুরোধ শেষ পর্যন্ত রক্ষা করেননি। তিনি সংবাদপত্রে এই মর্মে একটি বিবৃতি দেন যে কায়েদে আজম ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে আশীর্বাদ জানিয়েছেন এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র লীগকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। কাজেই সকলের উচিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগে যোগদান করে ছাত্র ঐক্যকে শক্তিশালী করা।

৬॥ কায়েদে আজমের বিদায়বাণী ও পূর্ব বাঙলা সফরের ফলাফল

পূর্ব বাঙলা সফর শেষে করাচী রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে কায়েদে আজম পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উদ্দেশ্যে রেডিও পাকিস্তানের মাধ্যমে ২৮শে মার্চ একটি বিদায় বাণী প্রচার করেন।[১] তাতে অন্যান্য বক্তব্যের সাথে রাষ্ট্র-ভাষার প্রশ্ন এবং আন্দোলন সম্পর্কিত বিষয়ে তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করেন তার মধ্যে নোতুনত্ব থাকলেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তার পরিধির সাথে পরিচয় লাভের জন্য পুনরুক্তি হলেও তা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য :

> এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে নব-অর্জিত স্বাধীনতাকে যথেচ্ছাচারের অধিকার হিসাবে দেখার একটা দুঃখজনক প্রবণতা আমি লক্ষ্য করছি। একথা সত্য যে বিদেশী রাজত্বের অবসানের পর জনগণই এখন তাদের ভাগ্যের নিয়ন্ত্রেতা। শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে কোনো সরকার বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা আছে। তার অর্থ আবার এই নয় যে সাধারণের ভোটে নির্বাচিত সরকারের উপর এখন যে কোনো একদল লোক নিজের ইচ্ছাকে বেআইনী ভাবে চাপিয়ে দিতে পারবে। সরকার এবং তার নীতি প্রাদেশিক বিধান সভার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভোটের দ্বারা পরিবর্তিত হতে পারে। শুধু তাই নয়। সরকারের পক্ষে এক মুহূর্তের জন্য ঐ জাতীয় উচ্ছৃঙ্খল ও দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকদের দলবদ্ধ গুণ্ডামী এবং রাজত্ব সহ্য না করে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে এই অবস্থার মোকাবেলা করা উচিত। এক্ষেত্রে আমি বিশেষভাবে ভাষার বিতর্কের কথা ভাবছি যেটা এই প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে অযথা অনেক উত্তেজনা ও সমস্যা সৃষ্টি করেছে। এই অবস্থাকে আয়ত্বে না আনলে এর ফলাফল ভয়ঙ্কর হতে পারে। এ প্রদেশের সরকারী ভাষা কি হওয়া উচিত সেটা আপনাদের প্রতিনিধিরাই স্থির করবেন। কিন্তু এই ভাষার বিতর্ক আসলে প্রদেশিকতার বৃহত্তর বিতর্কের একটি দিক। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে আপনারা একথা নিশ্চয় উপলব্ধি

করেন যে পাকিস্তানের মতো একটি নবগঠিত রাষ্ট্র, যার দুই অংশ পরস্পর থেকে অনেকখানি দূরে, যেখানে সকল অংশের সকল নাগরিকের মধ্যেকার একতা এবং সংহতি, তার প্রগতি, এমনকি অস্তিত্বের জন্যেও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মুসলিম জাতির ঐক্যের মূর্তরূপই হলো পাকিস্তান এবং সেইভাবেই তা বজায় থাকবে। মুসলমান হিসাবে সেই ঐক্যকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। আমরা যদি প্রথমে নিজেদেরকে বাঙালী, পাঞ্জাবী সিন্ধী ইত্যাদি মনে করে শুধু প্রসঙ্গক্রমে নিজেদেরকে পাকিস্তানী মনে করি তাহলে পাকিস্তান ধ্বংস হতে বাধ্য। মনে করবেন না এটা একটা দুর্বোধ্য কথা: এই সম্ভাবনা সম্পর্কে আমাদের শত্রুরা খুবই সচেতন এবং আমি আপনাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলতে চাই যে তারা ইতিমধ্যেই একাজে ব্যস্ত রয়েছে। আমি আপনাদেরকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করবো: যে সমস্ত ভারতীয় রাজনৈতিক সংস্থা ও প্রেসের মুখপত্র সর্বতোভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিলো তারাই যখন পূর্ব বাঙলার মুসলমানদের 'ন্যায়সঙ্গত দাবী'র প্রতি তাদের বিবেকের সমর্থন জানাতে আসে তখন সেটাকে আপনাদের কাছে একটা অশুভ ব্যাপার বলে কি মনে হয় না? একথা কি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না যে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকে রোধ করতে অক্ষম হয়ে এই সমস্ত সংস্থাগুলি বর্তমানে প্রতারণাপূর্ণ প্রচারণার মাধ্যমে মুসলমান ভাইদেরকে একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে ভেতর থেকে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে? আমি চাই যাতে আপনারা প্রাদেশিকতার এই হলাহল, যা আমাদের শত্রুরা আমাদের রাষ্ট্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে চায়, তার সম্পর্কে সতর্ক থাকুন।[২]

কায়েদে আজমের পূর্ব বাঙলা সফরের অন্যতম প্রধান ফল পূর্ব বাঙলা মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান। ঢাকায় অবস্থানকালে কায়েদে আজম মহম্মদ আলীর সাথে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করেন এবং তাঁকে বার্মায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসাবে পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।[৩] তফজ্জল আলী, আবদুল মালেক প্রভৃতির সাথে মন্ত্রীত্ব ইত্যাদির প্রশ্ন নিয়ে কোনো সরাসরি আলাপ না হলেও তাঁদের সাথে একটা আপোষ রফায় উপনীত হওয়ার জন্যে খাজা নাজিমুদ্দীনকে তিনি নির্দেশ দেন।[৪]

মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির সদস্যদের সাথেও তিনি মিলিত হন এবং সেই সমাবেশে ভাষণ দান করতে গিয়ে বলেন যে তাঁরা যেন নিজেদেরকে বাঙালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী ইত্যাদি মনে না করে খাঁটি পাকিস্তানী হিসাবে

রাষ্ট্রের ঐক্য ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে মনোনিবেশ করেন। পার্লামেণ্টারী পার্টির আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানোর জন্য তিনি সকলের কাছে আবেদন করেন। সেই প্রসঙ্গে সরকারের বিরুদ্ধে তাঁদের কোনো অভিযোগ থাকলে সেটি সরাসরিভাবে তাঁকে জানানোর জন্যে তিনি সদস্যদেরকে উপদেশ দেন।[৫]

এই সময় ডক্টর মালেক কায়েদে আজমকে জিজ্ঞেস করেন যে ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী লোকদেরকে খোলাখুলিভাবে প্রশ্ন করে বিব্রত করা চলে কিনা। এর উত্তরে তিনি বলেন যে সে জাতীয় আচরণ শৃঙ্খলা বহির্ভূত এবং সেই হিসাবে তা' কিছুতেই অনুমোদন করা যায় না।[৬] ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, পার্লামেণ্টারী পার্টিতে ঐক্যের উপর গুরুত্ব দান এবং সর্বোপরি পার্টির অভ্যন্তরীণ কলহ মিটিয়ে নেওয়ার জন্যে নাজিমুদ্দীনের প্রতি নির্দেশের ফলে মহম্মদ আলী বার্মায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতের পদ এবং ডক্টর মালেক এবং তফজ্জল আলী প্রাদেশিক সরকারে মন্ত্রীত্বের পদ লাভ করেন। পার্লামেণ্টারী উপদলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এইভাবে গদীনশীন হওয়ার ফলে মুসলিম লীগের পার্লামেণ্টারী পার্টিতে অভ্যন্তরীণ গোলযোগের মোটামুটি অবসান ঘটে এবং তার ফলে নাজিমুদ্দীন সরকারের শক্তি অনেকখানি বৃদ্ধি লাভ করে। এই শক্তি বৃদ্ধির প্রভাব এপ্রিল মাসে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন চলাকালে নাজিমুদ্দীন সরকারের আচরণের মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়।

উর্দু ও ইংরেজীর সাথে বাংলাকেও জাতীয় পরিষদের সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করার ফলে পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। এই আন্দোলনের ফলে প্রাদেশিক সরকার রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সাথে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হতে বাধ্য হন যে তাঁরা প্রাদেশিক পরিষদের পরবর্তী অধিবেশনে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করবেন। এই চুক্তির ফলে ভাষা আন্দোলনের সাফল্য অনেকখানি নিশ্চিত মনে হওয়ায় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ্ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন।

কায়েদে আজম জিন্নাহ এই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার মাত্র চারদিন পর ঢাকা সফরে আসেন এবং তার দুই দিন পর ২১শে মার্চ তারিখে রেস কোর্সের সম্বর্ধনা সভায় ভাষা আন্দোলন এবং প্রাদেশিক সরকার ও রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের মধ্যেকার চুক্তিকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে উর্দু ব্যতীত অন্য কোনো ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে দাবী করার অধিকার পাকিস্তানের কোনো নাগরিকের নেই। শুধু তাই নয়, সে দাবী

কেউ উত্থাপন করলে একথা নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া চলে যে সেই ব্যক্তি রাষ্ট্র-শত্রু, ভারতের পোষা গুপ্তচর এবং সেই হিসাবে নাগরিক অধিকারের অযোগ্য। কাজেই তাকে কঠোর হস্তে দমন করা রাষ্ট্রের পক্ষে একটা অপরিহার্য কর্তব্য।

কেবল মাত্র রেস কোর্সের বক্তৃতাতেই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে, বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের সাথে আলাপ-আলোচনায় এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বিদায় বাণীতেও তিনি ঐ একই বক্তব্যের পুনরুক্তি করেন। তাঁর এই আচরণ সত্ত্বেও পূর্ব বাঙলায় ভাষা আন্দোলন ১৯৪৮ সালে নোতুনভাবে শুরু করা সম্ভব হয়নি। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন বিরোধী নানা উক্তি এবং পূর্ব বাঙলার জনসাধারণের বিভিন্ন দাবী-দাওয়াকে প্রাদেশিকতা আখ্যা দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আনুগত্যের আহ্বান সত্ত্বেও কায়েদে আজমের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা এবং তাঁর প্রতি সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধাই এই পর্যায়ে নোতুন আন্দোলন গঠনের পক্ষে ছিলো মস্ত বাধাস্বরূপ। এই অবস্থার পরিপূর্ণ সুযোগ নিতে পূর্ব বাঙলার প্রাদেশিক সরকার কোনো গাফিলতি করেনি।

কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তাকে কায়েদে আজম জিন্নাহ আন্দোলন দমন করার কাজে ব্যবহার করতে সমর্থ হলেও তাঁর বিভিন্ন প্রকার উক্তির ফলে ছাত্র এবং জনসাধারণের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা অনেকখানি কমে আসে। শুধু রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবেই নয়, পাকিস্তান আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা হিসাবেও পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশের গণতান্ত্রিক দাবী-দাওয়াকে তিনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করবেন সকলে তাই আশা করেছিলো। কিন্তু তিনি তাদের সে আশা পূর্ণ না করায় প্রথম পর্যায়ে একটি নিদারুণ হতাশার ভাব সকলকে আচ্ছন্ন করে এবং তার ফলে প্রায় সকলেই আন্দোলনের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন।

কায়েদে আজম ঢাকা পরিত্যাগ করার পর রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের একটি বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে আন্দোলনের পর্যালোচনাকালে ছাত্র লীগ এবং তমদ্দুন মজলিসের সদস্যেরা নিজেদের সংগঠনের কৃতিত্বের উপর জোর দেওয়ার চেষ্টা করেন।[৭] তমদ্দুন মজলিস আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে, বিশেষতঃ যখন তা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো তখন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কিন্তু মার্চের প্রথম দিক থেকে আন্দোলন রাজনৈতিক চরিত্র পরিগ্রহ করার সাথে সাথে তমদ্দুন মজলিসের গুরুত্ব এবং তাদের নেতৃত্বের প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসে। এই পরবর্তী পর্যায়ে গণতান্ত্রিক যুব লীগ এবং সাধারণ ছাত্র সমাজই আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আন্দোলনের সময় তমদ্দুন মজলিসের শামসুল আলম এবং মুসলিম ছাত্র লীগের নঈমুদ্দীন আহমদ যৌথভাবে রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহ্বায়কের কাজ করেন।[৮] এই দুজনের মধ্যে শামসুল আলমের কাছেই পরিষদের খাতাপত্র এবং অন্যান্য রেকর্ড থাকতো।[৯] কর্মপরিষদের এই বৈঠকে শামসুল আলম আহ্বায়কের পদে ইস্তফা দেন। কারণ তাঁর মতে আন্দোলন তখন এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলো যাতে করে সত্যিকার কিছু করার জন্যে প্রয়োজন ছিলো একটি নোতুন কর্মপরিষদ্। পুরাতন পরিষদ্ তাঁর মতে সেদিক থেকে ছিলো সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।[১০]

সেই বৈঠকেই শামসুল আলম মহম্মদ তোয়াহার কাছে সমস্ত কাগজপত্র বুঝিয়ে দেন এবং তারপর এম. এস.সি. শেষ বর্ষের ছাত্র আবদুল মান্নান অস্থায়ী-ভাবে আহ্বায়কের কাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে মনোনীত হন।[১১]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ নাজিমুদ্দীন সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা

১ ॥ ব্যবস্থাপক সভায় খাজা নাজিমুদ্দীনের সরকারী প্রস্তাব

৬ই এপ্রিল, ১৯৪৮, মঙ্গলবার বেলা তিনটের সময় পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থাপক সভায় যে অধিবেশন বসে তাতে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন বাংলাকে সরকারী ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করার জন্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাব[১] পেশ করেন :

(ক) পূর্ব বাঙলা প্রদেশে ইংরাজীর স্থলে বাংলাকে সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে ; এবং

(খ) পূর্ব বাঙলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার মাধ্যম হইবে যথাসম্ভব বাংলা অথবা প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশ স্কলারদের মাতৃভাষা।*

এর পর ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস দলের নেতা বসন্তকুমার দাস স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে পূর্বদিন পরিষদের নেতা খাজা নাজিমুদ্দীন একটি নোটিশ মারফত জানিয়েছিলেন যে তিনি সেদিন একটি প্রস্তাব উত্থাপন করবেন, কিন্তু তাঁর প্রস্তাবের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোনোকিছু উল্লেখ করেননি। তিনি আরও বলেন যে প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবটিকে সরকারী প্রস্তাব বলেই মনে হয় এবং সেটা সরকারী দলের অনুমোদনও নিশ্চয় লাভ করেছে। বসন্তকুমার দাস প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্যে সময় প্রার্থনা করে বলেন যে এ বিষয়ে সংশোধনী প্রস্তাব আনার অধিকার তাঁদের আছে এবং তার পূর্বে মূল সরকারী প্রস্তাবটি তাঁদের পার্টি মিটিং-এ আলোচিত হওয়া প্রয়োজন।[২]

বিরোধী দলীয় নেতার এই বক্তব্যের পর খাজা নাজিমুদ্দীন তাঁর প্রস্তাবের উপর আলোচনা পরদিন মূলতুবী রাখতে সম্মত হন। এর পর স্পীকার আবদুল করিম বলেন যে মূলতুবী প্রস্তাবের সংখ্যা দুই-একটি হলে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু সংখ্যা যদি তার থেকে বেশী হয় তাহলে যাঁরা সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করতে চান তাঁরা যেন পরদিন বেলা তিনটের মধ্যে সেগুলি দাখিল করেন।[৩]

৮ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার বেলা তিনটের সময় পরিষদের কাজ শুরু হয়। অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনার পর স্পীকার আবদুল করিম

---

* মূল সরকারী প্রস্তাব এবং পরবর্তী সংশোধনী প্রস্তাবগুলি সবই পরিষদে ইংরাজীতে পেশ করা হয়।

সদস্যদেরকে তারা বিষয়ক সংশোধনী প্রস্তাবগুলি পেশ করতে অনুরোধ জানান। প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীন তখন বলেন যে পরিষদের সামনে পূর্বে যে প্রস্তাব তিনি উপস্থিত করেছেন তার শেষ বাক্যে 'স্কলার'-এর স্থলে 'ছাত্র' শব্দটি তিনি সংযোজন করতে চান।[1]

২॥ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সংশোধনী প্রস্তাব

প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের উপরোক্ত বক্তব্যের পর বিরোধীদলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সরকারী প্রস্তাবের উপর নিম্নলিখিত সংশোধনী প্রস্তাবটি[১] পেশ করেন :

১। এই পরিষদের অভিমত এই যে—

(ক) বাংলা পূর্ব বাঙলা প্রদেশের সরকারী ভাষারূপে গৃহীত হইবে ;

(খ) পূর্ব বাঙলা প্রদেশে ইংরেজীর স্থলে বাংলা প্রবর্তনের জন্য আশু ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

(গ) পূর্ব বাঙলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার মাধ্যম হইবে বাংলা।

২। এই পরিষদ্ আরও মনে করে যে বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র-ভাষা হওয়া উচিত ; এবং

৩। এই পরিষদ্ পাকিস্তান সরকারের নিকট সুপারিশ করে যে—

(ক) সর্বপ্রকার নোট ও টাকা পয়সা, টেলিগ্রাফ, পোস্টকার্ড, ফর্ম, বই ইত্যাদি ডাক সংক্রান্ত যাবতীয় জিনিস, রেলওয়ে এবং পাকিস্তান সরকারের অন্য সর্বপ্রকার সরকারী ও আধা-সরকারী কর্মে অবিলম্বে বাংলা প্রচলন করা হউক ;

(খ) কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসে এবং সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে যোগ-দানের জন্য সকল প্রকার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যম এবং অন্যতম বিষয় হিসাবে বাংলা প্রবর্তন করিতে ; এবং

৪। এই পরিষদ্ সংবিধান সভার সকল সদস্যকে অনুরোধ জানাইতেছে এবং পূর্ব বাঙলার প্রতিনিধিদের নিকট বিশেষভাবে আবেদন করিতেছে যাহাতে তাঁহারা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর প্রস্তাবটিকে পাঠ করার পরই সে সম্পর্কে কয়েকজন

সদস্য আপত্তি উত্থাপন করেন। প্রথমেই আবদুল বারি চৌধুরী বলেন যে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের উত্থাপিত সংশোধনী প্রস্তাবটি বাস্তবপক্ষে মূল প্রস্তাবের পরিবর্তে একটি সম্পূর্ণ নোতুন প্রস্তাব। কাজেই সেটি সংশোধনী প্রস্তাব হিসাবে কোনোমতেই বিবেচিত হতে পারে না।[২] শিক্ষামন্ত্রী আবদুল হামিদ বলেন যে প্রস্তাবটি সংশোধনী প্রস্তাবের আকারে কখনোই আসতে পারে না কারণ তাতে এমন কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ আছে যেগুলির উপর প্রাদেশিক সরকারের কোনো এখতেয়ার নেই।[৩] তাঁকে সমর্থন করে অর্থ দফতরের মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী বলেন যে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পার্লামেন্টের আকারে একটি নোতুন প্রস্তাব হিসাবে আসতে পারে অন্য হিসাবে নয়, কারণ তার মধ্যে যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ আছে সেগুলি প্রাদেশিক সরকারের আওতা বহির্ভূত।[৪]

উপরোক্ত সমালোচনার জবাবে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন যে সরকারী প্রস্তাবটিতে বাংলা ভাষাকে শুধু পূর্ব বাঙলার সরকারী ভাষা করার কথা বলা হয়েছে কিন্তু তাঁর প্রস্তাবে তিনি বাংলা ভাষাকে এই প্রদেশের মাতৃভাষা এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলেছেন। তাঁর সেই মূল প্রস্তাব যদি না নেওয়া হয় তাহলে সংশোধনী প্রস্তাব দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না।[৫]

এর জবাবে প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীন বলেন :

এটি একটি স্বীকৃত নীতি যে প্রাদেশিক সরকারের এলাকা বহির্ভূত কোনো বিষয়ে প্রাদেশিক পরিষদে প্রস্তাব উত্থাপন করা চলে না, তার জন্যে গভর্নরের কাছে সরাসরি বক্তব্য পেশ করতে হয়। স্যার, আপনার হয়তো স্মরণ আছে যে আগেকার দিনে কেন্দ্রীয় সরকারের এখতেয়ারভুক্ত কোনো বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বক্তব্য পেশ করতে হলে গভর্নরের মাধ্যমে সেটা করার একটা নির্ধারিত পদ্ধতি ছিলো। যে সমস্ত বিষয়গুলি প্রাদেশিক, একমাত্র সেগুলিই এখানে আলোচিত হতে পারে। এই প্রস্তাবটির যা বিষয়বস্তু তাতে করে এর একমাত্র আলোচনাক্ষেত্র সংবিধান সভা। সেই হিসাবে গভর্নরের মাধ্যমে একটা আবেদন ব্যতীত অন্য কোনোভাবে বিষয়টি তিনি এখানে আলোচনা করতে পারেন না।[৬]

ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের এই সংশোধনী প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে খাজা নাজিমুদ্দীন ব্যবস্থাপক সভার এখতেয়ার এবং নির্ধারিত নীতির উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে একজন অভিজ্ঞ সংসদীয় রাজনীতিক হিসাবে তিনি পূর্ববর্তী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইন-কানুন সম্পর্কেও স্পীকারের মাধ্যমে পরিষদকে স্মরণ করিয়ে দেন।

এক্ষেত্রে নীতি বিষয়ে তিনি যাই বলুন রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদের সাথে তিনি যে ৮ দফা চুক্তি সম্পাদন করেন তার তৃতীয় দফা অনুসারে তিনি এই মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থাপক সভার পরবর্তী অধিবেশনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করে তিনি একটি সরকারী প্রস্তাব উত্থাপন করবেন। এই চুক্তিপত্রটি তিনি ১৫ই মার্চ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় পাঠ করে শোনান। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাবটিতে ৮ দফা চুক্তি বহির্ভূত কোনো বক্তব্য ছিলো না। বিতর্কের পরবর্তী পর্যায়ে কয়েকজন সদস্য চুক্তির এই দিকটি সম্পর্কে উল্লেখ করলেও কর্ম-পরিষদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার সময় নাজিমুদ্দীনের এই নীতিজ্ঞান বিলুপ্ত হয়েছিলো কেন এ সম্পর্কে প্রশ্ন করে তাঁকে কেউই খুব বেশী বিব্রত করেননি। উপরন্তু প্রস্তাবটি মূল প্রস্তাবকে ছাড়িয়ে গেছে এবং তা প্রাদেশিক সরকারের এলাকা বহির্ভূত এই বলে স্পীকার সংশোধনী প্রস্তাবটিকে অগ্রাহ্য করায় এ বিষয়ে বিশেষ কোনো উচ্চবাচ্য না করে করে সকলেই স্পীকারের সিদ্ধান্ত মেনে নেন।[৭] শুধু তাই নয়। এই স্বীকৃতির পরও ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সংশোধনী প্রস্তাবটি প্রাদেশিক সরকারের আওতা বহির্ভূত এই কথার পুনরুক্তি করে আবদুস সবুর খান এবং শামসুদ্দীন আহমদ খোন্দকার পরিষদের সময় নষ্ট করেন।[৮]

প্রথম সংশোধনী প্রস্তাবটি নাকচ হওয়ার পর ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত নিম্নোল্লিখিত দ্বিতীয় প্রস্তাবটি[৯] উত্থাপন করেন :

১। এই পরিষদের অভিমত এই যে—

(ক) বাংলা পূর্ব বাঙলা প্রদেশের সরকারী ভাষারূপে গৃহীত হইবে ;

(খ) পূর্ব বাঙলা প্রদেশে ইংরাজীর স্থলে বাংলা প্রবর্তনের জন্য আশু ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

(গ) পূর্ব বাঙলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে শিক্ষার মধ্যেম হইবে বাংলা।

২। এই পরিষদ্ পাকিস্তান সরকারের নিকট সুপারিশ করে যে—

(ক) সর্বপ্রকার নোট ও টাকা-পয়সা, টেলিগ্রাফ, পোস্টকার্ড, ফর্ম, বই ইত্যাদি ডাক সংক্রান্ত যাবতীয় জিনিস, রেলওয়ে টিকিট এবং পাকিস্তান সরকারের অন্য সর্বপ্রকার সরকারী ও আধা-সরকারী ফর্মে অবিলম্বে বাংলা প্রচলন করা হউক ;

(খ) কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসে এবং সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে যোগদানের জন্য সকল প্রকার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যম এবং অন্যতম বিষয় হিসাবে বাংলা প্রবর্তন করিতে হইবে।

এই দ্বিতীয় প্রস্তাবটিকেও খাজা নাজিমুদ্দীন প্রাদেশিক সরকারের এলাকা বহির্ভূত হিসাবে বিবেচনার অযোগ্য বলে বর্ণনা করেন। এ-কথার পর ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত তৎক্ষণাৎ অন্য একটি সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করতে উদ্যত হন। তাঁর এই অবস্থা দেখে হামিদুল হক চৌধুরী বলে ওঠেন যে ধীরেনবাবু তাঁর প্রস্তাবগুলির দোষত্রুটি সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে অবহিত কাজেই তিনি আসল সংশোধনী প্রস্তাবটির দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে আসছেন।[১০]

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এর পর তাঁর তৃতীয় এবং শেষ সংশোধনী প্রস্তাব[১১] পেশ করেন :

১। এই পরিষদের অভিমত এই যে—

(ক) বাংলা পূর্ব বাঙলা প্রদেশের ভাষারূপে গৃহীত হইবে।

(খ) দুই বৎসরের মধ্যে পূর্ব বাঙলা প্রদেশে ইংরাজীর স্থলে বাংলা প্রবর্তনের জন্য আশু ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

(গ) পূর্ব বাঙলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার মাধ্যম হইবে বাংলা।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাব উত্থাপন পদ্ধতি থেকে একটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে প্রস্তাবটি সম্পর্কে হামিদুল হকের বক্তব্য আংশিকভাবে সত্য। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রথম প্রস্তাবটি তিন অংশে বিভক্ত। এই তিন অংশকে তিনি এমনভাবে সাজিয়েছিলেন যাতে প্রথমবার সেটির বিরুদ্ধে আপত্তি উঠলে শেষ অংশকে তিনি বাদ দিতে পারেন। এবং দ্বিতীয় প্রস্তাবের ক্ষেত্রে আপত্তি উঠলে দ্বিতীয় অংশটিকে বাদ দিয়ে প্রথম অংশটি আবার উত্থাপন করতে তাঁর কোনো অসুবিধা না হয়। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের তিন দফা প্রস্তাব এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে কংগ্রেস দলীয় সদস্যদের একের পর এক সংশোধনী প্রস্তাব পেশের দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে তাঁদের প্রস্তাবগুলি প্রত্যাখ্যাত হবে একথা তাঁরা পূর্বেই ধরে নিয়েছিলেন এবং সেই হিসাবে নাজিমুদ্দীন সরকারের সাথে ভাষার দাবী নিয়ে দরাদরি করার জন্যেই ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ধাপে ধাপে তাঁর ন্যূনতম প্রস্তাবের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এদিক থেকে বিচার করলে প্রস্তাবটি ত্রুটিপূর্ণ এই উপলব্ধি থেকে আলোচ্য প্রস্তাবটি তিন দফায় পেশ করা হয়েছিলো, হামিদুল হকের এই যুক্তির ভ্রান্তি সহজেই বোঝা যাবে।

প্রস্তাবটি পাঠ করার পর ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পরিষদে একটি ব্যাখ্যামূলক বক্তৃতা দেন। বাংলাকে যথাশীঘ্র দেশের শিক্ষা ও সরকারী কাজকর্মের ভাষা হিসাবে প্রচলনের যুক্তি হিসাবে তিনি বলেন :

এখন কথা হচ্ছে যে প্রস্তাব এই House-এ উত্থাপিত হয়েছে সে প্রস্তাবে কতদিনের ভিতর বাংলা ভাষা আমাদের official-language হবে তার

উল্লেখ নাই। আমাদের কথা হচ্ছে অতি শীঘ্র তা করা দরকার। কারণ যদি অতি শীঘ্র তা করা না হয়, যদি তার ভিতর dead line পড়ে যায় তাহলে ১০০ বৎসরেও বাংলাভাষা এখানকার প্রাদেশিক ভাষার স্থান লাভ করতে পারবে না। সেজন্য আমি বলছি যত শীঘ্র হয় তার ব্যবস্থা করুন যাতে আমরা বাংলা ভাষাকে সম্পূর্ণভাবে প্রাদেশিক ভাষায় পরিণত করতে পারি। বর্তমানে আর্জি ও শিক্ষাক্ষেত্রে সব কিছুই ইংরাজীর Throughতে হয়ে আসছে। এখন হতে ইংরেজী বাদ দিয়ে বাংলা করতে হবে। অনেকে বাংলা ভাল জানেন, লিখতে পড়তে পারেন, অথচ Court কাছারীর কোনো কাজের জন্য তাঁদের ইংরেজী জানা লোকের উপর নির্ভর করতে হয়। বাংলা হলে এই সব অসুবিধাগুলি দূর হতে পারে। আর একটা কথা, নিজের ভাষা আয়ত্ব করা সহজ কিন্তু পরের ভাষা ইংরাজী আমরা যতই বুঝি বা বলি আমার অভিজ্ঞতা হতে বলতে পারি যে নিজের ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় মনের ভাব ঠিক-ঠিক ব্যক্ত করা যায় না। আমি একজন উকিল হিসাবে একথা বলতে পারি যে উকিল ও বিচার কর্তারাও মাতৃ-ভাষায় বক্তৃতা ও রায় দানের ব্যবস্থা হলে ভালভাবে কাজ করতে পারবেন। স্কুল কলেজে শিক্ষার ভিতর দিয়ে বাংলাকে গড়ে তুলতে হবে। কাজেই বাংলা ভাষার উন্নতি ও পরিপুষ্টির জন্য একটি Committee গঠন করতে হবে যেরূপ পশ্চিমবঙ্গে গঠিত হয়েছে। যদি এ বিষয়ে ভাল ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয় তাহলে ১০ বৎসরে কেন ১৫ বৎসরেও কোনো উন্নতি হবে না। কাজে কাজেই ইংরেজী থেকে যাবে।[১২]

বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার যুক্তি হিসাবে তিনি বলেন :

জনগণের দাবী যে প্রাদেশিক ভাষা নিয়েই পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে। জনগণের এই দাবীর পিছনে একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। আমরা যে রাষ্ট্র গঠন করছি এই রাষ্ট্রের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবধান ২ হাজার মাইল। রাষ্ট্রের এক অংশের সঙ্গে অপর অংশের ব্যবধান ২ হাজার মাইল এমন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রভাষা দুইটি করাই সঙ্গত। প্রকৃত প্রস্তাবে পাকিস্তানের দুই unit-এর মধ্যে এক unit-এর ভাষা পুরাপুরি বাংলা আর এক unit-এ সিন্ধু, বেলুচিস্তান, পশ্চিম পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কোনোটির ভাষার কোনোটির সঙ্গে মিল নেই। এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের ৪ কোটি অধিবাসীর ভাষাকে তারা তাদের unit-এর রাষ্ট্রভাষা

দাবী করলে অন্যায় বলা যায় না। প্রথম যখন এ বিষয়ে কথা উঠেছিল তখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী সাহেব বলেছিলেন একটা agreement হচ্ছে যাতে বাংলাকে এই প্রদেশের রাষ্ট্রভাষা করা হয়। তিনি আরও জানান যে এটা পাকিস্তান মন্ত্রীসভাকে জানান হবে ও ব্যবস্থা করা হবে। মুসলিম লীগ পক্ষের সভ্য মিঃ আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী এই প্রস্তাব এনেছিলেন যে বাংলা ভাষা প্রাদেশিক ভাষা হবে ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে। এই agreement-এর উপর আমি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম কিন্তু সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়েছে। আপনারা জানেন প্রকৃত প্রস্তাবে আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তা শুধু বাংলাকে পাকিস্তানের official language করবার জন্য। আমাদের উজিরে আজমের সেই প্রস্তাব আনা উচিত ছিলো।[১৩]

এর পর ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ফেব্রুয়ারি মাসে গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশনে ভাষা সম্পর্কিত বিতর্কের উল্লেখ করে বলেন :

আপনারা জানেন এটা সর্ববাদী সম্মত যে প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলা ভাষাই এখানকার রাষ্ট্রভাষা। আমাদের Constituent Assemblyতে এই প্রস্তাব আমি গত অধিবেশনে উত্থাপন করেছিলাম। আমাদের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী সাহেব সেটা সংশোধন করে নেবেন এইটাই ছিল আমার অভিপ্রায়। আমাদের দেশের শিক্ষিতের শতকরা ৬০ জনের বেশী লোক বাংলা ভাষায় পড়তে পারে অথচ ইংরাজী জানে না, উর্দু জানে না, এই প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী সাহেব ব্যবস্থা করব বলেছিলেন। আমি আমাদের প্রধানমন্ত্রী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করছি যে তার কি ব্যবস্থা করা হয়েছে। Post card-এ বাংলার নাম নাই, money order form -এ বাংলার নাম নাই, Telegraph-এ বাংলার নাম নাই, Railway ticket-এ বাংলার নাম নাই। আমি জিজ্ঞাসা করি বাংলা দেশের কত লোক বাংলা ছাড়া অন্য ভাষা বোঝে। উজিরে আজমের বোঝা উচিত ছিল যে currencyতে বাংলা না থাকলে সাধারণ লোকের কত অসুবিধা হয়। Railway ticket নিয়েও কম অসুবিধা হবে না। একজন অজ্ঞ-লোক যে উর্দু জানে না এমন লোকের সংখ্যা এখানে খুব বেশী। তাদের অসুবিধার কথা একটু চিন্তা করুন।[১৪]

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর বক্তৃতার শেষে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষে পরিষদের কাছে নিম্নলিখিত ভাষায় আবেদন করেন :

এই সংশোধনী প্রস্তাব প্রকৃতপক্ষে জনগণের নিজেদের ; আমি প্রতিনিধি মাত্র। এই প্রস্তাব অনুসারে কাজ করলে জনসাধারণের যথেষ্ট কষ্টের ও অসুবিধার লাঘব হতে পারত। এগুলি Central Subject বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না।

Provincial Administration-এর উপর যা এসে পড়েছে তার উপর Province-এর জনগণের একটা দাবী আছে। এই সব প্রশ্ন উত্থাপন করলে উজিরে আজম ও মন্ত্রীবর্গ নানা কথা বলে থাকেন। আমি আপনাদের কাছে জানাতে চাই এটা সমর্থন করুন বা না করুন এটাই জনগণের দাবী। আমি পাকিস্তানের অধিবাসী হিসাবে এবং পাকিস্তানের প্রতি আমার আনুগত্য আছে বলে আমি এই অসুবিধার কথা পাকিস্তান পরিষদে পেশ করেছিলাম। আমার এর ভিতর অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। এটা আমার দাবী বলে মনে করি বলেই এই প্রশ্ন আমি উত্থাপন করেছিলাম। আমরা পাকিস্তান গ্রহণ করেছি বলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উপর আমাদের একটা দাবী রয়েছে। ৭ কোটি বাঙালীর মধ্যে ৪ কোটির উপর পাকিস্তানে রয়েছে। তাদের রাষ্ট্রভাষা বাঙলা হওয়া যুক্তিসঙ্গত এইজন্য আমি এই দাবী উপস্থিত করেছিলাম। আমি আশা করি মন্ত্রীমণ্ডলী এবং জনগণের প্রতিনিধি যাঁরা আছেন তাঁরা জনগণের এই দাবী সমর্থন করবেন এবং নিজেরাই এই প্রস্তাব করবেন। শুধু বাংলায় বক্তৃতা করলে চলবে না। বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে হবে।[১৫]

বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে প্রস্তাব উত্থাপনকালে পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের কিছু বলা প্রয়োজন হয়েছিলো তার কারণ গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশনের বিতর্ক থেকে শুরু করে কয়েকটি প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্র, মুৎসুদ্দীদের স্মারকলিপি, কায়েদে আজমের বক্তৃতা এবং প্রাদেশিক পরিষদের বিতর্কে ভাষা আন্দোলনকে হিন্দুদের দ্বারা প্ররোচিত এবং অন্তর্ঘাতমূলক বলে সব সময়েই অভিহিত করা হয়েছিলো। অবশ্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের এই আনুগত্য প্রকাশের পর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সম্পর্কে এই সাম্প্রদায়িক এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা প্রচারণা যে বন্ধ হয়েছিলো তা নয়। বস্তুতঃ এর কোনো প্রভাবই সরকারী মহলের পরবর্তী সমালোচনার মধ্যে প্রতিফলিত হয়নি। এবং তা না হওয়ারই কথা।

৩ ॥ অন্যান্য সংশোধনী প্রস্তাব

ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বক্তৃতার পর সিলেটের মুনাওয়ার আলী একটি সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করার সময় স্পীকার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি তাঁর প্রস্তাবগুলি লিখিতভাবে দাখিল করেছিলেন কিনা। জবাবে মুনাওয়ার আলী বলেন যে তিনি পূর্বদিন কয়েকটি সংশোধনী প্রস্তাব লিখিতভাবে দাখিল করেছিলেন এবং অন্য একটির নোটিশও দিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেন যে তিনি আশা করেছিলেন তাঁর প্রস্তাবগুলি মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি মিটিং-এ আলোচিত হবে কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে তা হয়নি। কাজেই এখন যদি তাঁর নেতা অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীন তাঁকে অনুমতি দেন তাহলে তিনি পরিষদে তাঁর সংশোধনী প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে পারেন। মুনাওয়ার আলীর এই কথার পর পরিষদে তুমুল হাস্যধ্বনির মধ্যে স্পীকার তাঁকে বলেন, 'আপনি দেখছি নিজের প্রস্তাব পেশ করার পরিবর্তে অন্যের দিকে তাকিয়ে আছেন'। এর পর মুনাওয়ার আলী আর কোনো উচ্চবাচ্য না করে তার সংশোধনী প্রস্তাবটি আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করা থেকে বিরত হন।[১]

স্পীকারের নির্দেশমতো বিনোদচন্দ্র চক্রবর্তী এর পর নিম্নলিখিত সংশোধনী প্রস্তাবটি[২] উত্থাপন করেন :

(ক) পূর্ব বাঙলা প্রদেশের সকল অফিস এবং আদালতে ইংরাজীর পরিবর্তে বাংলা সরকারী ভাষা হিসাবে গৃহীত হইবে ; এবং

(খ) পূর্ব বাঙলায় বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বাঙালীদের শিক্ষার মাধ্যম হইবে বাংলা।

বিনোদচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর সংশোধনী প্রস্তাবটি পাঠ করার পর বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে তিনি যেভাবে ভাষা বিষয়ক প্রস্তাবটি পরিষদের সামনে উপস্থিত করেছেন তাতে তাঁদের মনে যথেষ্ট আশঙ্কার সঞ্চার হয়েছে। তিনি মন্ত্রীসভার উদ্দেশ্যের সততা সম্পর্কে তাঁদের সন্দেহের অবসান ঘটানোর জন্যে নাজিমুদ্দীনের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি সরকারী প্রস্তাবে 'যথাসম্ভব' কথাটির প্রতি বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলেন যে এই ধরনের একটা অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যে সরকার যে কোনো আশু ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন সে ভরসা তাঁদের নেই। ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে সরকারী মনোভাবই যে তাঁদের এই আশঙ্কার মূল কারণ একথাও তিনি তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

এই বাংলা ভাষার আন্দোলন অধিবেশন হবার পূর্ব হতে যখন আরম্ভ করা

হয়েছিল তখন আপনারা জানেন যে সকল যুবক ও নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন তাঁরা ছিলেন সকলেই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের এবং মুক্ত নাগরিক হিসাবে সম্পূর্ণভাবে এটা সমর্থন করবার ইচ্ছা আরও অনেকে প্রকাশ করেছিলেন। আমরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেকে নানা দিক বিচার করে এর সঙ্গে যোগ দিতে পারি নাই। তাদের আমরা কোনো সাহায্য করি নাই তবুও তাদের নিন্দার ভাগী করা হয়েছে। যদি আমরা সর্ব সম্প্রদায় এই আন্দোলনকে আরও সাহায্য করতাম তাহলে আন্দোলন আরও বড় হয়ে উঠত। তথাপিও প্রধানমন্ত্রী মহাশয় ঘোষণা করেছিলেন এই আন্দোলনের পিছনে অনেকের দুরভিসন্ধিমূলক সম্পর্ক ছিল।[৩]

বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী এবং মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী পার্টির ষড়যন্ত্রের বিষয়ে উল্লেখ করে বিনোদচন্দ্র চক্রবর্তী বলেন :

আপনারা জানেন এই বাংলা ভাষার প্রচলনের বিরুদ্ধে অনেক গোপন ষড়যন্ত্র হয়েছিল এবং যারা এই পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল তারা কেবল মাত্র এটা নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ রাখে নাই সরকারী কর্মচারীদেরও প্রভাবান্বিত করেছিল এবং এই যুক্তিসঙ্গত আন্দোলন যারা করেছিল তাদেরও নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল। এর দায়িত্ব কাহারও নিজের একার নয় সমস্ত দলের ও নেতার প্রতি দায়িত্ব রয়েছে। আমরা খবরের কাগজে দেখেছি (১লা এপ্রিল) যে এই প্রদেশের ভাষা বাংলা হবে এবং পাকিস্তানেরও রাষ্ট্রভাষা করবার যে কথা হয়েছিল তা করা হবে না এটাই লীগ দলের সভায় স্থির হয়েছে।[৪]

কায়েদে আজম জিন্নাহর পূর্ব বাঙলা সফরের পর ভাষা সম্পর্কে পূর্ব বাঙলা মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী পার্টির ৩১শে মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে কেন্দ্রের কাছে সুপারিশের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত হয়। কায়েদে আজম কর্তৃক বাংলার দাবীকে অস্বীকার এবং উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হওয়ার যোগ্য এই ঘোষণার পর পার্লামেণ্টারী পার্টি রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে প্রাদেশিক পরিষদে কোনো সরকারী প্রস্তাব উত্থাপন করার পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করে। বিনোদচন্দ্র চক্রবর্তীর বক্তৃতায় তিনি এই ঘটনারই উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদ, শিক্ষা সেক্রেটারী ফজলে আহমদ করিম ফজলী প্রভৃতি আমলাদের খোলাখুলি বাংলা বিরোধিতার কথা ভাষা আন্দোলনের সময় কারো অজানা ছিলো না। সরকারী কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা ভাষা এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে অনেক সময় সক্রিয় এবং সরাসরিভাবে তাঁদের মতামত বিভিন্ন জায়গায় ব্যক্ত করেন। এ

বিষয়ে সরকারী নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও তাঁদের ভূমিকা খুব উল্লেখযোগ্য ছিলো।

এসব সমস্যার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিনোদচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর বক্তৃতার শেষে বলেন :

> আজ যদি নাগরিক অধিকার ও সুখ সুবিধার ক্ষেত্রে বাংলার স্বাতন্ত্র্য রোধ করা হয় তাহলে আমরা কোনো কাজে অগ্রণী না হয়ে সকলের পিছনে পড়ে থাকবো। আর পাকিস্তানের এই অংশে দুর্গতি বেড়েই চলবে এবং পাকিস্তানের উন্নতিকর কাজে জনগণের মনোবল ক্ষুণ্ণ হবে। পাকিস্তান শাসনকার্যে যে সব কর্মচারীর প্রয়োজন হবে আর অধিকাংশ সংখ্যানুপাতে বাংলা থেকেই নেবার প্রয়োজন হবে এবং সকল কাজে লোক সংখ্যারই অনুপাতে ও দায়িত্বে বাংলার স্থান থাকবে এটাও আমরা দেখতে চাই। আমাদের দায়িত্ব বিরাট, কর্তব্য মহান, সেই কর্তব্য ও দায়িত্ব আমাদের পালন করতে হবে। রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হওয়ার কারণ সত্যই অনুধাবন করতে পারি না। যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ থাকলে না হয় বুঝতে পারতাম কিন্তু তা কিছুই দেখি না। ইংরাজীর কোনোই প্রয়োজন নাই এখন বাংলার প্রয়োজন এত বেশী এবং তা কথায় বলে শেষ করা যায় না। বাংলা এ প্রদেশের ভাষা হবেই এটা অবশ্য খুব আনন্দের কথা। আজ আর বাংলাকে অবহেলা করলে চলবে না। আমরা যাতে ঠিকমতো আমাদের দায়িত্ব পালন করি সেই আলোচনাই করব। নেতৃস্থানীয় যাঁরা আছেন তাঁদের এ বিষয়ে অগ্রণী হতে হবে কিন্তু দুঃখের বিষয় নেতৃস্থানীয় যাঁরা তাঁরা এ বিষয়ে অবহেলা করেছেন। সমস্ত পাকিস্তানে বাংলা যাতে অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে স্থান পায় তার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত।[৫]

বিনোদচন্দ্র চক্রবর্তী বক্তৃতার এই পর্যায়ে আবদুস সবুর খান তাঁকে বাধা দিয়ে স্পীকারকে বলেন যে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রথম সংশোধনী প্রস্তাবকে উত্থাপন করতে না দিয়ে তিনি পরিষদ্ ভাষা বিষয়ক আলোচনার গণ্ডী প্রকৃতপক্ষে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে যে তিনি সে বিষয়ে সদস্যদেরকে যথেচ্ছ আলোচনার সুযোগ দান করছেন। এর পর তিনি সদস্যদেরকে কেবলমাত্র প্রাদেশিক ভাষা সম্পর্কেই নিজেদের বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখতে অনুরোধ জানান। বিনোদচন্দ্র চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ করেন যে তিনি নিজের বক্তৃতায় পাকিস্তানের এলাকা বহির্ভূত বিষয়েব উল্লেখ করেছেন। সমগ্র বক্তৃতাটি শেষ দিকে নাগরিক অধিকারও সুখ-সুবিধার 'ক্ষেত্রে বাঙলার

স্বাতন্ত্র্য' রক্ষার কথা ছিল। এ কারণেই সবুর খান বিনোদচন্দ্র চক্রবর্তীর বক্তৃতা সম্পর্কে উপরোক্ত অভিযোগ করেন। অন্যথায় সমগ্র বক্তৃতার মধ্যে পাকিস্তানের এলাকা বহির্ভূত অন্য কোনো বিষয়ের বিন্দুমাত্র উল্লেখ ছিলো না।

সবুর খানের আপত্তি উত্থাপনের পর স্পীকারের নির্দেশ অনুযায়ী বিনোদচন্দ্র চক্রবর্তী সামান্য দুই এক কথা বলে তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন।[৬]

স্পীকার আবদুল করিম এর পর সদস্যদেরকে বলেন যে তাঁরা যেন সেই সব সংশোধনী প্রস্তাবগুলি প্রথমে পেশ করেন যেগুলি মূল সরকারী প্রস্তাবটির প্রতিকল্প। সেগুলি আলোচনার পর অন্য সংশোধনী প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করার জন্যে তিনি তাঁদেরকে অনুরোধ করেন। প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীন এ বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে স্পীকারকে বলেন যে সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাবগুলি উত্থাপিত হওয়ার পর তিনি সেগুলির জবাব দিতে চান। স্পীকার তাঁর এই প্রস্তাবে আপত্তি না করায় একে একে অন্য সংশোধনী প্রস্তাবগুলি পেশ করা হয়।

বিনোচন্দ্র চক্রবর্তীর পর আবদুল বারী চৌধুরী যে সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন তার মধ্যে দুই একটি সামান্য শব্দগত পরিবর্তন ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কিছু ছিলো না। তবে প্রস্তাবটি পরিষদে পাঠ করার পর ইংরেজীতে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দানকালে তিনি বলেন উদ্দেশ্যের সততা সম্পর্কে কোনো প্রকার সন্দেহ প্রকাশ না করে তিনি শুধু একথা বলতে চান যে সরকারী প্রস্তাবটি খুব অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট। বাংলা যে পূর্ব বাঙলার সরকারী ভাষা হবে তা প্রস্তাবটি থেকে ভালভাবে বোঝা যায় না। তাতে শুধুমাত্র এটুকুই বলা হয়েছে যে ভবিষ্যতে কোনো এক সময়ে ইংরাজীকে তুলে দিয়ে তার স্থানে বাংলাকে পূর্ব বাঙলার সরকারী ভাষা করা হবে।[৭]

আবদুল বারী চৌধুরীর পর প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী যে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন তার মধ্যে তিনিও সরকারী প্রস্তাবের মধ্যে 'যথাসম্ভব' কথাটি তুলে দিতে বলেন। তিনি অন্যান্য কয়েকটি সংশোধন ছাড়াও প্রস্তাবটির (খ) ধারার পর নিম্নলিখিত ধারাটি যোগ দেওয়ার প্রস্তাব করেন :

(গ) এই পরিষদ্ আরও মনে করে যে (১) পাকিস্তান রাষ্ট্রের মুদ্রা, টেলিগ্রাফ এবং ডাক সংক্রান্ত যাবতীয় জিনিস যেমন পোস্টকার্ড, ফর্ম, বই ; রেলওয়ে টিকিট এবং অন্যান্য সরকারী ও আধা-সরকারী ফর্মে বাংলার ব্যবহার অবিলম্বে চালু করিতে হইবে এবং (২) কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস এবং সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর সমস্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যম এবং অন্যতম বিষয় হিসাবে বাংলা প্রবর্তন করিতে হইবে।

এবং গ(১) ও গ(২) ধারা সম্বলিত প্রস্তাবটির এই অংশ যাহাতে পাকিস্তান সরকার কার্যকর করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে অবগত করাইবার জন্য পূর্ব বাংলা সরকারের নিকট অনুরোধ জানাইতেছে।

প্রস্তাবটির পাঠ শেষ হওয়ার পর আবদুল বারী চৌধুরী বলেন যে সংশোধনী প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাভুক্ত এবং সেই হিসাবে সেটিকে অগ্রাহ্য করা উচিত।[৯] এখানে উল্লেখযোগ্য যে প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ীর পূর্বে তিনি নিজের সংশোধনী প্রস্তাবের উপর বক্তৃতা প্রসঙ্গে সরকারী প্রস্তাবটিকে 'অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট' বলে বর্ণনা করেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবটি অস্পষ্ট ছিলো এজন্যে যে তার মধ্যে কিভাবে, কোথায় এবং কতদিনের মধ্যে বাংলা পূর্ব বাঙলার সরকারী ভাষা হিসাবে প্রবর্তিত হবে সে সম্পর্কে কোনো উল্লেখ ছিলো না। এই সমস্ত কথাই যখন প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী তাঁর প্রস্তাবটিতে উল্লেখ করলেন তখন আবদুল বারী চৌধুরী সেগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাভুক্ত এই কথা বলে আবার তার বিরোধিতা করলেন।

আবদুল বারী চৌধুরীর এই আপত্তির জবাবে এবং প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ীর সংশোধনী প্রস্তাবের সমর্থনে কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা বসন্তকুমার দাস বলেন যে প্রস্তাবিত (গ) ধারাটি কিছুতেই অগ্রাহ্য করা চলে না কারণ প্রস্তাটির প্রথম অংশে বলা হচ্ছে যে বাংলা হবে প্রদেশের সরকারী ভাষা এবং সেই হিসাবে প্রথম অংশটি থেকেই (গ) ধারাটি সরাসরিভাবে এসেছে। তিনি আরও বলেন যে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হোক এ বক্তব্য তাঁরা এই প্রস্তাবটিতে পেশ করেননি। তাঁরা শুধু একথাই বলেছেন যে মুদ্রা এবং অন্যান্য সব কিছুতে বাংলা ভাষাকে ব্যবহার করা হোক। বাংলা এই প্রদেশের সরকারী ভাষা হবে তার অর্থই হলো এই প্রদেশের সাধারণ মানুষ যাতে মুদ্রা ইত্যাদির উপর লেখা বুঝতে পারে তার ব্যবস্থা করা। সেজন্যেই এই প্রদেশের যে মুদ্রা ব্যবহৃত হবে তাতে বাংলাতে সব কিছু লেখা থাকা দরকার। পাকিস্তান সরকার যাতে সে ব্যবস্থা করতে পারেন তার জন্যেই তাঁদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। কাজেই সংশোধনী প্রস্তাবটি সম্পূর্ণভাবে প্রাসঙ্গিক।[১০]

শিক্ষামন্ত্রী আবদুল হামিদ এর পর বলেন যে বসন্তবাবু নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেননি যে প্রস্তাবটিতে 'বাংলাকে অবিলম্বে সকল প্রকার মুদ্রায় ব্যবহার করা হোক' একথা বলা হয়েছে। এবং যে রকম কোনো প্রস্তাব তাঁরা কিছুতেই গ্রহণ করতে পারেন না।[১১]

বসন্তকুমার দাস এর জবাবে বলেন মন্ত্রী মহোদয়েরও উচিত প্রস্তাবটির শেষের দিকে কি আছে সেটা দেখা। কারণ সেখানে প্রস্তাবটিকে পাকিস্তান সরকারের কাছে পাঠিয়ে সেটি কার্যকর করার জন্যে তাঁদেরকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।[১২] কিন্তু তা সত্বেও মন্ত্রী আবদুল হামিদ বলেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত ইংরেজী 'shall' কথাটি প্রস্তাবে আছে ততক্ষণ সেটিকে বাধ্যতামূলক বলেই নিতেই হবে।[১৩]

এর পর বসন্তকুমার দাস বলেন নাজিমুদ্দীনের প্রস্তাবটিতে 'সরকারী ভাষা' কথাটি অত্যন্ত অস্পষ্ট। তার অর্থ অনেক কিছুই হতে পারে। এ বিষয়ে প্রধান-মন্ত্রী পরিষদে কোনো ব্যাখ্যাও উপস্থিত করেননি। কাজেই প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ীর সংযোজিত ধারাটি তাঁর বক্তব্যের একটি অনুসিদ্ধান্ত মাত্র।[১৪] স্পীকার শেষ ধারাটি সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে সংশোধন প্রস্তাবটির (গ) (১) এবং (গ) (২) অংশটি যাতে পাকিস্তান সরকার কার্যকর করতে পারেন সেজন্যে তাঁদেরকে সে বিষয়ে জানানোর উদ্দেশ্য তাতে শুধু পূর্ব বাঙলা সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করলে তা কার্যকর করতেও পারেন, না করতেও পারেন। এটা একটা অনুরোধ মাত্র। এর মধ্যে কোনো বাধ্যতা নেই।[১৫] কিন্তু খাজা নাজিমুদ্দীন তাঁর এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কোনো সুপারিশ করতে হলেই সেটা গভর্নরের মাধ্যমে করতে হবে। পরিষদে সাধারণভাবে কোনো প্রস্তাব পাস করে তা করা যাবে না।[১৬]

বিতর্কের এই পর্যায়ে নাজিমুদ্দীন আবার এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় বসন্তকুমার দাস তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন যে তিনি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির সাথে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন তাতে তিনি নিজেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই বিষয়ে সুপারিশ করতে সম্মত হয়েছিলেন।[১৭] কিন্তু নাজিমুদ্দীন বিরোধী-দলের নেতার এই বক্তব্যকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে আবার বলেন যে সুপারিশ করতে হলে তা গভর্নরের মাধ্যমেই করতে হবে।[১৮]

প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ীর সংশোধনী প্রস্তাবের উপর কিছুক্ষণ এই বিতর্কের পর তিনি নিজের প্রস্তাবটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন :

> আমার মনে হচ্ছে কিছুদিন আগে যখন ভাষা সমস্যা নিয়ে আন্দোলন হয়েছিল সেই সময় আমাদের প্রধানমন্ত্রী মহাশয় একটা agreement পড়িয়ে শুনিয়েছিলেন তাতে আমরা আশান্বিত হয়েছিলাম। এখন যে প্রস্তাব উপস্থিত হয়েছে তাতে দেখছি agreement-এর অনেক কথা প্রস্তাবের

ভিতর নেই। আমি এই জিনিসই পরিষ্কার করে প্রকাশ করতে চাই। Official language of the province of East Bengal, in all offices of Government and semi-Government institutions and in all Courts, including the High Court of the Province, এখন যে সমস্ত গভর্নমেণ্ট Institutions ও অফিস আছে এবং semi-Government Institution যথা—District Board, Municipality এসব জায়গায়ও বাংলা ভাষা প্রচলিত হোক এইজন্য semi-Government কথাটি যোগ করতে বলছি। এবং High Court ও অন্যান্য court-এ বাংলা ভাষা প্রচলন করতে হবে কিন্তু High Court-এর order না হলে অন্যান্য Court-এ হতে পারে না। High Court থেকে যদি অন্যান্য Court-এ direction দেয় তাহলে সেখানে বাংলা ভাষায় রায় লেখা ইত্যাদি হতে পারে। (b) Clause-এ আছে as far possible যার বাংলায় অর্থ হয় যথাসম্ভব—আমি এই কথাটি উঠিয়ে দিতে চাই। এবং তার পরে একটি alternative প্রস্তাব আছে যে—প্রদেশের ভিতর যেখানে অবাঙালী ছাত্রের সংখ্যা বেশী সেখানে তাদের মাতৃভাষা গ্রহণ করা হবে আমি এই কথাটা বা এ জায়গাটা amend করতে চাই। এতে দেখা যাচ্ছে কোনো Institution-এ যদি majority ছাত্রদের ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা হয় এবং সেখানে যদি অল্প সংখ্যক বাঙালী ছাত্র থাকে তাহলে তাদের শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা হবে না। যাতে উভয়ের শিক্ষা হয় তার ব্যবস্থা করা হোক।[১৯]

প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ীর পর যতীন্দ্রনাথ ভদ্র তাঁর সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন। এই প্রস্তাবে পূর্ববর্তী প্রস্তাবগুলির থেকে নোতুন কোনো কথা বলা হয়নি। কয়েকটি শব্দ পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছিলো মাত্র। তাঁর এই সংশোধনী প্রস্তাবের উপর বক্তৃতা প্রসঙ্গে যতীন্দ্রনাথ ভদ্র বলেন:

এই resolution খুব আশাপ্রদ হলেও এর ভিতর যে একটি কথা as far as possible আছে সেটি বাদ না দিলে অনেক অসুবিধা আসবে। ঐ as far as possible কথার ধূম্রজালে অনেক কিছু লুক্কায়িত থাকতে পারে বলে সন্দেহ হওয়া অহেতুক নয় তাই আমি প্রস্তাব করছি যে ঐ as far as possible-এর জায়গায় immediately কথা লাগান হোক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয় এর এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে কোনো আপত্তির কারণ থাকতে পারবে না এবং এটা ঠিক কাজই করা হবে। এই বাংলা দেশে

অবাঙালী আসবে না বা থাকবে না তা আমি বলছি না। কিন্তু যেখানে শতকরা ১০০ জন বাঙালী সেখানে বাংলা ভাষা না করার কোনো যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। সেইজন্য আমি আশা করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয় আমার প্রস্তাব গ্রহণ করবেন।[২০]

এর পর অমূল্যচন্দ্র অধিকারী এবং সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত যথাক্রমে তাঁদের সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন। তাঁদের প্রস্তাবগুলিকে মোটামুটিভাবে পূর্ববর্তী প্রস্তাবগুলির পুনরুক্তিই বলা চলে। সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত তাঁর সংশোধনী প্রস্তাবে বাংলাকে পূর্ব বাঙলার সরকারী ও শিক্ষার ভাষা হিসাবে ১৯৪৮-এর জুন মাসের মধ্যে প্রচলনের কথা বলেন। অমূল্যচন্দ্র অধিকারী তাঁর প্রস্তাবটি পাঠ করার পর কোনো বক্তৃতা দেননি। সুরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় ভাষা বিষয়ক প্রস্তাবটি পরিষদে উত্থাপন করার জন্যে প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনকে অভিনন্দন জানিয়ে তার পর বলেন :

কিন্তু বাংলা ভাষাকে আমরা যাতে তার যথাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি এইজন্য বলছিলাম প্রস্তাবের মধ্য হতে as far as possible কথাটি তুলে দিন। এর দুইটি কারণ রয়েছে। একটি হচ্ছে ইংরাজীর কোনো কথা আমরা আনব না। কোনোদিন বাংলা ইংরাজীর সমান পর্যায়ে আসবে তা আমরা বিচার করব না, তাহলে মাতৃভাষার অবহেলা করা হবে। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে English will be replaced by Bengali এমন কোনো কথা প্রস্তাবে থাকবে না। এই প্রকারের কথায় ভয় হয়। অনেক লোক এদেশে আসে বাইরে হতে তারা এই সুযোগে বাংলা শিখবে না। মাইনে নেবে এ দেশ হতে আর এদেশের ভাষাকে অবহেলা করবে।...রাষ্ট্রের সকল প্রয়োজনীয় কাজে বাংলার প্রচলন করতে হবে, আদালতে বাংলার প্রচলন করতে হবে স্কুলে বাংলার প্রচলন করতে হবে, আইন বাংলা ভাষায় তৈরী করতে হবে। আমরা চাই যাবতীয় কিছু বাংলা ভাষায় করে দেওয়া হোক এবং তা as far as possible নয় যত শীঘ্র সম্ভব করুন।[২১]

সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের এই বক্তৃতার পর গোবিন্দলাল ব্যানার্জি একটি সংশোধনী প্রস্তাবে এক বৎসরের মধ্যে বাংলা ভাষা প্রচলনের কর্মসূচীকে কার্যকর করার প্রস্তাব করেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

যে প্রস্তাব তিনি এনেছেন তাতে মনে সন্দেহ জাগছে তাই এটা সংশোধন করে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি যে এক বৎসরের মধ্যে

বাংলা ভাষার প্রচলন হবে তার চেষ্টা করতে হবে। এ সম্পর্কে আমাদের আরও একটি সন্দেহ জাগছে এবং তাতে গভর্নমেন্টের কাজের অসুবিধা থেকে যাবে এইজন্য বলছি যে সরকারী কর্মচারীদের ভিতর অনেক non-Bengali officer আছেন তাঁরা যে দেশের সেবা করছেন সেই দেশের ভাষাও তাঁদের শিখতে হবে। তা না হলে অনেক অসুবিধা হবে। কারণ আমাদের দেশের একটি ভাষাকে নির্দিষ্ট ভাষায় পরিণত করতে হবে অবশ্য বাংলা ভাষার সাথে অন্য ভাষাও থাকবে। আর একটি কথা— রাষ্ট্রনীতির দিক হতে আমরা স্বাধীন হয়েছি কিন্তু পাকিস্তানের অধিবাসী আজ পর্যন্ত তার তাৎপর্য ভাল করে উপলব্ধি করতে পারছে না। যারা পাকিস্তান অর্জন করেছে তারা কতকগুলি জিনিস আজও বুঝতে পারছে না। তা শুধু আইনেই লেখা রয়েছে। যে দেশে তাদের জন্ম যে ভাষায় তারা ছোট বেলা হতে কথা বলতে শিখেছে সেই ভাষাকে যদি তারা নিজেদের ভাষারূপে গ্রহণ করবার অধিকার না পায় তাহলে তারা স্বাধীনতার কি অর্থ বুঝবে। সেইজন্য আমার সংশোধনী প্রস্তাব যে এক বৎসরের মধ্যে বাংলা ভাষার প্রচলন করার ব্যবস্থা করা হোক।[২২]

গোবিন্দলাল ব্যানার্জির এই বক্তৃতার পর আহমদ আলী মৃধা প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবের (ক) ধারার শেষে 'এবং যত শীঘ্র বাস্তব অসুবিধাগুলি দূর করা যায় তত শীঘ্র তাহা কার্যকর করা হইবে' এই অংশ যোগ দেওয়ার কথা বলে একটা সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন।[২৩] প্রস্তাবটি কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিশেষ কতকগুলি অসুবিধার উল্লেখ করে তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন:

বিজ্ঞানে বাংলা ভাষায় বই লিখতে এখনও অনেক সময়। ডাক্তারী পড়তে ইংরেজী ছাড়া উপায় দেখা যায় না। ইঞ্জিনিয়ার ইংরাজীতে পড়ে, ইংরাজীতে ভাবে, ইংরাজীতে গড়ে, ইংরাজীতে ভাঙে, বাংলায় এইসব করতে হবে। দেখুন ঐ ঘড়িটি উহার 'ডায়ালে' লিখতে হবে বাংলায় ১, ২, ৩। তবে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হবে। বিভিন্ন জগদ্দল পাথর আমাদের বুকের উপর থেকে নেমে গেলে আমরা মানুষ হয়ে দাঁড়াতে পারবো। ধীরেনবাবুর সবুর হয় না? এইসব বাধা যতদূর সম্ভব দূর না করে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা যায় না। এই বলে আমার সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করছি। আমি আশা করি আমাদের নেতা এটি গ্রহণ করবেন।[৪]

আহমদ আলী মৃধার পর রাজেন্দ্রনাথ সরকার একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে সেই প্রসঙ্গে বলেন:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয় সময় উপযোগী এই প্রস্তাব এনেছেন বলে তিনি ধন্যবাদার্হ। কিন্তু এই প্রস্তাব যেভাবে আমাদের সামনে আনা হয়েছে তাতে অনেক অসুবিধা আছে। আমরা জানি বাংলা ভাষার মধ্যে বহু রকম শব্দ আমরা গ্রহণ করেছি—মন্ত্রী মহাশয় বললেন বাংলা ভাষা আরও অনেক শব্দ হজম করেছে এবং এখনও অনেক করতে হবে। সত্যই আমাদের ভাষার মধ্যে অনেক ইংরাজী, আরবী, উর্দু, ফার্সী ও অন্যান্য ভাষা এসে পড়েছে। সেগুলি ব্যবহার করা আমাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। সেইজন্য বলছি এই প্রস্তাব যদি সমর্থিত হয় তাহলে গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে কোনো কার্যকরী প্রস্তাব ঘোষণা করা হোক।[২৫]

এর পর মনোরঞ্জন ধর তাঁর সংশোধনী প্রস্তাবে ডাক টিকিট, মুদ্রা, রেলওয়ে টিকিট, সরকারী ফর্ম ইত্যাদিতে বাংলা ব্যবহারের জন্য পাকিস্তান সরকারের সাথে আলোচনার জন্যে পূর্ব বাঙলা সরকারকে অনুরোধ জানান এবং সেই সাথে মূল প্রস্তাবটি থেকে 'যথাসম্ভব' কথাটি তুলে দেওয়ারও প্রস্তাব করেন।[২৬]

মনোরঞ্জন ধরের পর মুদাব্বের হোসেন চৌধুরী একটি সংশোধনী প্রস্তাবে পূর্ববর্তী সংশোধনী প্রস্তাবগুলির মতই 'যথা সম্ভব' তুলে দেওয়ার কথা বলেন। এ ছাড়া তিনি আরও প্রস্তাব করেন যে পূর্ব বাঙলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা, উর্দু অথবা ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষা। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজের বক্তৃতায় বলেন যে ৫১।৪৯ এই সংখ্যাধিক্য একটা ভয়ানক অনিশ্চিত ব্যাপার সেই জন্যে তিনি 'অধিকাংশ' কথাটি তাঁর সংশোধনী প্রস্তাব থেকে বাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন যে মণিপুরী চা বাগানগুলিতে তিনি সেখানকার ছাত্রদের মাতৃভাষায় তাদেরকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা দেখেছেন। তিনি সেই ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার বিরোধী। ঢাকাতেও কোনো কোনো অঞ্চলে উর্দু ব্যবহৃত হয়।[২৭]

এই কথা বলার সময় পরিষদে 'না, না' ধ্বনি ওঠে। এর পূর্বেও মুদাব্বের হোসেন যখন ইংরেজীতে তাঁর বক্তৃতা শুরু করেন তখন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁকে বাংলাতে তাঁর বক্তব্য পেশ করার জন্যে বলায় কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।[২৮]

এর পর আবদুল বারী চৌধুরী তাঁর সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপনের পর একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিলো না।[২৯] আবদুল বারী চৌধুরীর সংশোধনী প্রস্তাবটিই সেদিনকার পরিষদে প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের প্রস্তাবের উপর সর্বশেষ সংশোধনী প্রস্তাব। এর পর সরকারী প্রস্তাবের কয়েকটি দিক এবং সাধারণভাবে ভাষা প্রশ্নের উপরে পরিষদের

কয়েকজন সদস্য তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। সর্বশেষ সংশোধনী প্রস্তাবটির পর পূর্ণেন্দুকিশোর সেনগুপ্ত খুব সংক্ষেপে দুই এক কথা বলার পর শামসুদ্দীন আহমদ ইংরেজীতে তাঁর বক্তৃতা শুরু করেন। পরিষদে ভাষা বিষয়ক প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্যে নাজিমুদ্দীনকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের পর তিনি বলেন যে রাষ্ট্র-ভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে প্রধানমন্ত্রী যে আটদফা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন সেই চুক্তির শর্তগুলি তাঁর প্রস্তাবে কয়েকটি স্থানে পরিবর্তন করা হয়েছে। সেই চুক্তির চতুর্থ ধারায় ছিল প্রধানমন্ত্রী পরিষদে একটি সরকারী বিল উত্থাপন করবেন। শামসুদ্দীন আহমদের এই কথার প্রতিবাদ করে নাজিমুদ্দীন বলেন যে, তিনি যা বলছেন তা সঠিক নয়। মোদাব্বের হোসেন প্রধানমন্ত্রীকে এই যুক্তিতে সমর্থনের চেষ্টা করেন যে পরিষদের বাইরে কার সাথে কি চুক্তি হয়েছে সেটা পরিষদে আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে না। প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী তখন তার জবাবে বলেন যে প্রধানমন্ত্রী নিজেই তাঁদের অবগতির জন্যে পরিষদে চুক্তিটি পাঠ করে শুনিয়েছিলেন।[৩০]

এই বিতর্কের পর শামসুদ্দীন আহমদ আবার তাঁর বক্তৃতা শুরু করেন। বাংলাকে যথাশীঘ্র কি ভাবে পূর্ব বাঙলায় চালু করা সম্ভব সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি অথবা ঐ ধরনের কোনো তারিখ থেকে মাট্রিকুলেশন পর্যায় পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে হবে এই মর্মে আগামীকালই আমরা শিক্ষা বিভাগকে নির্দেশ দিতে পারি। স্যার, আমি মনে করি যে সমস্ত জিনিসটি যখন পরিষদের সামনে আনা হয়েছে তখন সেটা পরিষ্কার করে নেওয়া এবং এ ব্যাপারে একটা লক্ষ্য-তারিখ নির্ধারণ করা উচিত।[৩১]

এর পর শামসুদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রীকে 'যথাসম্ভব' কথাটি মূল প্রস্তাব থেকে প্রত্যাহার করে নিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে 'পূর্ব বাঙলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার মাধ্যম বাংলা হবে' প্রস্তাবটির পাঠ এই রকম হওয়া দরকার। কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকারী প্রস্তাবের এই ধারার শেষ অংশের সাথে তাঁর কোনো ঝগড়া নেই বলেও তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। কোনো প্রতিষ্ঠানে অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষা উর্দু অথবা বাংলা হলে সেইভাবে তাদেরকে শিক্ষা দানের অসুবিধার কথা উল্লেখ করলেও তিনি প্রস্তাবের সেই অংশের বিরোধিতা থেকে বিরত থাকেন। প্রস্তাবটি থেকে 'যথাসম্ভব' কথাটি তুলে নিলে অনেক 'ভুল' বোঝাবুঝি, হতবুদ্ধিতা এবং বিতর্কের' অবসান হবে

একথা বলার পর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে পরিষদের সামনে প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের বক্তৃতা শেষ করেন।

শামসুদ্দীন আহমদের বক্তৃতার এই অংশের সাথে প্রথম অংশের বক্তব্যের গরমিল সহজেই লক্ষণীয়। প্রথমদিকে তিনি প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ উত্থাপন করলেও শেষের দিকে তিনি চুক্তি রক্ষার জন্যেই তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন!

এর পর স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার পরিষদে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি দীর্ঘ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দেন।* প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন ব্যতীত তাঁর বক্তৃতায় পরিষদে উত্থাপিত সরকারী ভাষা বিষয়ক প্রস্তাবটি সম্পর্কে তিনি তেমন কোনো আলোচনাই করেননি। তাঁর সেদিনকার বক্তৃতা পাঠ করলে মনে হয় তিনি যেন পরিষদে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনার জন্যে না দাঁড়িয়ে বাংলাভাষা বিষয়ক একটি সাহিত্য সভায় সভাপতির ভাষণ প্রদান করছেন। অবশ্য এই প্রসঙ্গে তিনি বাংলা ভাষাকে পূর্ব বাংলার সরকারী ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে প্রচলনের কতকগুলি বাস্তব দিক সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতার শেষের দিকে আলোচনা করেন। মূল প্রস্তাবের উপর বিশেষ কোনো বক্তব্য পেশ না করলেও বাংলা ভাষা সম্পর্কে তিনি সেদিন যে সব কথা বলেন তার কোনো কোনো অংশ ভাষা-বিষয়ক কতকগুলি সাধারণ প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত এবং সেই হিসাবে তার উল্লেখ প্রয়োজন। বাংলা ভাষা চর্চার প্রথম পর্যায়ে তার প্রতি হিন্দু মুসলমান শাস্ত্রকার এবং নবাব বাদশাহদের মনোভাব সম্পর্কে আলোচনা করে তিনি দেখাতে চান যে বাংলা বস্তুতঃপক্ষে মুসলমানদের দ্বারা গঠিত ভাষা। হিন্দুদের হাত থেকে উদ্ধার করে তারাই তাকে নবজীবন দান করে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

ইসলাম গণতান্ত্রিক ধর্ম, বিপ্লবী ধর্ম, এইজন্য ইসলামের অনুসারীরা

*বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি হাবিবুল্লাহ বাহারের যে একটা সত্যিকার দরদ ও ভালবাসা ছিলো তা অনস্বীকার্য। প্রাদেশিক মন্ত্রীদের মধ্যে যে দু-তিন জন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা চিন্তা করতেন এবং সে ব্যাপারে সহায়তা করতে ইচ্ছুক ছিলেন তাদের মধ্যে বাহার সাহেব নিঃসন্দেহে ছিলেন অগ্রগণ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও মন্ত্রীত্বের প্রতি তাঁর দুর্বলতাও ছিলো অনস্বীকার্য। এই দ্বিবিধ দুর্বলতার দোটানায় পড়ে ইচ্ছাসত্ত্বেও বাংলাভাষার আন্দোলনে তিনি পরিপূর্ণ-ভাবে কখনো শরীক হতে পারেননি। এ ব্যাপারে তাঁর দোদুল্যমানতা ও দ্বৈত আনুগত্য ব্যবস্থাপক সভায় তাঁর এই বক্তৃতার মধ্যে সুস্পষ্ট।

স্বাভাবিকভাবেই জনগণের ভাষা বাঙলাকে রাজদ্বারে আসন দিয়েছিলেন। শাহী দরবারে বাংলা ভাষা যখন মজলিস জমিয়ে বসেছিল সে সময় এদেশের শাস্ত্রকাররা রামায়ণ বা পুরাণের অনুবাদক বা অনুবাদে শ্রোতার জন্ত রৌরব নরকের ব্যবস্থা দিচ্ছিলেন। কবি কাশীদাস মহাভারতের প্রতি অধ্যায়ের শেষে "মস্তকে বাঁধিয়া ব্রাহ্মণের পদরজঃ কহে কাশীদাস "বলে ব্রাহ্মণের বন্দনা করলেও এতটুকু সহানুভূতি পাননি তাঁদের কাছ থেকে। বরং ভট্টাচার্য মহাশয়েরা প্রবাদ বাক্য তৈরী করেছিলেন "কৃত্তিবেসে কাশীদেশে আর বামুন ঘেসে এই তিন সর্বনেশে" বলে।

শুধু তাই নয় শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেনের উদ্যোগে পূর্ব বঙ্গ থেকে যে সব গীতি কথা ও পল্লীগান সংগৃহীত হয়েছে, যেগুলো সাহিত্যের অত্যুজ্জ্বল মণি, বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাওয়ার যোগ্য বলে প্রশংসা পেয়েছে রমাঁ রলাঁর মতো আধুনিক সাহিত্য-রসিকদের কাছ থেকে, সেগুলোও সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছিল হিন্দু শাস্ত্রকারদের দ্বারা। কারণ কবির এই অপূর্ব সৃষ্টি শাস্ত্রের অনুশাসন মানেনি, লোকাচার ও সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে তুলেছে বিদ্রোহের আওয়াজ। এসব গানে নেই ঠাকুর দেবতা ভগবানের প্রতি ভক্তির কথা। এতে আছে ইতর জাতির নায়কের কথা, কুমারী কন্যার স্বেচ্ছাবর গ্রহণের কথা, ভিন জাতির নায়ক-নায়িকার প্রেমের কাহিনী।

শাস্ত্রকারের বিদ্রোহের ভেতর দিয়ে যে সাহিত্যের ভিত্তিপত্তন হয়, যে ভাষা ছিল গণ-মানসের বাহন তা যে গোড়া থেকেই মুসলিম নবাব, আমীর বাদশাহদের সমর্থন লাভ করবে তা স্বাভাবিক। আজ সেই ভাষা যে নবজাত পূর্ব পাকিস্তানের আইন সভায় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করবে তা আরও স্বাভাবিক—ইংরেজীতে যাকে বলে in the fitness of things.

গৌড়ের দরবারে বাংলা ভাষার আদি কবি কৃত্তিবাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস যখন মর্যাদা লাভ করেছিলেন তখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সমর্থন এঁরা পাননি। আনন্দের বিষয় আজ ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ, হিন্দু, মুসলিম, তপসিলী, খৃস্টান সকলের সমর্থন পাচ্ছে জননী বঙ্গভাষা। বিরোধের সুর শোনা যাচ্ছে না আজকের এই সভায় কোনো দিক থেকেই "অষ্টাদশ-পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ। ভাষায়াং মানবং শ্রুত্বা রৌরবং নরকং গচ্ছেৎ॥" বলে বাংলা ভাষার সেবকদের যাঁরা অভিসম্পাত করছিলেন তাঁদের সুযোগ্য বংশধর বন্ধুবর গোবিন্দলাল ব্যানার্জি, গণেন ভট্টাচার্যি আজ আমাদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন তাঁদের ধন্যবাদ।[৩২]

স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহারের বক্তৃতার এই অংশের মূল বক্তব্য হলো এই যে বাংলা আসলে মুসলমানদের ভাষা, তারাই হিন্দুদের বিরোধিতা সত্ত্বেও এর পরিচর্যা করে এসেছে কাজেই মুসলমানরা তাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দান করবে সেটাই স্বাভাবিক। শুধু তাই নয়। তিনি বাংলাকে পূর্ব বাঙলার রাষ্ট্রভাষা করার উদ্যোগে 'আজ' শরীক হওয়ার জন্যে হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিষদ্ সদস্যদেরকে ধন্যবাদও জ্ঞাপন করেন। এই বক্তৃতারই অন্যত্র তিনি আবার বলেন :

> যে ভাষা ছিল গণ-মানসের বাহন তা যে গোড়া থেকেই মুসলিম নবাব, আমীর বাদশাহদের সমর্থন লাভ করবে তা স্বাভাবিক। আজ সেই ভাষা যে নবজাত পূর্ব পাকিস্তানের আইনসভায় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করবে তা আরও স্বাভাবিক।

এই সমস্ত কথার মাধ্যমে হাবিবুল্লাহ বাহার কর্তৃক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এবং সমগ্র ভাষা আন্দোলনের চরিত্রকে বিকৃত করার অদ্ভুত প্রচেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমতঃ, সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে উনিশ এবং বিশ শতকে হিন্দু সাহিত্যিকদের বাংলা ভাষা চর্চা ও সাধনার বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই। হুসেনশাহী আমল থেকে এক লাফে খাজা নাজিমুদ্দীনের রাজত্বে পৌঁছে গিয়ে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দানের ক্ষেত্রে হিন্দুদের উদ্যোগ ও সহযোগিতাকে তিনি একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা বলে চিত্রিত করার যে চেষ্টা করেছেন তা হাস্যকর হলেও তাৎপর্যপূর্ণ।

হুসেন শাহী আমলে বাংলা ভাষার চর্চাকে উৎসাহ দান করা হয়েছিলো এজন্যে নয় যে 'বাংলা ভাষা ছিল গণ-মানসের বাহন কাজেই স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম নবাব, আমীর বাদশাহরা তাকে সমর্থন করেছিলেন।' তাঁরা বাংলা চর্চার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে বাঙলাদেশের হিন্দু ক্ষাত্রশক্তিকেই আঘাত করতে চেয়েছিলেন। মুসলমান সুলতানেরা বাঙলাদেশে রাজত্ব স্থাপন করলেও বিদেশী হিসাবে এদেশের সাথে তাঁদের কোনো সংযোগ ছিল না। সংস্কৃতচর্চাকারী হিন্দু অভিজাত সমাজের বিরুদ্ধে নানাভাবে সংগ্রাম করে তাঁরা এদেশে নিজে-দেরকে প্রতিষ্ঠা করার যে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন বাংলা চর্চায় উৎসাহদান ছিল তারই একটি। সেই সময় হিন্দু অভিজাতদের ভাষা ছিল সংস্কৃত। কাজেই তাঁরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে বাংলার বিরোধিতা করেছিলেন এবং শাস্ত্রকাররা এ ব্যাপারে যথারীতি এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের সহায়তা করতে। প্রকৃতপক্ষে মুসলমান বাদশাহরা যে কারণে বাংলা ভাষার উন্নতিতে কিছুটা উৎসাহ দান করেছিলেন সেই একই রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক কারণে হিন্দু

অভিজাত ও শাস্ত্রকারেরা তার বিরোধিতা করেছিলেন। তার মধ্যে 'গণ-মানস', 'গণ-স্বার্থ' ইত্যাদির কোনো প্রশ্নই ছিল না।

যে নবাব বাদশাহরা মুসলমান হওয়ার জন্যে শত শত বছর পূর্বে বাংলা ভাষা চর্চায় উৎসাহদান করেছিলেন 'তাঁদের বংশধর' খাজা নাজিমুদ্দীন বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দান করার প্রস্তাব করায় হাবিবুল্লাহ বাহার তাকে অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে বর্ণনা করেছেন। একথা অনস্বীকার্য যে তাঁর এইসব উক্তি সদ্য সংঘটিত ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসকে বিকৃত করে বাংলা ভাষা কিভাবে খাজা নাজিমুদ্দীনের দ্বারা পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী ভাষা হিসাবে প্রস্তাবিত হলো সে বিষয়ে একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে।

এর পর ভারতীয় ইতিহাসে ভাষার ক্ষেত্রে অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্রের ভূমিকা সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্য উপস্থিত করে তিনি নিজের পূর্ব বক্তব্যকে জোরদার করার চেষ্টা করেন :

> ভারতের ইতিহাস অভিজাততন্ত্র আর গণতন্ত্রের বিরোধের ইতিহাস। আদি যুগে অভিজাত ঋষিদের ভাষা ছিল বৈদিক ভাষা, আর লৌকিক ভাষা ছিল জনগণের ভাষা। এই দুই ভাষার বিরোধে লৌকিক ভাষার জয় হল। নিরুপায় হয়ে অভিজাততন্ত্রীরা লৌকিক ভাষাকে সংস্কৃত করে নিল। জনসাধারণ তখন ব্যবহার করতে লাগল লৌকিক ভাষা পালী। বিপ্লবী বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় পালী হয়ে উঠলো ঐশ্বর্যশালী। পরের যুগে পালী হল অভিজাত ভাষা, লৌকিক ভাষা হ'ল প্রাকৃত। পালীকে হারিয়ে জনগণের ভাষা প্রাকৃত চলল এগিয়ে। এর পর প্রাকৃতকে পরাস্ত করে জনগণের ভাষা অপভ্রংশ থেকে জন্ম নিল বাংলা, হিন্দী, গুজরাতী, আসামী, উড়িয়া, মারাঠি ও বন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা। অভিজাততন্ত্র আর গণতন্ত্রের এ লড়াই এখনো শেষ হয়নি। এ সংগ্রাম চলছে এখনো বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বংশধরেরা বাংলাকে এখনো বেঁধে রাখতে চাচ্ছেন সংস্কৃতের শৃঙ্খলে। আর জনগণের ভাষা পেতে চাচ্ছে সাহিত্যের মর্যাদা। বাংলা ভাষা যখন রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেতে চলেছে সে সময় জনগণের ভাষা আমাদের কাছে স্বীকৃতি পাবে কিনা, এ প্রশ্ন নূতন করে আমাদের সামনে দেখা দিয়েছে। আমরা গণতন্ত্রের সমর্থক। এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের দিতে পারা উচিত সহজেই। জনগণের ভাষাকে সাহিত্যের ভাষায় রূপায়িত করাই হবে

আমাদের নীতি। লৌকিক বৈদিককে, পালী সংস্কৃতকে, প্রাকৃত পালীকে, অপভ্রংশ প্রাকৃতকে যেমন করে হারিয়ে দিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল তেমনিভাবে গণভাষা ও গণসাহিত্য সংস্কৃত ঘেঁষা অভিজাত সাহিত্যকে ঠেলে ফেলে মাথা উঁচু করে দাঁড়াক—এই হবে আমাদের আকাংখা।৩৩

অভিজাততন্ত্র এবং গণতন্ত্রের ভিত্তিতে ভারতীয় ইতিহাসে ভাষার লড়াইয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে হাবিবুল্লাহ বাহার তাঁর এই অংশের বক্তব্যকে যে পরিণতির দিকে নিয়ে গেছেন সেটাও সদ্য সংঘটিত ভাষা আন্দোলনের বিকৃত ব্যাখ্যা এবং ভাষা বিতর্কের প্রকৃত তাৎপর্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টির আর একটি উদাহরণ। এই অংশের শেষে তিনি 'সংস্কৃত ঘেঁষা অভিজাত সাহিত্যকে বাদ দিয়ে বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পূর্ব বাঙলায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন যে 'সংস্কৃত ঘেঁষা অভিজাত সাহিত্য' বিরোধী নয়, উর্দুকে পূর্ব বাঙলার উপর চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে একটা গণতান্ত্রিক সংগ্রাম এই গুরুত্বপূর্ণ কথার কোনো উল্লেখ তাঁর বক্তৃতায় নেই। তাঁর বক্তব্য থেকে মনে হয় ভাষা আন্দোলন হিন্দু অভিজাতদের সংস্কৃত ভাষার বিরুদ্ধে খাজা নাজিমুদ্দীন এবং তাঁর মন্ত্রীসভার অন্যান্য 'গণতন্ত্রের সমর্থক'দের বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন!

ভারতীয় ইতিহাসের অন্যান্য পর্যায়ের মতো এই পর্যায়েতেও যে 'অভিজাতদের' ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রীয় এবং অন্যান্য কারণে বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার ফলেই ভাষা আন্দোলনের উৎপত্তি ও বিকাশ এবং তার পরিণতি হিসাবেই যে খাজা নাজিমুদ্দীনের সরকারী প্রস্তাব—একথার উল্লেখ হাবিবুল্লাহ বাহারের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতার কোথাও নেই।

এরপর হাবিবুল্লাহ বাহার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আরবী ফারসী প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেন এবং এইসব ভাষার কত প্রকার শব্দ বাংলা ভাষার নিজস্ব হয়ে গেছে তার একটা তালিকাও পেশ করেন। বাংলা ব্যাকরণের উপর কতকগুলি শব্দ কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

বাংলা ব্যাকরণেও মুসলমান প্রভাব কম নয়। 'খোর' (গাঁজাখোর ইত্যাদি শব্দে) 'দার' (ঠিকাদার ইত্যাদি শব্দে), 'দান' (পিকদান ইত্যাদি শব্দে) এবং গিরি (গুরুগিরি ইত্যাদি শব্দে) তদ্ধিত প্রত্যয়ের কাজ করছে। ভট্টাচার্য পণ্ডিতের আপত্তি সত্বেও 'ধনদৌলত', 'গরীব-কাঙাল', 'হাট-বাজার', 'জিনিসপত্র', 'লজ্জা' 'সরম', 'চালাক' 'চতুর', 'কাণ্ড', 'কারখানা,' 'লোক', 'লস্কর', 'খানা' 'খন্দক', 'শাকসবজি', 'ঝড়', 'তুফান', 'মুটে'

'মজুর', 'হাসি,, 'খুসি' প্রভৃতি যুগ্ম শব্দে সংস্কৃত, আরবী, ফারসীর সঙ্গে যেমন গলাগলি করে চলেছে তেমনি হিন্দু মুসলিম হাত ধরাধরি করে সৃষ্টি করেছে বাংলা সাহিত্য।[৩৪]

'হিন্দু মুসলিম হাত ধরাধরি করে সৃষ্টি করেছে বাংলা সাহিত্য' একথা এখানে এবং অন্যত্র দুই-একবার স্বীকার করলেও হাবিবুল্লাহ বাহারের সমগ্র বক্তৃতার সত্যিকার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো এই যে মুসলমানরাই বাংলা সাহিত্যের বর্তমান উন্নতির কৃতিত্বের মুখ্য দাবীদার। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে মুসলমান কবি সাহিত্যিকদের দান অনস্বীকার্য এবং তাঁদের কাব্য ও সাহিত্য চর্চা যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে নূতন শব্দ এবং চিন্তাধারার দিক দিয়ে অনেকাংশে সমৃদ্ধ করেছে তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু হাবিবুল্লাহ বাহার এই সত্যকে তার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচারের কোনো চেষ্টা না করে কোনো কোনো প্রখ্যাত হিন্দু সমালোচক এবং ঐতিহাসিকের সাম্প্রদায়িক পথ অনুসরণ করেই তাঁর আগাগোড়া বক্তব্যকে একটা বিকৃত সাম্প্রদায়িক চরিত্র দান করেন। পূর্ব বাঙলায় সাহিত্যিকদের সাহিত্য কর্ম কি ধরনের হবে সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন :

আদি বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে দেবতার লীলা-খেলাকে কেন্দ্র করে। দেবভূমি থেকে বাংলা সাহিত্যকে মাটির পৃথিবীতে নামিয়েছেন মুসলমান। এর পর বহুদিন বাংলা সাহিত্যের কারবার ছিল রাজরাজড়া নিয়ে। ধীরে ধীরে উজির পুত্র, কোটালপুত্র, সওদাগর পুত্র স্থান পেয়েছে এখানে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র মধ্যবিত্ত সমাজে সাহিত্যকে নামিয়ে এনেছেন। বাঙলার বিরাট জনসমাজ এখনো সাহিত্যে স্থান পায়নি। আজ পাকিস্তানবাদী সাহিত্যিকের কাজ হবে—রিক্ত সর্বহারাকে সাহিত্যে স্থান দেওয়া। এদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করা। এক কথায় সত্যিকারের গণ-সাহিত্য সৃষ্টির সাধনা হবে আমাদের সাধনা।[৩৫]

এক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে 'পাকিস্তানী' সাহিত্যিকের পরিবর্তে পাকিস্তানবাদী' সাহিত্যিকদের উপর এদেশের সাহিত্যকে গণ-মুখী করার দায়িত্ব অর্পণ করার আবেদন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর এই সমস্ত সাধারণ বক্তব্যের পর তিনি বর্ণ মালা এবং ব্যাকরণ সংস্কার সম্পর্কে নিজের অভিমত পরিষদে ব্যক্ত করেন :

বাংলা অক্ষর সংস্কার সম্পর্কে আমাদের কোনো সংস্কার দিয়ে চালিত হলে চলবে না। বাংলায় আরবী বর্ণমালা চালান যায় কিনা, এ বিষয়ে কোনো

কোনো মহলে আলোচনা চলছে। এক সময় বাংলা আরবী অক্ষরে লেখা হ'ত তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। আমার কাছে আলাওলের পদ্মাবতীর কয়েকখানি হাতে লেখা পুঁথি আছে। বইখানি আরবী অক্ষরে লেখা (মাননীয় মিঃ হাবিবুল্লাহ সাহেব এই সময় পুথিখানি সকলকে দেখান) বাংলায় আরবী অক্ষরের প্রবর্তন হলে যদি আমাদের সুবিধা হয়, ছাপা টাইপরাইটার ইত্যাদি ব্যাপারে আরবী অক্ষর অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত বলে প্রমাণ হয়, নিশ্চয়ই আমরা এ অক্ষর গ্রহণ করব। শুধু Sentiment-এর বশবর্তী হয়ে কিছু করা নিশ্চয়ই সমীচীন হবে না বাংলায় রোমান বর্ণমালা প্রবর্তনের প্রস্তাবও রয়েছে আমাদের সামনে। এ সম্পর্কেও ভাবা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে আমরা এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি দিয়ে যেন চালিত হই।[৩৬]

বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির নামে বাংলা অক্ষর বর্জন করে আরবী অক্ষর এবং অন্যথায় রোমান হরফ বিবেচনার প্রস্তাবকে হাবিবুল্লাহ বাহার এ ক্ষেত্রে যুক্তি-সঙ্গত বলে দেখাতে চেয়েছেন। শুধু তাই নয়। আরবী অক্ষরের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্বকেও তিনি গোপন করেননি। খোলাখুলিভাবে তাঁর বক্তব্যের যৌক্তিকতা প্রদর্শনের জন্যে আলাওলের একটি পুথি নিয়ে এসে সেটি সকলকে দেখাবার চেষ্টাও তিনি করেন। রোমান অক্ষরের কথা তিনি প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করলেও নিজের বক্তৃতার মধ্যেই তিনি আরবী অক্ষর সম্পর্কে একথা স্বীকার করেছেন যে, 'এ বিষয়ে কোনো কোনো মহলে আলোচনা চলছে।' এই মহলটি হল পাকিস্থান সরকারের শিক্ষা দফতর। আরবী অক্ষর প্রবর্তনের চেষ্টায় তাদের কার্যকলাপ এর পরও বেশ কিছুদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

হাবিবুল্লাহ বাহার তাঁর এই সব গুরুত্বপূর্ণ উক্তির মাধ্যমে নানা বিভ্রান্তিকর বক্তব্য উপস্থিত করার পর এই কথা বলে তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন :

আজ আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। এই নূতন আবহাওয়ায় আমরা সন্ধান পাব জাতির শাশ্বত প্রাণধারার। আমরা সহজভাবে সাড়া দিতে পারব বিশ্বসংস্কৃতির আবেদনে। নবলব্ধ আজাদীর অপূর্ব প্রাণশক্তি এনে দেবে আমাদের মানস ও মনকে অফুরন্ত উদ্যম ও তেজ। এই উদ্যম এই প্রাণচঞ্চলতা থেকে জন্ম নেবে নূতন যুগের নূতন সাহিত্য। এই নূতন সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাপারে আজকের এই রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক প্রস্তাব নানাদিক থেকেই হবে সহায়ক।[৩৭]

হাবিবুল্লাহ বাহারের বক্তব্য যাই-হোক ভাষা ও বাচনভঙ্গীর প্রসাদগুণে

তাঁর বক্তৃতার সময় পরিষদে একটা গুরুগম্ভীর আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। সেই আবহাওয়াকে চুরমার করে এর পরই আবদুস সবুর খান ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে ধীরেনবাবু তাঁর সংশোধনী প্রস্তাবে immediately কথাটার উপর বড় জোর দিয়েছেন এবং বক্তৃতা দেওয়ার সময় প্রাদেশিকতার গণ্ডী ছাড়িয়ে গোটা পাকিস্তানকে নিয়ে আলোচনা করেছেন যদিও প্রস্তাবে শুধু পূর্ব পাকিস্তানের কথাই আছে। এর পর তিনি ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি সংবিধান সভায় এ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার চেষ্টা করেননি কেন? এ ছাড়া ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রস্তাব করেছেন বাংলা ভাষাকে সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রভাষায় স্থান দেওয়ার। কিন্তু সেটা যে সম্ভব নয় ধীরেনবাবু তা ভালভাবেই জানেন। ভারতেও হিন্দী রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃত হলেও সেখানে তাকে সেইভাবে চালু করা একই কারণে বিলম্বিত হচ্ছে।[৩৮]

সবুর খানের প্রশ্নের জবাবে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন :

প্রথম কথা হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় পরিষদের নিয়ম অনুসারে সেখানে ইংরাজীতেই সকল কাজকর্ম হয়ে থাকে। তৎসত্ত্বেও আমি বাংলায় বলতে চেষ্টা করেছিলাম সেকথা যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা জানেন। আমি ইংরাজী জানা একজন উকিল একথা তমিজুদ্দীন সাহেব ও কায়েদে আজম জানেন। সে ক্ষেত্রে ইংরাজী না জানার অজুহাতে অন্য ভাষার ব্যবহার করতে পারি না। তাই আমাকে বাংলা বলার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করার পর ইংরাজীতে বলতে হয়েছিল।[৩৯]

সংবিধান সভা ও গণ-পরিষদে ভাষা বিষয়ক যে নীতি নির্ধারিত হয়েছিল সে অনুসারে ইংরাজী এবং উর্দু ব্যতীত অন্য কোনো ভাষা সেখানে ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। কোনো সদস্য এই দুই ভাষার একটিও না জানলে শুধুমাত্র সে ক্ষেত্রেই অন্য ভাষায় বক্তৃতার অনুমতি ছিল। এই নীতি অনুসারে ইংরেজী জানা উকিল হিসাবে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাংলায় বক্তৃতা দেওয়ার উপায় ছিল না।

খাজা নাজিমুদ্দীন কিন্তু এসব প্রশ্ন সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের কথার প্রতিবাদে বলে ওঠেন, 'সেটা ঠিক নয়। আপনি যদি ইংরেজীতে কথা বলতে না পারেন তাহলে আপনি বাংলা বলতে পারেন।'[৪০]

সবুর খানের প্রশ্ন এবং ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে নাজিমুদ্দীনের এই বক্তব্য নিতান্তই অর্থহীন এবং হাস্যকর। খুব সম্ভবতঃ তাঁর এই অদ্ভুত উক্তির আসল কারণ বাংলাতে পেশ করা ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বক্তব্য

তাঁর পক্ষে সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব হয়নি।

এই ঘটনার পর মহম্মদ আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী, আবদুল মমিন এবং নূরুল হোসেনখান পরিষদে বক্তৃতা করেন। আবদুল মমিন বলেন যে পরিষদে প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবের যে সমালোচনা হয়েছে তাতে মনে হয় তাঁরা চান আলা-উদ্দীনের প্রদীপের মতো রাতারাতি সব পরিবর্তন করে দিতে। যাঁরা বাংলা সম্বন্ধে এত কথা বলেন তাঁরা নিজেরাই ইংরেজীতে প্রশ্ন করেন বলেও তিনি অভিযোগ করেন। এ প্রসঙ্গে নূরুল হোসেন খান শামসুদ্দীন আহমদের বক্তৃতার উল্লেখ করে বলেন যে তিনি বাংলা ভাষার একজন মস্ত ধ্বজাধারী হওয়া সত্ত্বেও ভাষা বিষয়ক প্রস্তাবের উপর নিজে বক্তৃতা করেছেন ইংরাজীতে। এর থেকেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে এদেশে বাংলা প্রচলনের জন্য যথেষ্ট সময় প্রয়োজন।[৪১]

৪ ॥ বিতর্কের জবাবে নাজিমুদ্দীনের বক্তৃতা

এর পর ভাষা বিষয়ক সরকারী প্রস্তাবের উত্থাপক প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন তাঁর প্রস্তাবের উপর বিতর্কের জবাব দিতে ওঠেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে প্রস্তাবটির দ্বিতীয় অংশটির কতকগুলি সমালোচনা সত্ত্বেও মূল প্রস্তাবটির বিষয় পরিষদে সম্পূর্ণ মতৈক্য লক্ষিত হয়েছে। একটি সমালোচনা হয়েছে 'যথাসম্ভব'কে কেন্দ্র করে এবং অপরটি হয়েছে তারিখ নির্ধারণের বিষয়টি নিয়ে। এই দুই সমালোচনাকে বিবেচনা করে তিনি আহমদ আলী মৃধার ১৬ নম্বর সংশোধনী প্রস্তাবটিকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে পরিষদকে জানান। তিনি বলেন যে সংশোধনী প্রস্তাবটিকে গ্রহণ করার পর মূল প্রস্তাবের প্রথম অংশের পাঠ দাঁড়াবে নিম্নরূপ :

> পূর্ব বাঙলা প্রদেশে ইংরাজী স্থলে বাংলাকে সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা হইবে ; এবং যত শীঘ্র বাস্তব অসুবিধাগুলি দূর করা যায় যত শীঘ্র তাহা কার্যকর করা হইবে।[১]

সংশোধনী প্রস্তাবটিকে গ্রহণ করার কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে খাজা নাজিমুদ্দীন বলেন :

> আমি সংশোধনী প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছি এজন্য যে প্রথমতঃ ইংরাজীর স্থান বাংলা কত দিনে নিতে পারবে সে বিষয়ে কোনো নিশ্চয়তা নেই। কতকগুলি বাস্তব অসুবিধা যে আছে সেকথা অস্বীকার করা যায় না।

উদাহরণস্বরূপ এই পরিষদে অধিকাংশ বক্তৃতা বাংলাতে দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা ইতিমধ্যেই একটা পদক্ষেপ নিয়েছি কিন্তু স্যার, একাধিকবার আপনি নিজেই বাংলা বক্তৃতা রেকর্ড করা নিয়ে নানা অসুবিধার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনুরোধ জানিয়েছেন যাতে সদস্যেরা ইংরাজীতে তাঁদের বক্তৃতা দেওয়ার চেষ্টা করেন। সুতরাং, স্যার, আপনি সহজেই কল্পনা করতে পারেন যে এ রকম একটা ছোট জায়গাতেও আমরা এমন বাস্তব অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছি যার ফলে আমি নিশ্চত যে এখানে বাংলা বক্তৃতার রিপোর্ট তৈরী করতে অনেক বেশী সময় লাগছে। কাজেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন না করে যদি সমগ্র প্রশাসন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলা প্রবর্তন করে দেওয়া হয় তাহলে সেটা খুব অসুবিধাজনক ব্যাপার হবে। আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে বাংলা ভাষায় টাইপ করার জন্য টাইপ-রাইটারের কোনো ব্যবস্থা এখনো পর্যন্ত নেই এবং আমাদের নথিপত্র এবং অন্যান্য রেকর্ড টাইপ করার ক্ষেত্রে এটা এক বাস্তব অসুবিধা। কাজেই স্যার, এ বিষয়ে অসুবিধা আরও বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং আমি জোর দিয়ে বলছি যে এই প্রস্তাবকে এখনি কার্যকর করার পক্ষে আমাদের কি কি অসুবিধা আছে সেগুলি বিবেচনার জন্য এখনই একটি কমিটি নিয়োগ করা এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে অসুবিধাগুলিকে দূর করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলা যাতে ইংরাজীর স্থান নিতে পারে তার উপায় বের করার জন্য আমাদের পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করা উচিত।[২]

খাজা নাজিমুদ্দীনের প্রস্তাবে 'যথাসম্ভব' কথাটি ব্যবহারের জন্যে পরিষদে যে সমালোচনা হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি বলেন:

স্যার, প্রস্তাবটির দ্বিতীয় অংশে 'যথাসম্ভব' এই কথাটির উপর অনেক সমালোচনা হয়েছে। আমরা যে প্রস্তাব এখন পাস করাতে যাচ্ছি সেটা যে একটা সরকারী প্রস্তাব এবং সেটাকে যে আপনারা এখনই কার্যকর করতে চান একথা আমি পরিষদকে বিবেচনা করতে বলবো। অবস্থা যা আছে সেইভাবে তাকে যদি আমরা রেখে দিই তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজে, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাবটিকে কার্যকর করা সম্ভব হবে না। কারণ তার জন্য বাংলাতে লিখিত বই পুস্তক নেই। এমনকি মফঃসসিলের ইণ্টারমিডিয়েট এবং বি.এ. কলেজগুলির জন্যেও বাংলায় কোনো বই নেই। এবং সে কারণেই আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এখনই বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে

গ্রহণ করা সম্ভব নয়। আমরা যদি 'যথাসম্ভব' কথাটি প্রস্তাব থেকে বাদ দিই তার অর্থ দাঁড়াবে এই যে প্রস্তাবটি পাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে পরিণত হবে। এই কাজ করা কি সম্ভব? আমার মনে হয় একজন বক্তা, মোদাব্বের হোসেন চৌধুরী —উল্লেখ করেছিলেন যে মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে ফিকাহ্‌ হাদিস এবং অন্যান্য ধর্মীয় বইপত্রগুলি সমস্ত বাংলাতে তরজমা করতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রস্তাবটিকে কিভাবে কার্যকর করা যাবে? আপনাদেরকে কিছু ফাঁক রাখতেই হবে অন্যথায় লোকে বলবে যে প্রস্তাবটিকে কার্যকর করা যায় না একথা ভালভাবে জানা সত্ত্বেও ব্যবস্থাপক সভার মতো একটি দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান কিভাবে এরকম একটি প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারলো। বিলম্ব করার চেষ্টা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন ওঠে না কারণ ব্যবস্থাপক সভা তো রয়েছেই এবং যখনই আমরা সমবেত হবো তখনই আমরা কতদূর কি করেছি সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠবে এবং আমাদেরকে তার কৈফিয়ৎও দিতে হবে। কাজেই 'যথাসম্ভব' কথাটি ইংরাজীর বদলে বাংলা প্রচলনে বিলম্ব ঘটানোর উদ্দেশ্যে বসান হয়েছে এই সন্দেহ সঠিক নয়। শুধুমাত্র কতকগুলি দুরপনেয় অসুবিধার জন্য আপনাদেরকে কিছু ফাঁক রাখতেই হবে কারণ বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে প্রচলনের মতো অবস্থা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত ইংরেজীকে চালু রাখা ব্যতীত উপায় নেই।[৩]

এর পর 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষা' নিয়ে প্রস্তাবটির দ্বিতীয় অংশের যে সমালোচনা হয়েছে সে সম্পর্কে নাজিমুদ্দীন পরিষদকে বলেন :

এই সমালোচনা প্রসঙ্গে আমার মাননীয় বন্ধুরা সুযোগমতো একথা ভুলে গেছেন যে পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো এমন জায়গা আছে যেখানকার অধিবাসীদের মাতৃভাষা বাংলা নয়। তা ছাড়া ময়মনসিংহে যে এলাকাগুলিতে গারো এবং হাজংরা বসবাস করে সেখানকার অধিবাসীদের মাতৃভাষাও বাংলা নয়। এই সব এলাকাতে যদি বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে প্রচলন করা হয় তাহলে তাদের কি হবে? আমাদের শিক্ষাবিদদের মতানুসারে ছাত্রদেরকে তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়াই সব থেকে সহজ। যেহেতু পূর্ব বাঙলার শতকরা ৯৯ জন বাংলায় কথা বলে সেজন্য আমরা বাংলাকে এখানে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে রাখার প্রস্তাব

করেছি। এই নীতিকে যদি আপনারা মেনে নেন তাহলে যাদের মাতৃভাষা বাংলা নয় তাদের জন্যও আপনাদেরকে উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। মুদাব্বের হোসেন চৌধুরী তাঁর একটি সংশোধনী প্রস্তাবে বলেছেন যে সংখ্যার কথা বিবেচনা না করে যে সমস্ত স্কুলে উর্দুভাষী ছাত্রছাত্রী আছে সেখানে উর্দুর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আমাদেরকে অবশ্যই রাখতে হবে। এটাও আবার সম্ভব নয়। ধরা যাক কোনো একটি স্কুলে ২, ৫ অথবা ৭ জন ছাত্র আছে যাদের মাতৃভাষা বাংলা নয়। ৫, ৬ অথবা ২০ জন ছাত্রকেও তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দানের বিশেষ ব্যবস্থা শুধু যে অসুবিধাজনক তাই নয় সেটা খুব ব্যয়সাধ্যও বটে। যেখানে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শতকরা ৫১ জন ছাত্র উর্দুভাষী সেখানে অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা আপনাদেরকে অবশ্যই করতে হবে। তার অর্থ এই নয় যে শতকরা ৪৯ জনকেও উর্দু শিখতে হবে। আমরা যথাসম্ভব চেষ্টা করবো যাতে ছাত্রদেরকে তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমেই আমরা শিক্ষাদান করতে পারি। কাজেই আপনারা যদি সোজা 'যথাসম্ভব' কথাটিকে বাদ দেন তাহলে তার অর্থ এই হবে যে হয় আপনি সেটা করতে বাধ্য থাকবেন অথবা বাধ্য থাকবেন না। কাজেই আমার মনে হয় 'যথাসম্ভব' কথাটি রাখা দরকার।[৪]

এর পর প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীন বিরোধীদলের সহকারী নেতা ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বক্তৃতার উত্তর দেন। তিনি বলেন যে এ ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট ইতস্ততঃ বোধ করছেন এবং ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বক্তৃতার সময় তিনি যেমন কোনো গণ্ডগোল করেননি তেমনি তাঁর বক্তৃতার সময়ও বিরোধীদলের নেতা এবং তাঁর পার্টিও কোনো গণ্ডগোল করবেন না, তিনি সেই আশা করেন। নাজিমুদ্দীন বলেন যে অন্যেরা তাঁকে ভুল বুঝুন সেটা তিনি চান না তবে একথা সত্য যে ভাষা সংক্রান্ত যে প্রস্তাবটি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উত্থাপন করেছেন সেটা উত্থাপন করা চলে না একথা জানা সত্ত্বেও বিরোধীদলের সহকারী নেতা সে প্রস্তাব জোরপূর্বক উত্থাপন করেছেন। নিজের বক্তব্যকে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন :

মিঃ দত্তের বক্তৃতার মুখ্য বক্তব্য হলো পাকিস্তানের ভাষা বিষয়ক বিতর্ক। তাঁর বক্তৃতায় যে দু-তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি সম্পর্কেই আমি বলতে চাই। একটি হচ্ছে ডাক, মনি অর্ডার ফর্ম এবং অন্যান্য জিনিস সংক্রান্ত। এই পরিষদের অন্য কোনো সদস্য যদি এই প্রশ্ন উত্থাপন করতেন

তাহলে আমার অভিযোগের কিছু থাকতো না। কিন্তু আমার মনে হয় মিঃ দত্তের এই প্রশ্ন উত্থাপনের কোনো অধিকার নেই। কারণ সংবিধান সভায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী তাঁকে বলেছিলেন যে এখানে ঐ সমস্ত জিনিসের ব্যবস্থা করা হবে। আবার তিনি মনি অর্ডার ফর্ম, টেলিগ্রাফ ফর্ম, মুদ্রা ইত্যাদির প্রশ্ন তুলেছেন। এ ব্যাপারে একটা নিশ্চিত আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁকে বলাও হয়েছিল যে এ সম্পর্কে ইতিমধ্যে নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রশ্ন আবার তোলা হয়েছে।

এই পর্যায়ে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত নাজিমুদ্দীনের বক্তৃতায় বাধা দিয়ে বলেন যে প্রশ্নটি তিনি উত্থাপন করেছেন এজন্যে যে মনি অর্ডার ফর্মে তা এখনো করা হয়নি। এর উত্তরে নাজিমুদ্দীন বলেন যে পরিষদে এই সব প্রশ্ন ওঠার বহু পূর্বেই সেগুলি ছাপা হয়েছিলো। এ বিষয়ে তাঁকে নিশ্চিত আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও প্রশ্নটি তিনি আবার নোতুন করে তুলেছেন।

এর পর বিভিন্ন সার্ভিসে পরীক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা প্রচলনের বিষয়ে তিনি বলেন :

এদিক থেকে এই মর্মে আর একটি প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে আমরা যদি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা না করি তাহলে আমাদের ছেলেদের পক্ষে বিভিন্ন সার্ভিসে সুযোগ পাওয়া সম্ভব হবে না। স্যার, এটা একটা দারুণ ভুল কথা। যে কোনো জায়গায় গিয়ে উর্দু বলুন তারা আপনাকে বুঝতে পারবে না। সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান যান, সেখানকার শতকরা ৯৯ জন ভালভাবে উর্দু বুঝতে পারবে না। পাঞ্জাবের গ্রামগুলিতেও দেখবেন সেই একই অবস্থা। কাজেই এদিক দিয়ে অন্যান্যদের তুলনায় বাঙালীদের অসুবিধা বেশী হবে না। কেন্দ্রীয় সার্ভিসগুলির ক্ষেত্রে আমাদের কোটা সংরক্ষিত হবে। কেন্দ্রীয় সার্ভিসের সব পরীক্ষা হবে ইংরাজীতে এবং সংস্কৃত, ফারসী, আরবী, উর্দুর মতো বাংলাও সেই পরীক্ষার একটি বিষয় হিসাবে থাকবে। আমাদের ছেলেদের তুলনামূলকভাবে কোনো অসুবিধা হবে না। তাদের অংশ সংরক্ষিত থাকবে এবং ইনশাল্লাহ বিভিন্ন সার্ভিসে তারা তাদের ন্যায্য অংশই পাবে।[৬]

কেন্দ্রীয় সার্ভিসে পূর্ব বাঙলার সংরক্ষিত অংশ কত সে সম্পর্কে খয়রাত হোসেনের এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে সে বিষয়ে তখনো পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।[৭] এর পর রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে ১৫ই মার্চের চুক্তির প্রসঙ্গটি তিনি উত্থাপন করেন :

ভাষার এই প্রশ্নটি মিঃ দত্ত এবং তাঁর পার্টির কয়েকজন সদস্য এখানে উত্থাপন করেছেন। তাঁরা ১৫ই মার্চের সেই তারিখটি এবং আমি যে চুক্তি করেছিলাম. তা মনে রেখেছেন। কিন্তু ২১শে মার্চ অথবা ২৪শে মার্চ যা ঘটেছিলো তাঁর সবকিছুই তাঁরা ভুলে গেছেন। তাঁরা পাকিস্তানের প্রতি অনুগত, তাঁরা পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতিও অনুগত, কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান যা বলেন তার কিছুই তাঁদের মনে থাকে না। একটা নোতুন সংবিধান যে হয়েছে সেকথাও তাঁরা স্বীকার করেন না।[৮]

খাজা নাজিমুদ্দীন এই পর্যন্ত বলার পর পরিষদে হট্টগোল শুরু হয়। চীৎকার থেমে যাওয়ার পর নাজিমুদ্দীন আবার তাঁর বক্তৃতা শুরু করেন :

পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান কায়েদে আজম বলেছেন এই প্রশ্নটি আপনাদেরকে বিশৃঙ্খলার দিকে ঠেলে দেবে। আমি আপনাদেরকে তাঁর এ কথাটি বিবেচনা করতে বলেছি। তাঁর মতে এই প্রশ্নটি ঠিক নয় এবং আমাদের তা আলোচনা করাও উচিত নয়। এই হলো তাঁর সুনির্দিষ্ট নির্দেশ। পাকিস্তানের মঙ্গল কিসের মধ্যে নিহিত সেটা অন্য যে কোনো ব্যক্তির থেকে কায়েদে আজমই যে বেশী বোঝেন একথাও আমি তাঁদেরকে বিচার করিতে বলি। যে ব্যক্তি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ও গঠন করেছেন তিনি বলছেন যে রাষ্ট্রের স্বার্থেই তা করা হচ্ছে। শিশুর মায়ের থেকে শিশুর প্রতি আপনাদের দরদ যদি বেশী হয় তাহলে আমার বলার কিছু নেই (হাততালি)। আপনাদের নিশ্চয় গঠনতান্ত্রিক অধিকারই আছে, গণতান্ত্রিক অধিকার আছে এবং পৃথিবীর সমস্ত কিছু অধিকার আছে কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত পাকিস্তানী হিসাবে আপনাদের কোনো কর্তব্য আছে কিনা তা আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই। রাষ্ট্রপ্রধান যখন বলেছেন যে এটা রাষ্ট্রকে বিশৃঙ্খলার দিকে ঠেলে দিয়ে তার কল্যাণকে বিপদগ্রস্থ করবে তখন অন্য লোকেরা কি চিন্তা করবে সেটা আমি তাঁদেরকে বিবেচনা করতে বলি। শুধুমাত্র নিজেদের মতামত ব্যক্ত করার গঠনতান্ত্রিক অধিকারের জন্য আপনারা একটা বিতর্কমূলক বিষয়ের অবতারণা করতে চান। এবং এই প্রশ্নটি এখানে আনার জন্য পীড়াপীড়ি করেন।. আমি নিজের মতামত ব্যক্ত করতে চাই না। পরিষদের উপরই আমি তা ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু, স্যার, আমি সব সময়েই কাজে বিশ্বাস করি, কথায় নয়। কাজটাই আসল কথা। কিন্তু এই ভাষার প্রশ্নটি যে এখানে আনা হয়েছে সেটা আমার পক্ষে একটা দুর্ভাগ্যের বিষয়।[৯]

নাজিমুদ্দীনের এই অদ্ভুত-যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর বিরোধীদলের নেতা বসন্তকুমার দাস বলেন যে প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রস্তাবটি উত্থাপনের সময় পরিষদে কোনো বক্তৃতা করেননি। এবং তার ফলেই এতো হতবুদ্ধিতার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি যদি প্রথমেই ব্যাখ্যা করে বলতেন কেন তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে পাকিস্তান সরকারের কাছে সুপারিশ করে প্রস্তাব উত্থাপন করেননি, তাহলে এতো অসুবিধা সৃষ্টি হতো না। কাজেই তাঁর উচিত ছিলো বিষয়টি পরিষদের সামনে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া। সেটা করলে কোনো সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপনেরও আর প্রয়োজন হতো না।[১০]

বসন্তকুমার দাসের এই বক্তব্যের পর স্পীকার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে সেই অবস্থায় তাঁরা তাঁদের সংশোধনী প্রস্তাবগুলি প্রত্যাহার করবেন কিনা। এর উত্তরে বিরোধীদলের পক্ষ থেকে বসন্তকুমার দাস তাঁকে জানান যে তাঁরা সেগুলি প্রত্যাহার করবেন। প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীন ইতিপূর্বেই তাঁর বক্তৃতায় আহমদ আলী মৃধার সংশোধনী প্রস্তাবটি গ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছিলেন। সেই অনুসারে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি এর পর পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:

(ক) পূর্ব বাঙলা প্রদেশে ইংরেজী স্থলে বাংলাকে সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা হইবে; এবং যত শীঘ্র বাস্তব অসুবিধাগুলি দূর করা যায় তত শীঘ্র তাহা কার্যকর করা হইবে।

(খ) পূর্ব বাঙলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার মাধ্যম হইবে 'যথাসম্ভব' বাংলা অথবা প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশ স্কলারদের মাতৃভাষা।[১১]

রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের সাথে ১৫ই মার্চ সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করার যে যৌক্তিকতা দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রী বিরোধীদলীয় হিন্দু সদস্যদের বিরোধিতা বন্ধ করলেন তা যে কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষেই অত্যন্ত মারাত্মক। একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করাকে রাষ্ট্রস্বার্থ বিরোধী বলে ঘোষণা করা একদিকে যেমন চরম ব্যক্তিশাসনের পরিচায়ক তেমনি আবার সেই ঘোষণাকে প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শিরোধার্য করে সে বিষয়ে সমস্ত আলোচনা বন্ধ রাখার হুমকিও সেই ব্যক্তিশাসনেরই অনিবার্য পরিণতি। আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব বাঙলায় বাংলাকে পাকিস্তানের 'রাষ্ট্রভাষা করার যে দাবী উত্থাপিত হয়েছিলো এবং যে দাবীকে প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তির মাধ্যমে স্বীকার করে নিয়েছিলেন তা তিনি কায়েদে আজমের দোহাই

পেড়ে অস্বীকার তো করলেনই এমনকি যারা সে বিষয়ে পরিষদে আলোচনার সূত্রপাত করলেন তাদেরকে তিনি পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রবিরোধী বলে অভিহিত করতেও দ্বিধাবোধ করলেন না। আন্দোলনের মুখে চুক্তি সম্পাদন এবং আন্দোলনের পর পরিস্থিতি পরিবর্তনের সুযোগে সেই চুক্তি ভঙ্গের মাধ্যমে পূর্ব বাঙলার প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তা এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু শুধু প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন এই বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। পার্লামেণ্টারী উপদলের যে সমস্ত নেতারা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের নেতা হিসাবে নাজিমুদ্দীনের কাছে নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করে মন্ত্রীত্ব ইত্যাদি পদ আদায়ের চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন তাঁদের বিশ্বাসঘাতকতা অধিকতর উল্লেখযোগ্য। মহম্মদ আলী, তফজ্জল আলী, ডক্টর মালেক প্রভৃতি এই উপদলভুক্ত নেতৃবৃন্দ পরিষদে ভাষা প্রশ্নের উপর বিতর্ককালে একটি বাক্য উচ্চারণ করেননি। তাঁদের এই মৌন ভূমিকার কারণ ইতিমধ্যেই তাঁরা প্রাদেশিক সরকারের সাথে আপোষ-আলোচনার মাধ্যমে বিক্রীত হয়েছিলেন। তাঁদের মন্ত্রীত্ব ও রাষ্ট্রদূতের পদ সম্পর্কে তাঁদেরকে নিশ্চিত আশ্বাস দেওয়া হয়েছিলো।

উপরোক্ত পার্লামেণ্টারী নেতৃবৃন্দ ভাষা আন্দোলনের সদ্ব্যবহার করার পর পূর্ব বাঙলা মুসলিম লীগের মধ্যে সুহরাওয়ার্দী সমর্থক উপদলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। তাদের এক অংশ সরকারী মুসলিম লীগের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং অপর অংশ যোগদান করে নবগঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥ ভাষা আন্দোলন—উত্তর ঘটনাপ্রবাহ—১৯৪৮

১ ॥ সাধারণ অসন্তোষ ও সরকারী নীতি

মার্চ মাসের ভাষা আন্দোলনের পর ছাত্রদের কর্মতৎপরতা কিছুদিনের জন্যে কমে এলেও পূর্ব বাঙলার সামগ্রিক পরিস্থিতি নানা প্রকার আর্থিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দ্বারা ক্রমশঃ পরিবর্তিত হতে থাকে। ভাষা আন্দোলনের মতো ব্যাপক কোনো ছাত্রবিক্ষোভ না ঘটলেও এ সময়ে ছাত্রেরা নিজেদের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সাধারণভাবে পূর্ব বাঙলার নানা সমস্যা সম্পর্কে অনেকখানি সচেতন হয়ে ওঠে এবং ব্যক্তিগত ও সংগঠনগতভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও আর্থিক আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়। এই পর্যায়েই শিক্ষা সংক্রান্ত দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে ঢাকাতে সর্বপ্রথম সংঘটিত হয় ব্যাপক ছাত্রী ধর্মঘট।

ছাত্র আন্দোলন ছাড়াও এ সময়ে সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট এবং বিক্ষোভও উল্লেখযোগ্য। ব্যাপক খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ, জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি, আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচার এবং চাকরিগত নানা অসুবিধার তাড়নায় জনসাধারণ ও সেক্রেটারিয়েট কর্মচারী থেকে শুরু করে পুলিশ কনস্টেবল পর্যন্ত সকলেই সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সংগঠিতভাবে তাদের কাছে নিজেদের দাবীদাওয়া পেশ করে। এবং সেগুলি আদায়ের জন্যে ধর্মঘটের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের চেষ্টা, গ্রেফতার, বহিষ্কার আদেশ ইত্যাদির মাধ্যমে মতামতের স্বাধীনতা ও ব্যক্তি অধিকার খর্বের সরকারী চেষ্টা নিয়মিতভাবে শুরু হয়। এ ক্ষেত্রে আমলাদের স্বতঃপ্রণোদিত উদ্যোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উচ্চপদস্থ আমলারা শুধু ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করেই ক্ষান্ত না থেকে নিজেদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে নানাভাবে জাহির করার প্রচেষ্টা করে এবং তার ফলে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের নেতৃস্থানীয় কিছু কিছু ব্যক্তির সাথেও তাদের রেষারেষি এবং সংঘর্ষ দেখা দেয়। এই অবস্থায় মৌলানা ভাসানী, শামসুল হক প্রভৃতির নেতৃত্বে মুসলিম লীগকে পুনর্গঠনের শেষ চেষ্টা হিসাবে এপ্রিল ও মে মাসে টাঙ্গাইল ও নারায়ণগঞ্জে লীগ কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়।[১]

রাজনীতি তেমন সংগঠিত রূপ পরিগ্রহ না করলেও দেশের এই সামগ্রিক পরিস্থিতির মধ্যে একদিকে শুরু হয় মুসলিম লীগের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অবক্ষয় এবং অন্যদিকে সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দল ও আন্দোলন গঠনের বিবিধ

উদ্যোগ। ১৯৪৮-এর এই পর্যায়ে পূর্ব বাঙলার সাধারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সর্বস্তরের জনগণের চেতনার সাথে সাধারণ পরিচয়ের উদ্দেশ্যে নীচে কয়েকটি নির্বাচিত ঘটনা ধারাবাহিকভাবে উল্লিখিত হলো।

(ক) কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা ঢাকাতে ৮ই এপ্রিল বিভিন্ন দাবীতে ধর্মঘট শুরু করেন। এই ধর্মঘট ১৮ দিন স্থায়ী হওয়ার পর তাঁরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে ২৬শে এপ্রিল কাজে যোগ দেন। সরকারী কর্মচারীরা এর পূর্বে বিভিন্ন বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ এবং ভাষা আন্দোলনের ধর্মঘটে যোগদান করলেও এই সর্বপ্রথম তাঁরা নিজেদের আর্থিক ও অন্যান্য দাবীদাওয়ার ভিত্তিতে সংগঠিতভাবে ধর্মঘটকে আঠারো দিন অব্যাহত রাখেন।

(খ) ঢাকার মেডিকেল ছাত্রেরা কতকগুলি দাবীদাওয়া কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করেন। কর্তৃপক্ষ সেগুলি স্বীকার করতে সম্মত না হওয়ায় ৩৬ জন ছাত্র ১৮ই এপ্রিল থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। অনশনকারী ছাত্রেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে জনস্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহারের বাসভবনের সামনে এবং সার্জেন জেনারেল ও মিটফোর্ড হাসপাতালের অফিসের সামনে কয়েকদিন ধরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।[২] অবশেষ তাঁদের সমস্ত দাবীদাওয়া কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত হওয়ার পর ২৭শে এপ্রিল তাঁরা নিজেদের ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন।[৩]

(গ) নোতুন বিক্রয় কর ধার্যের বিরুদ্ধে ঢাকা এবং প্রদেশের অন্যত্র জনসাধারণ ও দোকানদারদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিক্রয় কর সম্পর্কিত সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ২৬শে এপ্রিল ঢাকাতে পূর্ণ সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। বিকেলের দিকে আরমানীটোলা ময়দানে মওলানা দীন মহম্মদের সভাপতিত্বে একটি বিরাট জনসমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে কমরুদ্দীন আহমদও বক্তৃতা করেন। সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তার মধ্যে একটি বিশেষ প্রস্তাবে বিক্রয় কর সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্যে সরকারকে অনুরোধ করা হয়। সরকার তাতে সম্মত না হলে ১৫ই মে থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে বলে সরকারকে তাঁরা সাবধান করে দেন।[৪]

(ঘ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্বের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ৩০শে এপ্রিল সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ অফিসে নওবেলালের প্রধান সম্পাদক মহম্মদ আজরফের সভাপতিত্বে সিলেটের সাংবাদিকের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় তাঁরা নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেন :

কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার দরুন পূর্ববঙ্গের সাপ্তাহিক

পত্রিকাগুলিকে বন্ধ করার জন্য যে আদেশ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে তাহাতে সিলেটের সাংবাদিকদের এই সভা অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়াছে। এই আদেশের ফলে জনমতকে নিতান্ত অগণতন্ত্রীয়ভাবে রুদ্ধ করা হইয়াছে এবং যাহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংবাদিকতার দ্বারা জীবিকার সংস্থান করিতেছিলেন তাঁহাদিগকে বেকার শ্রেণীতে পরিণত করা হইয়াছে। রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য যাহাতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পুনর্বার বহাল হয় এবং এতগুলি লোক বেকার না হইয়া পড়ে এই উদ্দেশ্যে এই সভা প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারকে অবিলম্বে এই আদেশ প্রত্যাহার করার দাবী জানাইতেছে। বর্তমানে যে সব সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে তাহাদিগকে চালু রাখিবার জন্য উপযুক্ত ছাপার কাগজ সরবরাহ করিবার জন্য এই সভা উভয় সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছে।[৫]

পূর্ব বাঙলা সরকারের ডেপুটি ইনসপেক্টার জেনারেলের আদেশক্রমে নওবেলালের প্রকাশনা ১৯৪৮-এর ১৩ই সেপ্টেম্বর থেকে ৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্ধ থাকে।[৬]

(ঙ) অল্পকাল পূর্বে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার পর শহীদ সুহরাওয়ার্দী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা এবং পূর্ব বাঙলা থেকে সংখ্যালঘুদের প্রস্থান বন্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রদেশ সফরের জন্যে ঢাকা উপস্থিত হলে ৩রা জুন তাঁকে জননিরাপত্তা আইনের ১০ ধারা বলে অন্তরীণ করা হয়। পূর্ব বাঙলা সরকার এক ইস্তাহারে বলেন যে সে সময় পূর্ব বাঙলাতে এমন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই যার জন্যে সাম্প্রদায়িক সাম্প্রীতি বিস্তারের উদ্দেশ্যে সুহরাওয়ার্দীর সফরের কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে। সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির উন্নতির জন্যে ইতিমধ্যে যা কিছু করণীয় সরকার তা করেছেন কাজেই তাঁর সফরের আসল উদ্দেশ্য প্রদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। সুহরাওয়ার্দীর সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য পূর্ব বাঙলাকে পশ্চিম বাঙলা অর্থাৎ ভারতের সাথে যুক্ত করা এই মর্মেও সরকারী ইশতাহারটিতে অভিযোগ করা হয়। তাতে বলা হয় যে সুহরাওয়ার্দী তাঁর সফরসূচী বাতিল করে প্রদেশ ত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করলেই তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে। তিনি প্রাদেশিক সরকারের কাছে অনুরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করার পর তাঁকে মুক্তি দান করা হয় এবং তিনি কলকাতার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন।[৭]*

---

* এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই সময়ে শহীদ সুহরাওয়ার্দী পাকিস্তান গণ-পরিষদের একজন সদস্য ছিলেন।

(চ) ৩০শে জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা নানা অব্যবস্থা এবং শিক্ষা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হন। সভায় সভাপতিত্ব করেন আবদুর রহমান চৌধুরী। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যে আবদুর রহমান চৌধুরীকে আহ্বায়ক নিযুক্ত করে একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।[৮]

এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের একটি স্মারকলিপিতে বলা হয় যে উত্তরোত্তরভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সব দিক দিয়ে অবনতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। স্মারকলিপিটিতে অব্যবস্থার কারণসমূহ উল্লেখ করার পর তার প্রতিকারকল্পে নিম্নলিখিত দাবীসমূহ উত্থাপন করা হয়:

১। বেতনের হার বৃদ্ধি করিতে হইবে, প্রারম্ভিক বেতন বর্তমানের ১৫০ টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ২৫০ টাকা করিতে হইবে।

২। অধ্যাপকগণের প্রতি বাধ্যতামূলক অবসর লাভের বয়স বৃদ্ধি করিয়া অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় ইহা ষাট বৎসর করিতে হইবে।

৩। নিয়োগ ও পদোন্নতির সময় পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি বা সাম্প্রদায়িকতা চলিবে না।

৪। অবিলম্বে শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ অধ্যাপক নিয়োগ করিয়া বর্তমানের শূন্যপদ পূরণ করিতে হইবে।

৫। অধ্যাপকবৃন্দের অভাব-অভিযোগ অবিলম্বে পূরণ করিতে হইবে।

৬। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাঁহাদিগকে রাখিবার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।[৯]

(ছ) দেড় মাস কাল বেতন না পাওয়ার ফলে বহু পুলিশ কন্‌স্টেবল্‌ ১৪ই জুলাই ধর্মঘট এবং সারা ঢাকা শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সন্ধ্যার দিকে অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্যে সরকার সামরিক বাহিনী তলব করেন এবং তারা লালবাগস্থ পুলিশ লাইনে ধর্মঘটী পুলিশদেরকে ঘেরাও করে।[১০] এই সময় সশস্ত্র পুলিশ ও সৈন্যদের মধ্যে সংঘর্ষ ও গুলি বিনিময়ের ফলে দুইজন পুলিশ নিহত এবং নয়জন আহত হয়।[১১]

(জ) ২০শে অগাস্ট রাজশাহীতে একটি জনসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে পূর্ব বাঙলার অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্প সচিব হামিদুল হক চৌধুরী বলেন যে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদ করলে সেটা হবে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ।

এবং এই হস্তক্ষেপের ফলে সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনে ব্যাপক অরাজকতা সৃষ্টি হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে কমিউনিজমের সাথে ইসলামের কোনো সমঝোতা হতে পারে না। কাজেই কমিউনিস্টদের সম্পর্কে সকলের হুঁশিয়ার থাকা প্রয়োজন।[১২]

(ঝ) পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পূর্ব বাঙলা সফরের উদ্দেশ্যে ১৮ই নভেম্বর তেজগাঁ বিমান বন্দরে উপস্থিত হলে প্রাদেশিক মন্ত্রী-পরিষদের সদস্য, সরকারী কর্মচারী, সাংবাদিক এবং এক বিরাট জনতা তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে সেখানে সমবেত হয়। প্রধানমন্ত্রীকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ঢাকার মুসলিম লীগের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তিকে নিয়ে একটি অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়। এই অভ্যর্থনা কমিটির সদস্য এবং সাংবাদিকবৃন্দ সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা নানাভাবে অপমানিত ও উপেক্ষিত হন। এই প্রসঙ্গে অভ্যর্থনা কমিটি ও সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে 'আমলাতন্ত্রী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়।[১৩]

অভ্যর্থনা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সাহেবে আলম তাঁর বিবৃতিতে বলেন :

অভ্যর্থনা কমিটি গত কয়েক দিন ধরিয়া শাহী অভ্যর্থনার আয়োজন করিতেছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে বিমান ঘাঁটিতে উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে সশস্ত্র প্রহরীদের পশ্চাতে থাকিতে দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য মন্ত্রীমণ্ডলী এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাই সম্মুখের সারিতে ছিল।

অভ্যর্থনা কমিটির অজ্ঞাতসারেই মন্ত্রী এবং উপদস্থ কর্মচারীদিগকে বিশেষ প্রবেশপত্র দেওয়া হয়। সরকারী ব্যবস্থা এমন অদ্ভুত হয় যে, পূর্ব পাকিস্থান মোসলেম লীগের সভাপতি,, অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান, সম্পাদক এবং সংবাদপত্র প্রতিনিধিদিগকে সশস্ত্র রক্ষীরা একস্থান হইতে অন্যস্থানে তাড়াইয়া বেড়াইতেছিল।[১৪]

(ঞ) ১৭শে নভেম্বর অর্থাৎ উপরোক্ত ঘটনার পরদিন পূর্ব বাঙলা সাংবাদিক সংঘের এক বিশেষ অধিবেশনে তেজগাঁও বিমান ঘাঁটিতে প্রধান মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের সময় যে অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলা দেখা যায় তার সমালোচনা প্রসঙ্গে খায়রুল কবীর (আজাদ), গোলাম আহমদ (পাসবান), কাজী শামসুল ইসলাম (জিন্দেগী) এবং আরও কয়েকজন সাংবাদিক বলেন যে 'পূর্ব বঙ্গের মন্ত্রীমণ্ডলী এবং সরকারী কর্মচারীগণের উচিত সংবাদপত্রের প্রতি তাঁহাদের দায়িত্ব উপলব্ধি করা।'

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়:

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খাঁর তেজগাঁও বিমান ঘাঁটিতে উপস্থিতির সময় পূর্ব বঙ্গ সরকারের চীফ সেক্রেটারীর আমন্ত্রণক্রমে বিমান ঘাঁটিতে উপস্থিত বিশিষ্ট সাংবাদিকগণের প্রতি মিঃ ডি. এন. পাওয়ার, মিঃ নর্টন জোন্স ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারীরা যে অপমানসূচক আচরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, পূর্ব বঙ্গ সাংবাদিকসংঘের এই সভা তাহার তীব্র নিন্দা করিতেছে।

এই সভা গতকল্যকার ব্যাপার সম্পর্কে আজাদ, জিন্দেগী ও পাসবানে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি পূর্ব বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী জনাব নূরুল আমীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে এবং এইরূপ অভিমত পোষণ করিতেছে যে, সরকারী কর্মচারীদের এই আচরণ দ্বারা সাংবাদিকগণের সর্বদেশ স্বীকৃত অধিকার ও সুবিধাদির উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে।[১৫]

(ট) পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ২০শে নভেম্বর পল্টন ময়দানে বিরাট এক জনসমাবেশে বক্তৃতা দানকালে বলেন:

আপনারা কখনই মনে এ ধারণার স্থান দিবেন না যে, পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবর্গ ও তথাকার জনসাধারণ আপনাদের প্রগতি, সমৃদ্ধি ও হেফাজত সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁহারা আপনাদের পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের খেদমতের জন্য সদা সর্বদাই মনে প্রাণে হাজির আছেন।[১৬]

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতামূলক মনোভাবের পরিচয় এই বক্তব্যের মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট। তাছাড়া হেফাজতকারী হিসাবে পাকিস্তানের নেতৃবর্গ না বলে 'পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবর্গের উল্লেখও এক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এরপর বাঙালীদের প্রাদেশিকতার নিন্দা করে তিনি বলেন:

আজকাল নানাপ্রকার ধ্বনি শোনা যাইতেছে। পূর্ব পাকিস্তানের এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে উগ্র প্রাদেশিকতার মনোভাব সৃষ্টি হইয়াছে। আপনাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রকৃত মুসলমান কখনও তাহার চিন্তাধারাকে প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ রাখিতে পারে না। পাঞ্জাবী, বাঙালী, সিন্ধী, পেশোয়ারী, পাঠান প্রভৃতির মধ্যে বৈষম্যের চিন্তা অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। এছলামে ভেদাভেদের কোনো স্থান নাই। আমরা পাঞ্জাবী, বিহারী, সিন্ধি কিংবা পেশোয়ারী যাহাই হই না কেন আমাদিগকে সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা 'পাকিস্তানী' (হর্ষধ্বনি)।[১৭]

(ঠ) সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের কন্যা এলিজাবেথের পুত্র সন্তান প্রসব উপলক্ষে অন্যান্য সরকারী ভবনের সাথে রাজশাহী কলেজেও পাকিস্তান পতাকার সাথে বৃটিশের ইউনিয়ন জ্যাক উত্তোলন করা হয়। এর ফলে ছাত্রেরা দারুণ-ভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং তারা 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক', 'কমনওয়েলথ ছাড়তে হবে' ইত্যাদি ধ্বনি সহকারে জোরপূর্বক কলেজ ভবনে উত্তোলিত ইউনিয়ন জ্যাক নীচে নামিয়ে তা বিনষ্ট করে।[১৮]

প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীর রাজশাহী সফরকালে তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে রাজশাহীর ছাত্রেরা শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করেন কিন্তু ২১শে নভেম্বর কর্তৃপক্ষ সেই শোভাযাত্রাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। প্রধানমন্ত্রীর কাছে ছাত্র প্রতিনিধিদের ডেপুটেশনের অনুমতিও তাঁরা বাতিল করে দেন। কর্তৃপক্ষের এই সব আচরণের ফলে ছাত্রদের মধ্যে বিক্ষোভ অনেক বৃদ্ধি পায় এবং তারা একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করে। পুলিশের উপস্থিতিতে এই মিছিলটিকে গুণ্ডাদল লাঠি ও ছোরার সাহায্যে আক্রমণ করে এবং তার ফলে ২৫ জন আহত হন। সেই রাত্রে রাইফেল ও রিভলভারধারী পুলিশদল কলেজ হোস্টেল ঘেরাওপূর্বক হোস্টেলের মধ্যে ব্যাপক খানাতল্লাশী চালায়। কোনো পরোয়ানা ছাড়াই দুইজন ছাত্রকে পুলিশ গ্রেফতার করে এবং পরে তাঁরাসহ মোট তিনজন ছাত্রকে রাজশাহী শহর থেকে বহিষ্কার করা হয়।[১৯]

(ড) ২৭শে নভেম্বর লিয়াকত আলী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি ছাত্রসভায় ভাষণ দেন। এই উপলক্ষে তাঁকে একটি মানপত্র দেওয়ার বিষয় আলোচনার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী ভাইস চ্যান্সেলর সুলতান উদ্দিন আহমদ পূর্ব সন্ধ্যায় জগন্নাথ হলে এক ছাত্র সভা আহ্বান করেন। এই সভায় প্রধানমন্ত্রীকে প্রদত্ত মানপত্রটিতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীর অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করা হলে প্রতিনিধিদের মধ্যে এ বিষয়ে গুরুতর মতভেদ দেখা দেয়। এবং তার ফলে শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবটিকে ভোটে দিতে হয়। অধিকাংশ ছাত্র প্রস্তাবটির সপক্ষে ভোট দেওয়ায় সেটি গৃহীত হওয়ার পর সেই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কয়েকজন ছাত্র প্রতিনিধি সভাকক্ষ পরিত্যাগ করে।[২০] পরদিন বিকেলে নির্ধারিত সময়ে অস্থায়ী ভাইস চ্যান্সেলর সুলতান উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়নের সম্পাদক গোলাম আজম বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে মানপত্রটি পাঠ করেন। লিয়াকত আলী তাঁর ভাষণ দানকালে মানপত্রে উল্লিখিত বিভিন্ন বিষয়ের উপরই প্রধানতঃ নিজের বক্তব্যকে সীমাবদ্ধ রাখেন;[২১] কিন্তু ভাষা প্রশ্ন সম্পর্কে কোনো

নির্দিষ্ট অভিমত প্রকাশ করেন না।

১৭ নভেম্বর সন্ধ্যা সাতটায় আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের একটি বৈঠক বসে। আজিজ আহমদ, আবুল কাসেম, শেখ মুজিবর রহমান, কমরুদ্দীন আহমদ, আবদুল মান্নান, আনসার এবং তাজউদ্দীন আহমদ এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।[২২] প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীর আসন্ন পূর্ব বাঙলা সফরকালে তাঁকে রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় এবং সেই স্মারক লিপিটির খসড়া তৈরীর ভার অর্পিত হয় কমরুদ্দীন আহমদের উপর।[২৩]

কমরুদ্দীন আহমদ কায়েদে আজমকে ২৪শে মার্চ তারিখে প্রদত্ত স্মারক লিপির ভিত্তিতে একটি নূতন স্মারকলিপি তৈরী করে সেটি লিয়াকত আলীর ঢাকা অবস্থানকালে সরাসরি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। লিয়াকত আলী এই স্মারকলিপিটির কোনো প্রাপ্তি স্বীকার করেননি এবং রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের সাথে তাঁর কোনো সাক্ষাৎকারই ঘটেনি।[২৪] ছাত্রদের প্রদত্ত স্মারক-লিপিটির মতো এক্ষেত্রেও তিনি রাষ্ট্রভাষা প্রশ্ন সম্পর্কে কোনো মন্তব্য প্রকাশ অথবা আলোচনা অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকেন।

২ ॥ ঢাকা শহরে ব্যাপক ছাত্রী বিক্ষোভ

ইডেন ও কমরুন্নেসা গার্লস স্কুল একত্রীভূত করার প্রতিবাদে এই দুই স্কুল ও ইডেন কলেজের প্রায় পাঁচশত ছাত্রী ১৫ই নভেম্বর ধর্মঘট করার পর বেলা দুটোর সময় প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েট ভবনের সামনে সমবেত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। উপরোক্ত দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একত্রীভূত হওয়ার পর কমরুন্নেসা স্কুলের স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি সরকারের কাছে হস্তান্তরিত করা হয় এবং উভয় প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরাই এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে। কমরুন্নেসা স্কুলের বরখাস্ত শিক্ষয়িত্রীদের পুনর্নিয়োগ, গরীব ছাত্রীদের জন্যে অধিকসংখ্যক বৃত্তি এবং ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত করার জন্যেও তারা দাবী জানায়। বিক্ষোভকারিণী ছাত্রীরা প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী আবদুল হামিদের সাথে সাক্ষাতের চেষ্টা করে কিন্তু তিনি মফস্বলে সফররত থাকায় তারা সেক্রেটারিয়েট থেকে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে উপস্থিত হয়।[১]

প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন চারজন ছাত্রী প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সেই সাক্ষাৎকালে তিনি তাদেরকে বলেন যে মাত্র মাস কয়েক পূর্বে

'কমরুন্নেসা গার্লস স্কুলের কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষা বিভাগের সাথে যথোপযুক্ত আলাপ-আলোচনার পর ইডেন স্কুল ও কমরুন্নেসা স্কুলকে একত্রিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কাজেই সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগ এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে পুনরায় এ ব্যাপারে আলোচনা না করা পর্যন্ত উল্লিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুটিকে পৃথক করার নোতুন আদেশ তিনি দিতে পারেন না। কমরুন্নেসা স্কুলের বরখাস্ত শিক্ষয়িত্রীদের পুনর্নিয়োগ সম্বন্ধে অবশ্য নূরুল আমীন বলেন যে তাঁদের মধ্যে যাঁদের উপযুক্ত যোগ্যতা আছে তাঁদেরকে নোতুন স্কুলে শিক্ষকতার কাজে নিয়োগ করা হবে। তবে এ বিষয়ে শিক্ষা দফতরের সাথে আলোচনার পূর্বে তিনি কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে সরাসরি অস্বীকার করেন এবং শিক্ষা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাতের জন্যে ছাত্রীদেরকে উপদেশ দেন।[২]

১৫ই তারিখের ছাত্রী বিক্ষোভ সম্পর্কে দৈনিক আজাদে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হয়:

> পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা-সঙ্কট সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে কয়েকবার মন্তব্য করিয়াছি। অবস্থা কতদূর চরমে উঠিয়াছে, তাহা ১৫ই নভেম্বর তারিখের ঢাকার ছাত্রীবিক্ষোভ হইতেই অনুমিত হয়। ছাত্রীদের এত বড় মিছিল ইতিপূর্বে ঢাকায় দেখা যায় নাই। নিতান্ত দায়ে না পড়িলে যে ছাত্রীরা বাহির হয় নাই, এ কথা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে এক বৎসরের অধিককাল চলিয়া গিয়াছে। এ পর্যন্ত ইডেন বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় গৃহ ও শিক্ষয়িত্রী যোগাড় করা কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। যে-সকল রিকুইজিশন করা বিরাট বাড়িগুলি বর্তমানে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার যে-কোনো একটায় সহজেই এই বিদ্যালয়ের জন্যে স্থান করা যাইত। অন্যান্য অভিযোগ এই যে, বর্তমান দুই স্কুলে মিলাইয়া যে এক হাজারের মতো ছাত্রী আছে, তাহাদের বসিবার উপযুক্ত বেঞ্চি প্রভৃতিও নাই, পড়াইবার জন্যে শিক্ষায়িত্রী তো নাই-ই। দীর্ঘ এক বৎসরের এই অকর্মণ্যতা শিক্ষা বিভাগের যোগ্যতার সাক্ষ্য দেয় না। উজিরে আজম জনাব নূরুল আমিন শিক্ষা বিভাগের আসহাবে-কাহাফী নিদ্রা ভাঙাইবার কোনো ব্যবস্থা করিবেন কি?[৩]

১৫ই তারিখ থেকে ইডেন ও কমরুন্নেসা স্কুলে ছাত্রী ধর্মঘট অব্যাহত থাকে। ২৪শে নভেম্বরও ছাত্রীরা পূর্ব দিনগুলির মতো স্কুলের প্রধান প্রবেশ দ্বারে পিকেটিং এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই বিক্ষোভের ফলে স্কুলের সামনে

পুলিশ মোতায়েন করা হয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও যতদিন কর্তৃপক্ষ ইডেন স্কুলকে পৃথক ভবনে স্থানান্তরিত না করেন ততদিন পর্যন্ত তারা শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্পের কথা ঘোষণা করে।[৪]

কমরুন্নেসা ও ইডেন স্কুলের ছাত্রীদের অভাব অভিযোগ এবং নানা অসুবিধার প্রতি স্কুল কর্তৃপক্ষের উদাসীন মনোভাবের তীব্র নিন্দা করে ২৪শে তারিখে প্রিয়নাথ হাই স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকদের একটি সম্মিলিত সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। তাঁরা ধর্মঘটী ছাত্রীদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করে অন্য একটি পৃথক প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[৫]

কমরুন্নেসা ও ইডেন স্কুলের ছাত্রী ধর্মঘট চলাকালে ১৮ই নভেম্বর ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্রেরাও তাদের নিজস্ব দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে ধর্মঘট শুরু করার প্রস্তুতি নেয়। এই উদ্দেশ্যে কলেজের সংগ্রাম পরিষদ্ নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করেন:

> পুনঃ পুনঃ আবেদন ও ডেপুটেশন সত্ত্বেও পূর্ব বাংলা সরকার ঢাকা ইণ্টার-মিডিয়েট কলেজের দাবী দাওয়ার প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করায় কলেজ ছাত্র-লীগ আগামী ২১শে নভেম্বর সোমবার সকাল সাতটা হইতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট চালাইয়া যাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া পূর্ব বাঙলা সরকারকে নোটিশ দিয়াছেন।
>
> উক্ত নোটিশে বলা হয়, সরকার সিদ্দিক বাজারের আবর্জনাময় ও অসুবিধা-জনক পরিবেশে কলেজকে রাখার জন্য জেদ করায় এবং কলেজকে প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত করিতে অহেতুক বিলম্ব করায় ও বাণিজ্য বিভাগকে স্থায়ী করিতে অস্বীকার করায় ছাত্রগণ ধৈর্যের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। ছাত্রগণ আর সরকারের মিষ্টবাক্যে ভুলিতে প্রস্তুত নয়। তাহারা দাবী করিতেছে যে সরকার বর্তমানে প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলরের আদি বাড়িটি কলেজের জন্য ছাড়িয়া দিন, কলেজকে বর্তমান সেসন হইতে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করুন, বাণিজ্য বিভাগকে স্থায়ী করায় ও উক্ত বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের বাকী বেতন অবিলম্বে মিটাইয়া দিন ও ছাত্রাবাসগুলিতে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন। উক্ত দাবী অমান্য করা হইলে ছাত্রগণ আগামী ২১শে নবেম্বর সোমবার সকাল সাতটা হইতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘট ও প্রয়োজনবোধে অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করিতে বাধ্য হইবে।[৬]

এর পর ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের ৫৭৫ জন ছাত্রের মধ্যে প্রায় ৫০০ ছাত্র ২৪শে নভেম্বর থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে ধর্মঘট শুরু করে। ধর্মঘটী

ছাত্রেরা কলেজের প্রধান প্রবেশদ্বার বন্ধ করে রাখে। এর পর তারা সম্মিলিত-ভাবে মিছিল সহকারে সেক্রেটারিয়েট ভবনের সামনে উপস্থিত হলে পুলিশ তাদেরকে বাধা দান করে। এইভাবে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার পর মিছিলটি শহরের বিভিন্ন অঞ্চল প্রদক্ষিণ করে।[৭]

২৩শে নভেম্বর ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের একটি ছাত্র-প্রতিনিধিদল পূর্ব বাঙলা সরকারের শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী ফজলে আহমদ করিম ফজলীর কাছে কয়েকটি দাবী পেশ করে কিন্তু কর্তৃপক্ষ সে দাবীদাওয়ার প্রতি কর্ণপাত না করায় ছাত্রেরা ধর্মঘটের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ছাত্রদের দাবীগুলি নিম্নরূপ :

১। ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ বস্তি এলাকা হইতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের গৃহে স্থানান্তরিত করিতে হইবে।

২। কলেজটিকে প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত করিতে হইবে।

৩। ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের বাণিজ্য বিভাগকে স্থায়ী করিতে হইবে।

৪। কলেজের ছাত্রাবাসের অসুস্থ ছাত্রগণের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে।[৮]

ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্র ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিন ২৫শে নভেম্বর বেলা সাড়ে এগারোটার সময় ছাত্রদের একটি বিরাট মিছিল শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীনের বাসভবনের সামনে সমবেত হয়। সেখানে তারা 'প্রধানমন্ত্রী বেরিয়ে আসুন', 'আমাদের দাবী মানতে হবে', 'ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ' প্রভৃতি ধ্বনি দিতে থাকলে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে তাদেরকে জানানো হয় যে অসুস্থতার জন্যে তিনি তাদের সাথে দেখা করতে তখনকার মতো অক্ষম। একথা শোনার পর ছাত্রেরা তাঁকে অল্পক্ষণের জন্যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাদের দাবী দাওয়ার কথা শুনতে অনুরোধ করে। নূরুল আমীন কিন্তু তাদের সে অনুরোধ রক্ষা করতে অসম্মতি জানানোর পর ছাত্রেরা বিক্ষুব্ধ অবস্থায় 'বর্ধমান হাউস' পরিত্যাগ করে নানাপ্রকার ধ্বনি সহকারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে মিছিল ভঙ্গ করে।[৯]

এর পূর্বে সকাল দশটায় ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ প্রাঙ্গণে এক সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় :

(ক) আজাদ কাশ্মীর গভর্নমেণ্ট ও তাহার যুদ্ধরত মোজাহেদগণের প্রতি আমরা আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি এবং প্রয়োজনবোধে তাঁহাদিগকে সকল প্রকার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।

(খ) আমরা কমরুন্নেসা ও ইডেন গার্লস স্কুলের ধর্মঘটী ছাত্রীদের প্রতি আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি এবং তাহাদের

অভিযোগের স্বরাহা করিতে কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী জানাইতেছি।

(গ) ২৬শে নভেম্বরের ভিতর স্মাপকলিপি পেশ করা হউক। সরকার আমাদের দাবী পূরণ না করিলে বাধ্য হইয়া ২৭শে নভেম্বর শনিবার হইতে অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করিব।[১০]

সরকারী ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্র ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে ১৬শে নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সেণ্ট্রাল একোমডেশন কমিটির আহ্বায়ক মহম্মদ আবদুল ওদুদ সংবাপত্রে বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন:

আমরা বিশ্বাস করি, ঢাকা ইণ্টারের ছাত্রদের ন্যায্য সংগ্রামের পাশে কেবল ঢাকার ছাত্রসমাজ কেন, গোটা ছাত্রসমাজ আসিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াইবে। আমরা জানি, কোটি কোটি লোকের রাজধানী ঢাকায় একটি মাত্র সরকারী কলেজের উত্তম পরিবেশ, ছাত্র ও অধ্যাপকদের সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা-বিশিষ্ট প্রথম শ্রেণীর কলেজ পনর্গঠনে ছাত্রদের সত্যিকার সহযোগিতার ঐকান্তিক ইচ্ছা ও ন্যায়সঙ্গত দাবী রুটির দাবীর চাইতে কম জোরালো নহে বরং স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সুন্দর পাকিস্তান গঠনে অপরিহার্য।[১১]

১৫ই নভেম্বর থেকে ইডেন ও কমরুন্নেসা স্কুলের ধর্মঘট ২৫শে তারিখ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এবং স্কুল এলাকায় পুলিশ বাহিনীকেও মোতায়েন রাখা হয়। ধর্মঘটী ছাত্রদের সংগ্রাম পরিষদের মুখপাত্রেরা সংবাদপত্র প্রতিনিধিদেরকে জানায় যে তাদের দাবী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত তারা সংগ্রাম অব্যাহত রাখবে। পরবর্তী শনিবার ২৭শে নভেম্বর সকাল নয়টায় কমরুন্নেসা স্কুলের ছাত্রীদের একটি জরুরী সভাও সেদিন আহ্বান করা হয়।[১২]

২৬শে তারিখে ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্রেরা সকাল ৮টায় কলেজ হোস্টেল ও বেলা ১২টায় কলেজ প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে সভা করে এবং দৃঢ়তার সাথে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা নেয়। পূর্ব সন্ধ্যা পর্যন্ত সরকারের কাছে প্রেরিত চরমপত্রের কোনো জবাব না পাওয়ার ফলে ২৭শে নভেম্বর তারিখে ছাত্রদেরকে আবার কলেজ প্রাঙ্গণে সমবেত হওয়ায় জন্যে আহ্বান জানানো হয়।[১৩]

ইডেন-কমরুন্নেসার ছাত্রী সংগ্রাম পরিষদ্‌ও ছাত্রদেরকে সেদিন সকাল নয়টায় স্কুল প্রাঙ্গণে সমবেত হওয়ার জন্যে অনুরোধ করে।[১৪]

ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ ও ইডেন-কমরুন্নেসা স্কুলের সংগ্রাম পরিষদ্‌ এক যুক্ত বিবৃতিতে জানান যে, ইডেন কমরুন্নেসার শত শত ছাত্রী শান্তিপূর্ণ-ভাবে ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সরকার তাদের দাবীর প্রতিকারের কোনো

ব্যবস্থা করেন নাই। ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েটের ছাত্রদের দাবীও অনুরূপভাবে উপেক্ষিত হওয়ার ফলে তারা ২৭শে নভেম্বর থেকে আমরণ অনশন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। শিক্ষার প্রতি সরকারের চরম উদাসীনতার প্রতিবাদে যুক্ত বিবৃতিটিতে সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানান। তাঁরা ২৭শে তারিখে মিছিল সহকারে ঢাকার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদেরকে বেলা বারোটায় সাধারণ প্রতিবাদ সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হওয়ার জন্যে অনুরোধ করেন।[১৫]

ধর্মঘটী ছাত্রছাত্রীদের সংগ্রামকে সমর্থন করে ২৭শে নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্রীসংঘ এবং নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের পক্ষ থেকে সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রচারিত হয়।[১৬]

২৭শে নভেম্বর ঢাকাতে ধর্মঘটী ছাত্রছাত্রীদের সমর্থনে সাধারণ ছাত্র ধর্মঘট হয় এবং সারা শহরের ছাত্রছাত্রীরা বেলা দুটোর সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে নিজেদের দাবী সম্পর্কে আলোচনা এবং সরকার ও কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।[১৭]

৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত ইডেন-কমরুন্নেসার ধর্মঘট অব্যাহত রাখায় ১লা ডিসেম্বর প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন তাদেরকে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে ক্লাসে যোগদানের জন্যে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি[১৮] মারফত আবেদন জানান। বিবৃতিটিতে তিনি ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ এবং ইডেন-কমরুন্নেসা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ধর্মঘট সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন :

> ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের কিছুসংখ্যক ছাত্র ধর্মঘট করিয়া কলেজে যাওয়া বন্ধ করিয়াছে এবং তাহাদের কেহ কেহ কলেজে যোগদানেচ্ছু ছাত্রদের উপর বলপ্রয়োগও করিতেছে জানিয়া আমি ব্যথিত হইয়াছি। যে সময় জাতির জন্য একতা এবং নিয়মানুবর্তিতা একান্ত অপরিহার্য, ঠিক সেই সময়ে তাহাদের এই আচরণ আরও বেদনাদায়ক। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাহাদের অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া দেখিয়াছি তাহাদের ধর্মঘটের পশ্চাতে কোনো যুক্তিই নাই।

এবং

> তরুণ মুসলিম ছাত্রীদের রাস্তায় রাস্তায় প্যারেড করিয়া বেড়ান অত্যন্ত অসম্মানজনক এবং অশোভন। ইহা মুসলিম ঐতিহ্যের পরিপন্থী। পাকিস্তানে আমাদের, বিশেষ করিয়া নারীদের, মধ্যে ইসলামিক তমদ্দুন অনুসৃত হওয়া উচিত। আমি একান্তভাবে আশা করি যে, ছাত্রীরা এ

বিষয়ে অবহিত হইবেন এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ কার্য হইতে বিরত থাকিবেন। কারণ ইহাতে মুসলিম জনসাধারণ অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করেন।

নূরুল আমীন তাঁর বিবৃতিতে আগামী দুই বৎসরের মধ্যে কলেজের স্থানাভাব দূর করা, সেটিকে উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত করা, সেখানে বাণিজ্য বিভাগকে স্থায়ী করা ইত্যাদি বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের উল্লেখ করেন। এর পর তিনি আবার কলেজ স্কুলের ধর্মঘটী ছাত্রছাত্রীদের ধর্মঘটের অযৌক্তিকতা প্রসঙ্গে প্রথমে ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্র এবং পরে ইডেন-কমরুন্নেসার ছাত্রীদেরকে উদ্দেশ করে বলেন :

> শিক্ষকদের অগ্রিম বেতন, ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা, চাকুরির শর্তাশর্ত সম্পর্কে ছাত্রেরা যে অভিযোগ করিয়াছে, 'প্রকৃত অবস্থার' সহিত তাহার কোনোই সামঞ্জস্য নাই। এ বিষয়টি চাকুরিদাতা এবং গ্রহীতার মধ্যে চাকুরির এক সাধারণ শর্তের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং অধিক বিলম্ব না করিয়া ধর্মঘট প্রত্যাহার করতঃ পড়াশোনায় মনোনিবেশ করিবার জন্য আমি ধর্মঘটী ছাত্রদের প্রতি আবেদন জানাইতেছি।

এবং

> কমরুন্নেসা সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের ধর্মঘটী ছাত্রীদের প্রতিও আমি অনুরূপ আবেদন করিতেছি। কমরুন্নেসা স্কুলের কর্তৃপক্ষের পরামর্শক্রমেই কমরুন্নেসা এবং ইডেন বালিকা বিদ্যালয় একত্রিত করা হয়। দুইটি বিদ্যালয়ের বর্তমান মিলিত ছাত্রীসংখ্যা বিভাগ-পূর্বকালীন কমরুন্নেসা বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা অপেক্ষাও কম। সরকার নারী শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দান করেন। ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্কুল এবং কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে।

প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতিতে ছাত্রছাত্রীদের ধর্মঘটের অযৌক্তিকতা এবং সুদূর-প্রসারী সরকারী পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু বললেও তাদের শিক্ষা এবং আবাসিক জীবনের নানা অসুবিধা সম্পর্কে তেমন কোনো বক্তব্য তাতে ছিলো না। যাই হোক বিবৃতির মাধ্যমে তাঁর এই আবেদনের পূর্বেই ছাত্রদের কতকগুলি দাবী-দাওয়া স্বীকার করে নেওয়ায় ৩০শে নভেম্বর দুপুর থেকে ঢাকা ইণ্টার-মিডিয়েট কলেজের ছাত্রেরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে। যে সাতজন ছাত্র পঞ্চাশ ঘণ্টা উপবাস ছিলো তারাও তাদের অনশন ভঙ্গ করে।[১৯]

সরকারী ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্রদের ধর্মঘট অবসান এবং প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ছাত্রীদের ধর্মঘট 'মুসলিম ঐতিহ্যের পরিপন্থী' এ কথা ঘোষণার পরও ইডেন-

কমরুন্নেসার ছাত্রীরা তাদের ধর্মঘট ভঙ্গ না করায় শিক্ষামন্ত্রী আবদুল হামিদও সংবাদপত্রের মাধ্যমে একটি বিবৃতিতে[২০] বলেন যে সরকার মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের সুবিধা দান করতে সর্বদাই প্রস্তুত। এ ব্যাপারে তাদের অতিরিক্ত সুবিধাদানের সত্যিকার প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার তা তাদেরকে দেবেন না ছাত্রীদের এরূপ আশঙ্কা করা উচিত নয়। বিবৃতিটিতে তিনি আরও বলেন যে কমরুন্নেসা স্কুলের ন্যায়সঙ্গত অভাব-অভিযোগগুলি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

এর পর কর্তৃপক্ষ ছাত্রীদের দাবী আংশিকভাবে স্বীকার করে নেওয়ায় ৬ই ডিসেম্বর ছাত্রী সংগ্রাম পরিষদ্ ইডেন-কমরুন্নেসার প্রায় তিন সপ্তাহকাল স্থায়ী ধর্মঘটের অবসান ঘোষণা করে।[২১]

৩॥ পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন

প্রাদেশিক স্বাস্থ্য মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহারের উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তানে সর্বপ্রথম একটি সাহিত্য সম্মেলনের ব্যবস্থা হয়। এই সম্মেলনের জন্যে যে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয় তাতে হাবিবুল্লাহ বাহার সভাপতি এবং অধ্যাপক অজিত গুহ ও সৈয়দ আলী আশরাফ উভয়ে সম্পাদক মনোনীত হন।[১] দৈনিক 'আজাদ' অফিসেই অভ্যর্থনা সমিতির বৈঠকগুলি অনুষ্ঠিত হয়।

৫ই ডিসেম্বর, রবিবার, অভ্যর্থনা সমিতির একটি সভায়[২] স্থির হয় যে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮ ও ১লা জানুয়ারি, ১৯৪৯ তারিখে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের বিভিন্ন শাখা এবং শাখা সভাপতি সম্পর্কে বৈঠকটিতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

অভ্যর্থনা—হাবিবুল্লাহ বাহার
মূল—ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহ
কাব্য—জসিমুদ্দীন
শিশু সাহিত্য—বেগম শামসুন্নাহার
ভাষা বিজ্ঞান—আবুল হাসনাৎ
ইতিহাস—অধ্যক্ষ শরফুদ্দীন
পুঁথি সাহিত্য ও লোক সংস্কৃতি—ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী।
বিজ্ঞান—ডক্টর এস. আর. খাস্তগীর
চিকিৎসাবিজ্ঞান—ডক্টর আবদুল ওয়াহেদ
শিক্ষা—অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ

৭ই ডিসেম্বর অভ্যর্থনা সমিতির বৈঠকে সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ১লা জানুয়ারি একটি 'তাহজীব' অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটির আয়োজনের জন্যে হাবিবুল্লাহ বাহার, সৈয়দ আলী আহসান, নাজির আহমদ, শামসুল হুদা, আবদুল আহাদ, আমিরুজ্জামান, আব্বাস উদ্দিন আহমদ, বেদারুদ্দীন আহমদ, মমতাজ আলী খান, লায়লা আরজুমন্দ বানু, মোহম্মদ কাসেম, ফররুখ আহমদ, আবদুল কাইউম, ফতেহ লোহানী, নুরুল ইসলাম চৌধুরী, মুজীবর রহমান খাঁ, কাজী মোতাহার হোসেন, আসাদুজ্জামান খাঁ, মোহাম্মদ সোলায়মান এবং খায়রুল কবীরকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়।[৩] অনুষ্ঠান লিপি ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি ঠিক করার জন্যে ১৭ই ডিসেম্বর বেলা ৩-৩০ মিনিটে ফজলুল হক হলের মিলনায়তনে উপরোক্ত অনুষ্ঠান কমিটির একটি বৈঠক বসে এবং তাতে অনুষ্ঠান সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়।[৪]

সাহিত্য সম্মেলনের প্রস্তুতি চলাকালে ঢাকা প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের একটি বৈঠকে এই মর্মে মত প্রকাশ করা হয় যে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের উদ্দেশ্য প্রগতি সাহিত্য বিরোধী এবং প্রকৃত গণতন্ত্র ও গণসাহিত্যের পরিপন্থী। সেই অনুসারে তাঁরা একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে বলেন যে, অতঃপর লেখক সংঘের কোনো সদস্য আসন্ন পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের সাথে কোনো প্রকার সহযোগিতা করবেন না।

লেখক সংঘের উপরোক্ত ঘোষণাটি ২৯শে ডিসেম্বর 'আজাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং তার ফলে সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক অজিত গুহ একটা জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। লেখক সংঘের সাথে তাঁর যোগাযোগ বরাবরই খুব ঘনিষ্ঠ ছিলো এবং ৮রা ডিসেম্বর সংঘের এক সাধারণ সভায় তাঁকে নতুন বৎসরের জন্যে তার সভাপতিও করা হয়। অন্যান্যদের মধ্যে মুনীর চৌধুরী সম্পাদক এবং আবদুল্লাহ আলমুতী শরফুদ্দীন ও আলাউদ্দীন আল আজাদ যুগ্ম সহকারী সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন।[৫] সাহিত্য সম্মেলন বর্জন করার সিদ্ধান্ত সংঘের যে বৈঠকে নেওয়া হয় তাতে অজিত গুহ ব্যক্তিগতভাবে অনুপস্থিত ছিলেন এবং তাঁকে সেখানে উপস্থিত থাকার জন্যে কোনো খবরও দেওয়া হয়নি।[৬]

বস্তুতপক্ষে সম্মেলন বর্জন করার সিদ্ধান্ত অজিত গুহের বিরুদ্ধে একটা শৃঙ্খলাগত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যেই গৃহীত হয়। সম্মেলনের প্রস্তুতি বেশ কিছুদিন থেকেই চলে আসছিলো এবং অজিত গুহ তার অভ্যর্থনা সমিতির

সম্পাদক হিসেবেও কয়েক সপ্তাহ ধরে কাজ করে আসছিলেন। কাজেই সম্মেলন সম্পর্কে লেখক সংঘ পূর্বেই একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারতো। কিন্তু তারা তা নেয়নি। এর কারণ বর্জন সংক্রান্ত তাদের প্রস্তাবটির একটা পূর্ব ইতিহাস ছিলো যেটিকে বাদ দিয়ে সেই সিদ্ধান্তের সত্যিকার অর্থ ও তাৎপর্য বোঝা যাবে না।

রবীন্দ্র গুপ্ত নামে ভবানী সেন কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'মার্কসবাদী'তে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে প্রগতি বিরোধী সাহিত্যিক হিসাবে চিত্রিত করেন। সেই হিসাবে প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের রবীন্দ্র সাহিত্য বর্জন করা একটি বৈপ্লবিক দায়িত্ব এই মর্মেও তিনি প্রবন্ধটিতে অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁর এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে পশ্চিম বাঙলার সুধী ও সাহিত্যিক মহলে ১৯৪৮ সালে এক দারুণ বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সুশোভন সরকার, গোপাল হালদার প্রভৃতি ভবানী সেনের রবীন্দ্রনাথ বর্জনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে লেখালেখি করেন এবং তাঁরা ছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে এই বিতর্ক বেশ ব্যাপক আকার ধারণ করে।

১৯৪৮-এর শেষের দিকে এই বিতর্কের ঢেউ পূর্ব বাঙলায়, বিশেষতঃ ঢাকাতেও, এসে পৌঁছায় এবং লেখক সংঘের অধিকাংশ সদস্যদের মধ্যেই রবীন্দ্রবিরোধী বক্তব্যই প্রাধান্য লাভ করে। মোটামুটিভাবে বলা চলে যে রবীন্দ্রনাথ প্রগতিবিরোধী কাজেই তাঁকে সেই হিসাবে বর্জন করার সিদ্ধান্ত লেখক সংঘে নীতিগতভাবে স্বীকৃত হয়।[৭] মুনীর চৌধুরী, আখলাকুর রহমান, আবদুল্লাহ আলমুতী প্রভৃতি এই রবীন্দ্রবিরোধিতার পুরোভাগে ছিলেন। এখানেই অজিত গুহের সাথে তাঁদের সরাসরি বিরোধ বাধে। কারণ অজিত গুহ রবীন্দ্রনাথকে প্রগতি বিরোধী সাহিত্যিক হিসাবে স্বীকার করতে অথবা তাঁকে বর্জন করতে সম্মত ছিলেন না।[৮]

প্রথমদিকে এই বিতর্ক লেখক সংঘের সংস্থদের মধ্যে মোটামুটিভাবে সীমাবদ্ধ থাকলেও সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের একটি সাহিত্য সভায় তা একটা সাধারণ বিতর্কে পরিণত হয়। এই সাহিত্য সভাটিতে হলের প্রভোস্টের সভাপতিত্বে ডক্টর শহীদুল্লাহ এবং অন্যান্যেরা আলাচনায় যোগদান করেন।[৯] লেখক সংঘের সদস্য আখলাকুর রহমান এই সভায় অংশ গ্রহণকালে তাঁদের রবীন্দ্রবিরোধী বক্তব্যের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' কবিতাটি থেকে—

> পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার,
> দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে—
> এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

এই অংশটি উদ্ধৃত করে বলেন যে কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ বস্তুতঃ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের ভারত অধিকারকে সমর্থন জানিয়েছেন এবং সেই হিসাবে সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা মূলতঃ প্রতিক্রিয়াশীল। তিনি তীব্র ভাষায় রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিরুদ্ধে এ ধরনের আরও অনেক কিছু বলেন।

আখলাকুর রহমানের এই বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের সভাপতি অজিত গুহ তাঁর উপরোক্ত বক্তব্যের বিরোধিতা করেন এবং রবীন্দ্রনাথ থেকে অন্যান্য উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর সাহিত্যের প্রগতিশীল ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। ডক্টর শহীদুল্লাহও আখলাকুর রহমানের বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বক্তৃতা দেন।

সলিমুল্লাহ হলের এই সাহিত্য সভার পর লেখক সংঘের অভ্যন্তরে অজিত গুহের বিরুদ্ধে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং লেখক সংঘের সভাপতি হওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণের সামনে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ভুল বক্তব্য হাজির করার জন্যে তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে একটা শৃঙ্খলাগত ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নেন। সেই সিদ্ধান্তকে কার্যকর প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে তাঁরা পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনকে মাত্র দুই দিন পূর্ব আকস্মিকভাবে বর্জন করার প্রস্তাব করেন।

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন বর্জন করার সপক্ষে লেখক সংঘের সিদ্ধান্ত আকস্মিক হলেও তার সঙ্গত কারণও অবশ্য ছিলো—সম্মেলনটি সর্বতোভাবে সরকারী উদ্যোগে আয়োজিত হওয়ায় স্বভাবতঃই তার মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রাধান্য ছিলো অনস্বীকার্য।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সম্মেলনটিকে দুদিন পূর্ব বর্জন করার সিদ্ধান্তের ফলে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক হিসাবে অজিত গুহ শেষ পর্যন্ত তাতে যোগদান করাই স্থির করেন। তবে তাঁর এই সিদ্ধান্তের অন্যতম কারণ ছিল এই যে তিনি ইতিমধ্যে সঠিকভাবে একথা জেনেছিলেন যে লেখক সংঘের সদস্যেরা তাঁকে সংঘ থেকে বহিষ্কার করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। কাজেই সংঘের এই সিদ্ধান্তের পরি-প্রেক্ষিতে তাদের সম্মেলন বিরোধী প্রস্তাব অনুযায়ী সম্মেলন বর্জন করতে তিনি নিজেকে বাধ্য মনে করেননি।[১০] পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সংঘের নির্দেশ অমান্য করে তাতে যোগদানের অভিযোগে সম্মেলনের পরেই অজিত গুহকে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ থেকে বহিষ্কার করা হয়।[১১]

৩১শে ডিসেম্বর, শুক্রবার বিকেল ২-৩০ মিঃ কার্জন হলে বিপুল জনসমাগমের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহ। মৌলানা আবদুর

রহিমের কোরান পাঠের দ্বারা সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। তারপর কবি গোলাম মোস্তফা নবজাগ্রত রাষ্ট্রের নব চেতনা এবং সাহিত্য সাধনার ভবিষ্যৎ ও সাহিত্যিকদের কর্তব্য সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত ভাষায় আলোচনা করেন। বেদার-উদ্দীন, বিমলচন্দ্র রায়, শেখ লুৎফর রহমান প্রভৃতি রেডিও পাকিস্তানের শিল্পীবৃন্দ আবদুল আহাদের পরিচালনায় নাজির আহমদ রচিত "পাকিস্তান জিন্দাবাদ" নামে একটি গান পরিবেশন করেন।[১২]

তারপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হাবিবুল্লাহ বাহার ভাষণে শাহী জমানার ঢাকা ও পূর্ব বাঙলার শিল্পী, সাহিত্য ও স্থাপত্যের বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই আলোচনার উপসংহারে তিনি বলেন:

> এ দেশের সাহিত্যের ইতিহাস শাস্ত্রকার ও অভিজাতদের সঙ্গে জনগণের বিরোধের ইতিহাস। এ বিরোধে বারে বারে জনগণের জয় হয়েছে। জনগণের ভাষা বাংলাকে শাস্ত্রকাররা বর্জন করেছিলেন। তখন সেই ভাষা সাম্যবাদী ও গণতন্ত্রী পাঠান সুলতান ও আমীর ওমরাদের সমর্থন পেয়েছিলো।* এই জন্যই দেখি: কৃত্তিবাস, বিদ্যাপতি থেকে আরম্ভ করে আদিমযুগের হিন্দু কবিরা এদের বন্দনা করেছেন কৃষ্ণের অবতার বলে। শুধু সমর্থন নয় রামায়ণ-মহাভারতের সঙ্গে অসংখ্য আরবী ফারসী গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন মুসলিম সাহিত্যিকরা। এখনো মুসলিম কবিদের লেখা প্রায় দশ হাজার পুঁথি বঙ্গ সাহিত্যের জয় ঘোষণা করছে।
>
> বঙ্গ সাহিত্য পুষ্টিলাভ করেছে স্থানীয় ও মুসলিম তাহজিব-তমদ্দুনের সংঘাতের ফলে। এই সংঘাতেরই ফলে জন্ম হয়েছে শ্রীচৈতন্যের ও চৈতন্য পরবর্তী সাহিত্যের যার প্রাণবাণী "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" ইসলামী বিপ্লব বাঙলায় সম্পূর্ণ হয় নাই নানা কারণে। তা সত্ত্বেও ইসলাম এখানে যেটুকু প্রভাব বিস্তার করেছে, তারই ফলে দেখি বাঙালী ভারতের অন্য প্রদেশের চেয়ে বেশী গণতন্ত্রী, বেশী সাম্যবাদী, বেশী বিপ্লবী। ইংরেজ আগমনের পরে আবার হয় সংস্কৃতির সংঘাত। এ দেশীয় মুসলিম ও ইউরোপীয় সংস্কৃতির সম্মেলনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের জন্ম। রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি যতখানি হয়ে থাকুক, এ সাহিত্যের বিরাট ত্রুটি এই যে, এর সঙ্গে ছিলো না গণমানসিকতার যোগ। এ ছিল মধ্যবিত্ত সমাজের সাহিত্য যাকে বলা যায় শহুরে সাহিত্য।

---

* এই জাতীয় বক্তব্য হাবিবুল্লাহ বাংলা ব্যবস্থাপক সভায় বাংলা ভাষা সম্পর্কে আলোচনাকালে ইতিপূর্বে পেশ করেছিলেন। এই বইয়ের ১৫০-৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আজ আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। পূর্ববঙ্গে জন্ম হয়েছে পাকিস্তান রাষ্ট্রের। শহর থেকে দূরে স্বাধীনতার আবহাওয়ায় তৈরী হবে আমাদের নূতন যুগের নূতন সাহিত্য। এতদিন বাংলা সাহিত্যে জনগণের জীবন প্রতিফলিত হয় নাই। এবার তাই হবে, নূতন পাকিস্তানী সাহিত্যে আমরা দেখতে পাবো ঐ সব মানুষের জীবনের ছবি, যারা মাটিতে ফলায় সোনা, পদ্মা-মেঘনা, সাগর-মহাসাগরে দেয় পাড়ি, ধানের ক্ষেতে বাজায় বাঁশী। এ সাহিত্য দেশের দুঃসাহসী জনগণের সাহিত্য।

পাকিস্তানের সোনার কাঠির স্পর্শে আজ পূর্ববঙ্গে জাগছে কবি, জাগছে শিল্পী, জাগছে নূতন যুগের সাহিত্যিক। শক্তিধর সৃষ্টিধর্মী শিল্পীর পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আজিকার সমবেত সাহিত্যিকদের মধ্য দিয়ে সেই অনাগত শিল্পীকে জানাই খোদ আমদেদ।[১৩]

ডক্টর শহীদুল্লাহ মূল সভাপতি হিসাবে তাঁর ভাষণে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন। জাতীয় সাহিত্য সম্পর্কে তিনি বলেন :

স্বাধীন পূর্ব বাংলার স্বাধীন নাগরিকরূপে আজ আমাদের প্রয়োজন হয়েছে সর্ব শাখায় সুসমৃদ্ধ এক সাহিত্য। এই সাহিত্যে আমরা আজাদ পাক-নাগরিক গঠনের উপযুক্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের অনুশীলন চাই। এই সাহিত্য হবে আমাদের মাতৃভাষা বাংলায়। পৃথিবীর কোনো জাতি জাতীয় সাহিত্য ছেড়ে বিদেশী ভাষায় সাহিত্য রচনা করে যশস্বী হতে পারেনি। ইসলামের ইতিহাসের একেবারে গোড়ার দিকেই পারস্য আরব কর্তৃক বিজিত হয়েছিল, পারস্য আরবের ধর্ম নিয়েছিল, আরবী সাহিত্যেরও চর্চা করেছিল। কিন্তু তার নিজের সাহিত্য ছাড়েনি।[১৪]

হরফ সমস্যা সম্পার্ক তিনি বলেন :

কিছুদিন থেকে বানান ও অক্ষর সমস্যা দেশে দেখা দিয়েছে। সংস্কারমুক্ত-ভাবে এগুলির আলোচনা করা উচিত এবং তার জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে পরামর্শ সমিতি গঠন করা আবশ্যক। যাঁরা পালী, প্রাকৃত ও ধ্বনি তত্ত্বের সংবাদ রাখেন, তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য যে বাংলা বানান অনেকটা অবৈজ্ঞানিক, সুতরাং তার সংস্কার দরকার। স্বাধীন পূর্ব বাংলায় কেউ আরবী হরফে, কেউ বা রোমান অক্ষরে বাংলা লিখতে উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু বাংলার শতকরা ৮৫ জন যে নিরক্ষর, তাদের মধ্যে অক্ষরজ্ঞান বিস্তারের জন্য কি চেষ্টা হচ্ছে? যদি পূর্ব বাংলার বাইরে বাংলা দেশ না থাকতো আর যদি গোটা বাংলা দেশে মুসলমান ভিন্ন অন্য সম্প্রদায় না

থাকত, তবে এই অক্ষরের প্রশ্নটা এত সঙ্গীন হত না। আমাদের বাংলা ভাষী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে। কাজেই বাংলা অক্ষর ছাড়তে পারা যায় না। পাকিস্তান রাষ্ট্র ও মুসলিম জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার প্রয়োজনীয়তা আমরা স্বীকার করি। তার উপায় আরবী হরফ নয়; তার উপায় আরবী ভাষা। আরবী হরফে বাংলা লিখলে বাংলার বিরাট সাহিত্য ভাণ্ডার থেকে আমাদিগকে বঞ্চিত হতে হবে। অধিকন্তু আরবীতে এতগুলি নতুন অক্ষর ও স্বরচিহ্ন যোগ করতে হবে যে বাংলার বাইরে তা যে কেউ অনায়াসে পড়তে পারবে তা বোধ হয় না। ফলে যেমন উর্দু ভাষা না জানলে কেউ উর্দু পড়তে পারবে না, তেমনি হবে বাংলা।[১৫]

শিক্ষা এবং অনুশীলনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

আমরা পূর্ব বাঙলার সরকারকে ধন্যবাদ দেই যে তাঁরা বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করে বাংলা ভাষার দাবীকে আংশিকরূপে স্বীকার করেছেন। কিন্তু সরকারের ও জনসাধারণের এক বিপুল কর্তব্য সম্মুখে রয়েছে। পূর্ব বাঙলা জনসংখ্যায় গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, পর্তুগাল, আরব, পারস্য, তুর্কি প্রভৃতি দেশের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এই সোনার বাঙলাকে কেবল জনে নয়, ধনে ধান্যে, জ্ঞানে গুণে, শিল্প বিজ্ঞানে পৃথিবীর যে কোনো সভ্য দেশের সমকক্ষ করতে হবে। তাই কেবল কাব্য ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাংলাকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল বিভাগে বাংলাকে উচ্চ আসন দিতে হবে। তার জন্য শিক্ষার মাধ্যমে স্কুল কলেজ মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় আগাগোড়া বাংলা করতে হবে।[১৬]

এর পর আবার উর্দু শিক্ষার উপরও জোর দিতে গিয়ে তিনি বলেন:

আজাদ পাকিস্তানে আমাদের অবিলম্বে শিক্ষা তালিকার সংস্কার করতে হবে। এই নূতন তালিকায় রাষ্ট্রভাষা উর্দুকে স্থান দিতে হবে। যারা এতদিন রাষ্ট্রভাষা রূপে ইংরেজির চর্চা করেছে, তাদের উর্দু শিখতে কি আপত্তি থাকতে পারে?[১৭]

মূল সভাপতির ভাষণে ডক্টর শহীদুল্লাহর উপরোক্ত বক্তব্যসমূহ ছাড়াও তাঁর বক্তব্যের যে অংশটি সর্বাপেক্ষা গুরুতর বিতর্কের সৃষ্টি করে তা হলো:

আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালী। এটি কোনো আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙি-দাড়িতে ঢাকবার জোটি নেই।[১৮]

ডক্টর শহীদুল্লাহর ভাষণ এবং প্রথম অধিবেশনের অন্যান্য লেখাগুলি পড়া শেষ হওয়ার পর পূর্ব বাঙলা সরকারের শিক্ষা দফতরের সেক্রেটারী ফজলে আহমদ করিম ফজলী সৈয়দ আলী আহসানকে বলেন যে তিনি শ্রোতাদেরকে উদ্দেশ করে বাংলাতে কিছু বলতে চান। হাবিবুল্লাহ বাহার এ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহিত বোধ না করলেও শেষ পর্যন্ত সম্মত হন।[১৯]

ফজলী বক্তৃতা দিতে উঠে প্রথমেই বলেন, 'আজ এখানে যে সমস্ত প্রবন্ধগুলি পড়া হলো সেগুলি শোনার পর আমি ভাবছি আমি কি ঢাকাতে আছি না কলকাতায়।' ফজলী তাঁর বক্তৃতায় ভাষা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে পশ্চিম বাঙলার বাংলা ভাষার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলার সংযোগ থাকার কোনো কারণ নেই। কমিউনিস্টদের একটি জিনিস তাঁর খুব পছন্দ বলেও তিনি উল্লেখ করেন--কমিউনিস্টরা মনে করেন যে সকল দেশের কমিউনিস্ট পরস্পরের সাথী এবং ভাই। কাজেই সে অবস্থায় পশ্চিম বাঙলার হিন্দুদের সাথে এবং তাদের ভাষার সাথে পূর্ব পাকিস্তানী মুসলমানদের ভাষার যোগ কোথায়? এইসব মন্তব্য ছাড়াও তিনি সভাপতি ডক্টর শহীদুল্লাহর অভিভাষণের অনেক সরাসরি সমালোচনাও করেন।[২০]

ফজলী অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিলেন এবং তার বক্তৃতা শেষ হওয়ার কোনো লক্ষণ না দেখে হাবিবুল্লাহ বাহার সভা চলাকালে সভাপতির সমালোচনা করা উচিত নয়, এই বলে ফজলীকে তাঁর বক্তৃতা শেষ করতে বলেন। কিন্তু স্বাস্থ্য-মন্ত্রীর এই অনুরোধ সত্ত্বেও স্বাস্থ্য ও শিক্ষা দফতরের সেক্রেটারী তাঁর বক্তৃতা শেষ করতে সম্মত হলেন না। শুধু তাই নয়, পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী তাঁর কিছু সমর্থকও সেই সভাস্থলে উপস্থিত ছিলো, যারা হাবিবুল্লাহ বাহারের উপর এ সময় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং ফজলীকে বক্তৃতা করতে দেওয়ার জন্যে চীৎকার করে।[২১]

এর পর ফজলী আরও অল্পক্ষণ বক্তৃতা করে আবোল-তাবোল অনেক কিছু বলায় হাবিবুল্লাহ বাহার ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং তাঁকে 'মিথ্যাবাদী' ইত্যাদি বলে তৎক্ষণাৎ বক্তৃতা শেষ করতে বলেন।[২২] এই পর্যায়ে প্রাদেশিক

মন্ত্রী এবং তাঁর দফতরের সেক্রেটারীর মধ্যে খোলাখুলিভাবে তর্কবিতর্ক এবং অশালীন মন্তব্য বিনিময় হয়। অবস্থা প্রায় আয়ত্তের বাইরে যাওয়ার উপক্রম হলে অজিত গুহ এবং আলী আহসান মাইকের কাছে গিয়ে ফজলীকে মাইক ছেড়ে সভামঞ্চ থেকে নীচে নামতে বলেন।[২৩] এতে ফজলী অজিত গুহের উপর খুব রুষ্ট হন। কিন্তু আলী আহসান আবার তাঁকে এই বলে মঞ্চ ত্যাগ করতে বলেন যে তিনি সভাস্থলে আর কিছুক্ষণ থাকলে ছাত্রদের হাতে তাঁর মার খাওয়ার সম্ভাবনা।[২৪]

মঞ্চের উপর উদ্ভূত পরিস্থিতির ফলে ইতিমধ্যে সাধারণ শ্রোতারাও ফজলীর উপর ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং তাঁর বিরুদ্ধে নানাপ্রকার ব্যাঙ্গাত্মক ধ্বনি দিতে থাকে। সেই অবস্থায় বাধ্য হয়েই স্বাস্থ্য ও শিক্ষা দফতরের সেক্রেটারী ফজলে আহমদ করিম ফজলী সভাস্থলে উপস্থিত লোকজনের বিপুল করতালির মধ্যে ক্রুদ্ধচিত্তে সভাস্থল পরিত্যাগ করেন।[২৫]

ফজলীর উপরোক্ত আচরণে হাবিবুল্লাহ বাহার তাঁর প্রতি ভয়ানক রুষ্ট এবং অসন্তুষ্ট হন। সম্মেলন শেষ হওয়ার পরই তিনি চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদকে বলে তাঁকে স্বাস্থ্য দফতরের সেক্রেটারীর পদ থেকে অপসারণ করে অন্য একজনকে সেই পদে নিযুক্ত করেন।[২৬] ফজলী অবশ্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দফতরের সেক্রেটারীর পদে যথারীতি বহাল থাকেন।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন ১লা জানুয়ারি 'আজাদে' সম্মেলনের উপর একটি সম্পাদকী প্রকাশিত হয়। সম্পাদকীয়টিতে সম্মেলনের সম্পর্কে অত্যন্ত বিরূপ আলোচনার সংবাদ পেয়ে ৩১শে ডিসেম্বর রাত্রেই হাবিবুল্লাহ বাহার আজাদ অফিসে গিয়ে আবুল কালাম শামসুদ্দীনের সাথে দেখা করে সেটা বাতিলের চেষ্টা করেন। কিন্তু আজাদ অফিসে সম্পাদকের দেখা না পেয়ে এবং অন্যত্র সন্ধান করেও ব্যর্থ হয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কিছু করতে অক্ষম হন।[২৭] কাজেই সম্পাদকীয়টি যথারীতি ১লা জানুয়ারি প্রকাশিত হয় এবং তাতে আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন ডক্টর শহীদুল্লাহের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন :

> সভাপতি তাঁর ভাষণের এক স্থানে বলিয়াছেন, "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালী। এটি কোনো আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, তা মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি লুঙি-দাড়িতে ঢাকবার জোটি নেই।"

অখণ্ড ভারতের যুক্ত বাঙলায় সাহিত্যিক অভিভাষণে এমন কথা অনেকেই বলিয়াছেন বটে ; কিন্তু বিভক্ত ভারতের দ্বিখণ্ডিত বাঙলায় পাকিস্তানী পরিবেশে এই শ্রেণীর কথা শুনিতে হইবে, একথা ভাবা একটু কঠিন ছিল বৈ কি। তা ছাড়া কোনো হিন্দু লেখক নয়, একেবারে স্বয়ং ডক্টর শহীদুল্লাহ "মা প্রকৃতির" এমন স্তব গাহিবেন, এ-কথাই বা কে ভাবিতে পারিয়াছিল।

উপরোক্ত সম্পাদকীয়টিতে আর বলা হয় যে ডক্টর শহীদুল্লাহ তাঁর ভাষণে ইসলামী ভাবধারা আমদানীর কোনো প্রয়োজন বোধ করেননি। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে ডক্টর শহীদুল্লাহ এক মৌখিক ভাষণে আজাদের সম্পাদকীয়টির জবাব দিতে গিয়ে বলেন যে ইসলাম সম্পর্কে কোনো কথা বলার অধিকার দৈনিক পত্রিকাটির অপেক্ষা তাঁরই বেশী। কাজেই এ বিষয়ে তাদের মন্তব্য অনধিকার চর্চা ব্যতীত কিছুই নয়।[২৮]

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সম্মেলনে একটি কার্যকরী সংসদ গঠনের প্রস্তাব আনা হয়। এই প্রস্তাবে অন্যান্যেরা ছাড়া হাবিবুল্লাহ বাহার, শামসুন্নাহার মাহমুদ, সৈয়দ আলী আহসান, সৈয়দ আলী আশরাফের নামও ছিলো। কার্যকরী সংসদ সংক্রান্ত প্রস্তাবটি উত্থাপন করার পর অধ্যাপক আবুল কাসেম তার প্রতিবাদ করেন। এর পর আরও কয়েকজন তাঁর সাথে প্রতিবাদে যোগ দেন। তাঁদের বক্তব্য ছিলো এই যে বাঙলার প্রগতিবাদী তরুণ লেখক এবং ঢাকার বাইরের অনেক নামজাদা সাহিত্যিককে তার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রতিবাদের ফলে হাবিবুল্লাহ নিজেই প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করেন। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে ব্যবস্থাপক সভায় বাংলাকে পূর্ব বাঙলার রাষ্ট্রভাষা করার যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিলো তাকে কার্যকরী করার জন্যে আবুল কাসেম একটি প্রস্তাব করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে সে প্রস্তাব গৃহীত হয়।[২৯]

'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে কি দেখিলাম' এই শিরোনামায় আকালী চৌধুরী কর্তৃক লিখিত প্রত্যক্ষদর্শীর একটি বিস্তৃত বিবরণ ৯ই জানুয়ারি ১৯৪৯-এর সাপ্তাহিক 'সৈনিকে' প্রকাশিত হয়। বিবরণটির কয়েকটি অংশ উল্লেখযোগ্য।

সম্মেলন সম্পর্কে সাধারণভাবে মন্তব্য করতে গিয়ে তাতে বলা হয় :

পুরা একটি বছর এত ঢোল শহরতের পর সম্মেলনে যা পরিবেশন করলেন তা বহু কষ্টে পর্বতের মূষিক প্রসবের মতোই হয়েছিলো। গিয়েছিলাম পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে কিন্তু সেখানে না পেলাম পূর্ব পাকিস্তানকে আর না পেলাম পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যকে। ঢাকার বাইরে যে

পূর্ব পাকিস্তান আছে তা বোধহয় সম্মেলনের উদ্যোক্তারা মনেই করেননি। ডক্টর শহীদুল্লাহর ভাষণে বিক্ষুব্ধ প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণটিতে বলা হয়:

মূল সভাপতি পণ্ডিতপ্রবর শহীদুল্লাহ সাহেব তো তবু নূতন কথা কিছু আমাদের শুনিয়েছেন—মুসলমানের চেয়েও বেশী সত্য আমরা বাঙালী, প্রকৃতি মা যেন আমাদের চেহারায় ছাপ মেরে দিয়েছেন, টিকি টুপিতে, আমাদের ফরখ্ করবে কি করে।—নূতন কথাই বটে, মিস্টার জিন্নাহ আর তাঁর চেলা-কেলাদের এই এতদিনকার পুরোনো দুই জাতিত্বের রক্তক্ষয়ী চীৎকারের পর এবং পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পরও মুসলমানের চাইতে আমাদের বাঙালী পরিচয়টাই খাটি সত্য এর চেয়ে অভিনব কথা আর কি হতে পারে? 'পূর্ব পাকিস্তানের' সম্মেলনের প্রধান পুরোহিতের যোগ্য কথাই বটে।

এর পর আজাদের সম্পাদকীয় সমালোচনা এবং ডক্টর শহীদুল্লাহর জবাবের জের টেনে বিবরণদাতা বলেন:

কিন্তু এত বড় পণ্ডিত ব্যক্তির সমালোচনা করতে যাবো না—এ ব্যাপারে ভয়ও আছে যথেষ্ট। নিতান্ত অর্বাচীনের মতো কোনো একটা দৈনিক সভাপতি সাহেবের খুঁত ধরতে গিয়েছিলো, বলতে চেয়েছিলো আমাদের সাহিত্যিক পিতামহ এই সভাপতি সাহেব দাদুর গল্পের মতোই সাহিত্যের অনেক পুরানো কাহিনী আমাদের শুনিয়েছেন। নূতন কিছু শুনাতে পারেননি! সভাপতি সাহেব তাঁর মুখের মতোই উত্তরই দিয়েছেন—এসব তিনি ভয় করবেন কেন! এরকম সমালোচনা কত তাঁর পায়ের তলা দিয়ে গড়ায়। শুধু তাই নয়, দৈনিকটি যে বলেছিলো ডক্টর সাহেব আমাদের সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা আমদানীর কোনো প্রয়োজন অনুভব করেননি এ নাকি তার অনধিকার চর্চা। আমরাও স্বীকার করি। চোরের মুখে ধর্মের কাহিনী।

সম্মেলন আয়োজনের ক্ষেত্রে সরকারী মহলের উদ্যোগ এবং প্রথম দিনের অধিবেশনে হাবিবুল্লাহ বাহার ও ফজলীর ক্রুদ্ধ বাক্য বিনিময় সম্পর্কে বিবরণটির প্রাথমিক অংশটি উল্লেখযোগ্য:

দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার আগে কে একজন বলছিলো—এটা তো ইডেন বিল্ডিং সম্মেলন। ভদ্রলোকের অজ্ঞতা দেখে হেসেছিলাম—এখন আবার হাসলাম। বোকার 'তৃতীয় হাসি', অর্থাৎ এখন বুঝে হাসলাম। সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজনে সাহিত্যিকদের না ডেকে বড় বড় সরকারী কর্মচারীদের সহযোগিতাই কামনা করেছেন বেশী

করে, এই বোধহয় ছিল ভদ্রলোকটির ইশারা। কথাটা আমাদের আগেই বুঝা উচিত ছিলো। প্রথম দিনের অধিবেশনে ইডেন বিল্ডিং-এর বিশিষ্ট কর্মচারী শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী অবাঙালী এফ. এ. করিম সাহেবকে বাংলা ভাষায় তমদ্দুন সম্বন্ধে বলতে দিয়ে পরে স্বভাবতঃ বক্তৃতাটা কিছু অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেলে সভাপতির অপেক্ষা না করেই বাহার সাহেব যে ভাবে ভদ্রলোককে ধমক দিয়েছিলেন (আর নিজেও ধমক খেয়েছিলেন) তাতে ইডেন বিল্ডিং-এর কথাটা মনে হওয়া উচিত ছিলো আমাদের তখন। কিন্তু উজিরে সেক্রেটারীতে বেধে গেলো মুরগীর লড়াই। ব্যাপারটা দেখতে উপভোগ্য হয়েছিলো মন্দ নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত, আর বাহার সাহেবের কাছে প্রেরণা পেয়ে হাজার হাজার লোকের হাততালির মধ্যে অপমানিত ও বিতাড়িত ভদ্রলোকের জন্যে সহানুভূতিতে প্রাণটা এতই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো যে তখন আর কিছু ভাববারই অবসর ছিলো না। এবার কথাটা বুঝলাম, আর এও বুঝলাম উজির সাহেবানদের সেক্রেটারীরা তাঁদেরকে থোড়াই কেয়ার করে থাকেন।

১৯৪৯ সালের এই সাহিত্য সম্মেলন এবং তৎকালীন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ডক্টর শহীদুল্লাহ ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন:

১৯৪৭ সালের ১৪ই অগাস্টে বহু দিনের গোলামীর পর যখন আজাদীর সুপ্রভাত হল, তখন প্রাণে আশা জেগেছিল যে এখন স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে বাংলা সাহিত্য তার সমৃদ্ধির পথ খুঁজে পাবে। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর ঢাকায় যে সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশন হয়েছিল, তাতে বড় আশাতেই বুক বেঁধে আমি অভিভাষণ দিয়েছিলুম। কিন্তু তারপর যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাতে হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলুম, স্বাধীনতার নূতন নেশায় আমাদের মতিচ্ছন্ন করে দিয়েছে। আরবী হরফে বাংলা লেখা, বাংলা ভাষায় অপ্রচলিত আরবী পারসী শব্দের অবাধ আমদানি, প্রচলিত বাংলা ভাষাকে গঙ্গাতীরের ভাষা বলে তার পরিবর্তে পদ্মাতীরের ভাষা প্রচলনের খেয়াল প্রভৃতি বাতুলতা আমাদের একদল সাহিত্যিককে পেয়ে বসল। তাঁরা এই মাতলামিতে এমন মেতে গেলেন, যে প্রকৃত সাহিত্য সেবা যাতে দেশের দশের মঙ্গল হতে পারে, তার পথে আবর্জনা স্তূপ দিয়ে সাহিত্যের উন্নতির পথ কেবল রুদ্ধ করেই খুশিতে ভূষিত হলেন না, বরং খাঁটি সাহিত্য

সেবীদিগকে নানা প্রকারে বিড়ম্বিত ও বিপদগ্রস্ত করতে আদা-জল খেয়ে কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। তাতে কতক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীরা উস্‌কানি দিতে কসুর করলেন না। ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং অন্যান্য পশ্চিমবঙ্গের কবি ও সাহিত্যিক-গণের কাব্য ও গ্রন্থ আলোচনা, এমন কি বাঙালী নামটি পর্যন্ত যেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে কেউ কেউ মনে করতে লাগলেন। কেউ এতে মিলিত বঙ্গের ভূতের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আবল-তাবল বক্‌তে শুরু করে দিলেন এবং বেজায় হাত-পা ছুড়তে লাগলেন। করাচীর তাঁবেদার গত লীগ গভর্নমেণ্ট বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্যে কিছু করা দূর থাক, বাঙালী বালকের কচি মাথায় উর্দুর বোঝা চাপিয়ে দিলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আরবী হরফে বাংলা ভাষা লেখার এবং উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার অপচেষ্টায় সহযোগিতা করেছেন। এইরূপ বিষাক্ত আবহাওয়ায় ১৯৪৮ সালের পরে আর কোনোও সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন সম্ভবপর হয়নি।* আজ জনপ্রিয় পূর্ব বাঙলার গভর্নমেণ্টের আশ্রয়ে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এক সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করেছি।[৩০]

*১৯৪৮ সালের পর ১৯৫১ সালে চট্টগ্রামে এবং ১৯৫২ সালে কুমিল্লায় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তবে ১৯৪৮-এর পর ১৯৫৪ সালেই ঢাকাতে সর্বপ্রথম সাহিত্য সম্মেলন হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আন্দোলনের অগ্রগতি

১ ॥ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ

পূর্বতন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম ছাত্র লীগ নেতৃত্বের বাংলা ভাষার বিরোধিতা এবং চরম সুবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকার জন্যে সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে একটা তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। সেই অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ছাত্র একটি নোতুন ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠনে ১৯৪৮-এর প্রথম দিকেই উদ্যোগী হন।

নিজেদের মধ্যে কিছু প্রাথমিক ঘরোয়া আলোচনার পর প্রদেশের ছাত্রদের প্রতি একটি নোতুন ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠনের আহ্বান জানিয়ে ১৯৪৮-এর মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে তাঁরা 'পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম ছাত্র ছাত্রীদের প্রতি আবেদন' নামে একটি সার্কুলার প্রচার করেন। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে সার্কুলারটি একটি উল্লেখযোগ্য দলিল। প্রথমেই সাধারণ ছাত্রদের সহযোগিতা কামনা করে তাতে বলা হয়:

> ছাত্র সমাজের অভূতপূর্ব ত্যাগ ও কর্মপ্রেরণা দ্বারাই আমরা পাকিস্তান অর্জন করিয়াছি। এই শিশু রাষ্ট্রকে গড়িয়া তুলিবার ব্যাপারেও আমাদেরই প্রধান ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ও জনগণ যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন তার আশু সমাধানের জন্যে সুষ্ঠু ছাত্র আন্দোলন একান্ত প্রয়োজনীয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ এ ব্যাপারে পূর্বতন ছাত্র প্রতিষ্ঠান "মুসলিম ছাত্র লীগ" আমাদের নিরাশ করিয়াছে। বর্তমানে নির্জীব ও অকর্মণ্য এই প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে আমরা যাহা চাহিয়াছি, তাহার কিছুই পাই নাই। তাই পাকিস্তান রাষ্ট্রকে সুদৃঢ় ভিত্তির গড়িয়া তুলিবার জন্য ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন একান্ত প্রয়োজনীয় এবং এই ছাত্র আন্দোলন পরিচালনা করিবার জন্য "পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ" নামে একটি নূতন ছাত্র প্রতিস্থান গঠনে সহায়তা করিবার জন্য আমরা আপনাদের সহযোগিতা কামনা করি।

নোতুন ছাত্র প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা এবং যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সার্কুলারটিতে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করে বলা হয়:

প্রশ্ন উঠিতে পারে পূর্বতন "মুসলিম ছাত্র লীগের" পরিবর্তে নূতন ছাত্র প্রতিষ্ঠান কেন? আমাদের মনে হয় নিম্নোক্ত কারণগুলি এই প্রস্তাবিত নূতন ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠনের পক্ষে যথেষ্ট: (১) ছাত্র লীগের বাৎসরিক সাধারণ নির্বাচনের জন্য কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সর্বশেষ অধিবেশন হইয়াছিল ১৯৪৪ সালে কুষ্টিয়াতে। তার পর গত চার বৎসরে ছাত্র লীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কাউন্সিলের অন্ততঃ ৮টি অধিবেশন হওয়া বাধ্যতামূলক থাকা সত্ত্বেও একটি অধিবেশনও ডাকা হয় নাই। (২) বার বার রিকুইজিশন নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও সেক্রেটারী কাউন্সিলের অধিবেশন আহ্বান করিতে ও নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে অস্বীকার করিয়াছেন (কিন্তু দলবাজী করিবার জন্য ঢাকায় যুব-সম্মেলন করিয়াছেন)। (৩) চারি বৎসর পূর্বে গঠিত ছাত্র লীগের কর্ম পরিষদের সদস্যদের প্রায় সকলেরই ছাত্র জীবনের অবসান হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির মানসে তাঁহারা গদি আঁকড়াইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। (৪) ভূতপূর্ব ছাত্র লীগের কর্মকর্তারা দলীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিয়া মন্ত্রিগণের হাতে ক্রীড়া পুত্তলির অভিনয় করিতেছেন। (৫) মুসলিম লীগ বিভক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও ছাত্র লীগ বিভক্ত হয় নাই (বাংলা দেশ পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানে বিভক্ত হওয়ার পর "নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র লীগ" আর থাকিতে পারে না)। (৬) বর্তমানে উদ্ভূত জরুরী সমস্যাগুলির সমাধান করিতে এবং ছাত্র আন্দোলন পরিচালনা করিবার ব্যাপারে ছাত্র লীগের কর্মকর্তারা লজ্জাহীন নিষ্ক্রিয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। (৭) তথাকথিত ছাত্র নেতাদের ছাত্রনীতি বিরোধী কার্য-কলাপ ও প্রতিষ্ঠানের নাম ভাঙাইয়া চাকুরি সংগ্রহের প্রচেষ্টা ছাত্র সমাজে গভীর হতাশা ও বিক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছে। (৮) জনকয়েক ছাত্র নেতার বাংলা ভাষা বিরোধী কার্যকলাপ এবং ঢাকার বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাঁদের সক্রিয় কর্মপন্থা এবং গুণ্ডামী ছাত্র ও জনসাধারণের মাঝে ছাত্র লীগের প্রতি ঘৃণার সঞ্চার করিয়াছে। (৯) এই কর্মকর্তারা নিজেরাও কিছু করিতেছেন না। পক্ষান্তরে কেহ কিছু করিবার জন্য আগাইয়া আসিলে নেতৃত্ব খোওয়া যাইবার ভয়ে তাঁহাদের বাধা দিতেছেন। এ বিষয়ে উত্তরবঙ্গ ছাত্র সম্মেলন (রাজশাহী) এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যুব সম্মেলন (কলিকাতা) সম্পর্কে মিঃ আজিজুর রহমানের বিবৃতি প্রণিধানযোগ্য। (১০) তদুপরি ছাত্র লীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ীই ছাত্র লীগ বাতিল হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব বাঙলার ছাত্র সমাজ তৎকালে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলো সেগুলির উল্লেখ করে সার্কুলারের স্বাক্ষরদাতারা বলেন :

ইণ্টারমিডিয়েট কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে ভর্তি করিবার ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চরম উদাসীনতা দেখাইয়াছে, পূর্ব পাকিস্তানে নবাগত ছাত্রদিগের পড়াশুনা এবং বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে সরকার পূর্ব গাফেলতি প্রকাশ করিতেছে; বেপরোয়াভাবে রিকুইজিশন দিয়া সরকার সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি দখল করিয়া লইয়াছে; প্রাইমারী শিক্ষা-ব্যবস্থা বানচাল হইয়া যাইবার পথে; বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহন, রাষ্ট্রভাষা এবং আদালতের ভাষা বলিয়া ঘোষণা করিতে বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকার অস্পষ্ট ও সন্দেহজনক অভিমত প্রকাশ করিয়াছে; সরকারের উদাসীনতা এবং পরিচালনার অব্যবস্থার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের পথে আসিয়া পৌছিয়াছে; রাষ্ট্রভাষা রূপে বাংলা যেন স্থান না পায় তজ্জন্য ভীষণ ষড়যন্ত্র চলিতেছে এবং নূতন নোট, স্ট্যাম্প, খাম, পোস্ট কার্ড, মনি অর্ডার ফর্ম, মুদ্রা ও অন্যান্য জিনিস হইতে সমস্ত পাকিস্তানের জনসাধারণের অংশের ভাষা বাংলাকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের নৌ-বাহিনী পরীক্ষায় উর্দুতে টেস্ট করিবার ছলনায় পূর্ব বাঙলার যুবকদের বাদ দেওয়া হইতেছে। ইংরাজীর পরিবর্তে উর্দুর জুলুম আমাদের ঘাড়ে চাপিতে বসিয়াছে। বিমান, নৌ ও স্থল বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকদের পুরোপুরি বাদ দেওয়া হইতেছে।

এর পর নোতুন ছাত্র প্রতিষ্ঠানটির নীতি ও কর্মসূচী ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাঁরা বলেন :

আমাদের অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা এই যে ছাত্র নেতাগণ বরাবর পেশাদার নেতাদের অঙ্গুলী হেলনে পরিচালিত হইয়া স্বাধীন নিষ্কলুষ ছাত্র সমাজের উপর কলঙ্ক লেপন করিয়াছেন। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের পর আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। মন্ত্রীসভা বা বিরোধীদলের হস্তে ক্রীড়া পুত্তলি হওয়া আমাদের নীতি নয় বরং দলীয় রাজনীতির ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও সম্পর্কহীন থাকিয়া পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্নমুখী প্রতিভা সৃষ্টি এবং উদ্ভূত জাতীয় সমস্যাগুলির উপর গঠনমূলক আন্দোলন সৃষ্টি করাই আমাদের উদ্দেশ্য। সরকারের জনকল্যাণকর কর্ম পদ্ধতির প্রতি আমাদের সক্রিয় সাহায্য ও সহানুভূতি থাকিবে কিন্তু সরকারের জন ও ছাত্র স্বার্থ বিরোধী কর্মপন্থাকে আমরা রুখিয়া দাঁড়াইব।

পক্ষান্তরে বাধ্যতামূলক ফ্রি প্রাইমারী শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা, বিনা খেসারতে জমিদারী ও বর্গাদার প্রথার উচ্ছেদ, নানাবিধ কারিগরি শিক্ষার সুবন্দোবস্ত, পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শিক্ষার সুবন্দোবস্তের জন্য সামরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন, ডাক্তারী ও ধাত্রীবিদ্যা প্রসারের জন্য উন্নত ধরনের নূতন কারিকুলামের দাবী, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, মুনাফাকারীর ও চোরা কারবারীর সমূলে বিনাশ এবং ইসলামী ভাবধারায় শিক্ষা প্রসারের জন্য আমাদের এই প্রস্তাবিত নব প্রতিষ্ঠান কাজ করিয়া যাইবে।

সর্বশেষে তাঁরা প্রত্যেক জেলা ও মহকুমায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের অস্থায়ী সাংগঠনিক কমিটি গঠনের জন্যে ছাত্র সাধারণের কাছে আবেদন করেন এবং পরবর্তী সময়ে প্রাদেশিক পর্যায়ে নোতুন প্রতিষ্ঠানটির নির্বাচিত জেলা প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন আহ্বানের কথাও উল্লেখ করেন।

সার্কুলারটির দুটি পাদটিকার মধ্যে একটিতে বলা হয় যে বিভিন্ন স্বার্থের হস্তক্ষেপের ফলে বাংলা ভাষা সম্পর্কে ছাত্রদের দাবী পাকিস্তানের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মহলের কাছে যথোপযুক্তভাবে উপস্থিত করা সম্ভব হয় নাই। এ বিষয়ে কায়েদে আজম এবং প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীর কাছে ভাষা বিষয়ক দাবীর বিবরণসমূহ সরাসরি পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করা হয়। দ্বিতীয় পাদটিকাতে স্বাক্ষরকারীরা যথাশীঘ্র নিজ নিজ জেলায় সাংগঠনিক কাজের উদ্দেশ্যে কর্মীদের সাথে সংযোগ স্থাপন করবেন বলে সাধারণভাবে সকলকে জানানো হয়।

সার্কুলারটিতে "পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ অস্থায়ী অর্গানাজিং কমিটির" নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ স্বাক্ষর দান করেন :

নাইমউদ্দিন আহমদ বি. এ. অনার্স বনভেনর (রাজশাহী), আবদুর রহমান চৌধুরী বি. এ. (বরিশাল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যুব সম্মেলনে পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের নেতা), আবদুল কুদ্দুস চৌধুরী বি.এ. অনার্স (চট্টগ্রাম), শেখ মুজিবর রহমান বি. এ. (ফরিদপুর), আজিজ আহমদ বি. এ. (নোয়াখালী), আবদুল আজিজ এম. এ. (কুষ্টিয়া), সৈয়দ নূরুল আলম বি. এ. (মোমেনশাহী), আবদুল মতিন বি. এ. (পাবনা), দবিরুল ইসলাম বি. এ. (দিনাজপর), মফিজুর রহমান (রংপুর) আলী আহাদ (ত্রিপুরা), নওয়াব আলী (ঢাকা), আবদুল আজিজ (খুলনা), নূরুল কবীর (ঢাকা সিটি)।

সাংগঠনিক কমিটির এই সার্কুলার প্রচারিত হওয়ার পর তার সদস্যেরা

অন্যান্য কিছুসংখ্যক কর্মীদের সাথে একটি বৈঠকে মিলিত হন।* সেসময় নোতুন ছাত্র প্রতিষ্ঠানটিকে একটি অসাম্প্রদায়িক ছাত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে গঠন করার প্রশ্ন ওঠে।[১] শেখ মুজিবর রহমান এবং তাঁর সঙ্গীরা মহম্মদ তোয়াহা এবং অলি আহাদের অসাম্প্রদায়িক ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠনের এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।[২] অলি আহাদ উপরোক্ত সার্কুলারে সই দেওয়া সত্ত্বেও এই পর্যায়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সাথে আর কোনো সম্পর্ক না রাখার সিদ্ধান্ত নেন। শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে 'মুসলিম, শব্দটির একটা বিরাট মূল্য আছে কাজেই তখনো পর্যন্ত অসাম্প্রদায়িক ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠনের উপযুক্ত সময় আসেনি।[৩] এই মতবিরোধের ফলে তোয়াহা এবং অলি আহাদ নোতুন ছাত্র প্রতিষ্ঠানটির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা স্থির করেন। পাবনার আবদুল মতিন সে সময়ে তাঁদের দুজনকে ছাত্র প্রতিষ্ঠানটিতে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য থেকে তাকে একটা অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার চেষ্টা চালাতে অনুরোধ জানান।[৪] কিন্তু এই ধরনের কৌশলকে তোয়াহা এবং অলি আহাদ মনে করেন অচল এবং পরিত্যাজ্য। শুধু তাই নয়। মতিনের এই সব কথাবার্তা তাঁরা দুজনে খুব অপছন্দ করেন। এবং তাঁকে বলেন যে তিনি তখনো পর্যন্ত পেটি বুর্জোয়া সংস্কার থেকে মুক্ত হননি। এই বৈঠকের পর তোয়াহা এবং অলি আহাদ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের সাথে আর কোনো সম্পর্ক না রাখলেও আবদুল মতিন এই নোতুন সংগঠনটির মধ্যে থেকেই কাজ করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

এর পর নঈমুদ্দীন আহমদকে আহ্বায়ক নিযুক্ত করে উপরোক্ত যে কমিটি গঠিত হয় সেই কমিটি নোতুন ছাত্র প্রতিষ্ঠানটিকে গঠন করতে উদ্যোগী হয়। ১৯৪৯ সালের এপ্রিলে নঈমুদ্দীন আহমদের বহিষ্কারের পর মুসলিম ছাত্র লীগের কেন্দ্রীয় অর্গানাইজিং কমিটি পুনর্গঠিত হলেও প্রতিষ্ঠানটির প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন ১৯৪৯-এর সেপ্টেম্বরের পূর্বে অনুষ্ঠান সম্ভব হয়নি। কিন্তু তাহলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় কেন্দ্রীয় এবং এলাকাগত কমিটিগুলির নেতৃত্বে এই ছাত্র প্রতিষ্ঠানটির সদস্যেরা বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে।

---

*অলি আহাদ সাহেবের মতে বৈঠকটি হয় সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ১২ নং কামরায়। কিন্তু পাবনার আবদুল মতিন সাহেবের মতানুসারে সেটি অনুষ্ঠিত হয় ফজলুল হক হলের মিলনায়তনে।

২ ॥ অসাম্প্রদায়িক ছাত্র রাজনীতি

পূর্ব বাঙলার একমাত্র অসাম্প্রদায়িক ছাত্র প্রতিষ্ঠান ছিলো 'ছাত্র ফেডারেশন'। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটির সাথে কমিউনিস্ট পার্টির ঘনিষ্ঠ সংযোগের ফলে মুসলমান ছাত্রেরা সাধারণভাবে তার সাথে জড়িত হওয়ার বিরোধী ছিলো। কাজেই প্রগতিশীল ছাত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে তার যে প্রভাব ছিলো তা দারুণভাবে কমে আসে।

কিন্তু ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দান করতে অনিচ্ছুক হলেও অল্পসংখ্যক ছাত্র অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁরা সেই ধরনের একটি অ-কমিউনিস্ট অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গঠনের চিন্তা করছিলেন। এই সময় 'পাকিস্তান স্টুডেন্টস্ র‍্যালী' বা 'পাকিস্তান ছাত্র সংঘ' নামে একটি অসাম্প্রদায়িক ছাত্র সংগঠন গঠনের চেষ্টা হয়। মহম্মদ গোলাম কিবরিয়াকে আহ্বায়ক নিযুক্ত করে এর জন্যে একটি কমিটি গঠিত হয় এবং সেই কমিটি প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য, কর্মসূচী এবং গঠনতন্ত্রের একটি খসড়া[১] ১৯৪৯-এর জানুয়ারির দিকেই প্রকাশ করেন।

এই খসড়াটিতে অন্যান্য ছাত্র প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে বলা হয় যে সেগুলির প্রত্যেকটিই কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত। তাছাড়া তারা প্রত্যেকেই কমিউনিজম, সমাজতন্ত্র, সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি আদর্শের প্রচারক। সেই হিসাবে বিভিন্ন ছাত্র প্রতিষ্ঠানগুলি ছাত্রদের মধ্যে নানাপ্রকার অস্বচ্ছ চিন্তার সৃষ্টি করছে।[২]

একটি নোতুন ও স্বাধীন অসাম্প্রদায়িক ছাত্র প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাতে আরও বলা হয়:

> আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এই গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে রাজনৈতিক দলগুলির সাথে অসম্পর্কিত একটি স্বাধীন অসাম্প্রদায়িক ছাত্র প্রতিষ্ঠানের অনুজ্ঞামূলক প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে শেষ করা যায় না। বস্তুতঃপক্ষে ছাত্র আন্দোলনকে সঠিক নেতৃত্ব দানের জন্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে একটি অসাম্প্রদায়িক ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠনের সপক্ষে অনেকেই জোরালোভাবে মতপ্রকাশ করেছে। পাকিস্তান এখনো একটা গঠনমূলক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবং একমাত্র পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদই বিভিন্ন লোকজন, সম্প্রদায় এবং শ্রেণীকে একটি সংগঠনের মধ্যে একত্রিত করতে পারে। আচ্ছন্নতা ও নিষ্ক্রিয়তা কাটিয়ে উঠতে ছাত্রদেরকে তা দারুণভাবে উদ্বুদ্ধ করবে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ নয়, পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদই পশ্চিমী

জাতীয়তার উগ্র চরিত্র থেকে মুক্ত থাকতে পারে। জনসাধারণের আর্থিক ও সামাজিক মুক্তির জন্ম তার একটা সমাজতান্ত্রিক বক্তব্য থাকবে।

'পাকিস্তান স্টুডেণ্টস্ র্যালীর' উপরোক্ত এবং অন্যান্য বক্তব্যের মধ্যে বহু জটিলতা এবং অস্বচ্ছতা থাকলেও অসাম্প্রদায়িক ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রাথমিক উদ্যোগ হিসাবে তা উল্লেখযোগ্য। এই খসড়াটিতে উর্দু এবং বাংলা এই উভয় ভাষাকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলা হয়। প্রাদেশিক ভাষা হিসাবে বাংলাকে অবিলম্বে চালু করার দাবীও তাতে জানানো হয়।[৩]

এই প্রতিষ্ঠানটির আহ্বায়ক মহম্মদ গোলাম কিবরিয়া অলি আহাদকে তাতে যোগদানের জন্যে অনুরোধ জানান। অলি আহাদ প্রথম দিকে কিছুটা উৎসাহ প্রকাশ করলেও কমরুদ্দীন আহমদ, তাজউদ্দিন, তোয়াহা এবং ডক্টর করিমের পরামর্শ মতো তিনি 'স্টুডেণ্টস্ র্যালীর' সাথে জড়িত না হওয়ার সিদ্ধান্ত করেন।[৪]

ব্যক্তিগতভাবে অনেক ছাত্র অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করলেও একমাত্র ছাত্র ফেডারেশন ছাড়া এই পর্যায়ে অন্য কোনো অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান ছিলো না। অনেক দুর্বলতা সত্ত্বেও নানা গণতান্ত্রিক দাবীর ভিত্তিতে ছাত্র ফেডারেশন এই সময়ে অন্যান্য ছাত্র প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় সভা অনুষ্ঠানের চেষ্টা করলেও সুবিধাবাদী ছাত্র নেতৃত্ব এবং ছাত্রদের সাম্প্রদায়িক সংস্কারের জন্যে তার সাফল্য ছিলো খুবই সীমিত।

রাজশাহীতে ছাত্র ফেডারেশনের আবুল কাসেম এবং অন্য কয়েকজন ছাত্রের বহিষ্কার এবং ঢাকা ও প্রদেশের অন্যত্র বহু ছাত্রের উপর নির্যাতনমূলক ব্যবস্থার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে ৮ই জানুয়ারি, ১৯৪৯, 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' উদ্‌যাপনের আহ্বান জানানো হয়।[৫] ঢাকা কলেজে আংশিক ধর্মঘট হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সেদিন পূর্ণ ধর্মঘট হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় ময়দানে বেলা ২টার সময় মুসলিম ছাত্র লীগের আহ্বায়ক নঈমুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে একটি সাধারণ ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শেখ মুজিবর রহমান, দবিরুল ইসলাম প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। ছাত্রদের দাবীসমূহ বিবেচনা করে সেগুলিকে স্বীকার করে নেওয়ার জন্যে সরকারকে এক মাসের সময় দেওয়া হয়।[৬]

কিন্তু প্রথম দিনের এই ধর্মঘট সত্ত্বেও পরবর্তী পর্যায়ে এই আন্দোলন বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিধাবাদী ছাত্র নেতৃত্বের 'আপোষ' মনোবৃত্তির ফলে আর অগ্রসর হতে পারেনি।[৭]

১৪ই ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ফেডারেশন ময়মনসিংহের হাজং চাষীদের

উপর গুলি বর্ষণ ও চাষী হত্যার প্রতিবাদে একটি ছাত্রসভা আহ্বান করে। একদল ছাত্র সেই সভাটিকে ভেঙে দেওয়ার উদ্দেশ্যে পূর্বপ্রস্তুতি অনুসারে সেখানে উপস্থিত হয়। মহম্মদ বাহাউদ্দিনের সভাপতিত্বে সভা আরম্ভ হওয়ার পরই তাদের মধ্যে একজন 'সভা কে আহ্বান করেছে' এই কথা জানতে চেয়ে সভাপতির হাত ধরে টান দিয়ে তাঁকে নীচে নামিয়ে আনে এবং অন্য একজন সভাপতির চেয়ারটিকে বেলতলার পাশের পুকুরে ছুড়ে ফেলে দেয়। এর পর সেই ছাত্র গুণ্ডাদল নির্বিচারে উপস্থিত ছাত্রদের উপর কিল, চড়, ঘুঁষি মেরে সভাটিকে সম্পূর্ণভাবে পণ্ড করে।[৮]

ছাত্র ফেডারেশন খুব সক্রিয় না হলেও সেই জাতীয় একটি প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব স্বীকার এবং সহ্য করতে প্রতিক্রিয়াশীলরা প্রস্তুত ছিলো না। এজন্যেই তাদের উপর সে সময় প্রায়ই নানা প্রকার হামলা হতে দেখা যেতো। ১৪ই মার্চ তারিখে একদল গুণ্ডা সিলেটে ছাত্র ফেডারেশনের অফিসের উপর হামলা করে এবং সেই জাতীয় হামলা বন্ধ করার ব্যবস্থার জন্যে ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দেন।[৯]

৩॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিম্ন-কর্মচারী ধর্মঘট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নতম বেতনের কর্মচারীরা কতকগুলি দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে অনেকদিন আলাপ আলোচনার পর তাঁদের দুরবস্থার প্রতিকারের অন্য কোনো উপায় না দেখে এক মাসের নোটিশে ৩রা মার্চ থেকে ধর্মঘট শুরু করেন।[১]

ধর্মঘটের প্রস্তুতির বিভিন্ন স্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি ছাত্র প্রতিষ্ঠানের, বিশেষতঃ ছাত্র ফেডারেশন এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের কর্মীদের সাথে কর্মচারীরা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং তাদের সমর্থন, উৎসাহ এবং সহযোগিতা ধর্মঘটের ক্ষেত্রে তাঁদেরকে অনেকাংশে পরিচালিত করে।

নিম্ন-কর্মচারীদের ধর্মঘটের সমর্থনে ৩রা মার্চ ছাত্রেরাও ক্লাস বর্জন করেন। এর পর ৫ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বান এবং উদ্যোগে[২] পূর্ণ ছাত্রধর্মঘটের পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বেলা ১২-৩০ মিনিটে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।[৩] তাতে ছাত্রেরা স্থির করেন যে কর্মচারীদের দাবী-দাওয়া কর্তৃপক্ষ যতদিন না স্বীকার করেন ততদিন পর্যন্ত তাঁরা সহানুভূতিসূচক ধর্মঘট অব্যাহত রাখবেন। তার পর সেই সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন-কর্মচারী ও

ছাত্রদের ধর্মঘট পরিচালনার ভার বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র কর্ম পরিষদের উপর অর্পণ করা হয়।[৪]

বেলা ২-৩০ মিনিটের সময় এই সভা শেষ হলে ছাত্রেরা ভাইস-চ্যান্সেলরের বাড়ির সামনে মিছিল সহকারে উপস্থিত হন এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন। সে সময় ভাইস-চ্যান্সেলরের বাসায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারও উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছাত্রদের জানান যে সেদিন বিকেল পাঁচটায় বিশ্ববিদ্যালয় একজিকিউটিভ কাউন্সিলের বৈঠক বসলে তিনি তাঁদেরকে ধর্মঘট ইত্যাদির বিষয় অবহিত করবেন।[৫]

একজিকিউটিভ কাউন্সিল সেইদিনকার বৈঠকে ছাত্রদেরকে নিম্ন-কর্মচারী ধর্মঘটে অংশ গ্রহণকারী বলে ঘোষণা করে তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের হুমকি দেন।[৬] বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই হুমকি সম্পর্কে আলোচনার জন্যে ছাত্র কর্মপরিষদের একটি সভায় কর্তৃপক্ষের হুমকির নিন্দা এবং ছাত্রদের মনোভাব ব্যাখ্যা করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৭] মুসলীম ছাত্র লীগের আবদুর রহমান চৌধুরী তার নকল ভাইস-চ্যান্সেলারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নেন কিন্তু তিনি তাঁর সে দায়িত্ব পালন না করায় সেটি কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছায়নি। কয়েকদিন পর কর্ম-পরিষদের এক সদস্য এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে আবদুর রহমান চৌধুরী বলেন যে ইতিমধ্যে অনেক দেরী হয়ে গেছে কাজেই সেটা তখন আর কর্তৃপক্ষের কাছে দেওয়ার কোনো অর্থ নেই।[৮]

ধর্মঘটকে শক্তিশালী করার আশায় সাধারণ ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেরানীদের সহানুভূতি লাভের আশায় তাঁদের অফিসের দরজায় যখন পিকেটিং করছিলেন সে সময়ে আবদুর রহমান চৌধুরী নিজে পিকেটারদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে আনেন। পরদিন ছাত্রসভায় তাঁকে এ বিষয়ে খোলাখুলিভাবে প্রশ্ন করা হলে তিনি অবশ্য ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেন।[৯]

৯ই মার্চ বেলা ১২-৩০ মিনিটে আবদুর রহমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি সভা হয়।[১০] তাতে স্থির করা হয় যে ছাত্রেরা মিছিল করে ভাইস-চ্যান্সেলরের বাড়িতে যাবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে ধর্মঘটী নিম্ন-কর্মচারীদের দাবীদাওয়া স্বীকার করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা ভাইস-চ্যান্সেলরের বাড়িতে অবস্থান ধর্মঘট চালিয়ে যাবেন।[১১] এই সিদ্ধান্ত অনুসারে সভার পর ছাত্রেরা মিছিল সহকারে ভাইস-চ্যান্সেলরের বাসভবনে উপস্থিত হন। কিন্তু সেখানে রাত্রি ৯-৩৫ মিনিট পর্যন্ত

অপেক্ষা করেও একজিকিউটিভ কাউন্সিল অথবা ভাইস-চ্যান্সেলারের কাছ থেকে কোনো লিখিত প্রতিশ্রুতি অথবা আশ্বাস পাওয়া গেল না।[১২] বেলা পাঁচটার দিকে ভাইস-চ্যান্সেলর, কোষাধ্যক্ষ, ডক্টর পি. সি. চক্রবর্তী, রেজিস্ট্রার প্রভৃতি ছাত্রদের সাথে দেখা করে এই মর্মে তাদেরকে একটা মৌখিক আশ্বাস দেন যে অদূর ভবিষ্যতে একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সভায় তাঁরা ব্যাপারটি আলোচনার জন্যে প্রস্তাব করবেন।[১৩] মুসলিম ছাত্র লীগের নেতৃবৃন্দ কর্তৃপক্ষের এই মৌখিক আশ্বাসে মোটামুটিভাবে সন্তুষ্ট হয়ে সেদিন দুপুরের ছাত্রসভার সিদ্ধান্তের বরখেলাফ করে ছাত্রদেরকে ভাইস-চ্যান্সেলরের বাসভবন পরিত্যাগ করতে পরামর্শ দিলেন।[১৪]

পরদিন অর্থাৎ ১০ই মার্চ বেলা বারোটায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্র এবং নিম্ন-কর্মচারীদের একটি যৌথ সভা হয়।[১৫] সেই সভায় ছাত্র লীগের নেতৃবৃন্দ কর্তৃপক্ষের কথা বিশ্লেষণ করে সকলকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেন যে ছাত্র এবং ধর্মঘটীরা প্রকৃতপক্ষে জয়লাভ করেছেন কাজেই এর পর তাঁদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করা উচিত।[১৬] কর্মপরিষদের বিশিষ্ট সদস্য দবিরুল ইসলাম ধর্মঘটী কর্মচারীদের কাছে এ ব্যাপারে বিশেষভাবে আবেদন জানালেন এবং ওজস্বিনী ভাষায় তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে কর্তৃপক্ষ তাঁদের অঙ্গীকার রক্ষা না করলে ছাত্রেরা তাদের বুকের রক্ত দিয়ে ধর্মঘটীদের দাবীদাওয়া আদায় করে দেবেন। ছাত্র নেতাদের এই বক্তৃতা ও প্রতিশ্রুতির পর নিম্ন-কর্মচারীরা তাঁদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেন এবং বেলা ১টার সময় নিজ নিজ কাজে যোগদান করতে যান।[১৭]

কিন্তু ধর্মঘটীদের ধর্মঘট প্রত্যাহার ও কাজে যোগদানের সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদেরকে কাজে যোগ দিতে বাধা দেন। সেদিন সন্ধ্যায় রেডিওতে এবং পরদিন সংবাদপত্রের মাধ্যমে একটি বিবৃতি প্রচার করে ভাইস-চ্যান্সেলর বলেন যে ১০ই মার্চ বেলা ১১টার মধ্যে কর্মচারীদের কাজে যোগদানের কথা ছিলো। তারা ঐ সময়ে কাজে যোগদান না করায় তিনি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। পরদিন থেকে একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ রাখার কথাও তিনি ঘোষণা করেন।[১৮] প্রকৃতপক্ষে পূর্ব দিন ভাইস-চ্যান্সেলরের সাথে ছাত্রদের আলাপের সময় বেলা ১১টার মধ্যে কর্মচারীদের কাজে যোগদানের কোনো কথাই হয়নি।[১৯]

কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের সাথে তাঁদের মৌখিক চুক্তি ভঙ্গ করার পর ছাত্র কর্ম-

পরিষদ সেদিনই একটি বৈঠকে মিলিত হন এবং নোতুন পরিস্থিতিতে পূর্ব নির্ধারিত পথেই সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া স্থির করেন। রাত্রি ৯টায় সেদিন ফজলুল হক হলের ছাত্রদের একটি সভা হয় এবং তাতে দবিরুল ইসলাম ও তাজউদ্দিন আহমদ পরিস্থিতির উপর বক্তৃতা দেন। রাত্রি ১১-৩০ মিনিট পর্যন্ত সভাটি স্থায়ী হয় এবং তাজউদ্দিন আহমদ ও রুহুল আমীনকে কর্ম-পরিষদের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত করা হয়।[২০]

ফজলুল হক হলের এই সভা ভঙ্গ হওয়ার পর সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে রাত্রি ১টায় কর্মপরিষদের একটি বৈঠক বসে। প্রায় এক ঘণ্টাকাল স্থায়ী এই বৈঠকে সামগ্রিকভাবে নোতুন পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা হয়।[২১]

প্রথম থেকে শেষ পর্যায় পর্যন্ত ঘটনাবলীর বর্ণনা দিয়ে ১১ই মার্চ কর্ম-পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁরা একটি বিবৃতি তৈরী করেন এবং সেটি সংবাদপত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।[২২] সেদিন বিকেল ৪টায় ঢাকা হলের মিলনায়তনে একটি সভা বসে এবং ঢাকা ও ফজলুল হক হলের ছাত্রেরা মিলিতভাবে মিছিল করে বিকেল ৫-৩০ মিনিটে ভাইস-চ্যান্সেলরের বাসভবনে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে বিভিন্ন দাবী উত্থাপন করেন। কিন্তু ভাইস-চ্যান্সেলর তাঁদের কোনো আশ্বাস দিতে অস্বীকার করায় তাঁরা সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ তাঁর বাসভবন এলাকা ছেড়ে হলে ফিরে আসেন।[২৩] সেদিন রাত্রেই ১০টা থেকে ৩-৩০ পর্যন্ত সলিমুল্লাহ হলে কর্ম-পরিষদের একটি দীর্ঘ বৈঠক বসে।[২৪] ইতিমধ্যেই কর্তৃপক্ষ হল বন্ধ করার সিদ্ধান্তও ঘোষণা করেন।[২৫]

১২ই মার্চ সকাল ৯টায় সমস্ত হলের ছাত্রদের এক মিলিত মিছিল বের হয়। সলিমুল্লাহ হলের ছাত্রেরা তাতে ৯-৩০ মিনিটে যোগ দেয় এবং মিছিলটি তার পর ভাইস-চ্যান্সেলরের বাসভবনে উপস্থিত হলে দেখা যায় যে গৃহকর্তা তার পূর্বেই গৃহত্যাগ করে বেরিয়ে গেছেন। সেই অবস্থায় মিছিলটি নিয়ে শহর ঘোরার সিদ্ধান্ত হয় এবং লালবাগ, চকবাজার ইসলামপুর, সদরঘাট, নবাবপুর, সিদ্দিকবাজার হয়ে মিছিলটি ফজলুল হক হলের সামনে এসে বেলা ১টায় শেষ হয়।[২৬]

বিকেল ৫টায় ঢাকা হলের ছাত্রেরা হল-ছাত্রদের একটি সভায় স্থির করেন যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ডাইনিং হল বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেও তাঁরা নিজেরা তা চালিয়ে যাবেন। এর পর সন্ধ্যা ৬টায় সলিমুল্লাহ হলে ছাত্র কর্ম-পরিষদের এক বৈঠক বসে।[২৭] সেই বৈঠকে পরবর্তী কর্মপন্থা সম্পর্কে আলোচনা চলাকালে একজন বক্তা পরিষ্কারভাবে বলেন যে ছাত্রেরা তখন আর সংগ্রামের

জন্মে প্রস্তুত নয়, তাদের বিশ্রাম প্রয়োজন। এর পর উপরোক্ত নেতৃস্থানীয় কর্মীটি অন্য কাউকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সভা ভঙ্গ করে দেন।[২৮]

১২ মার্চ ছিলো পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন। সেদিন সকালের ছাত্র মিছিলের পর বিকেলের দিকে কিছু সংখ্যক ছাত্র, পরিষদ্ ভবনের সামনে, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'আরবী হরফ চাই না' ইত্যাদি ধ্বনি উত্থাপন করে দলবদ্ধভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই বিক্ষোভকারী ছাত্রদের মধ্যে থেকে সৈয়দ আফজাল হোসেন, মৃণালকান্তি বাড়রী, বাহাউদ্দিন চৌধুরী, ইকবাল আনসারী, আবদুস সালাম এবং এ. কে. এম. মুনিরুজ্জামান চৌধুরীকে গ্রেফতার করা হয়। রাষ্ট্রভাষা বাংলার সপক্ষে বিশেষতঃ আরবী হরফ প্রবর্তনের বিরুদ্ধে, এই বিক্ষোভটি প্রধানতঃ ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।[২৯]

পরদিন ১৩ই মার্চ ঢাকা হলের একটি সভায় খুব অল্পসংখ্যক ছাত্র বিশ্ব-বিদ্যালয় বন্ধ থাকাকালে হলে থাকার সপক্ষে মত দেন। সেদিনই বেলা ১টার পর সলিমুল্লাহ হলে কর্ম-পরিষদের আর এক বৈঠক বসে। তাতে স্থির হয় যে অধিকাংশ ছাত্র হল ছেড়ে চলে গেলে সকলকেই তাঁরা হল ত্যাগ করতে বলবেন।[৩০] ১৪ তারিখে সকাল ৯টায় ঢাকা হল প্রাঙ্গণে তাজউদ্দিন আহমদ প্রভৃতি অল্প সংখ্যক ছাত্র একত্রিত হয়ে স্থির করেন যে সকলে হল ত্যাগ করে চলে যাওয়ার জন্যে যেভাবে তৈরী হয়েছে তাতে তাঁদের পক্ষেও আর হলে থাকা সঙ্গত নয়। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে এর পর তাঁরা সকলেই হল ত্যাগ করেন।[৩১]

নিম্নকর্মচারী এবং ছাত্র ধর্মঘটের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে সাপ্তাহিক 'নওবেলাল' বলেন :

> দেশ বিভাগের পর বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রগণ অপরিসীম ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। অনেক আন্দোলনের পরও কর্তৃপক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতিই করেন নাই। বর্তমান মহার্ঘের দিনে নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির দাবী যে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ছাত্ররা স্বভাবতঃ আশাবাদী হইয়া থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের দুরবস্থা তাহাদের প্রাণে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই সমবেদনা ও সহানুভূতির উদ্রেক করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল অবিলম্বে তাহাদের ন্যায্য দাবীদাওয়া মানিয়া লওয়া এবং এই আর্থিক অনটনগ্রস্ত দারিদ্র্য প্রপীড়িত কর্মচারীগণ যাহাতে নিশ্চিন্তে জাতির খেদমতে আত্মনিয়োগ করিতে পারে

তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া। কিন্তু তাহার বদলে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়াই সমীচীন মনে করিয়াছেন। একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেই সব লেটা চুকিয়া যাইত। নয় কি ?[৩২]

৩রা থেকে ১৪ই মার্চ পর্যন্ত নিম্নকর্মচারী ও ছাত্র ধর্মঘটের উপর একজন প্রত্যক্ষদর্শী 'ছাত্র আন্দোলনের গলদ কোথায় ?' নামে একটি বিস্তৃত আলোচনা ২৪শে মার্চের নওবেলালে প্রকাশ করেন। সমসাময়িক ছাত্র আন্দোলনের পর্যালোচনা হিসাবে তার কয়েকটি অংশ উল্লেখযোগ্য। আন্দোলন সম্পর্কে সাধারণভাবে মন্তব্য করতে গিয়ে তাতে বলা হয় :

জনগণ ভুলপথে সজ্ঞানে চলে না, ভুলপথে তারা পরিচালিত হয়...এটা গণ-আন্দোলনের বেলায় যেমন সত্য, ছাত্র আন্দোলনের বেলায়ও তেমনই সত্য। সুতরাং আন্দোলনের যারা পরিচালক তাদের মনোবৃত্তি, তাদের আদর্শ ও তাদের কর্মদক্ষতার উপরই আন্দোলনের ফলাফলসম্পূর্ণ নির্ভর করে। হীন স্বার্থপর মনোবৃত্তি দ্বারা যে আন্দোলন পরিচালিত হয় তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতে বাধ্য। গত বৎসরের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনেও এরূপ মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমান বৎসরের আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহ বিচার করিলেও ঐ একই মনোবৃত্তির স্বরূপ প্রকাশ পায়। অবশ্য পর্দার অন্তরালে নেতৃত্বের ধোকাবাজির যে অভিনয় চলে তার স্বরূপ অনেক সময়ই সর্বসাধারণের চোখে পড়ে না। সদিচ্ছায় অনুপ্রেরিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট কর্মীরাই ঐ অভিনয়ের বাস্তব রূপ প্রমাণ করতে পারেন। আলোচ্য আন্দোলনের সমস্ত ঘটনাপ্রবাহের সহিত পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়েছে বলেই আমি এ আন্দোলনের পুনঃ বিশ্লেষণের একান্ত প্রয়োজন বোধ করছি।

এই প্রারম্ভিক মন্তব্যের পর কয়েকজন ছাত্রনেতার ভূমিকা সম্পর্কে উপরোক্ত সমালোচক বলেন :

৫ই মার্চ ছাত্রসভায় যে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাহার পিছনেও নেতাদের এক হীন মনোবৃত্তির আভাষ ছিল। কিন্তু ছাত্র সমাজ তা বুঝতে পারেনি। সদিচ্ছায় অনুপ্রেরিত হয়েই তারা পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের বিশিষ্ট নেতা নঈমুদ্দীন আহমদের অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের প্রস্তাবে সায় দেয়। তারা বুঝতে পারেনি যে ঐ সকল নেতাদের হতভাগ্য কর্মচারীদের প্রতি কোনো সত্যিকার দরদ ছিল না। পূঃ. পাঃ. মুঃ. ছাত্র লীগের আবদুল রহমান চৌধুরী, শেখ মুজিবর রহমান, মৌলবী

গোলাম হায়দার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই সিদ্ধান্তের পূর্বে ধর্মঘটী কর্মচারীদের সঙ্গে যে অভিনয় করেন তাহা ছাত্র সাধারণের কাছে সম্পূর্ণ গোপন করে যান। হতভাগ্য কর্মচারীদের প্রতি 'কিছুমাত্র সহানুভূতি থাকলেও তারা ধর্মঘটের পূর্বক্ষণে মির্জা গোলাম হায়দারকে একতাবদ্ধ কর্মচারীদের মধ্যে প্রেরণ করতেন না যাতে তাদের একতা ঐ সঙ্কটমুহূর্তে ভেঙে পড়ে। সৌভাগ্যের বিষয় মির্জা গোলাম হায়দারের এই অপচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয় এবং কর্মচারীদের কাছে মির্জা গোলাম হায়দারের মুখোশ ধরা পড়ে।

এর পর ৫ই মার্চের ধর্মঘট সম্পর্কে পর্যালোচনাটিতে আরও বলা হয়:

Lower Grade Employees' Union-এর পরিচালনাধীনে কর্মচারীদের একতার বন্ধন দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হয়ে দাঁড়াল এবং তারা ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তখন নিজেদের মান বাঁচাবার জন্য পূর্ব পাঃ মুঃ ছাঃ লীগের তথাকথিত নেতৃবৃন্দ ৫ই মার্চ ছাত্রসভার আয়োজন করেন। তাঁদের সহানুভূতিসূচক বক্তৃতাগুলির পেছনে লুক্কায়িত ছিল এক হিংসাবৃত্তি—তাঁরা চেষ্টা করছিলেন যে সমস্ত উৎসাহী কর্মী-কর্মচারীদের একতাবদ্ধ করায় মনোনিবেশ করেছিলেন তাদের সর্বনাশ সাধন করতে। এসব ব্যাপার তাঁরা ছাত্র সাধারণকে জানতে দেননি। সাধারণ ছাত্রদের ধোকা দিয়ে তাঁরা একটা অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের ভূয়া প্রস্তাব গ্রহণ করান। ভূয়া প্রস্তাব এজন্য বলছি যে, কোনো কর্মপন্থা ভিন্ন অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট চলতে পারে না। নেতৃবৃন্দ ছাত্রদের সম্বন্ধে কোনো কর্মপন্থা দেননি।

এই প্রস্তাবের কুফল দুদিন পরেই বেশ ভালভাবেই প্রকাশ পায়। কর্মপন্থার অভাবে সাধারণ ছাত্রগণের মধ্যে শিথিলতা আসে এবং তাঁরা আন্দোলন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন মনোভাব পোষণ করতে থাকেন। নেতারাও তাইই চেয়েছিলেন।

১০ই মার্চ সাধারণ সভায় ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধর্মঘটীদেরকে কাজে যোগদান করতে বাধা দেওয়ার কারণ হিসাবে তাতে বলা হয়:

তার পর ভাইস-চ্যান্সেলর ধর্মঘটী কর্মচারীদের ধ্বংস সাধনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়ার ব্যাপারে গভর্নমেন্টেরও অনুমোদন ছিল। ব্যবস্থাপক সভার বাজেট অধিবেশনের সময় ছাত্রদের দূরে রাখাই সরকারের স্বার্থের অনুকূল। তা ছাড়া বর্ণমালা নিয়েও ছাত্র আন্দোলনের আশঙ্কা তাঁরা করছিলেন।

তাই দেখা গেল প্রধানমন্ত্রী ও ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট একাধিকবার ভাইস-চ্যান্সেলরের বাড়িতে গুপ্ত বৈঠক করছেন।

আন্দোলনের শেষ পর্যায়ের ঘটনাবলী সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে উপরোক্ত প্রত্যক্ষদর্শী বলেন :

> আন্দোলনের শেষ দিকে আবদুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এক হীন যড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। ভাইস-চ্যান্সেলরের সঙ্গে কথা-বার্তায় আবদুর রহমান চৌধুরীর তোষামোদি মনোবৃত্তি সাধারণ ছাত্রদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে। আবদুর রহমান চৌধুরী কেবল তোষামোদ করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি নিজে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছিলেন কর্তৃপক্ষ যেন কঠোর হস্তে কয়েকজন আন্দোলনকারী ছাত্রকে দমন করেন। এই নেতৃবৃন্দের স্বরূপ আরও ভালভাবে প্রকাশ পেল, যখন দেখা গেল যে সাধারণ একটা অর্ডারের উপর ছাত্ররা দলে দলে হল ছেড়ে চলেছে তখন নেতৃবৃন্দ তাকে রোখবার কোনো ব্যবস্থা করছেন না। বরং সকল ছাত্ররা যাহাতে চলিয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে তথাকথিত নেতারা ব্যস্ত ছিলেন।

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ নেতৃবৃন্দের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে তাজউদ্দিন আহমদের ডায়েরীতেও একটি উল্লেখ আছে। ১৫ই মে, ১৯৪৯ তারিখে তাজউদ্দিন আহমদ তাঁর ডায়েরীতে লেখেন :

> (আজ) তোয়াহা সাহেব এসেছিলেন সন্ধ্যে ৮টায় এবং তার পর আমার কামরায় এসেছিলেন নঈমুদ্দীন সাহেব। নঈমুদ্দীন সাহেবের বিশ্বাস-ঘাতকতার পর এই তাঁর প্রথম আবির্ভাব। আমরা রাত্রি ১১টা পর্যন্ত আলাপ করলাম।

২৯শে মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের কাছে ভাইস-চ্যান্সলরের প্রদত্ত রিপোর্টে বলা হয় যে ছাত্রেরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছিলো এবং ধর্মঘটীরা কাজে যোগদান করতে এসেছিলো। কিন্তু তিনি তাদেরকে অনুমতি দেননি। তাঁর এই সিদ্ধান্তের কারণ তাদের যোগদান শর্ত সাপেক্ষ ছিলো।[৩৩] ভাইস-চ্যান্সেলরের এই বক্তব্য তাঁর ১১ই তারিখে প্রচারিত বিবৃতির বক্তব্যের বিরোধী কারণ তাতে তিনি বলেছিলেন যে, ধর্মঘটকারীরা কাজে যোগদান করতে অসম্মত হওয়ায় তাঁকে বাধ্যতা-বশতঃ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই পরস্পরবিরোধী এবং মিথ্যা অভিযোগের জবাবে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র কর্ম-পরিষদ্ ৪ঠা এপ্রিল সংবাদপত্রে এক বিবৃতি[৩৪] প্রকাশ করেন। তাতে বলা হয় :

প্রদেশের বিভিন্ন জায়গা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি জানিবার জন্য অনেক উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে বহু সহানুভূতিসূচক পত্র পাঠাইতেছেন। আমরা এই মনে করিয়া চুপ করিয়া থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছিলাম যে, ইতিমধ্যেই কর্তৃপক্ষ সকলের পক্ষে সম্মানজনক ও গ্রহণযোগ্য মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিবেন। কিন্তু ভাইস-চ্যান্সেলারের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের নিকট প্রদত্ত বিবৃতি, যাহা ২৯শে মার্চ তারিখে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এমন এক নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে যে, আমাদিগকে নূতনভাবে বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করিতে হইতেছে।

কোনো নিরপেক্ষ ব্যক্তি যদি ভাইস-চ্যান্সেলরের ১১ই এবং ২৯শে মার্চ তারিখের বিবৃতি দুইটি বিশদভাবে পাঠ করেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, একই ব্যক্তির মুখ দিয়া একই ঘটনা সম্বন্ধে দুইটি পরস্পর বিরোধী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। ১১ই তারিখে তিনি বলেন যে, যেহেতু ধর্মঘটকারীরা কাজে যোগদান করে নাই, সেই হেতু অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেওয়া ছাড়া তাঁহার কোনো গত্যন্তর ছিল না। ২৯শে মার্চ তিনি স্বীকার করেন যে ছাত্ররা ধর্মঘট প্রত্যাহার করিয়াছিল এবং ধর্মঘটীরা কাজে যোগদান করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহাদের অনুমতি দেন নাই, যেহেতু তাদের যোগদান শর্তসাপেক্ষ ছিল কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই যে, ছাত্র এবং ধর্মঘটী কর্মচারীরা পূর্ব রাত্রে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সভ্যদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে ১০ই তারিখ বিনাশর্তে উভয়েই ধর্মঘট প্রত্যাহার করিয়াছিল। ২৯শে তারিখে ভাইস-চ্যান্সেলর যাহা স্বীকার করিলেন, ১১ই তারিখে তিনি তাহা গোপন করিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা সম্বন্ধে দুইটি বিবৃতিতে সম্পূর্ণ দুইটি কারণ দর্শাইয়াছেন।

এর পর ছাত্রদের সম্পর্কে ভাইস-চ্যান্সেলরের অভিযোগ প্রসঙ্গে কর্মপরিষদ্ বলেন :

প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াই ছাত্ররা এবং ধর্মঘটী কর্মচারীরা বিনাশর্তে ধর্মঘট প্রত্যাহার করিয়াছিল স্থগিত রাখে নাই। ভাইস-চ্যান্সেলর অনুযোগ করেন যে, ছাত্ররা তাদের নিকট এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল যাহা বিশ্ববিদ্যালয় মানিয়া লইতে পারে নাই। আমরা পুনরায় ইহা পরিষ্কারভাবে বলিতে চাই যে ছাত্ররা ধর্মঘটকালীন একমাত্র

মীমাংসাকার হিসাবেই কাজ করিয়াছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক প্রসঙ্গে কর্মপরিষদ্ বলেন :

শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে সম্পর্ক হইতেছে ভক্তির এবং স্নেহের। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই সম্পর্ক তিক্ততায় পর্যবসিত হইয়াছে। ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে মধুর সম্পর্ক, সেটা যদি নষ্ট হয়, তবে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের যাহা মহান এবং ভাল তাহাই নষ্ট হইয়া যায়।

ছাত্রদের সাথে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ৯ই মার্চ বিকেলের আলোচনায় ধর্মঘটীদের দাবী-দাওয়ার স্বীকৃতি এবং ধর্মঘট প্রত্যাহারের সম্পর্কে যে মৌখিক চুক্তি হয় পরদিন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার বরখেলাফ করেন। তৎকালীন অবস্থা এবং ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে দুই কারণে কর্তৃপক্ষ ধর্মঘটী কর্মচারী ও ছাত্রদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করেন। তাঁদের প্রথম উদ্দেশ্য ছিলো ছাত্রদের থেকে ধর্মঘটীদেরকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের সাথে পৃথকভাবে আলোচনা করা। ছাত্রদের অবর্তমানে নিম্ন-কর্মচারীরা স্বাভাবিকভাবেই অনেক দুর্বল হয়ে পড়বে এবং সেই অবস্থায় তাদের সাথে একটা উপযুক্ত বোঝাপড়ার সুবিধে হবে। প্রকৃতপক্ষে তাই ঘটেছিলো। কারণ ছাত্রদের অনুপস্থিতিতে একজন ব্যতীত অন্য সব কর্মচারীরাই ধর্মঘট করে বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা সৃষ্টি করা অন্যায় হয়েছে স্বীকার করে লিখিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এ ছাড়া কর্তৃপক্ষের দেওয়া কতকগুলি শর্ত—যেমন ইউনিয়ন না মানা, ভবিষ্যতে ধর্মঘট না করা ইত্যাদি—সই করে কাজে যোগদান করে।[৩৫]

কর্তৃপক্ষের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিলো পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন চলার সময় ছাত্রেরা যাতে ঢাকাতে না থাকে তার ব্যবস্থা করা।

আরবী হরফ প্রবর্তনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ছাত্রদের মধ্যে তখন বেশ উত্তেজনা বিরাজ করছিলো। কাজেই প্রাদেশিক সরকার ১৯৪৮-এর মতো ছাত্র বিক্ষোভ যাতে আবার না ঘটে তার জন্যে কর্মচারী ধর্মঘটের সুযোগে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। ছাত্রদের সাথে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আকস্মিক চুক্তিভঙ্গ এবং কাজ শুরু করতে ইচ্ছুক নিম্ন-কর্মচারীদেরকে কাজে যোগদান করতে বাধাদানের সেটাই ছিলো প্রধান কারণ।

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়ার পর কর্তৃপক্ষ ২৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর বিরুদ্ধে

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।* এদের মধ্যেও ৬ জনকে ৪ বৎসরের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার, ১৫ জনকে হল থেকে বহিষ্কার, ৫ জনকে ১৫ টাকা হিসাবে এবং ১ জনকে ১০ টাকা হিসাবে জরিমানা করা হয়। এ ছাড়া তাঁরা শাস্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের বৃত্তি বন্ধ করারও সিদ্ধান্ত নেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা আরও স্থির করেন যে ১৭ই এপ্রিলের মধ্যে অভিভাবকদের মধ্যস্থতায় সৎচরিত্র সম্পর্কিত সার্টিফিকেট দাখিল না করলে তাদেরকেও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হবে।[৩৬] এদের মধ্যে অনেকেই এই ধরনের সার্টিফিকেট দাখিল করে এবং জরিমানা দিয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে আপোষ করেন।

কর্তৃপক্ষের এই আচরণের প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যাল ছাত্র কর্ম-পরিষদ ১৭ই

---

*দবিরুল ইসলাম (অস্থায়ী আহ্বায়ক পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ), আবদুল হামিদ (এম. এ. ক্লাস), অলী আহাদ (বি. কম. ক্লাস) আবদুল মান্নান (বি. এ. ক্লাস), উমাপতি মিত্র (এম. এসসি. পরীক্ষার্থী) সমীরকুমার বসু (এম. এসসি. ক্লাস) এই ৬ জনকে ৪ বৎসরের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়।

বিভিন্ন হল থেকে যাঁদেরকে বহিষ্কার করা হয় তাঁদের নাম: আবদুর রহমান চৌধুরী (সহ-সভাপতি সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ও আইন বিভাগের ছাত্র), জালালউদ্দিন আহম্মদ (এম. এ. ক্লাস), দেওয়ান মহবুব আলী (আইন বিভাগের ছাত্র), আবদুল মতিন (এম. এ. ক্লাস), আবদুল মতিন খাঁ চৌধুরী (আইন বিভাগের ছাত্র), আবদুর রসিদ ভুঁইয়া (এম. এ. ক্লাস), হেমায়েত উদ্দীন আহমদ (বি. এ. ক্লাস), আবদুল মতিন খাঁ (এম. এ. পরীক্ষার্থী), নুরুল ইসলাম চৌধুরী (এম. এ. ক্লাস) সৈয়দ জামাল কাদেরী (এম. এসসি. ক্লাস), আবদুস সামাদ (এম. কম. ক্লাস), সিদ্দিক আলী (এম. এ. ক্লাস), আবদুল বাকী (বি. এ. ক্লাস) জে. পাত্রনবিশ (এম. এসসি. ক্লাস) অরবিন্দ বসু (সহ-সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়ন এবং আইন বিভাগের ছাত্র)।

পনেরো টাকা হিসাবে যাঁদের জরিমানা করা হয় তাঁদের নাম: শেখ মুজিবর রহমান (আইন ক্লাসের ছাত্র), কল্যাণ দাসগুপ্ত (এম. এ. ক্লাসের ছাত্র এবং সাধারণ সম্পাদক ঢাকা হল), নঈমুদ্দীন আহমদ (আহ্বায়ক পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ) নাদিরা বেগম (এম. এ. ক্লাসের ছাত্রী), আবদুল ওয়াদুদ (বি. এ. ক্লাসের ছাত্র)। এ ছাড়া লুল বিলকিস বানু নামে আইন বিভাগের একজন ছাত্রীর দশ টাকা জরিমানা হয়।

এপ্রিল অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর থেকে সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানান।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুসৃত নীতি ও কর্মপন্থার সমালোচনা করে ১৪ই এপ্রিল 'নওবেলাল' মন্তব্য করেন :

> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগামী ১৭ই এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় খুলিবার নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু জানা গিয়েছে যে, পূর্ব পাক মুসলিম ছাত্র লীগের উদ্যোগে ১৭ই তারিখ হইতে আবার ধর্মঘট শুরু করার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের উপর যে অন্যায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ স্বরূপ এই ধর্মঘট শুরু হইবে। ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নতম কর্মচারীদের প্রতি সহানুভূতি জানাইয়া বিগত ৩রা মার্চ হইতে ধর্মঘট শুরু করেন এবং এই অপরাধেই কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।
>
> বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আন্দোলন নতুন নয়। ইতিপূর্বে আরও বহুবার এমনকি ব্রিটিশ আমলেও অনুরূপ আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ন্যায় মধ্যযুগীয় প্রথায় ছাত্রদের বহিষ্কৃত করা হয় নাই। তাহাদের জানা উচিত, যে কারণে ছাত্র ধর্মঘট বা আন্দোলন সংঘটিত হয় তাহার প্রতিকার না করিয়া আন্দোলনকারীদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে কোনো সুফল লাভ হইতে পারে না। আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের উপর হইতে অবিলম্বে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করিয়া তাহাদের ধর্মঘট করার কারণ দূর করিতে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী জানাইতেছি।

৪ ॥ আন্দোলনের নোতুন পর্যায়

নিম্ন-কর্মচারী ঘর্মঘটে অংশ গ্রহণের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশন ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ ১৭ই এপ্রিল সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ধর্মঘট ঘোষণা করে।[১]

প্রায় দু-হাজার ছাত্রছাত্রী সেদিন বেলা বারোটায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হওয়ার পর সেখানে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের স্বৈরাচারী নীতির তীব্র নিন্দা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। সরকারের দালালী করার উদ্দেশ্যে নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের কয়েকজন নেতা

সভায় কিছু গণ্ডগোলের চেষ্টা করলেও সাধারণ ছাত্রেরা তাদেরকে দালাল হিসাবে সহজেই চিহ্নিত করে।[২]

১৭ তারিখে সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ও রমনার বিভিন্ন এলাকায় সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয় এবং তারা ছাত্রদেরকে নানাভাবে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভা শেষ হওয়ার পর পুলিশের অবস্থান সত্ত্বেও ছাত্রেরা বিরাট এক মিছিল সহকারে ভাইস-চ্যান্সেলরের বাড়িতে উপস্থিত হয়। ভাইস-চ্যান্সেলরের সাথে সাক্ষাতের জন্যে তারা তাঁর কাছে বহুক্ষণ ধরে অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও তিনি ছাত্রদের সাথে সাক্ষাৎ করতে শেষ পর্যন্ত কিছুতেই রাজী না হওয়ায় ১৭ তারিখেই রাত নয়টায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতির পর্যালোচনা এবং নোতুন কর্মপন্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যের সাধারণ ছাত্রেরা একটি সভায় মিলিত হয়। পূর্ববর্তী কর্মপরিষদের সদস্য এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের দুজন বিশিষ্ট নেতা নঈমুদ্দীন আহমদ ও আবদুর রহমান চৌধুরী ইতিপূর্বে কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করায় তাঁদেরকে বাদ দিয়ে সেই সভায় নোতুনভাবে একটি কর্মপরিষদ্ গঠিত হয়।[৩]

রাত দশটা পর্যন্ত ভাইস-চ্যান্সেলর ছাত্রদের সাথে দেখা করতে অস্বীকার করায় নোতুন কর্ম পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে দশ-পনেরো জন ছাত্র ভাইস-চ্যান্সেলরের বাড়িতে সারারাত অবস্থান ধর্মঘট করে।[৪]

১৮ই এপ্রিল ঢাকা শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রেরা ধর্মঘট পালন করে।[৫] কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের গেটে সকাল থেকেই পিকেটিং শুরু হলেও সেদিন বিজ্ঞান, বাণিজ্য এবং আইনের ছাত্রেরা সকলেই ক্লাসে যোগ দেয়। মূল কলাভবনে ধর্মঘট হলেও অল্পসংখ্যক ছাত্র সেখানেও ক্লাস করে।[৬]

বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে একটি বিরাট মিছিল বের হয়ে সকালের দিকে শহর প্রদক্ষিণ করে[৭] এবং বেলা তিনটের দিকে মেডিকেল হোস্টেলের ব্যারাক এবং ইঞ্জিনিয়ারিং হোস্টেলের ভেতর দিয়ে ঢুকে ভাইস-চ্যান্সেলরের বাড়ির দিকে অগ্রসর হতে থাকে।[৮] পুলিশ সে সময় তাদেরকে বাধা দেওয়া সত্ত্বেও কোনো ঘটনা সৃষ্টি না করেই ছাত্রেরা ভাইস-চ্যান্সেলরের বাড়িতে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়।[৯] সেখানে গিয়ে তারা অবস্থান ধর্মঘটীদের সাথে যোগদান করে।[১০]

ভাইস-চ্যান্সেলারের বাসভবনে বিকেল ৫-৩০ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয় এক্সি-কিউটিভ কাউন্সিলের বৈঠক বসে। সেই সময় ইব্রাহিম খান, ওসমান গণি, আবদুল হালিম, ডক্টর টি. আহমদ, পি. সি. চক্রবর্তী এবং মিজানুর রহমান ছাত্রদের সাথে একটা আলোচনার সূত্রপাত করেন। প্রথম দিকে কিছুটা

আশার সঞ্চার হলেও শেষ পর্যন্ত রাত তুটোর সময় তা ব্যর্থ হয়।[১১] এর পর প্রায় তিরিশজন ছাত্র ভাইস-চ্যান্সেলরের বাড়ির প্রাঙ্গণে সারারাত অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেয়[১২] এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্মপরিষদ্ ২০শে এপ্রিল সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা করে।[১৩]

১৯শে এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ধর্মঘট অথবা পিকেটিং হয় নি।[১৪] বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত এলাকায় সেদিন সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয়। বেলা তিনটের সময় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ এবং পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বহুসংখ্যক সশস্ত্র পুলিশ সাথে নিয়ে ভাইস-চ্যান্সেলরের বাড়িতে হাজির হন[১৫] এবং কিছুক্ষণ পর অবস্থান ধর্মঘটরত সাত-আটজন ছাত্রকে গ্রেফতার করেন।[১৬]

১৮ তারিখের ঘোষণা অনুসারে ২০শে এপ্রিল ঢাকার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট শুরু হয়। সকালের দিকেই পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজের গেটের সামনে থেকে অনেক ছাত্রকর্মীকে গ্রেফতার করে। অন্যান্য জায়গাতেও কর্মীরা পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হয়।[১৭]

পুলিশের বাধা সত্বেও বেলা দেড়টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে এক বিরাট ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় পুলিশ জুলুমের নিন্দা করে ছাত্রেরা প্রস্তাব গ্রহণ করে। ২৭ জন ছাত্রছাত্রীর উপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বহিষ্কারাদেশ সরকারী দমন নীতিরই যে একটি বীভৎস রূপ বক্তৃতার মাধ্যমে একথাই সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[১৮] এবং সেজন্যে প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষা-মন্ত্রীর কাছে প্রতিকার দাবীর উদ্দেশ্যে তারা মিছিল সহকারে সেক্রেটারিয়েটের দিকে, অগ্রসর হয়।[১৯]

ঢাকা হলের কাছে এই মিছিলটির উপর পুলিশ বেপরোয়াভাবে লাঠি চালিয়ে এবং কাঁদুনে গ্যাস ছুড়ে সকলকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।[২০] এরপর ছাত্র-ছাত্রীরা আবার একত্রিত হয়ে মিছিল করে এবং সেক্রেটারিয়েটের দক্ষিণ গেটের কাছে উপস্থিত হয়। পুলিশ সেখানে তাদের পথ রোধ করে।[২১] দুই ঘণ্টা সেখানে দাঁড়িয়ে ভিতরে প্রবেশের চেষ্টার পর ছাত্রেরা যখন জোরপূর্বক পুলিশ কর্ডন ভেদ করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তখন পুলিশেরা নিরস্ত্র ছাত্রছাত্রীদের উপর অবিরাম লাঠি চালায় এবং কাঁদুনে গ্যাস ছোড়ে। এর ফলে বেশ কয়েকজন গুরুতরভাবে আহত হওয়ার পর তাদেরকে চিকিৎসার জন্যে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।[২২]

কিন্তু এত উৎপীড়ন ও নির্যাতনের পরও ছাত্রছাত্রীরা আবার একত্রিত হয়ে

বেলা তিনটের দিকে মিছিল করে শহর প্রদক্ষিণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং 'ছাত্রঐক্য জিন্দাবাদ', 'জুলুমবাজী চলবে না', 'হাজার লোকের ভাত মারা চলবে না', 'মজুর কৃষক ছাত্র ভাই ভাই', ইত্যাদি ধ্বনি [২৩] দিতে দিতে নাজিরাবাজার, মানসী, নবাবপুর, সদরঘাট, পটুয়াটুলি, ইসলামপুর, চক, জেল গেট, বেগম বাজার, ট্রেনিং কলেজ রোড হয়ে আরমানীটোলা ময়দানে জমায়েত হয়। সেখানে সমবেত জনসাধারণের সামনে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বিভিন্ন ছাত্রবক্তারা সমগ্র পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বোঝায় এবং কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণের পর পুলিশ জুলুমের প্রতিবাদে পরদিন আবার ধর্মঘট ঘোষণা করে।[২৪]

সেদিন অলি আহাদকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠের সামনে এবং মতিন, এনায়েত করিম ও নিতাই গাঙ্গুলীকে সেক্রেটারিয়েট গেটের সামনে গ্রেফতার করে। খালেক নওয়াজ, আজিজ আহমদ, বাহাউদ্দিন সকালের দিকেই গ্রেফতার হন। এ ছাড়া আরো অনেককে গ্রেফতার করে দূর দূর জায়গায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।[২৫]

আরমানীটোলা ময়দানে সমাবেশে ২১শে এপ্রিল ধর্মঘট ঘোষণা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো পিকেটিং হয়নি। তবে ছাত্রদের মধ্যে ক্লাস করার উৎসাহও সেদিন তেমন ছিলো না। বিকেলের দিকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে ছাত্রেরা একটি মিছিল বের করে সেক্রেটারিয়েটের পাশ দিয়ে অগ্রসর হয়ে কারোনেশন পার্কে উপস্থিত হয় এবং সেখানে একটি জনসভা অনুষ্ঠান করে।[২৬]

২২ তারিখে ঢাকা হল ছাত্রদের একটি সভায় ৬ জনকে নিয়ে একটি কর্ম-পরিষদ্ গঠিত হয়। পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আংশিক ধর্মঘট হয়। ফজলুল হক হলের দুই চারজন ছাত্র ছাড়া অন্য কেউই সেদিন ক্লাসে যোগদান করেনি। কিন্তু কেন্দ্রীয় কর্মপরিদের ভুল ব্যবস্থাপনার জন্যে সেদিন কোনো বিক্ষোভ মিছিল ইত্যাদি সম্ভব হয়নি।[২৭]

ছাত্র কর্ম-পরিষদ ২৫শে এপ্রিল সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং সেই সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার জন্যে ছাত্রকর্মীরা শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ছাত্রের বিরোধিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা এবং সরকারের দমনমূলক ব্যবস্থা সত্ত্বেও ধর্মঘটের প্রস্তুতি অব্যাহত থাকে এবং জনসাধারণ ছাত্রদের আহ্বানে উৎসাহের সাথে সাড়া দেন। এর ফলে সরকার গণ্ডগোল আশঙ্কার অজুহাতে সমগ্র রমনা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারী করে।[২৮]

পূর্ব বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৪৯ সালের ২৫শে এপ্রিল একটি

গুরুত্বপূর্ণ পথচিহ্ন। এই দিনই সর্বপ্রথম ছাত্রদের সাথে বৃহত্তর জনসাধারণের সত্যিকার রাজনৈতিক সংযোগ স্থাপিত হয় এবং ছাত্রজনতা সম্মিলিতভাবে স্বৈরাচারী সরকারের নির্যাতন ও নানা প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ভিত্তি স্থাপন করে।

২৫শে এপ্রিল ঢাকা শহরে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। নীলক্ষেত ও পলাশী ব্যারাকের সরকারী কর্মচারীরা বেলা ১২-৩০ মিনিট পর্যন্ত অফিস না গিয়ে[২৯] এবং চক থেকে শুরু করে ইসলামপুর, পাটুয়াটুলি, নবাবপুর পর্যন্ত সমস্ত দোকানপাট ও বাস রিক্সা পর্যন্ত বন্ধ রেখে সেদিন এক ঐতিহাসিক ধর্মঘটে সমগ্র ঢাকা শহর ছাত্রছাত্রীদের সাথে মিলিত হয়। এই ধর্মঘটের জন্যে শহরে ছাত্রদেরকে পিকেটিং করতে হয়নি। পিকেটিং সেদিন করেছে সাধারণ শ্রমিক ও দোকান কর্মচারীরা। নির্যাতিত ছাত্রদের থেকে শহরের উৎপীড়িত জনসাধারণ ও শ্রমিক কর্মচারীদেরকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্তকে সম্পূর্ণভাবে বানচাল করে ২৫শে এপ্রিল বস্তুতঃপক্ষে পূর্ব বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাসে রচনা করেছিলো এক নোতুন দিগন্ত।

বেলা ১২টা থেকে শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধর্মঘটী ছাত্রছাত্রীরা দলে দলে আরমানীটোলা ময়দানে সমবেত হতে থাকে এবং ১টার সময় সেখানে তাজউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে[৩০] একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। হাজার হাজার হাজার ছাত্র-জনতা সেই সভায় ঐক্যবদ্ধভাবে আওয়াজ তোলে 'ফ্যাসিস্ট নীতি ধ্বংস হোক' 'পুলিশ জুলুম চলবে না' '১৪৪ ধারা বাতিল করো' 'বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার কর', 'ছাত্র বন্দীদের মুক্তি চাই।'[৩১]

সভা শেষ হওয়ার পর আরমানীটোলা ময়দান থেকে সেক্রেটারিয়েটের উদ্দেশ্যে একটি বিরাট মিছিল সহকারে হাজার হাজার ছাত্র এবং জনসাধারণ বিভিন্ন ধ্বনিতে ঢাকার আকাশ বাতাস মুখরিত করে বেগমবাজার, জেলগেট, চকবাজার, মোগলটুলী, ইসলামপুর, সদরঘাট, নবাবপুর হয়ে অবশেষে স্টেশন রোডে উপস্থিত হয়। সারা পথে অসংখ্য মানুষ এগিয়ে এসে মিছিলে যোগদান করায় ইতিমধ্যে মিছিলের কলেবর অনেকখানি স্ফীত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও নাজিরাবাজার রেলওয়ে ক্রসিং পার হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হলো না। গাড়ি বোঝাই সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী সেখানে তাদের পথ রোধ করলো।[৩২]

পুলিশের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে মিছিল এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ছাত্র জনসাধারণও তখন বদ্ধপরিকর হলো। 'ব্যারিকেড ভাঙতে হবে', '১৪৪ ধারা মানব না' ইত্যাদি ধ্বনি তুলে তারা পুলিশ কর্ডন ভেদ্ করে এগিয়ে যাওয়ার

চেষ্টা করলে পুলিশ লাঠি চালনা করে ও কাঁদুনে গ্যাস ছুড়ে মিছিলটিকে সেখানে ছত্রভঙ্গ করে দিলো।[৩৩]

এরপর নাজিরাবাজার রেল ক্রসিং এলাকা পরিত্যাগ করে সকলে নবাবপুর ক্রসিংএর সামনে উপস্থিত হয় কিন্তু সেখানেও পুলিশবাহিনী কর্ডন সৃষ্টি করে তাদেরকে বাধা দেয় এবং সেই পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করতে অসমর্থ হয়ে ছাত্রেরা রাস্তার উপরেই বসে পড়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে। সশস্ত্র পুলিশ তখন নিরস্ত্র শোভাযাত্রাকারীদের উপর নির্দয়ভাবে অবিরাম লাঠি চালনার দ্বারা তাদের মধ্যে অনেককে জখম করে দেয়। সাধারণ পথচারী এবং নবাবপুর এলাকার ঔষধপত্রের দোকানগুলির মধ্যেকার কর্মচারীরা পর্যন্ত সেদিন পুলিশের মারধোর ও নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পায়নি।[৩৪] 'পল ফার্মেসী' নামে একটি ওষুধের দোকানে কয়েকজন আশ্রয় গ্রহণ করে। একজন পাঞ্জাবী হাবিলদারকে নিয়ে এক পুলিশ ইন্সপেক্টর দোকানটিতে ঢুকে প্রায় ১৫ ব্যক্তিকে অমানুষিকভাবে মারধোর করে। ২৫শে এপ্রিলের নানা ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে ২৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়।[৩৬]

পুলিশের এই নির্যাতনের পরও ছাত্রজনতার মধ্যে হতাশার পরিবর্তে দেখা দেয় নোতুন উদ্দীপনা এবং 'ছাত্র সাধারণ ঐক্য জিন্দাবাদ' 'খুদ আতপ চলবে না', 'ভাত কাপড় শিক্ষা চাই' ইত্যাদি ধ্বনি দিতে দিতে তারা নবাবপুর রোড দিয়ে ভিক্টোরিয়া পার্কে সমবেত হয়। ভিক্টোরিয়া পার্কের সেই সভায় জনসাধারণ দলে দলে যোগদান করে এবং বক্তৃতা দিয়ে ছাত্রদের প্রতি তাদের ঐক্য ও সংহতির কথা ঘোষণা করে। অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে একটিতে পরদিন প্রতিবাদ ধর্মঘট এবং করোনেশন পার্কে সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[৩৭]

এই পর্যায়ের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলনের তীব্রতা ও ব্যাপকতা ধীরে ধীরে কমে আসে। ২৬শে এপ্রিল সাধারণ ধর্মঘট এবং সাধাররণ সভা অনুষ্ঠানের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ্ ক্রমাগত-ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ২৭শে এপ্রিল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকার অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিয়মিতভাবে ক্লাস শুরু হয়। এরপর ছাত্র কর্মপরিষদ্ পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্যে মাঝে মাঝে বৈঠকে মিলিত হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে ধর্মঘটের আহ্বান জানায়।[৩৮] কিন্তু এসব সত্ত্বেও আন্দোলনের পূর্বাবস্থা আর ফিরে আসে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলনের সমর্থনে পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন

অঞ্চলে ধর্মঘট ও সভাসমিতি হয় এবং ছাত্র সম্প্রদায় ব্যাপকভাবে পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদ করে।[৩৯]

মার্চ-এপ্রিলের ছাত্র আন্দোলন করার ক্ষেত্রে পার্লামেন্টারী রাজনীতির ভূমিকা প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক 'সৈনিকে'র নিজস্ব সংবাদদাতার একটি রিপোর্টে[৪০] বলা হয়:

> তখন ছাত্রদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেল যে এই অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়ার পিছনে পার্লমেন্টারী রাজনীতি কাজ করছে। ১১ই মার্চ থেকে পূর্ব বাংলা আইন পরিষদের অধিবেশন শুরু হলো। ঐদিনই একদল ছাত্র বাংলা ভাষায় আরবী হরফ প্রচলনের প্রতিবাদ জানিয়ে পরিষদের রাস্তায় শোভাযাত্রা করে এবং ফলে কিছু ধরপাকড়ও হয়। ঠিক এক বৎসর আগে ঐদিনই তমদ্দুন মজলিসের* ঐতিহাসিক বাংলা ভাষার আন্দোলন শুরু হয় এবং তখন ছাত্র সমাজ পরিষদের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং এমন কি সরকারকে পরিষদ্ রক্ষার জন্য সামরিক বাহিনীর সাহায্য নিতে হয়েছিল। এবার যদিও পরিষদ্ গৃহের চতুর্দিকে পুরো দেওয়াল দিয়ে ঘেরা হয়েছে তবুও ছাত্রদের বিশ্বাস করা যায় না (!) তাই সবচেয়ে ভাল উপায় হলো আইন পরিষদের অধিবেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের রাজধানী থেকে

*ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে তমদ্দুন মজলিসের এই জাতীয় বক্তব্য অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। ১৯৪৭-৪৮ সালে আন্দোলন যে পর্যন্ত সাংস্কৃতিক গণ্ডীর মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ ছিলো সে পর্যন্ত অন্যান্য রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সাথে তারাও উল্লেখযোগ্যভাবে উদ্যোগী হয়। ভাষা আন্দোলনকে সাংস্কৃতিক থেকে রাজনৈতিক পর্যায়ে উত্তীর্ণ করার ক্ষেত্রেও তমদ্দুন মজলিসের প্রাথমিক প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ১১ই মার্চ, ১৯৪৮-এর পর থেকে ভাষা আন্দোলনে তাদের গুরুত্ব অন্যান্যদের তুলনায় ক্রমশঃ এবং দ্রুত কমে আসে। কাজেই ১৯৪৮-এর ভাষা আন্দোলনকে কোনো ক্রমেই 'তমদ্দুন মজলিসের আন্দোলন' অথবা কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর আন্দোলন, হিসাবে অভিহিত করা চলে না কিন্তু তমদ্দুন মজলিসের পত্রপত্রিকা এবং অধ্যাপক আবুল কাসেম লিখিত ও প্রকাশিত ভাষা আন্দোলনের উপর বিভিন্ন পুস্তিকা এই জাতীয় বিভ্রান্তিকর প্রচারণায় পরিপূর্ণ। পূর্ব বাঙলার ভাষা-আন্দোলনকে যথার্থভাবে বোঝার জন্যে এইসব বক্তব্য ও প্রচারণা সম্পর্কে যথোচিতভাবে সাবধান হওয়ার প্রয়োজন নিতান্ত অপরিহার্য। ব. উ.

সরিয়ে রাখা। এই বিশ্বাস আরো প্রবল হোল যখন অনার্স এম.এ. পরীক্ষার্থী ছাত্রদের পর্যন্ত হল থেকে একপ্রকার জবরদস্তি করে বের করে দেওয়া হলো।...

তাছাড়া ছাত্রদের শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারেও নাকি অল্পস্বল্প রাজনীতি ঢুকেছে। যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী শাস্তি পেয়েছে তাদের অনেকেই নাকি ধর্মঘট ব্যাপারে একেবারেই জড়িত ছিলো না, এমনকি কয়েকজন ধর্মঘটের পূর্ব থেকেই রাজধানীর বাইরে ছিলো।

এ সম্পর্কে তাজউদ্দীন আহমদ নিজের ব্যক্তিগত ডায়েরিতে ১৭ই এপ্রিল নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন :

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২৭ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছেন। এদের মধ্যে কয়েকজন আছে যারা বিভিন্ন ঘটনায় কোনো অংশ গ্রহণ করেনি। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে অন্য ব্যাপারের জের টেনে তাদের বিরুদ্ধে এইভাবে প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে।

২৮শে এপ্রিল সাপ্তাহিক নওবেলাল 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বৈরাচার' নামে একটি সম্পাদকীয় লেখেন। তাতে তাঁরা বলেন :

নিম্নতম কর্মচারীদের অতি সংগত দাবীর প্রতি সহানুভূতি জানাইবার জন্যই ছাত্ররা ধর্মঘট করে। ছাত্রদের এই সহানুভূতি প্রদর্শন মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়। কারণ অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সকল দেশেই ছাত্ররা চিরকাল প্রতিবাদ জানাইয়া আসিয়াছে। ছাত্ররা সাধারণতঃ আদর্শবাদী। সকলপ্রকার অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ানোই তাদের স্বভাব ধর্ম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারেও যদি তাহাই ঘটিয়া থাকে তাহাতে আর আশ্চর্য হইবার কি আছে ?

স্বল্পবেতন কর্মচারীদের দাবীর যৌক্তিকতা কর্তৃপক্ষ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। অতএব তাহাদের উচিত ছিল এই দাবী পূরণ করার সমস্ত ব্যবস্থা করা। তাহা না করিয়া তাঁহারা নির্লজ্জভাবে ন্যায়নিষ্ঠ ছাত্রদের প্রতি দমননীতি প্রয়োগ করিতে ব্যস্তহইয়া পড়িলেন। এক স্বাধীন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের জন্য ইহার চেয়ে লজ্জার ব্যাপার আর কি হইতে পারে ?

তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের খেদমতে আমাদের আরজ তাহারা যেন মিথ্যা আত্মমর্যাদা-বোধ পরিহার করিয়া বাস্তবদর্শী পরিচালকদের মতো ছাত্রদের আদর্শবাদীতার প্রতি নজর রাখিয়া সমস্যার উপযুক্ত সমাধান

করিয়া তাহাদের বর্তমান স্বৈরাচারমূলক দমন নীতি প্রত্যাহার করেন।

মার্চ-এপ্রিলের ছাত্র আন্দোলনে যে সমস্ত ছাত্র গ্রেফতার হন তাঁদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের অস্থায়ী আহ্বায়ক দাবিরুল ইসলামের পক্ষে হাই কোর্টে হেবিয়াস কর্পাসের আবেদন করা হয়[৪১] এবং শহীদ সুহরাওয়ার্দী সেই কেস পরিচালনা করেন।[৪২] হোবিয়াস কর্পাস আবেদন পেশ করার সময় সুহরাওয়ার্দী হাইকোর্টকে বলেন যে দবিরুল ইসলামের উপর আটক আদেশ অযৌক্তিক। তিনি মন্ত্রীসভার বিরোধী হতে পারেন কিন্তু মন্ত্রীসভার বিরোধিতার অর্থ রাষ্ট্রবিরোধিতা নয়। কাজেই সেই অভিযোগে কোনো ব্যক্তিকে নিরাপত্তা আইনে বন্দী করা চলে না।[৪৩]

দাবিরুল ইহলামকে ১৮ই জানুয়ারি ১৯৫০ বিনাশর্তে মুক্তি দান করা হয় এবং তার কয়েকদিন পূর্বে রাজশাহীর আতাউর রহমান ও খুলনার মহম্মদ একরাম মুক্তি লাভ করেন।[৪৪]

সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের উত্থান

১॥ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ

১৯৩৬ সালের পূর্বে বাঙলাদেশে মুসলিম লীগের কোনো উল্লেখযোগ্য সংগঠন ছিলো না। কায়েদে আজম ইংলণ্ড থেকে ফেরার পর কলকাতায় আসেন এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের মতো বাঙলাদেশেও মুসলিম লীগ গঠনে সচেষ্ট হন। ১৯৩৬ সালে ইস্পাহানীর বাসভবনে কিছু সংখ্যক মুসলমান নেতাদের সাথে আলাপ আলোচনার পর তিনি ঢাকার নবাব হাবিবুল্লাহ্‌কে সভাপতি করে একটি প্রাদেশিক কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি অল্পকাল পরেই ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের মুখে আবার মৌলানা আকরাম খানের সভাপতিত্বে নোতুনভাবে গঠিত হয়। সভাপতি আকরাম খান এবং সম্পাদক হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে এই প্রাদেশিক কমিটি ১৯৪৩-এর নভেম্বর পর্যন্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাজকর্ম পরিচালনা করে।

১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরবর্তী পর্যায়ে মুসলিম লীগ মহলে কিছু উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার হলেও সাংগঠনিক দিক থেকে প্রাদেশিক লীগ তখনও অত্যন্ত দুর্বল ছিলো। সে সময় শুধু বাঙলাদেশের জেলাসমূহে মুসলিম লীগের যে কোনো কমিটি ছিলো না তা নয়, এমনকি কেন্দ্র কলকাতায় তাঁদের কোনো সুপরিচালিত অফিসঘর পর্যন্ত ছিলো না। সাংগঠনিক তহবিল বলতে কিছু না থাকার ফলে কোষাধ্যক্ষ হাসান ইস্পাহানী এবং তাঁর মতো দু-চারজন ধনী মুসলিম লীগ সমর্থকের সাহায্যের উপরই তাঁদেরকে নির্ভর করতে হতো। মোটামুটিভাবে বলা চলে যে ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত মুসলিম লীগের সাধারণ জনপ্রিয়তা কিছুটা বৃদ্ধিলাভ করলেও প্রাদেশিক ও জেলা পর্যায়ে সংগঠন বলতে তার কিছুই ছিলো না।

মুসলিম লীগ শ্রেণীগতভাবে ছিলো একটি সামন্ত-বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেসের চরিত্রও তাই ছিলো। উনিশশো চল্লিশের দিকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন জোরদার হওয়ার সাথে সাথে নিম্ন মধ্যবিত্ত প্রভাব অবশ্য অত্যন্ত দ্রুত মুসলিম লীগের মধ্যে অনুভূত হতে থাকে। এই সময় বামপন্থী শক্তিসমূহের নোতুন শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে অন্যদিকে আবার সাম্প্রদায়িক প্রভাবও ক্রমশঃ বৃদ্ধিলাভ করে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে

এই দুই স্রোতের ক্ষিপ্রতার মুখে বাঙলাদেশের মুসলমান মধ্যবিত্তের মধ্যে সূত্রপাত হয় সাংগঠনিক চেতনার। এই সন্ধিক্ষণেই ১৯৪৩ সালের ৬ই নভেম্বর প্রাদেশিক কাউন্সিলের সভায় আবুল হাশিম বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক নির্বাচিত হন।[১]

এই নির্বাচনের পর আবুল হাশিম বাংলাদেশে মুসলিম লীগকে উপযুক্তভাবে সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বিস্তৃত সফরসূচী তৈরী করে তিনি প্রত্যেক জেলায় জেলায় কর্মীদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং মুসলমান যুবকেরা তাঁর এই সাংগঠনিক তৎপরতায় আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত হতে থাকে। ১৯৪৪-এর প্রথম দিকে তিনি নারায়ণগঞ্জে একটি ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে আসেন[২] এবং তার পর সেই বৎসরই তাঁর উদ্যোগে ৯ই এপ্রিলে ঢাকার ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের একটি শাখা অফিস স্থাপিত হয়।[৩] বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ এবং পাকিস্তানোত্তর রাজনীতির ইতিহাসে এই শাখা অফিসের গুরুত্ব অসামান্য। ঢাকার এই অফিসকে কেন্দ্র করেই ১৯৪৪-৪৭-এ সমগ্র পূর্ব বাঙলায় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনসহ মুসলিম লীগ সংগঠনের অন্যান্য কাজ পরিচালনা করা হয় এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তী কয়েক বৎসর এই অফিসকে অবলম্বন করেই এখানকার বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি ক্রমশঃ সংগঠিত হয়।

মুসলিম লীগের সাংগঠনিক কাজকর্ম এবং সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের অগ্রগতির সাথে সাথে প্রাদেশিক এবং জেলা সংগঠন-গুলিতে নোতুন মধ্যবিত্ত ও সামন্ত স্বার্থের একটা সংঘর্ষ ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে থাকে। মুসলিম লীগের উচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্বে অভিজাত জমিদার ও জোতদার প্রভাব বেশী থাকলেও মুসলমান মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক উত্থানের ফলে সে প্রভাবের প্রতাপ ক্রমশঃ কমে আসে। পূর্ব বাঙলার মুসলিম লীগের মধ্যে ঢাকার নবাববাড়ি-কেন্দ্রীক সামন্ত-প্রভাব খর্ব করার ক্ষেত্রে ১৫০ নম্বর মোগল-টুলীর যুবকদের ভূমিকা তাই অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। সমগ্র বাঙলাদেশে মুসলিম লীগ সংগঠনের চরিত্র কিভাবে পরিবর্তিত হলো তা বোঝার জন্যে এই যুবকদের রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি ও তৎপরতার পর্যালোচনা একান্ত অপরিহার্য।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে যে সমস্ত মুসলমান যুবকেরা রাজনীতিগত-ভাবে এগিয়ে আসেন তাঁরা ধীরে ধীরে প্রাদেশিক সম্পাদক আবুল হাশিমের নেতৃত্বে সংগঠিত হতে থাকেন। মুসলিম লীগের মধ্যে সামন্ত আভিজাত্যের প্রাধান্য খর্ব করার ক্ষেত্রে তাঁদের প্রথম বিজয় সূচিত হয় ঢাকা জেলা মুসলিম

লীগের নির্বাচনে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে খাজা নাজিমুদ্দীন, খাজা শাহাবুদ্দীন, সৈয়দ আবদুস সেলিম, সৈয়দ সাহেব আলম প্রভৃতি খাজা পরিবারের লোক-জনদেরকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করে মানিকগঞ্জের আওলাদ হোসেনকে সভাপতি এবং মুন্সীগঞ্জের শামসুদ্দীন আহমদকে সম্পাদক করে একটি নোতুন জেলা কমিটি নির্বাচিত হয়।[৪] এর পর থেকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ এবং সমগ্র বাংলাদেশের লীগ সংগঠনে খাজা পরিবার-কেন্দ্রিক অভিজাত এবং অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল নেতৃত্বের পরিবর্তে এক নোতুন নেতৃত্ব ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে শুরু করে এবং এই অগ্রগতির সাথে সাথে প্রাদেশিক সম্পাদক আবুল হাশিমের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা এবং ক্ষমতাও প্রভূতভাবে বৃদ্ধি পায়।

প্রাদেশিক লীগের সম্পাদক হিসাবে আবুল হাশিম সর্বপ্রথম একটি খসড়া ম্যানিফেস্টো প্রচার করেন। ঢাকা থেকে জেলা সম্পাদক শামসুদ্দীন আহমদ কর্তৃক প্রকাশিত এই ম্যানিফেস্টোটির মুখবন্ধে বলা হয়:

> বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ মনে করে যে এই পূর্বাঞ্চলের জনসাধারণের জীবন ও অবস্থার সাথে সম্পর্কিত পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক নীতি কি হবে সে কথা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করার সময় এখন উপস্থিত হয়েছে। এ ধরনের একটা নক্শা যে শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকেই উদ্বুদ্ধ করতে সহায়ক হবে তাই নয়। এর দ্বারা মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে সংস্কারাচ্ছন্ন ও আশঙ্কান্বিত লক্ষ লক্ষ অমুসলমানদের অন্তরেও আস্থা উপলব্ধির সৃষ্টি হবে। দেশবাসীর সামনে এই ম্যানিফেস্টো পেশ করার সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ আশা করে যে এটিকে তাঁরা শুধু আগামীদিনের স্বাধীনতার সনদ্ হিসাবেই নয়, আজকের সংগ্রামের পথনির্দেশ হিসাবেও গ্রহণ করবেন।[৫]

উপরোক্ত ম্যানিফেস্টোটিতে সংবিধান সভা সম্পর্কে বলা হয়:

> পূর্ব পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব জনগণের মধ্যে নিহিত থাকবে। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সংবিধান সভা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করবে।[৬]

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের এই দলিলটিতে যে কর্মসূচী প্রচারিত হয় তা খুবই উল্লেখযোগ্য। কারণ এগুলির মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরে এক নোতুন আন্দোলনের সাথে কিছুটা পরিচিত হওয়া যায়। আলোচ্য কর্মসূচীর কয়েকটি ধারা নীচে উল্লিখিত হলো:

৩। আইনের ক্ষেত্রে সমতা: আইনের ক্ষেত্রে সমতা নীতি হিসাবে স্বীকৃত ও প্রযোজ্য হবে। ন্যায় বিচারকে করা হবে সহজ ও ত্বরান্বিত। রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধমূলক আইন এবং বিনা বিচারে আটক রাখার প্রথা উচ্ছেদ করা হবে। সকল বিচারাধীন বন্দীকে হেবিয়াস কর্পাসের নিরাপত্তার আশ্রয় মুক্তভাবে দান করা হবে। বিচার বিভাগকে করা হবে শাসন বিভাগ থেকে বিযুক্ত।[৭]

৪। নাগরিক অধিকার: বাক স্বাধীনতা এবং লেখা, আন্দোলন, মেলামেশা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত ও কার্যক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। একমাত্র জনসাধারণের সতর্ক দৃষ্টিই এই স্বাধীনতার অপব্যবহারের খবরদারী করবে।[৮]

৬। শ্রমের স্বাধীনতা: সকল সমর্থ ব্যক্তিদের কাজ রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে। শ্রেণী, বিশ্বাস ও সংস্কৃতি নির্বিশেষে সকল পুরুষ ও নারীকে সমান সুযোগ সুবিধা দান করা হবে। নারীদের বিশেষ অক্ষমতা ও প্রয়োজনসমূহের প্রতি দৃষ্টি রেখে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হবে। নিজ নিজ শ্রমের ফল ভোগ করার অধিকার প্রত্যেকেরই থাকবে।[৯]

৭। শিক্ষার অধিকার: শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত থাকবে এবং তা প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর জন্য হবে বাধ্যতামূলক, প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হবে, মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ব্যাপকভাবে উৎসাহ দেওয়া হবে। এবং উচ্চ শিক্ষাকে করা হবে সস্তা ও সহজলভ্য। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হবে।* দেশের কারিগরি ও শিল্পক্ষেত্রে পশ্চাদপদত্বের পরিপ্রেক্ষিতে পেশাগত ও কারিগরি ও শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হবে এবং উচ্চ গবেষণা ও তার বিভিন্ন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সর্বপ্রকারের সুযোগ সুবিধা দান করা হবে।[১০]

৯। একচেটিয়া স্বার্থের উচ্ছেদ: সকল খাজনাপ্রাপ্তিমূলক স্বার্থের উচ্ছেদ করা হবে। যানবাহনসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ শিল্প অবিলম্বে জাতীয়করণ করা হবে। সকল একচেটিয়া স্বার্থ, বিশেষতঃ পাটের একচেটিয়া স্বার্থ অবিলম্বে উচ্ছেদ করা হবে।[১১]

১০। শ্রমিকের অধিকার: শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী ও মহার্ঘভাতা প্রচলিত অবস্থানুযায়ী নিশ্চিত করা হবে। ছুটি সংক্রান্ত আইনসহ আট ঘণ্টা দিন প্রবর্তন করা হবে। রাষ্ট্র সকলের জন্য বেকারত্ব বীমা ও বার্ধক্য

*এ বইয়ের ২য় পৃষ্ঠায় ভুলবশতঃ বলা হয়েছে যে ম্যানিফেস্টোটিতে ভাষা বিষয়ক কোনো দাবী উত্থাপন করা হয়নি। ব. উ.

ভাতা নিশ্চিত করা হবে এবং নারী শ্রমিকদের জন্য মাতৃকল্যাণ ও শিশুদের নার্সারীর ব্যবস্থা রাখবে। শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হওয়া, সভাসমিতি করা ও ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত অন্যান্য সর্বপ্রকার কাজকর্ম এবং যৌথ দর-কষাকষির জন্য ধর্মঘটের অধিকার থাকবে।[১২]

১১। কৃষকদের অধিকার: কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা ও সর্বপ্রকার খাজনার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করা হবে। সর্বপ্রকার অন্যায়মূলক কর উচ্ছেদ করা হবে। রাষ্ট্র সমবায় পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ করবে এবং কৃষকেরা যাতে তাদের কৃষিজাত দ্রব্যসমূহের ন্যায্য মূল্য লাভ করতে পারে সেজন্যে সমবায় বিক্রয় ব্যবস্থার প্রতি উৎসাহ দান করবে। রাষ্ট্র বিশাল আকারে সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ করবে যাতে করে দেশের কোনো অঞ্চলে কৃষকেরা চাষ আবাদের উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হয়।[১৩]

১২। কারিগরদের অধিকার: রাষ্ট্র শিল্পায়নের কাজে আত্মনিয়োগ করবে কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রাম্য কারিগরি শিল্পসমূহের প্রতিও উপযুক্ত দৃষ্টি দেওয়া হবে। কারণ তাদের উন্নতির দ্বারা সাধারণভাবে সমগ্র গ্রামের অধিকতর কল্যাণ সাধিত হবে। এজন্যই রাষ্ট্র বিভিন্ন গ্রাম্য কারিগরি শিল্পকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য, প্রয়োজনমতো অতিরিক্ত অর্থ প্রদান, কাঁচা মাল সরবরাহ এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় ব্যবস্থাকে সংগঠিত করবে।[১৪]

ম্যানিফেস্টোটির এ পর্যন্ত উদ্ধৃত অংশের থেকে একথাই মনে হবে যে সেটি একটি জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সাধারণ কর্মসূচী। কিন্তু মুসলমান ও অমুসলমান সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্পর্কে ম্যানিফেস্টোটিতে যা বলা হয়েছে তাতে মুসলমান ও অমুসলমান সংখ্যালঘুদের কতকগুলি নির্দিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকারের উল্লেখ থাকলেও মুসলমানদের জন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অভিভাবকের ভূমিকা নির্দেশ করার ফলে তার সামগ্রিক গণতান্ত্রিক চরিত্র অনেকাংশে খর্ব হয়েছে। মুসলিম লীগের সাধারণ কাঠামোর কথা বিবেচনা করলে অবশ্য সহজেই বোঝা যাবে যে তার মধ্যে মুসলমানদের এই ভূমিকা নির্দেশ অস্বাভাবিক ছিলো না। পাকিস্তান যে ইসলামী রাষ্ট্র হবে একথা কিন্তু ম্যানিফেস্টোটির কোনো স্থানেই উল্লেখ করা হয়নি। মুসলমানদের অধিকার সম্পর্কে ১৪ ধারায় শুধু বলা হয়েছে:

মুসলমান সমাজে শরিয়তের আইনকানুন যাতে প্রযুক্ত ও পালিত হয় তার প্রতি দৃষ্টি রাখা হবে মুসলিম লীগের কর্তব্য। ইসলামের নৈতিক মূল্য পুনরুত্থিত ও ইসলামী নীতিসমূহ অনুসরণ করা হবে। ইতিহাস, লোকগীতি,

শিল্প ও সঙ্গীতের মাধ্যমে পূর্বপাকিস্তানে ইসলামী সংস্কৃতির যে বিকাশ শত শত বছর ধরে ঘটেছে তাকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টাকে বিশেষভাবে উৎসাহ দান ও জনপ্রিয় করা হবে।[১৫]

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা ও ধর্মীয় আনুগত্যের যে আপাতঃ সমন্বয় সাধিত হয়েছিলো তারই পরিচয় পাওয়া যায় ম্যানিফেস্টোটির শেষ দুই অনুচ্ছেদে :

ইসলাম তার অনুসরণকারীদের কাছে সাম্য ও স্বাধীনতার যে নীতি প্রচার করে তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ মানবতার মুক্তির জন্য চূড়ান্ত সংগ্রাম যাতে আর বিলম্বিত না হয় তার জন্য সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সকল দল ও ব্যক্তিকে একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানাচ্ছে।

দেশবাসীর সামনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ নিজের ভূমিকাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে গিয়ে আবুবকরের বিখ্যাত নীতি অনুসারেই চলার চেষ্টা করে : 'আমি যদি সঠিক হই, আমাকে অনুসরণ করো। আমি যদি ভুল করি, আমাকে সংশোধন কর।' এই নীতির উপর নির্ভর করেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সর্বস্তরের দেশবাসীর কাছে আবেদন জানাচ্ছে, যাতে তাঁরা এগিয়ে আসেন এবং সমবেত শক্তি দ্বারা এ প্রচেষ্টার কামিয়াবীর মাধ্যমে এই সোনার দেশ পূর্ব পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীকে রক্ষা করেন।[১৬]

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কর্তৃক প্রকাশিত এই খসড়া ম্যানিফেস্টোটি সমগ্র প্রাদেশিক লীগের সমর্থন লাভ করেনি। এমনকি এই দলিল প্রচারের কোনো অধিকার আবুল হাশিমের নেই কাজেই তা প্রচারের জন্যে তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাগত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক এই মর্মে শহীদ সুহরাওয়ার্দী পর্যন্ত প্রাদেশিক লীগ সভাপতি আকরাম খানকে একটি পত্র দেন। সেই পত্রটি আকরাম খান আবার আবুল হাশিমের অবগতির জন্যে তাঁর কাছে পাঠান।[১৭]

এ ছাড়া সামন্ত প্রভাবাধীন দক্ষিণপন্থী মহলেও ব্যাপারটি নিয়ে আবুল হাশিম এবং তাঁদের 'বামপন্থী' উপদলের বিরুদ্ধে দারুণ এক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা বলা চলে যে ১৯৪৩ সালের পর থেকে মুসলিম লীগের পতাকাতলে যে নোতুন যুব সম্প্রদায় ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনসাধারণ দলে দলে সমবেত হয়ে মুসলিম লীগকে তাঁদের সমর্থন দান করতে

বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন এই ম্যানিফেস্টোটিতে তাঁদের আশা আকাঙ্খাই বিশেষভাবে প্রতিফলিত ও প্রতিধ্বনিত হয়েছিলো। বস্তুতঃপক্ষে এই দলিলটিকে কেন্দ্র করেই আবুল হাসিমের নেতৃত্বে বাঙলাদেশের মুসলিম যুব সম্প্রদায় নিজেদেরকে আদর্শগত ও সংগঠনগতভাবে সুসংহত করেন।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে সুহরাওয়ার্দী, এবং বিশেষ করে আবুল হাশিমের নেতৃত্বে মুসলিম লীগের বামপন্থী শক্তি নাজিমুদ্দীন ও সাধারণভাবে খাজা পরিবারের নেতৃত্বাধীন প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিকে গুরুতরভাবে আঘাত করতে সক্ষম হলেও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সামন্ত স্বার্থের প্রতাপকে তারা উপযুক্তভাবে খর্ব ও পরাভূত করতে সক্ষম হয়নি। শুধু তাই নয়, উপরোক্ত ম্যানিফেস্টোতে উল্লিখিত কোনো কোনো কর্মসূচীকে নিজেদের মন্ত্রিত্ব থাকাকালে বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টাকে তারা সমস্ত শক্তি দিয়ে বাধা প্রদান করেছে। প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী পার্টিতে তেভাগা বিলের পরিণাম এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শহীদ সুহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাশিম তো বটেই এমনকি ফজলুর রহমান প্রভৃতি দক্ষিণপন্থী নাজিমুদ্দীন উপদলভুক্ত বিশিষ্ট কয়েকজন নেতারও জমি অথবা জমিদারীতে বিশেষ কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিলো না। কাজেই সাধারণ নির্বাচনের পর ১৯৪৭ সালে সুহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে রাজস্ব সচিব ফজলুর রহমান চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে শোষিত বাঙালী কৃষকদেরকে কিছুটা রেহাই দেওয়ার জন্যে তেভাগা বিল প্রণয়ন করেন এবং তা প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী পার্টিতে যথারীতি পেশ করা হয়। কিন্তু মন্ত্রিসভার এই উদ্যোগ সত্ত্বেও উত্তর বাঙলার কিছু সংখ্যক শক্তিশালী জোতদারদের নেতৃত্বে পার্লামেণ্টারী পার্টির মধ্যে সামন্তশক্তি এমন চাপ সৃষ্টি করে যে আত্মরক্ষার্থে মুসলিম লীগ মন্ত্রিত্ব সেই বিল প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়।

কিন্তু মুসলিম লীগের শ্রেণীগত পরিচয় যে এই প্রথম উদ্ঘাটিত হলো তাই নয়। এর পূর্বেও প্রতিষ্ঠানগতভাবে মুসলিম লীগের সামগ্রিক শ্রেণী চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় তখনই যখন আলোচ্য মানিফেস্টোটির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল লীগ মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে সেটিকে ওয়ার্কিং কমিটিতে তো বটেই এমনকি প্রাদেশিক কাউন্সিলেও আলোচনার জন্যে পেশ করা সম্ভব হয় না। তথাকথিত বামপন্থী উপদলের অন্যতম প্রধান নেতা হওয়া সত্ত্বেও আবুল হাশিমের সাথে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব এবং ম্যানিফেস্টোটির নীতিসমূহের প্রতি পূর্ণ আস্থার অভাবে সুহরাওয়ার্দীও সেটি প্রাদেশিক

কাউন্সিলে উত্থাপনের ব্যাপারে বিরোধিতা করেন।[১৮] এর ফলে সাধারণভাবে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে এই কর্মসূচীর পেছনে বিরাট সমর্থন থাকলেও প্রাদেশিক কাউন্সিলে তাকে পাস করিয়ে নেওয়ার মতো প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা 'বামপন্থী'দের ছিলো না।

শুধু তাই নয়। তেভাগা আন্দোলনকে দমনের উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগ সরকার কৃষকদেরকে জেলে পুরে, তাদেরকে উত্তর বাঙলার বিভিন্ন জায়গায় গুলি করে হত্যা করে যে নির্মম নির্যাতন তাদের উপর চালিয়েছিলো সেটা একমাত্র তাদের শ্রেণী শত্রুদের দ্বারাই সম্ভব।

মুসলিম লীগকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে মুসলমান যুব সম্প্রদায়ের উদ্দীপনা এবং অসংখ্য কর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও এই সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানটির শ্রেণীগত চরিত্র সাধারণ কর্মীদের কাছে ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিত হতে শুরু করে। তেভাগা বিলের ক্ষেত্রে আবুল হাশিমের মধ্যেও উৎসাহের যে অভাব দেখা যায় তাকে শুধু নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে অনিবার্য নিষ্ক্রিয়তা বলে অভিহিত করা চলে না। এখানেও শ্রেণী চরিত্রের প্রশ্নই সত্য অর্থে প্রাসঙ্গিক। ম্যানিফেস্টোর মধ্যে কৃষকদের অধিকারের উল্লেখ এবং তেভাগা আন্দোলনের মুখে তেভাগা বিল প্রণয়নে তাঁর উৎসাহ থাকলেও সেই বিলকে মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী পার্টিতে পাস করিয়ে নেওয়ার জন্যে যে পরিশ্রম ও সাংগঠনিক তৎপরতার প্রয়োজন ছিলো আবুল হাশিম তার জন্যে কোনো উৎসাহ অথবা তাগিদ অনুভব করেননি। তেভাগা বিলের পরিণতি নিশ্চিত জেনেও 'তেভাগার রাজনীতি'র সপক্ষে মুসলিম লীগের 'বামপন্থী' মহলে এবং সামগ্রিকভাবে দেশে একটা আন্দোলন গঠনের চিন্তাও তাঁর মধ্যে আসেনি।

বস্তুতঃপক্ষে ১৯৪৩ সালের নভেম্বরের পর থেকে ১৯৪৭ সালে তেভাগা বিল প্রত্যাখ্যাত হওয়া পর্যন্ত এই পর্যায়টিই গণপ্রতিষ্ঠান হিসাবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সব থেকে গৌরবময় অধ্যায়। এর পর সূত্রপাত হয় সামগ্রিকভাবে মুসলিম লীগ নেতৃত্বের প্রতি সত্যিকার বামপন্থী অনাস্থার। মুসলিম লীগের মধ্যে আবুল হাশিমের সাংগঠনিক এবং আদর্শগত নেতৃত্বের সর্বোচ্চ বিকাশ এই পর্যায়েই ঘটে। এর পর থেকে তাঁর চিন্তার মধ্যে রক্ষণশীল প্রভাব ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দেয় এবং অগাস্ট ১৯৪৭-এর পর তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা এমন এক পথ ধরে অগ্রসর হতে থাকে যার ফলে ১৯৬৫ সালের দিকে সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর তুলনায় শহীদ সুহরাওয়ার্দী তো বটেই, এমনকি খাজা নাজিমুদ্দীনকেও মনে হয় বামপন্থী!

আবুল হাশিমের নেতৃত্বে মুসলিম লীগের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন যুব সম্প্রদায় যেভাবে একত্রিত হয়েছিলেন সেটা একদিক দিয়ে স্বাভাবিক হলেও প্রগতিশীল রাজনীতিক্ষেত্রে তা অনেক বিভ্রান্তিও সৃষ্টি করেছিলো। মুসলমান যুবকদেরকে সত্যিকার প্রগতিশীল রাজনৈতিক চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ করে ১৯৪৭-এর পর তাদেরকে নোতুন নেতৃত্বদানের যে সম্ভাবনা ছিলো ধর্মীয় রাজনৈতিক চিন্তার ফলে তাঁর পক্ষে সেটা আর সম্ভব হয়ে উঠেনি।

এর ফলে যারা ইতিমধ্যে মুসলিম লীগের মধ্যে এসেছিলেন তাঁদের বিপুল অধিকাংশই পরবর্তীকালে রাজনীতির প্রগতিশীল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহকেই জোরদার করেন। কাজেই আবুল হাশিমের প্রাথমিক রাজনৈতিক চিন্তা এবং সাংগঠনিক শক্তির মধ্যে যে সম্ভাবনা ছিলো তা গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন যুবকদেরকে মুসলিম লীগের অন্তর্গত চরম রক্ষণশীলদের দুর্গকে অনেকাংশে ধ্বংস করতে সমর্থ হলেও মুসলিম যুব সম্প্রদায়কে সত্যিকার বামপন্থী প্রগতিশীল রাজনৈতিতে উদ্‌বুদ্ধ করতে সমর্থ হয়নি। উপরন্তু তাদের অনেকেই সেই পথ থেকে বিচ্যুত করে মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত করে পরিশেষে তাদেরকে করেছিলো হতাশাচ্ছন্ন ও বিভ্রান্ত।

কিন্তু মুসলমান যুব সম্প্রদায়ের এই রাজনৈতিক পরিক্রমাকে আবার কোনোক্রমেই অস্বাভাবিক বলা চলে না। ব্যাপকভাবে গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী আন্দোলনে অংশ গ্রহণের প্রাথমিক পর্যায় হিসাবে তৎকালীন অবস্থায় সাধারণভাবে তাদের এই ভূমিকা শুধু স্বাভাবিক নয়, প্রয়োজনীয়ও ছিলো। এর ফলে দেখা যায় যে অল্পসংখ্যক হলেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ঠিক পরবর্তী সময়ে মুসলিম লীগের এই 'বামপন্থী' উপদলভুক্ত যুবকরাই পূর্ব বাঙলায় বিরোধীশক্তিকে সংহত ও সাংগঠনিক রূপ দান করেন। এবং অতি অল্প সংখ্যক হলেও তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সত্যিকার বামপন্থী রাজনীতি গঠনকার্যে সচেষ্ট হন।

২॥ মোগলটুলীর শাখা অফিস

১৯৫০ নম্বর মোগলটুলীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের যে শাখা অফিস স্থাপিত হয় কলকাতার সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হলেও ১৯৪৭-এর অগাস্ট মাসের পরও তাকে কেন্দ্র করে আবুল হাশিম-সুহরাওয়ার্দী উপদলের

কর্মীরা মোটামুটি একত্রিত থাকেন। এই অফিসটি ঢাকাতে অবস্থিত থাকলেও সারা পূর্ব বাঙলায় নাজিমুদ্দীন সরকার বিরোধী যুবকেরা রাজনীতিক্ষেত্রে তাকেই অবলম্বন করে নিজেদের প্রাথমিক কাজকর্ম পরিচালনা করেন।

যে সমস্ত কর্মীরা মোগলটুলীর এই শাখা অফিসটিকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় নতুন রাজনীতি গঠন চিন্তায় নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে শামসুল হক, কমরুদ্দীন আহমদ, মহম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, শওকত আলী, তাজউদ্দীন আহমদ, আতাউর রহমান, শামসুজ্জোহা, মহম্মদ আলমাস, মহম্মদ আউয়াল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী সময়ে শেখ মুজিবর রহমান এবং অন্যান্য কয়েকজনও কলকাতা থেকে আসার পর সেই রাজনীতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন।

মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদ ঘোষিত হওয়ার পর ১৯৪৭-এর জুলাই মাসে কমরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে উপরোল্লিখিত কর্মীদের মধ্যে কয়েকজন গণ-আজাদী লীগ নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করে। সে বছরই অগাস্ট-সেপ্টেম্বরে ১৫০ নম্বর মোগলটুলীকে কেন্দ্র করে গণতান্ত্রিক যুব লীগ গঠনের সাংগঠনিক কাজকর্ম পরিচালিত হয়। এর পরবর্তী সময়েও ঢাকার ছাত্র আন্দোলন এবং বিবিধ রকম গণ আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এই কর্মীদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মোগলটুলীর অফিসকে কেন্দ্র করে মুসলিম লীগের যে সমস্ত কর্মীরা একত্রিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে নানাপ্রকার রাজনৈতিক চিন্তা এলেও মুসলিম লীগ থেকে সরাসরি বিচ্ছিন্ন হওয়ার ইচ্ছা তাঁদের অধিকাংশের মধ্যেই ছিলো না। তাঁরা প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিম লীগকে নোতুনভাবে সংগঠিত করে তার মধ্যেই নিজেদের শক্তিকে সংহত করতে চেয়েছিলেন। এ জন্যেই শামসুল হক এবং শেখ মুজিবর রহমান ওয়ার্কার্স ক্যাম্প নামে অভিহিত মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলন আহ্বান করে রশিদ বই দেওয়ার জন্যে আকরাম খানের উপর চাপ প্রয়োগের চেষ্টা করেছিলেন। আকরাম খান কিন্তু ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের কর্মীদেরকে লীগবিরোধী রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যা দিয়ে তাদেরকে রশিদ বই দিতে অস্বীকার করেন।

ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের কর্মীদের প্রতি আকরাম খানের এই আচরণই প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিম লীগের বিপর্যয়ের অন্যতম প্রধান কারণ। ক্ষুদ্র উপদলীয় ও ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে সাংগঠনিক সমস্যাকে বিচার করলে তিনি সহজেই উপলব্ধি করতেন যে ১৫০ নম্বর মোগলটুলীকে ঘিরে যে কর্মী গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছিলো তারাই ছিলো মুসলিম লীগের সত্যিকার সম্পদ, তিনি যাদেরকে

নিয়ে নোতুনভাবে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ গঠন করতে চলেছিলেন তারা নয়। আবুল হাসিমের ভয়ে সন্ত্রস্থ আকরাম খান কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখেছিলেন যে পূর্বোক্ত কর্মীদেরকে সাংগঠনিক কাজকর্মের সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগ দিলে তারা পরিশেষে তাঁর নেতৃত্বের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে। এই চিন্তা থেকেই তিনি তাদেরকে মুসলিম লীগের আওতার বাইরে রাখতে সচেষ্ট হন। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি যুবকর্মীদেরকে পাকিস্তানবিরোধী আখ্যা দিতেও দ্বিধা বোধ করেননি, যদিও পাকিস্তান অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের পরিশ্রম ও অবদান তাঁর থেকে কোনো অংশেই কম ছিলো না।

আকরাম খানের এই নীতি পূর্ব বাঙলা মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী পার্টির দ্বারা পুরোপুরি সমর্থিত হয়েছিলো। কারণ সেখানে নাজিমুদ্দীনের ছিলো সুহরাওয়ার্দী ভীতি। নাজিমুদ্দীন এবং তাঁর উপদলের লোকজনেরা পূর্ব বাঙলায় সুহরাওয়ার্দীর আগমনকে দারুণ বিপজ্জনক মনে করতেন এবং সেজন্যে মোগলটুলীর কর্মীরা যাতে মুসলিম লীগের সাংগঠনিক কাজকর্মের সাথে যুক্ত হতে না পারে সেদিকেও তাঁদের লক্ষ্য কম ছিলো না।

মুসলিম লীগের সাংগঠনিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে এই অবস্থা সৃষ্টির ফলে বলিষ্ঠ কর্মীর অভাবে তার সম্প্রসারণ ও শক্তিবৃদ্ধি তো হয়ইনি উপরন্তু সমগ্র প্রতিষ্ঠানটিই ধীরে ধীরে পার্লামেণ্টারী পার্টির লেজুড়ে পরিণত হয়েছিলো। এই লেজুড়-বৃত্তি ১৯৪৯-এর এপ্রিল মাসে টাঙ্গাইল উপনির্বাচনের সময় মুসলিম লীগের পক্ষে এক দারুণ বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে।

১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত মোগলটুলীর অফিসকে কেন্দ্র করে মুসলিম লীগের যুব কর্মীরা মোটামুটিভাবে একত্রিত থাকেন। এই সময়ে তাঁরা অবশ্য একটি নোতুন সংগঠনের জন্যে নানা প্রকার উদ্যোগ গ্রহণ ও চিন্তা ভাবনা উপেক্ষা করেননি। নোতুন সংগঠনটি সাম্প্রদায়িক হবে, না অসাম্প্রদায়িক; তার রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচী কি হবে; ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁরা কিভাবে অগ্রসর হবেন; পার্লামেণ্টারী পার্টির সুহরাওয়ার্দী-সমর্থক উপদলের স্বার্থে কতখানি যোগাযোগ রাখা সঙ্গত হবে; এই সব বিষয়ে তাঁরা নিজেদের বৈঠকে প্রায়ই আলোচনা করতেন। এই বৈঠকগুলি মোগলটুলী ছাড়াও অধিকাংশ সময় কমরুদ্দীন আহমদের জিন্দাবাহার লেনস্থ বাসা এবং চাষাঢ়া-নারায়ণগঞ্জের খান সাহেব ওসমান আলীর বাসায় অনুষ্ঠিত হতো। এই বৈঠকগুলির সাথে কমরুদ্দীন আহমদ, তাজউদ্দীন আহমদ, মহম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, শামসুজ্জোহা, আলমাস,

আউয়াল প্রভৃতি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন।[১]

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে মোগলটুলীতে একত্রিত কর্মীরা ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাজনীতির বিভিন্ন খাতে নিজের কাজকর্মকে পরিচালনা করলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে পরবর্তীকালে সামগ্রিকভাবে তাঁরা পূর্ব বাঙলার রাজনীতির উপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হন।

৩॥ টাঙ্গাইল উপনির্বাচন

ভাসানীর মৌলানা আবদুল হামিদ খান পূর্ব বাঙলায় আসার পর ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল দক্ষিণ (মুসলিম) কেন্দ্র থেকে পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। নির্বাচনের পর করোটিয়ার জমিদার খুররম খান পন্নী ভাসানীর নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা করার জন্যে আবেদন জানান। সেই আবেদনের ভিত্তিতে প্রাদেশিক গভর্নর উপরোক্ত নির্বাচন বাতিল করে দেন। তা ছাড়া নির্বাচনে ব্যয়ের হিসাবে দাখিল না করার অপরাধে মৌলানা ভাসানী, খুররম খান পন্নী প্রভৃতি চারজন ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কোনো নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না এই মর্মে তাঁদের উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞাও জারী করা হয়।[১]

১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইল দক্ষিণ (মুসলিম) কেন্দ্রে প্রাদেশিক সরকার নোতুন করে আবার নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। এই খবর শোনার পর ১৫০ মোগলটুলীতে মোস্তাক আহমদ, শওকত আলী, শামসুল হক, কমরুদ্দীন আহমদ, নবাবজাদা হাসান আলী প্রভৃতি মিলে শামসুল হককে মুসলিম লীগের বিরোধী প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করানোর সিদ্ধান্ত নেন। এর পর অন্যান্য সকলেই মোটামুটিভাবে এ ব্যাপারে একমত হন কিন্তু তবু নির্বাচনের ব্যাপারে সাবধান হওয়ার জন্যে নারায়ণগঞ্জের ওসমান আলীর বাসায় এক বৈঠকে শওকত আলী, শামসুজ্জোহা, প্রভৃতি ১৫০ নম্বরের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা স্থির করেন যে মুসলিম লীগ যদি শামসুল হককে মনোনয়ন দেয় তাহলে তাঁরা তাঁকে সমর্থন তো করবেনই না উপরন্তু অন্য একজনকে তাঁর পরিবর্তে দাঁড় করিয়ে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধাচরণ করবেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য শামসুল হকই মুসলিম লীগ বিরোধী প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এবং প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি মনোনয়ন দেন খুররম খান পন্নীকে।[২]

কিন্তু ইতিপূর্বে প্রাদেশিক সরকারের জারীকৃত নিষেধাজ্ঞা অনুসারে ১৯৫০ সালের পূর্বে আইনতঃ কোনো কেন্দ্রেই নির্বাচন প্রার্থনার অধিকার খুররম খানের ছিলো না। এই অসুবিধা দূর করার জন্যে গভর্নর বিশেষ ক্ষমতা বলে কেবলমাত্র মুসলিম লীগ প্রার্থী খুররম খানের বিরুদ্ধে নির্বাচন সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞাটি প্রত্যাহার করেন। ভাসানী এবং অপর দুইজনের বিরুদ্ধে সে নিষেধাজ্ঞা অবশ্য পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বলবৎ থাকে।[৩]

নূরুল আমীন সরকারের এই চরম অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং নির্লজ্জ দলীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে সমগ্র প্রদেশে কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়। মুসলিম লীগ নেতৃত্ব এবং প্রতিষ্ঠানটি সামগ্রিক চরিত্রও এই অদৃষ্টপূর্ব সরকারী সিদ্ধান্তের ফলে জনসাধারণের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়। এই প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক নওবেলাল 'একটি দৃষ্টান্ত' নামে এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে[৪] বলেন :

> মুসলিম লীগ গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই জনসাধারণ জানিত এবং সেই জন্য তাহাদের সমর্থনও দান করিয়াছেন। কিন্তু মুসলিম লীগের বর্তমান অগণতন্ত্রী নীতির ফলে জনসাধারণ যদি তাহাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে, তাহা হইলে দায়িত্ব কাহার হইবে? জনসাধারণের—না দলীয় স্বার্থে যাহারা গণতন্ত্রের ন্যায়নীতিকে জলাঞ্জলি দিয়া ফ্যাসিস্ট নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাদের?
>
> এই প্রশ্নের জবাবের ভার আমরা গণতন্ত্রে দৃঢ়বিশ্বাসী পূর্ব পাকিস্তানের কোটি কোটি জনগণের উপর ছাড়িয়া দিতেছি।
>
> দেশের সত্যিকারের কোনো উন্নতিমূলক পরিকল্পনা সামনে লইয়া যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আগাইয়া যায় না তাহার পক্ষে এইরূপ ফ্যাসিস্ট নীতি অবলম্বন করা ছাড়া কি উপায় আছে? পাকিস্তান লাভের পর মুসলিম লীগের কর্তব্য ছিল জনগণের সত্যিকারের প্রতিনিধি হিসাবে সদ্য জাগ্রত এক জাতির সামনে রাষ্ট্রগঠনমূলক পরিকল্পনা লইয়া আগাইয়া আসা। কিন্তু মুসলিম লীগ সে কর্তব্য মোটেই পালন করে নাই। বরং দলীয়, উপদলীয় স্বার্থ নিয়া কোন্দল করিতেই রত রহিয়াছে। এমতাবস্থায় জনসাধারণ যদি মুসলিম লীগের প্রতি আস্থা হারাইয়া ফেলে তাহা হইলে কাহাকে দায়ী করা যাইবে?

টাঙ্গাইল উপ-নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থী খুরম খানের বিরুদ্ধে শামসুল হক স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা ঘোষণা করেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত মুসলিম লীগ সরকারের বিরোধী মহলে সন্তোষজনক প্রতিক্রিয়ার

সৃষ্টি করে এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই শামসুল হককে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। এ ব্যাপারে ১৫০ নম্বর মোগলটুলীর 'পার্টি হাউস'কে কেন্দ্র করে যে কর্মীদল তখনো পর্যন্ত মোটামুটি একত্রিত ছিলেন তাঁরাই সব থেকে সংগঠিত এবং ব্যাপকভাবে শামসুল হকের পক্ষে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। মোস্তাক আহমদই ছিলেন এই নির্বাচনের মূল সংগঠক। তা ছাড়া অন্যান্য যাঁরা এক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নেন তাঁদের মধ্যে কমরুদ্দীন আহমদ, নারায়ণগঞ্জের শামসুজ্জোহা, মহম্মদ আলমাস, মহম্মদ আউয়াল এবং শওকত আলী, আজিজ আহমদ, হজরত আলী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।[৫]

নির্বাচনী সংগ্রাম পরিচালনার জন্যে বিরোধী পক্ষের অর্থাভাব বেশ কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি করে। আলমাস নারায়ণগঞ্জ এলাকা থেকে ৫০০ টাকা তোলেন। তা ছাড়া চেম্বার অব কমার্সের সাখাওয়াৎ হোসেন ৫০ টাকা, আতাউর রহমান খান ৫০ টাকা, কাদের সর্দার ১৫০ টাকা দেন। অন্যান্যদের থেকে আরও কিছু টাকা নিয়ে সর্বসাকুল্যে নির্বাচনের জন্যে কর্মীরা প্রায় ১০০০ টাকা তুলতে সমর্থ হন।[৬] মুসলিম লীগের বিপুল অর্থ-সামর্থ্যের তুলনায় শামসুল হকের এই অবস্থা রীতিমতো আশঙ্কাজনক ছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও অর্থাভাব নির্বাচনের ক্ষেত্রে তেমন কোনো প্রতিবন্ধকতাই সৃষ্টি করতে পারেনি।[৭]

স্থানীয় স্কুল এবং করোটিয়া কলেজের বহুসংখ্যক ছাত্র শামসুল হকের নির্বাচনী সংগ্রামে খুব মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তারা অর্ধভুক্ত অবস্থায় এবং পায়ে হেঁটে নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন কেন্দ্রে ব্যাপক সরকার বিরোধী প্রচারণা চালায় এবং সরকারী সভা-সমিতিতে দলে দলে উপস্থিত হয়ে সেগুলিকে বিরোধীদলের সভায় পরিণত করে। এই ধরনের তিন-চারটি সভায় প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে শামসুল হকও সরকারকে বিভিন্ন বিষয়ে চ্যালেঞ্জ দেন এবং তাঁদের গণবিরোধী নীতি-সমূহের তীব্র সমালোচনার দ্বারা সেখানে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠান ও সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি করেন।[৮]

নির্বাচনকালে খুররম খানের স্ত্রী তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে শামসুল হকের পক্ষে প্রচারণায় অংশ গ্রহণের জন্যে বিরোধীদলের কাছে প্রস্তাব পাঠান। কিন্তু তাঁরা তাঁর সেই প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানোর পর বেগম পন্নী নিজেই একটি ইস্তাহার প্রচার করে তাতে তাঁর স্বামীর ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করেন ও ভোটারদেরকে খুররম পন্নীর পক্ষে ভোট না দেওয়ার জন্যে আবেদন জানান।[৯]

এই নির্বাচনের সময় পূর্ব পাকিস্তানের মুসলীম লীগ সভাপতি মৌলানা আকরাম খান, সম্পাদক ইউসুফ আলী চৌধুরী এবং প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন ভোটারদের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত আবেদন[১০] প্রচার করেন :

লাখো মোজাহেদের ত্যাগ ও কোরবাণীর ফলে আমরা পাকিস্তান লাভ করিয়াছি। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মোসলেম রাষ্ট্র আমাদের পাকিস্তান। পাকিস্তানের গঠনতন্ত্র আইনকানুন তৈরী হইতেছে ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক। এই নূতন রাষ্ট্রের শিশু অবস্থায় একে কত বিপদ—কত মছিবতের সম্মুখীন হইতে হইতেছে। কত জানী দুষমন শৈশবেই ইহাকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। ভারতের দশকোটি মুসলমান মোসলেম লীগের ঝাণ্ডার নীচে একযোগে কাজ করিয়াছিল বলিয়াই আমরা পাকিস্তান হাসিল করিতে পারিয়াছিলাম। পাকিস্তান হাসিলের জন্য মোসলেম সংহতি ও মোসলেম লীগের যতখানি দরকার ছিল আজ পাকিস্তানকে গড়িয়া তুলিবার দরকার তার চেয়েও বেশী। কায়েদে আজম বারে বারে বলিয়াছেন—পাকিস্তানকে মজবুত করিতে হইলে মোসলেম লীগকে মজবুত করিতে হইবে। এন্তেকালের কিছু দিন আগে তিনি ঢাকায় বক্তৃতায় ও মোসলেম লীগের দুষমনদের সম্বন্ধে আপনাদের সতর্ক করিয়াছেন, এবং মোসলেম লীগকে শক্তিশালী করিবার জন্য আকুল আহ্বান জানাইয়াছেন।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ইছলামী শরিয়ত মোতাবেক যে আইনকানুন তৈরী করিতেছেন, তা চালু করিতে হইলে প্রাদেশিক আইন সভারও মুসলমান সদস্যদিগকে একদিন একমত হইয়া মোসলেম লীগের ভিতর থাকিয়া কাজ করিতে হইবে। আপনারা জানেন দক্ষিণ টাঙ্গাইল হইতে আগামী ২৬শে এপ্রিল পূর্ব বঙ্গ আইন সভার উপ-নির্বাচন হইবে। এইবার এই আসনের জন্য মোসলেম লীগের তরফ হইতে নমিনেশন পাইয়াছেন করোটিয়ার স্বনামধন্য চাঁদ মিয়া সাহেবের নাতি খুররম খাঁ পন্নি। পাকিস্তান রাষ্ট্রকে রক্ষা করিলে হইলে—মজবুত করিতে হইলে—আপনাদের কর্তব্য হইবে এক বাক্যে মোসলেম লীগের সাইকেল মার্কা বাক্সে ভোট দেওয়ার। মোসলেম লীগে ও মোসলেম জামাতে ভাঙ্গন ধরাইবার জন্যে পাকিস্তান লাভের আগে যেমন চেষ্টা হইয়াছে এখনও সেই রকম চেষ্টা হইতেছে। বন্ধুর বেশে আসিয়া অনেকে মোসলেম লীগের ও মোসলেম লীগ প্রার্থীর বিরুদ্ধে অনেক কিছুই বলিবে। আপনি যদি মোসলেম রাষ্ট্রকে মজবুত দেখিতে চান দুনিয়ায় পাকিস্তানের ও মোসলেম জাতির ঝাণ্ডা চলন্ত হোক এ যদি আপনার

কামনা হয় আপনি নিশ্চয়ই লীগ প্রার্থী খুররম খাঁ পন্নির জন্য মোসলেম লীগের সাইকেল মার্কা বাক্সে ভোট দিবেন। মনে রাখবেন এ ভোট মোসলেম লীগ ও পাকিস্তান দৃঢ় করিবার জন্য। আশা করি অন্য বারের ন্যায় এবারও আপনারা মোসলেম লীগকে সমর্থন করিয়া মোসলেম জমাত কায়েদে আজম ও পাকিস্তানের মর্যাদা রক্ষা করিবেন।

'টাঙ্গাইল উপ-নির্বাচন' নামে একটি সম্পাদকীয়তে[১১] দৈনিক আজাদ নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেন :

দুইজন প্রার্থী বর্তমানে এই আসনের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই দুইজনের মধ্যে জনাব খুররম খান পন্নী সাহেব লীগের মনোনয়ন লাভ করিয়াছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জনাব শামসুল হক সাহেব দুই বৎসর আগে তদানীন্তন প্রাদেশিক লীগ সেক্রেটারী জনাব আবুল হাশেমের অনুবর্তী হিসাবে লীগের প্রচার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। আশা করা গিয়াছিল যে, লীগ কর্মী হিসাবে শেষোক্ত প্রার্থী জনাব শামসুল হক সাহেব লীগ মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থী জনাব খুররম খান পন্নীর অনুকূলে নির্বাচন-দ্বন্দ্ব হইতে সরিয়া দাঁড়াইবেন। কিন্তু তাহা হয় নাই। তিনি লীগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন এবং লীগ মনোনয়ন অগ্রাহ্য করিয়া লীগের প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াইয়াছেন।

এটি খুবই দুঃখজনক ব্যাপার, সন্দেহ নাই। লীগের নিয়ম-শৃঙ্খলা লীগ কর্মী বলিয়া পরিচিত এক ব্যক্তি ভাঙ্গিবেন, পূর্ব পাকিস্তানের সত্যকার লীগারদের কাছে তাহা এতদিন অভাবনীয় ব্যাপারই ছিল...

শৃঙ্খলা ভঙ্গের যে অভিযোগ সম্পাদকীয়টিতে করা হয়েছে সে অভিযোগ বস্তুতঃ প্রযোজ্য ছিলো সংবাদপত্রটির মালিক এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি মৌলানা আকরাম খান এবং মুসলিম লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের ক্ষেত্রে। তাঁরাই মুসলিম লীগকে কুক্ষিগত করে তাঁদের উপদলের বাইরের কোনো কর্মী অথবা নেতা যাতে প্রতিষ্ঠানে ঠাঁই পেতে না পারেন তার জন্যে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁদের এ ধরনের নানা কীর্তি-কলাপের পর মুসলিম লীগের প্রতি আস্থার অভাব ছিলো খুবই যুক্তিসঙ্গত ও স্বাভাবিক। সে সম্পর্কে কোনো কিছু উল্লেখ না করে আজাদের উক্ত সম্পাদকীয়টিতে ভোটারদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে আবার বলা হয় :

আমরা অবশ্য শামসুল হক সাহেবের এই লীগ-বিদ্রোহিতায় বিস্মিত হই নাই। তিনি আগেও যত না ছিলেন সত্যকার লীগমনা কর্মী তার চাইতে

বেশী ছিলেন আবুল হাশেম সাহেবের অন্ধভক্ত-শিষ্য। জনাব আবুল হাশেমের হটকারিতাপূর্ণ কীর্তি-কলাপের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের, বিশেষ করিয়া লীগারদের পরিচয় যথেষ্টই আছে, কাজেই সে সম্পর্কে এখানে পুনরালোচনা অনাবশ্যক। সেই আবুল হাশেম সাহেবের অন্ধভক্ত-শিষ্য হটকারিতার বশবর্তী হইয়া লীগ-নির্দেশ অমান্য করিয়া বসিবেন, তাতে বিস্ময়ের বিষয় আর কি থাকিতে পারে।

টাঙ্গাইলের ভোটারদের কাছে আমাদের আরজ: এখনো পূর্ব-পাকিস্তান সর্বাংশে বিপদমুক্ত হয় নাই, এখনো বাহিরের শক্রদল পাকিস্তানের নাম-নিশানা মুছিয়া ফেলার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পাতিয়া আছে এবং পাকিস্তানপন্থীদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ ও ভাঙ্গন সৃষ্টির মধ্য দিয়াই যে সে সুযোগ আসিবে, ইহারা তাহা জানে। কাজেই আমরা ভোটারদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করি: সাধু সাবধান।

নির্বাচনে শামসুল হক বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন। কিন্তু আজাদে এই জয়কে 'অল্প সংখ্যক ভোটে' বলিয়া অভিহিত করার চেষ্টা হয়। সংবাদপত্রটির সেই একই সংখ্যায় আবার একথাও বলা হয় যে 'ভোটের সঠিক সংখ্যা এখনও জানা যায় নাই।'[১২]

নির্বাচন শেষ হওয়ার ঠিক পরই একটি ঘটনায় মোহন মিঞা, শাহ আজিজুর রহমান, সোলায়মান ও আলাউদ্দীনের সাথে জড়িত হয়ে পড়ার জন্যে শামসুল হক, মোস্তাক আহম্মদ এবং টাঙ্গাইলের একজন স্থানীয় ব্যক্তি বদিউজ্জামানকে গ্রেফতার করা হয়। যে যুবক পুলিশ অফিসারটি তাঁদেরকে গ্রেফতার করেন তিনি জানান যে তাঁদের জামিনে মুক্তি লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। কারণ তাঁদেরকে যাতে জামিন না দেওয়া হয় সেই মর্মে ঢাকা থেকে নির্দেশ এসেছে। এই খবর দেওয়ার সাথে তিনি শামসুল হক ও মোস্তাক আহম্মদকে উপদেশ দেন মোহন মিঞা, শাহ আজিজুর রহমান এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের বিরুদ্ধে পাল্টা মামলা দায়ের করতে।[১৩]

সেই অনুসারে অগ্রসর হয়ে শামসুল হক পক্ষ পাল্টা মামলা দায়ের করার পরে সেই পুলিশ অফিসারটি মহকুমা হাকিম খুরশিদ আলমের বাসায় উপস্থিত হন। সেখানে তখন মোহন মিঞা এবং অন্যান্যরা অতিথি হিসাবে অবস্থান করছিলেন। মহকুমা হাকিমকে পুলিশ অফিসারটি পাল্টা মামলার কথা জানান এবং মোহন মিঞাদেরকে ঐ একই কারণে গ্রেফতার করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। এর উত্তরে মহকুমা হাকিম মোহন মিঞাদেরকে

জামিন দিতে নির্দেশ দিলে পুলিশ অফিসারটি তাঁকে জানান যে অন্যদেরকে একই ধরনের মামলায় জামিন না দেওয়ার নির্দেশ আছে কাজেই সেই নির্দেশ প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত অন্যদেরকে জামিন দেওয়া সম্ভব হবে না। এর পর অন্য উপায় না দেখে মহকুমা হাকিম সকলকেই জামিন দেওয়ার নির্দেশ দেন। সেই মামলা কয়েক বছর ধরে চলে এবং শেষ পর্যন্ত দুই পক্ষের একটা আপোষের মাধ্যমে মামলাটির নিষ্পত্তি হয়।[১৪]

নির্বাচনে জয় লাভের পর ৮ই মে শামসুল হক ঢাকা পৌঁছাবেন এই সংবাদ পাওয়ার পর শওকত আলী, কমরুদ্দীন আহমদ, আতাউর রহমান খান, আলী আমজাদ খান প্রভৃতি সকলে মিলে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানোর ব্যাপারে উদ্যোগী হন। কিন্তু কাদের সর্দার তাতে সম্মত না হয়ে আতাউর রহমানকে বলেন যে ঢাকাতে সে রকম কোনো অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। যা করতে হয় টাঙ্গাইলেই করা উচিত। একথা শুনে আতাউর রহমান স্থির করেন যে বেশী হাঙ্গামা না করে তাঁরা কয়েকজন স্টেশনে গিয়ে শামসুল হককে নিয়ে আসবেন।

এই সময় মুসলিম লীগের গুণ্ডারাও মাজেদ সর্দারের নেতৃত্বে শামসুল হকের সম্বর্ধনার চেষ্টা করবে এই মর্মে তাঁদেরকে শাসাতে থাকে। এই সংবাদ পেয়ে শওকত আলী, কমরুদ্দীন আহমদ, আতাউর রহমান প্রভৃতি ক্যাপ্টেন শাহজাহানের বাড়িতে উপস্থিত হন এবং উপরোক্ত পরিস্থিতির মোকাবেলার উপায় সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করেন। এই আলোচনা চলাকালে লতিফুর রহমান নামে একজন এ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন শাহজাহানের বাড়িতে তাঁর সাথে দেখা করতে যান। ক্যাপ্টেন শাহজাহানের সাথে লতিফুর রহমানের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিলো। তিনি সবকিছু শোনার পর তাঁদেরকে এই মর্মে আশ্বাস দেন যে মাজেদ সর্দার তাঁর অধীনে ঠিকাদারী করেন, কাজেই তিনি তাঁকে ধমক দিয়ে এই সব গুণ্ডামীর মধ্যে না যাওয়ার জন্যে বলে দেবেন। লুতিফর রহমান তাঁর কথা রেখেছিলেন এবং তাঁর নির্দেশমতো মাজেদ সর্দার শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনোপ্রকার গণ্ডগোল সৃষ্টি থেকে বিরত হন। শুধু তাই নয় মাজেদ সর্দার স্বীকারও করেন যে তাঁকে টাকা দিয়ে গণ্ডগোল সৃষ্টির জন্যে বলা হয়েছিলো।

এর পর শামসুল হকের সম্বর্ধনার জন্যে যথারীতি সব ব্যবস্থা করা হয়। রেলওয়ে স্টেশন থেকে মিছিল সহকারে তাঁকে নবাবপুর রোড দিয়ে নিয়ে গিয়ে ভিক্টোরিয়া পার্কে সকলে সমবেত হওয়ার পর সেখানে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।[১৫]

টাঙ্গাইল নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর দৈনিক আজাদ আবার

একটি সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এই সম্পাদকীয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর মধ্যে শুধু যে মুসলিম লীগ সমর্থক একটি পত্রিকার মতামতই ব্যক্ত হয় তা নয়, প্রাদেশিক মুসলিম লীগ প্রাদেশিক সরকারের অন্তর্দ্বন্দ্বও তাতে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। 'টাঙ্গাইলের উপনির্বাচন' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়টিতে[১৬] বলা হয়:

> টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে লীগ মনোনীত প্রার্থী হারিয়া গিয়াছেন। ইহা মোসলেম লীগ নির্বাচনের ইতিহাসে এক অভিনব এবং অভাবিতপূর্ব ব্যাপার। কোনো সাধারণ নির্বাচনের সময় যদি কোনো একজন লীগ প্রার্থীর পরাজয় ঘটে, তবে তাকে এতখানি গুরুত্ব না দিলেও চলে। কারণ, তখন লীগের নির্বাচন জয়ের প্রচেষ্টা একই সঙ্গে বহুদিকে ছড়াইয়া দিতে হয়। কিন্তু একটা উপনির্বাচনের পরাজয়ের সময় একই ধরনের কৈফিয়ত দিয়া অব্যাহতি লাভ করা যায় না। তার পর বিভক্ত ও অবিভক্ত বাঙলার লীগের ইতিহাসে কোনো পরিষদীয় উপনির্বাচনে লীগ প্রার্থীর আর কোনো দিন পরাজয় ঘটে নাই। জাতির আশা আকাঙ্খার প্রতীক এবং জাতির এক মাত্র বলিয়া বহুকীর্তিত লীগের ভাগ্যে এই কলঙ্ক স্পর্শ অত্যন্ত শোচনীয় ঘটনা। এক হিসেবে একে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম প্রধান মর্মান্তিক ব্যাপার বলিয়া চিরকাল বেদনা এবং ক্ষোভের সাথে দেশের মানুষ স্মরণ করিবে।
>
> কিন্তু প্রশ্ন জাগে, কেন এইরূপ ঘটনা ঘটিল। পূর্ব বাঙলার লীগের বহু কষ্টে অর্জিত গৌরব আজ কেন এইভাবে কলঙ্কমলিন হইল? এ প্রশ্ন আজ পূর্ব পাকিস্তানের কল্যাণকামী মানুষ মাত্রেই জিজ্ঞাসা না করিয়া পারেন না। আমাদের মনে হয় এ প্রশ্নের সদুত্তর পাইতে হইলে বহুদূরে যাইবার কোনো দরকার নেই। একটু তলাইয়া দেখিলেই, একটা সত্য সকলের নিকট পরিষ্কার হইয়া যাইবে যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর লীগের জীবন ও কার্যে এরূপ কতকগুলি ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, যার ফলে লীগ তাহার জনপ্রিয়তা এবং আবেদনের অনিবার্যতা অনেকখানি হারাইয়া ফেলিয়াছে। পাকিস্তান আনিতে হইবে—লীগের সে অতীত আবেদন আজও আর নাই, যদিও পাকিস্তান রক্ষা করিতে হইবে—এ আবেদন আজও অর্থপূর্ণ। কায়েদে আজমের অতুলনীয় নেতৃত্ব আজ আর নাই; যদিও কায়েদে আজমের অসমাপ্ত কাজের ভার তাঁর অনামধন্য অনুসারী নেতাদের স্কন্ধে পড়িয়াছে—পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত এবং

কায়েদে আজম পরলোকগত হওয়ার পর পাকিস্তানকে রক্ষার ও জনগণের ইচ্ছাকে অভিব্যক্তি দেওয়ার দায়িত্ব আজও লীগের: তবু সে দায়িত্ব আজ যথাযথ পালিত হইতেছে না। লীগের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এবং লীগ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের বিভিন্ন সরকারের ক্ষমতার লোভে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে, যাতে লীগের কার্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং গলদ দেখা দিতেছে। জনগণের মোকাবেলা করে বিশেষভাবে আজ লীগ, কিন্তু সর্বব্যাপী ক্ষমতা পরিচালনা করে সরকার। সরকারের প্রভাব লীগের কার্য-কলাপকে আজ সর্বত্র প্রভাবান্বিত করিতেছে—যায় উপনির্বাচনের প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে। ফলে নিজেদের বিশেষ ত্রুটি ও বিচ্যুতিরই নয়, সরকারী কাজের পাপের বোঝাও লীগকে সমানভাবে বহন করিতে হইতেছে। মোসলেম লীগ আজ সর্বত্র সরকারী ইচ্ছা ও অনিচ্ছার বাহন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, জনগণের ইচ্ছা অনিচ্ছার লীগ আর বাহন নয়। এরই দরুন লীগ আজ জনপ্রিয়তা হারাইতে বসিয়াছে। যেদিন হইতে লীগ সরকারী ইচ্ছার প্রতিচ্ছবিতে পরিণত হইয়াছে সেদিন হইতে তার কার্যকলাপে যথেচ্ছাচার ও দোষ ত্রুটি নানাদিক হইতে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। টাঙ্গাইলে লীগ প্রার্থী মনোনয়নেও ইহা লক্ষিত হইয়াছিল। জনমতের মুখ না চাহিয়া সরকারী মহলের ইচ্ছার জয়ই এক্ষেত্রে হইয়াছিল। আমরা কিছুদিন আগে টাঙ্গাইলে লীগের জয়ই কামনা করিয়াছিলাম—কিন্তু মনোনয়নের ব্যাপারে যে প্রকাণ্ড ভুল হইয়াছিল, তা আজ না বলিয়া উপায় নাই। বেশ বুঝা গেল, বহুদিন হইতে বহু ব্যাপারে অনাচার চরমে উঠিয়াছিল এবং তাহাই জনসাধারণের ধৈর্যের বাঁধ ছিঁড়িয়া দিয়াছে। এ সত্যই টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনের ভিতর দিয়া ঘোষিত হইল। টাঙ্গাইলের এই পরাজয় লীগের পরাজয় নিশ্চয়ই; কিন্তু ইহা এক হিসাবে সরকারের উপর অনাস্থা। নির্বাচনী প্রচার কার্যে পাঁচজন মন্ত্রীর উপস্থিতিও তার ফলাফলকে প্রভাবান্বিতও করিতে পারিল না—ঘটনার ইঙ্গিত আজ সকলকে গভীর-ভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। টাঙ্গাইলের পরাজয়কে এক প্রকাণ্ড বিপদ সংকেত বলিয়া সকলকে আজ গ্রহণ করিতে হইবে। লীগের বিরুদ্ধে উত্তোলিত বিদ্রোহের পতাকা একদিন সমগ্র পাকিস্তানকে আচ্ছন্ন করিবে কিনা, লীগ এবং পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন ও বিধ্বস্ত হইবে কি না, একথাও হয়ত এখন হইতেই চিন্তা করিতে হইবে। শুধু চিন্তা নয়, আজ ইহা সকল লীগপন্থীকে চক্ষুন্মিলনের সাহায্য করুক—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

আমাদের পাপ কোথায়, গলদ কোন্খানে তারই ক্ষমাহীন সন্ধান ও কঠোর প্রতিকারের সঙ্কল্প আজ প্রত্যেক লীগন্থীকে গ্রহণ করিতে হইবে। বাঁচা-মরার সঙ্কট-সঙ্কেত যদি আজ ইহা হইতে গ্রহণ করিতে না পারে তবে আমাদের বিপর্যয়কে কেউ ঠেকাইতে পরিবে না। লীগকে সকল দুর্বলতা, সকল প্রভাব এবং পতন স্খলনের হাত হইতে মুক্তি দানের অনিবার ইচ্ছা আজ জাতির মনে জাগিয়া উঠুক। লীগ পুনরায় হোক সত্যিকারের জনগণের প্রতিষ্ঠান এবং লীগ আজ আবার পরিচালনা করুক সরকারকে। লীগের ভিতর আবার শিখার মতো জ্বলিয়া উঠুক জাতির ইচ্ছাশক্তি। এবং তারই সাথে পূর্ব মহিমায় লীগের প্রতিষ্ঠা হোক জনগণের মনে।

আজাদের উপরোদ্ধৃত সম্পাদকীয়টিতে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ সভাপতি আকরাম খানকে বাঁচিয়ে শুধুমাত্র প্রাদেশিক সরকারের উপর দোষারোপ করা হয়। সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে টাঙ্গাইল উপনির্বাচনের উপর একটি প্রবন্ধে ৬ই মে, ১৯৪৯, সাপ্তাহিক 'সৈনিক' নিম্নলিখিত মন্তব্য করে :

টাঙ্গাইলের সবচেয়ে জাঁদরেল প্রভাবশালী জমিদার, যাঁর পূর্ব পুরুষ কলেজ ও অন্যান্য মহান প্রতিষ্ঠান করেছেন—তাঁকে সামান্য একজন নিঃস্ব কর্মী পরাজিত করেছেন—সুতরাং জমিদারী বা তালুকদারী শাসন যে চলবে না তা বলাই বাহুল্য। আজাদ বলেছে, এ নির্বাচন সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেছে। আমরা বলি—এ নির্বাচন সভাপতিসহ লীগ নেতাদের প্রতি দৃঢ় অনাস্থা জানিয়েছে। আরও জানিয়েছে—বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদই জনগণ চায়।...শোনা যায় চাটগাঁ উপনির্বাচনে লীগ প্রার্থীর নিশ্চিত পরাজয় হবে জেনেই লীগ কর্তৃপক্ষ নির্বাচন ঘোষণা করছেন না। কিন্তু এভাবে কতদিন আত্ম বা স্বার্থ রক্ষা করা চলবে? টাঙ্গাইল নির্বাচন লোকের চোখ খুলে দিয়েছে। এখন সরকারী প্রার্থীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বা ভোট দিতে কেউ দ্বিধা বা ভয় করবে না। টাঙ্গাইলে মন্ত্রীরাও গিয়েছিলেন সরকারী টাকা খরচ করেই। কিন্তু যে লীগ মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে ছাত্র-কৃষক-মজুরের জিন্দাবাদে সকল স্থান মুখরিত হত, সে মন্ত্রীরাও সেখানে দারুণভাবে অপমানিত, ও অপদস্থ হয়েছেন। শুধু তাই নয় মন্ত্রীদের সব কয়টি সভাই শামসুল হকের মিটিং-এ পরিণত হয়েছে।

নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু শামসুল হককে পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থাপক সভায় আসন গ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি। মৌলানা ভাসানীর মতো তাঁর বিরুদ্ধেও একটি নির্বাচনী মামলা দায়ের করা হয়। প্রাদেশিক সরকার বিচারপতি

আমীনউদ্দীন আহমদ, এনায়েতুর রহমান এবং শহরউদ্দীনকে নিয়ে একটি বিশেষ ট্রাইবুনালের গঠন করেন এবং সেই ট্রাইবুনালের উপর নির্বাচন মামলাটি পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয়। ট্রাইবুনাল তাঁদের প্রথম বৈঠকেই স্থির করেন যে মামলাটির নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচিত প্রতিনিধি শামসুল হক ব্যবস্থাপক সভায় আসন গ্রহণ করতে পারবেন না।[১৭]

একটি নির্বাচনী ইস্তাহারকে ভিত্তি করে টাঙ্গাইল নির্বাচনে শামসুল হকের বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করানো হয়। মৌলানা ভাসানী আসাম থেকে চলে আসার পর ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল মহকুমার কাগমারী গ্রামে বসবাস আরম্ভ করেন এবং টাঙ্গাইল থেকেই পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। সেই নির্বাচন বাতিল হওয়ার পর বন্ধু-বান্ধব ও মুরিদদের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে তিনি আসাম প্রদেশের ধুবড়ী শহরে উপস্থিত হলে আসাম সরকার মার্চ মাসের মাঝামাঝি তাঁকে গ্রেফতার করে। টাঙ্গাইলের দ্বিতীয় উপনির্বাচনের সময় ভাসানী ধুবড়ী জেলে অবস্থান করছিলেন। হজরত আলী নামে শামসুল হক সমর্থক একজন কর্মী সেখানে ভাসানীর সাথে সাক্ষাৎ করে শামসুল হকের সপক্ষে একটি ইস্তাহারে তাঁর স্বাক্ষর নিয়ে আসেন। নির্বাচনী প্রচারণার কাজে ভাসানীর স্বাক্ষরযুক্ত সেই ইস্তাহার বিলির ব্যবস্থা আরম্ভ হলে কমরুদ্দীন আহমদ প্রভৃতি তৎক্ষণাৎ সেগুলি বিলির ব্যবস্থা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে ছাপা ইস্তাহারগুলি নষ্ট করে দেন। কিন্তু তার পূর্বেই বেশ কিছু সংখ্যক ইস্তাহার নির্বাচনী এলাকায় বিলি হয়ে গিয়েছিলো। ইস্তাহারটিতে ভাসানীর স্বাক্ষরের ফ্যাক্সিমিলি পর্যন্ত ব্লক করে দেওয়া হয়েছিলো।[১৮]

ইস্তাহারটির বিলি বন্ধ করার নির্দেশ সত্ত্বেও তার কপি মুসলিম লীগ কর্মী ও সরকার পক্ষীয় লোকদের হস্তগত হয়। এবং নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর এই মর্মে তারা শামসুল হকের নির্বাচন বাতিলের আবেদন করে যে নির্বাচনে তিনি ভাসানীর স্বাক্ষর জাল করে জয়লাভের উদ্দেশ্যে অসৎ পন্থা অবলম্বন করেছেন। তারা আরও বলে যে মৌলানার স্বাক্ষরযুক্ত ইস্তাহার যখন জেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়নি তখন সেই ইস্তাহার যে নিতান্তই জাল সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।[১৯]

এই নির্বাচনী মামলা ১৯৫০ সাল পর্যন্ত চলে এবং শহীদ সুহরাওয়ার্দী ট্রাইবুনালের সামনে শামসুল হকের পক্ষে সেই মামলায় আবির্ভাবের উদ্দেশ্যে ঢাকা আসেন। এই সময় ১৯শে জুলাই, ১৯৫০, প্রাদেশিক সরকারের

নির্দেশে স্বরাষ্ট্র দফতরের সেক্রেটারী তাঁকে জানান যে ঢাকায় অবস্থানকালে তাঁকে নিজের কার্যাবলী ইলেকশান ট্রাইবুনালের ব্যাপারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। ঢাকা শহরের বাইরে তিনি অন্য কোনো জায়গায় যেতে অথবা কোনো জনসভাতে বক্তৃতা দান করতে পারবেন না। ট্রাইবুনালের কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ২৮শে জুলাইয়ের মধ্যে তাঁকে পূর্ব বাঙলা পরিত্যাগ করতে হবে। এবং সরকারের এইসব নির্দেশ অমান্য করলে তাঁকে গ্রেফতারও করা প্রয়োজন হতে পারে। প্রাদেশিক সরকারের এই নির্দেশপত্র পাওয়ার পর সুহরাওয়ার্দী সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের কাছে বলেন যে তিনি পাকিস্তানের উন্নতি ও মঙ্গল কামনা করেন এবং পূর্ব পাকিস্তান সরকার গণতন্ত্রের মূলনীতিকে কেন যে উপেক্ষা করে চলেছেন তার কারণ উপলব্ধি করতে তিনি অক্ষম।[২০]

বৎসরাধিককাল টাঙ্গাইল নির্বাচনী মামলা চলার পর তার রায় বের হয় এবং শামসুল হকের নির্বাচনকে ট্রাইবুনাল বাতিল ঘোষণা করেন।

এই নির্বাচনের পর পাকিস্তান দেশীয় রাজ্য মুসলিম লীগের সভাপতি মনজুর আলম করাচীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে পূর্ব বাঙলার একটি উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থীর পরাজয় খুবই অর্থপূর্ণ। মুসলিম লীগ যে আর সকল মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করে না এই নির্বাচনই তা প্রমাণ করেছে। সাংবাদিক বৈঠকটিতে মনজুর আলম পাকিস্তান গণপরিষদ, প্রাদেশিক আইন সভা ও মুসলিম লীগের নোতুন নির্বাচন দাবী করেন।[২১]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে লীগ প্রার্থীর শোচনীয় পরাজয়ের পর পূর্ব বাঙলার বহু এলাকাতে উপনির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলেও ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে নূরুল আমীন সরকার পরাজয়ের আশঙ্কায় অন্য কোনো এলাকাতেই উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেননি।

৪॥ মুসলিম লীগের আভ্যন্তরীণ সংকট

মুসলিম লীগ সংগঠনকে ব্যক্তিগত ও উপদলীয় স্বার্থে কুক্ষীগত রাখার ফলে তার মধ্যে যে আভ্যন্তরীণ সংকট শুরু হয় টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে ঘটে তার প্রথম বহিঃপ্রকাশ। পুরাতন পরীক্ষিত কর্মী এবং নোতুন উৎসাহী লোকজনের অভাবে মুসলিম লীগ সংগঠনগতভাবে নিতান্ত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সরকারী কীর্তিকলাপের বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে সেই সংকট এক তীব্র

আকার ধারণ করে।

এই অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ আলী চৌধুরী সংবাদপত্র মারফৎ জানান যে ১৮ই এবং ১৯শে জুন বিকেল ৩টায় কার্জন হলে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ কাউন্সিলের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। সেই সভায় আলোচ্য বিষয় হিসাবে উল্লিখিত হয়: (১) গত সভার কার্য বিবরণীর অনুমোদন, (২) সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট, (৩) কাশ্মীরের বর্তমান অবস্থা, (৪) দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা (৫) সংগঠন এবং (৬) বিবিধ। এ ছাড়া কোনো সদস্য যদি কোনো প্রস্তাব উত্থাপন করতে ইচ্ছুক হন তাহলে তাঁকে নিজের প্রস্তাব পরবর্তী ১৫ই জুনের পূর্বে ১৭৬ নং নবাবপুর রোডে কেন্দ্রীয় লীগ অফিসে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে অনুরোধ জানানো হয়।[১]

লীগ কাউন্সিলের এই সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কয়েকদিন পূর্বে প্রাদেশিক সভাপতি আকরাম খান কাউন্সিল এবং ওয়ার্কিং কমিটিতে বিবেচনার জন্যে তাঁর পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন।[২] টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে সরকারী লীগ প্রার্থীর শোচনীয় পরাজয়ের পর আকরাম খানের সংবাদপত্র আজাদ যে সম্পাদকীয় প্রকাশ করেন তার মধ্যেই মুসলিম লীগের আভ্যন্তরীণ সংকটের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাদেশিক সভাপতির পদত্যাগ প্রতিষ্ঠানটির এই সংকটেরই যে অনিবার্য পরিণতি পরবর্তী কাউন্সিল অধিবেশনে তা ভালোভাবে প্রমাণিত হয়।

১৮ই জুন অর্থাৎ কাউন্সিলের অধিবেশন শুরু হওয়ার দিনে দৈনিক আজাদ 'কাউন্সিলের অধিবেশন' শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রকাশ করেন। তাতে প্রথমদিকে সম্মেলনের সাফল্য কামনা এবং 'লীগের দুষমনদের' কার্যকলাপের উপর মন্তব্য প্রকাশের পর সভাপতির পদত্যাগ সম্পর্কে বলা বলা হয়:

> প্রসঙ্গতঃ এখানে জনাব মৌলানা মোহম্মদ আকরাম খাঁ সাহেবের পদত্যাগ-পত্রের কথাও আলোচিত হওয়ার যোগ্য মনে করি। সুদিনে দুদিনে লীগের জন্মদিন হইতে জনাব মৌলানা সাহেব লীগের সাথে যুক্ত আছেন, এবং কখনও সৈনিক হিসাবে এবং কখনও তার অগ্রভাগে দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং তাঁর প্রাদেশিক লীগ সভাপতির পদত্যাগের অর্থ লীগের সাথে তাঁর বিযুক্তি নয় মোটেই। তাঁর সাহায্য সহানুভূতি এবং সেবা হইতে লীগ কখনও বঞ্চিত হইবে না, হইতেও পারে না। তিনি

ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া আজ পদত্যাগের যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাতে লীগের অকল্যাণকর কিছুই তিনি কামনা করেন নাই। হয়ত লীগের অধিকতর কল্যাণের জন্যই তা তিনি করিয়াছেন। তিনি হয়তো মনে করেন সভাপতি হিসাবে লীগের সেবা করার চাইতে লীগের সাথে সাধারণভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তিনি লীগের অধিকতর সেবা করিতে পারিবেন। কাজে কাজেই তাঁর এ সিদ্ধান্তকে আমরা অভিনন্দিতই করিতেছি।

আকরাম খানের পদত্যাগপত্র এবং এবং আজাদের এই সম্পাদকীয় মন্তব্য সত্ত্বেও কাউন্সিলের অধিবেশন এবং তার পরবর্তী পর্যায়ের ঘটনাবলী থেকে শুধু একথাই বিশেষভাবে প্রমাণিত হয় যে আকরাম খান সত্য অর্থে প্রাদেশিক লীগ সভাপতির পদ পরিত্যাগ করতে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। কাউন্সিলের সভায় লীগের সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে তুমুল বাকবিতণ্ডা ও গণ্ডগোলের সম্ভাবনা তিনি পূর্বেই অনুমান করেছিলেন এবং সেই সভায় সভাপতিত্ব করতে গিয়ে সাধারণ সদস্যদের মোকাবেলা করার সাহস তাঁর ছিলো না। এ কারণেই পদত্যাগ পত্র দাখিল করে সেই দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে আবার সভাপতির পদে বহাল হওয়ার ষড়যন্ত্রের মধ্যেও তিনি কোনো ত্রুটি রাখেননি।[৩] বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ইতিহাসে তাঁর এই পদত্যাগপত্র দাখিলের ব্যাপারটি কোনো নোতুন কথা ছিলো না। অবস্থা বুঝে একাধিকবার তিনি সে কাজ করেছিলেন এবং সংকট উত্তীর্ণ হওয়ার পর সভাপতির পদে পুনর্বহালও হয়েছিলেন।

আজাদের পূর্বোক্ত সম্পাদকীয়টির বক্তব্য আকরাম খানের পদত্যাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। মুসলিম লীগের আভ্যন্তরীণ অন্যান্য সংকট সম্পর্কে তাতে বলা হয় :

নূতন করিয়া পাকিস্তানে লীগ গঠিত হইতেছে। কিন্তু গড়িয়া উঠিতে না উঠিতেই লীগের ভিতর ভাঙনও ধরিয়াছে। সীমান্ত, পশ্চিম পাঞ্জাব এবং সিন্ধুর লীগেও নানারূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে, এবং বাহির হইতে দেখিলে পূর্ব পাকিস্তানকে যদিও খুব শান্ত এবং সংহত দেখা যায়, তথাপি এখানেও ভিতরে গোলমাল আছে। ফলে এখানে লীগ ও লীগের গভর্নমেণ্ট জনপ্রিয়তা হারাইতে বসিয়াছে। পরিস্থিতির এই ক্রমবর্ধমান অবনতিকে রোধ করিতে হইবে। একাধিক সাম্প্রতিক ঘটনায় ইহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, আজ আত্মশুদ্ধির নির্মম ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে দেশবাসীর অসন্তোষ ক্রমেই ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর হইয়া উঠিবে এবং পরিণামে

লীগ ও লীগের মন্ত্রিসভার ধ্বংসই হয়তো অনিবার্য হইয়া উঠিবে। আমরা অতীতে একাধিকবার এজন্য লীগ ও মন্ত্রিসভাকে লক্ষ্য করিয়া সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়াছি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের সতর্কবাণীর বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া হয় নাই। যাহোক অতীতের ব্যাপার ঘাঁটাইয়া কোনো লাভ নাই। এবারকার লীগ কাউন্সিল যদি আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করিতে পারেন, তবেই আত্মরক্ষার পথ আবিষ্কার হবে।

প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে ১৮ই জুন ঢাকা উপস্থিত হলে এ. পি. পি.-র প্রতিনিধির সাথে এক সাক্ষাৎকার[৪] প্রসঙ্গে পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি চৌধুরী খালিকুজ্জামান বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মন্তব্য ব্যক্ত করেন। মুসলিম লীগের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি বলেন যে অতীতে তাঁদেরকে বহু বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সে বাধা তাঁরা উত্তীর্ণ হয়েছেন। ভবিষ্যতেও নানা বাধা বিপত্তিকে সেইভাবেই অতিক্রম করতে হবে। যে রাজনৈতিক বিচক্ষণতার বলে মুসলমানরা পাকিস্তান অর্জন করেছে তার দ্বারাই তারা ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের ঐক্য রক্ষা করবে।

টাঙ্গাইলের উপনির্বাচন সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি আসল ব্যাপার সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে গিয়ে বলেন যে, মুসলিম লীগ জনগণের আস্থা হারিয়েছে একথা ঠিক নয়। কেন্দ্রে ও প্রদেশে মুসলীম লীগ সরকারের একদলীয় শাসন অব্যাহত আছে এবং সরকার সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সর্বত্র জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করছেন। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে মুসলমানদের ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য একই এবং এ দুটোকে পৃথক করা চলে না। এ প্রসঙ্গে মুসলীম লীগের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একটি উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন যে জমিদার ও রায়তের মধ্যেকার সম্পর্ক নির্ধারণের জন্যে ইতিপূর্বে মুসলিম লীগ কর্তৃক একটি কৃষি কমিটি নিযুক্ত হয়েছে।

আলোচনার উপসংহারে খালিকুজ্জামান বলেন যে মুসলিম লীগ ও শাসন-যন্ত্রের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্যে এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি নির্ধারণের কাজে মুসলীম লীগের উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণের উদ্দেশ্যে শাসন-যন্ত্রের রাজনৈতিক বিভাগসমূহের সাথে লীগের উপদেষ্টা কমিটিসমূহের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১৮ই জুন, মঙ্গলবার, বিকেল ৩টার সময় কার্জন হলে এক উত্তেজনাময় পরিবেশের মধ্যে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়। সেই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন পূর্ব পাকিস্তান লীগের সহ-সভাপতি

মৌলানা আবদুল্লা ছিল বাকী।[৫] চারশোর বেশী কাউন্সিল সদস্যের মধ্যে প্রায় তিনশো জন সভায় যোগদান করেন।[৬] চৌধুরী খালিকুজ্জামানও সেদিন উপস্থিত ছিলেন।[৭]

সভাস্থলে সাংবাদিকদেরকে প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্যে প্রথম দিকেই গণ্ডগোল শুরু হয়। সাংবাদিকদের প্রতি এই মনোভাবের কারণ সম্পর্কে সাধারণ সদস্যেরা কৈফিয়ৎ দাবী করলে সভাপতি তাঁদের জানান যে প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক সাম্প্রতিক প্রস্তাবানুযায়ী এ জাতীয় সভায় সাংবাদিকদেরকে প্রবেশ না করতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।[৮] সদস্যেরা কিন্তু এই জবাবে সন্তুষ্ট না হয়ে মঞ্চে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ এবং অন্যান্যদের সাথে এক বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হন। এইভাবে কয়েক ঘণ্টা আলোচনার পর সাংবাদিকদেরকে সভাগৃহে প্রবেশ করতে দেওয়ার প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হলে বিপুল ভোটাধিক্যে তা গৃহীত হয়।[৯] প্রস্তাবটির বিপক্ষে ভোট পড়ে মাত্র ১২টি।[১০]

এরপর সাংবাদিকেরা সভাগৃহের ভেতরে প্রবেশ করেন। কিন্তু আসরের নামাজের সময় হওয়ায় সভা কিছুক্ষণের জন্যে মুলতবী থাকে। নামাজের পর আবার কাজ আরম্ভ হলে প্রথমে যুগ্ম-সম্পাদক শাহ মহম্মদ আজিজুর রহমান বিগত অধিবেশনের কার্যবিবরণী পাঠ করেন এবং তা যথারীতি গৃহীত হয়।[১১] এর পর প্রাদেশিক লীগ সম্পাদক ইউসুফ আলী চৌধুরী তাঁর লিখিত রিপোর্ট পেশ করেন।[১২]

রিপোর্টটিতে তিনি বলেন যে লীগ ওয়ার্কিং কমিটি পাকিস্তান থেকে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ব্যবস্থাপক সভার পরবর্তী অধিবেশনেই জমিদারী প্রথা বিলোপ করার জন্যে প্রাদেশিক সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

টাঙ্গাইল উপ-নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয়ের সত্যিকার গুরুত্বকে ঢাকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন যে দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে ৪টি এবং কেন্দ্রীয় গণ-পরিষদের ২টি আসনে উপ-নির্বাচন হয়েছে। তার মধ্যে ৪টিতে লীগ প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। এ ছাড়া গণ-পরিষদের নির্বাচনে লীগ প্রার্থী শহীদ সুহরাওয়ার্দীকে পরাজিত করে জয়লাভ করেছেন বলেও তিনি কাউন্সিলকে জানান।

এর পর টাঙ্গাইলের পরাজয় প্রসঙ্গে কৈফিয়ৎ স্বরূপ তিনি বলেন যে তাঁদের নিজেদের কিছু গাফিলতি, জয়লাভের নিশ্চয়তা এবং প্রতিপক্ষের সুযোগ-সুবিধার

প্রাচুর্যই সেই বিপর্যয়ের কারণ! লীগ সম্পাদকের রিপোর্টে উপনির্বাচনটি সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন সেকথা বলাই বাহুল্য।

ইউসুফ আলি চৌধুরী তাঁর রিপোর্টে এর পর বলেন যে পাকিস্তানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে মুসলিম লীগের পশ্চাতে সকল শক্তি নিয়োগ করে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে মুসলমানদের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর একতা হ্রাস পেয়েছে বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি উপস্থিত কাউন্সিলারদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে মুসলিম লীগই মুসলমানদের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্বাস, ঐক্য ও শৃঙ্খলা হচ্ছে তাঁদের লক্ষ্য।

সাধারণভাবে এসব কথা বলার পর লীগ সম্পাদক কতকগুলি অসুবিধার ব্যাপারে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন এবং তার মধ্যেই মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠান ও সরকারের দ্বন্দ্ব ও আভ্যন্তরীণ সংকটের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়।

সাংগঠনিক অক্ষমতার বিষয় উল্লেখ করতে গিয়ে ইউসুফ আলী চৌধুরী বলেন যে প্রাদেশিক লীগ সম্পাদক হিসাবে নিজের কর্তব্য তিনি সন্তোষজনকভাবে সম্পাদন করেছেন এ দাবী করার ক্ষমতা তাঁর নেই। প্রতি পদক্ষেপে তাঁকে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে বলেও তিনি জানান। সরকারী সহায়তা ছাড়া কোন বাড়িঘর পাওয়া সম্ভব নয় এবং সেই সহযোগিতার অভাবে তাঁর পক্ষে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অফিসঘর পর্যন্ত স্থাপন সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া লীগের তহবিল একেবারে শূন্য বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

এর পর সর্বশেষে তিনি সরাসরিভাবে মুসলিম লীগ ও সরকারের মধ্যে সহযোগিতার অভাব প্রসঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, প্রতিষ্ঠান ও সরকারের মধ্যে সহযোগিতার অভাব সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা চলে না যে সরকার মুসলিম লীগের সৃষ্টি এবং তাকে জনপ্রিয় রাখার দায়িত্ব সরকারকে অবশ্যই পালন করতে হবে।

জনগণ থেকে মুসলিম লীগ ১৯৪৯ সালেই কতখানি বিচ্ছিন্ন প্রাদেশিক লীগ সম্পাদক ইউসুফ আলী চৌধুরী প্রকৃতপক্ষে তাঁর উপরোক্ত রিপোর্টে তারই একটি সঠিক ও সুস্পষ্ট হিসাব দাখিল করেন। এবং এই বিচ্ছিন্নতার চিত্র কউন্সিল অধিবেশনের পরবর্তী পর্যায়ে অধিকতর স্পষ্টভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়।

প্রাদেশিক সম্পাদক তাঁর রিপোর্ট পেশ করার পর বহু সদস্য কর্তৃপক্ষের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করে সেগুলির উত্তর দাবী করেন। সেই সব প্রশ্নের মধ্যে প্রাদেশিক সভাপতি আকরাম খানের পদত্যাগের কারণ,

প্রাদেশিক লীগের গঠনতন্ত্র রচিত না হওয়ার কারণ, টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে মুসলিম লীগের সর্বশক্তি নিয়োজিত না হওয়ার কারণ, মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী বোর্ড গঠিত না হওয়ার কারণ, পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে ড্রাম চালান দেওয়া* সম্বন্ধে ট্রাইবুনাল নিযুক্ত না হওয়ার কারণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[১৩] এ ছাড়া আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন হলো ভাল কাজ করলে কর্মীদেরকে কমিউনিস্ট আখ্যা দেওয়া হয় কেন? লীগ এম. এল. এ.-রা দুর্নীতির আশ্রয় নেয় কেন? ইস্পাত ড্রাম নিয়ে জনৈক মন্ত্রী যে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছেন তার তদন্ত হয় না কেন? টাঙ্গাইলের অযৌক্তিক নমিনেশন দেওয়ার জন্যে দায়ী কে? জেলায়-জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের লীগ সদস্য অপমান করে কেন? বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথা রহিত হয় না কেন?[১৪]

সাধারণ সদস্যবৃন্দের উপরোক্ত প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে লীগ কর্তৃপক্ষ, বিশেষতঃ অধিবেশনের সভাপতি মৌলানা বাকী প্রশ্নগুলির জবাবদানের ব্যাপার সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে এক 'গণতান্ত্রিক' উপায় উদ্ভাবন করেন। তিনি কোনো সদস্যকে প্রশ্ন করতে বাধা দেওয়া তো দূরের কথা প্রত্যেককেই যথেচ্ছভাবে প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করায় প্রশ্ন করতে করতে মগরিবের নামাজের সময় উপস্থিত হয়।[১৫] এর ফলে সদস্যেরা প্রশ্নের বোঝা খালি করা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ সময়ের অভাবে সেদিন সেগুলির জবাব দান স্থগিত রেখে পরদিন সে বিষয়ে আলোচনা হবে বলে ঘোষণা করেন।[১৬]

এরপর প্রত্যেক জেলা থেকে একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে একটি বিষয় নির্বাচনী কমিটি গঠিত হয়। জেলা প্রতিনিধি ছাড়াও প্রাদেশিক লীগের কর্মকর্তারা পদাধিকার বলে সেই কমিটির সদস্য হন।[১৭]

এই কমিটি গঠিত হওয়ার পর সভাপতি ঘোষণা করেন যে চৌধুরী খালিকুজ্জামান বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহের বর্তমান পরিস্থিতি এবং বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করবেন।[১৮] ইতিমধ্যে সভাগৃহে একথা প্রচারিত হয় যে মৌলানা আকরাম খানকে আবার পশ্চাদ্দ্বার দিয়ে প্রাদেশিক লীগের সভাপতির পদে বহাল করার জন্যে কর্তৃপক্ষ মহল তৎপর

---

*ড্রাম চালান দেওয়ার ব্যাপারে তৎকালীন অর্থ দফতরের মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী জড়িত ছিলেন। সে সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে অনেক লেখালেখি হয় এবং লীগ বিরোধীরা সেগুলি টাঙ্গাইল নির্বাচনের সময়েও প্রচারণার কাজে লাগান।

হয়েছেন এবং খালিকুজ্জামান সেই উদ্দেশ্যে সম্মেলনের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করবেন।[১৯]

এর ফলে কাউন্সিলারদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং উপরোক্ত ঘোষণার পর কয়েকজন সদস্য বক্তৃতা মঞ্চের উপর উঠে দাবী করেন যে চৌধুরী খালিকুজ্জামানের বক্তৃতার পূর্বেই প্রাদেশিক লীগ সভাপতি মৌলানা আকরাম খানের পদত্যাগ সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কয়েকজনসদস্য আপত্তি জ্ঞাপন করলে কার্জন হলের মধ্যে তুমুল হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। কোনো প্রকার শৃঙ্খলা রক্ষা না করে বহু সদস্য বক্তৃতামঞ্চে আরোহণ করে সচীৎকারে বক্তৃতা দেওয়ার চেষ্টা করেন। অবস্থা আয়ত্বে আনার উদ্দেশ্যে সভাপতি আবদুল্লা হিল বাকী কিছু বলার চেষ্টা করলে একজন সদস্য তাঁর সামনে থেকে মাইক সরিয়ে নেন। অপর একজন পূর্ববর্তী সদস্যের এই আচরণে আপত্তি জানালে গণ্ডগোল আরও বৃদ্ধিলাভ করে।[২০]

গোলমালের মধ্যে কয়েকজন সদস্য মঞ্চের উপর থেকে নীচে পড়ে যান। কয়েকটি ফুলের টবও মেজের উপর পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়। এই পরিস্থিতিতে উত্তেজিত অবস্থায় সমবেত কাউন্সিলাররা প্রায় সকলেই নিজেদের আসন থেকে উঠে দাঁড়ান এবং সভাগৃহে এক দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।[২১] অবস্থা কোনো-ক্রমেই আয়ত্বের মধ্যে আনতে সমর্থ না হয়ে সভাপতি পরদিন পর্যন্ত সভা মূলতুবী ঘোষণা করেন।[২২]

কাউন্সিলের অধিবেশন সেদিনের মতো মূলতুবী ঘোষিত হওয়ার পর সন্ধ্যাবেলা শতাধিক সদস্য কার্জন হল প্রাঙ্গণে একটি প্রতিবাদ সভায় মিলিত হন।[২৩] এঁদের মধ্যে বরিশাল জেলা লীগ সম্পাদক মহীউদ্দীন আহমদ, বরিশাল জেলা বোর্ডের সদস্য শাহজাহান চৌধুরী, মহম্মদ ওয়াসেক, মাহবুবুল হক প্রভৃতি লীগ নেতারাও ছিলেন।[২৪] সমবেত সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন যে সভার জন্যে যে সমস্ত ভলান্টিয়ার জড়ো করা হয়েছিলো তাদের অনেকেই ছিলো গুণ্ডা প্রকৃতির এবং হলের ভিতর গণ্ডগোলের সময় তারাই বরিশালের মহীউদ্দীন আহমদ ও শাহজাহান চৌধুরীকে ঘুঁষি মেরে মাটিতে ফেলে দেয়। গুণ্ডাদের সাহায্যে সভা আয়ত্বে রাখার ক্ষেত্রে লীগ নেতা ও মন্ত্রীদের ভূমিকা সম্পর্কেও কেউ কেউ মন্তব্য করেন। সভা আরম্ভ হওয়ার পর বক্তারা আলোচনা প্রসঙ্গে সেখানে বলেন যে গুণ্ডাপ্রকৃতির লোকের ভলান্টিয়ার করা এবং লীগ সদস্যদেরকে তাদের দ্বারা অপমাণিত করা মুসলিম লীগের ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়।[২৫]

অনেকে এই সব কথায় উত্তেজিত হয়ে কাউন্সিলের পরবর্তী অধিবেশন বর্জন করার প্রস্তাব আনেন।[২৬] কিন্তু শেষ পর্যন্ত কতিপয় কাউন্সিল সদস্যের অন্যায় ও অভদ্র কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহণ[২৭] এবং পরদিন সভায় যোগদান করে গণতান্ত্রিক 'সংগ্রামের' সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর প্রতিবাদ সভার কাজ শেষ হয়।[২৮]

পরদিন রবিবার ১৯শে জুন বেলা ১০টায় অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার কথা ছিলো।[২৯] সেই অনুসারে নির্ধারিত সময়মতো প্রায় একশো জন কাউন্সিলার কার্জন হল প্রাঙ্গণে সমবেত হন এবং বহুক্ষণ ধরে অপেক্ষা করতে থাকেন। ইতিমধ্যে শোনা যায় যে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে কর্তৃপক্ষ সভার সময় বেলা ১-৩০ মিঃ পর্যন্ত পিছিয়ে দিয়েছেন।[৩০]

কিছু সংখ্যক কাউন্সিলার এবং সাংবাদিক সমবেত সদস্যদের সাথে আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে পূর্বদিনের মতো সেদিনকার অধিবেশনে আর কোনো গণ্ডগোল হবে না। নেতারা যা বলবেন এবার সেই মতো কাজ হবে। এর কারণ হিসাবে তাঁরা উল্লেখ করেন যে পূর্ব রাত্রিতে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ, মন্ত্রীবর্গ, আকরাম খান ও নবাববাড়ির নেতাদের মধ্যে গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমস্ত রাত্রি নেতাদের মোটর-ট্যাক্সী অলিতে-গলিতে গিয়ে প্রত্যেক সদস্যকে 'ঠাণ্ডা' করেছে। তার উপর সেদিন বিকেলেই প্রাদেশিক সম্পাদক ইউসুফ আলী চৌধুরী কাউন্সিলারদেরকে এক চা চক্রে আপ্যায়িত করার ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং এত কিছুর পর লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে আর কোনো প্রতিবাদের সম্ভাবনা নেই একথা ধরে নেওয়াই স্বাভাবিক।[৩১]

এই সব আলোচনা চলাকালে সদস্যেরা সমালোচনা প্রসঙ্গে আরও অনেক কিছু বলেন। একজন মন্তব্য করেন যে যারা বেশী উত্তেজিত অবস্থায় লাফালাফি করছে তাদের মধ্যে অনেকেই দুর্নীতিপরায়ণ। একজনের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে অন্য একজন বলেন যে মস্ত প্রগতিশীলের অভিনয় করলেও আসলে তিনি কালোবাজারীতে সিদ্ধহস্ত। অন্য একজন বলেন যারা গণ্ডগোল করছে আসলে তারা কিছুই নয়, কেরোসিন তেল বা টিনের পারমিটের আশ্বাস পেলে তারা সকলেই 'ঠাণ্ডা' হয়ে যাবে। তাদের মধ্যে শতকরা নব্বইজন জমিদার, জোতদার, ব্যবসায়ী। সুতরাং হাওয়া কোন্‌দিকে বইবে তা সহজেই অনুমান করা চলে।[৩২]

দ্বিতীয় দিন সভায় কাজ কিন্তু বেলা ১-৩০ মিনিটেও শুরু করা হয় সম্ভব হয়নি। সভাপতি মৌলানা বাকী সময়মতো উপস্থিত হলেও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের

অনুপস্থিতির কারণে সভার কাজ আরম্ভ হতে আরও দেড় ঘণ্টা বিলম্ব ঘটে। এই বিলম্বের ফলে সমবেত কাউন্সিলাররা নানা বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করলেও সভার কাজ শান্তিপূর্ণভাবেই শুরু হয়।[৩৩]

প্রথমেই সভাপতি আবদুল্লা হিল বাকী একটা ছোট বক্তৃতা দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি কলকাতার দৈনিক ইত্তেহাদে প্রকাশিত পূর্বদিনের অধিবেশনের রিপোর্টের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে তার একাংশ পাঠ করে শোনান এবং বলেন যে পত্রিকাটি বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে কাউন্সিল অধিবেশন সম্পর্কে বিকৃত বিবরণ পরিবেশন করেছে।[৩৪] প্রেস প্রতিনিধিদের উপস্থিতি নিয়ে অধিবেশনে পূর্বদিনের বিতর্ক প্রসঙ্গে ইত্তেহাদের উপরোক্ত বিবরণটিতে বলা হয়:

> অধিকাংশ সদস্য প্রেস প্রতিনিধিকে বৈঠকে উপস্থিত হইতে দিবার দাবী জ্ঞাপন করেন। কতিপয় মন্ত্রী ও সভাপতি মওলানা আবদুল্লাহ আল বাকী সাহেব আবেদন করেন যে এই বৈঠকে অনেক গোপনীয় বিষয় আলোচনা হইবে এবং দোষ-ত্রুটি পৃথিবীর বহু জনগণের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে ইহা আপনাদের বুঝা উচিত।[৩৫]

উপরোক্ত বিবরণটি পাঠ করার পর তা সত্য কিনা সেকথা তিনি কাউন্সিলার-দেরকে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে তাঁরা সকলে বলেন যে বিবরণটি সম্পূর্ণ মিথ্যা কোনো মন্ত্রী বা সভাপতি কেউই তাঁদের কাছে উপরোক্ত মর্মে আবেদন করেননি। আবদুল্লা হিল বাকী এর পর বলেন যে ইত্তেহাদের বিবরণের অপর অংশে বলা হয়েছে যে সদস্যেরা মঞ্চ আক্রমণ করেন এবং তাঁদের দ্বারা চেয়ার টেবিল চূর্ণীকৃত হয়। কাউন্সিল সদস্যেরা সেই বিবরণকেও মিথ্যা বলে সভাপতির সাথে একমত হন।[৩৬]

উল্লিখিত বিবরণসমূহ অল্পকিছু পরিবর্তিত অবস্থায় 'দৈনিক আজাদ' সাপ্তাহিক 'নওবেলাল' এবং সাপ্তাহিক 'সৈনিকে' প্রকাশিত হয়। কাজেই 'ইত্তেহাদের' বিবরণ 'সম্পূর্ণ' মিথ্যা মনে করার কোনো কারণ নেই। এখানে উল্লেখযোগ্য হলো দ্বিতীয় দিনের অধিবিশনে কাউন্সিলারদের নমনীয় মনোভাব। সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার এবং আকরাম খানের পদত্যাগ পত্র বিবেচনার প্রশ্ন নিয়ে পূর্বদিন যাঁরা তুমুল হট্টগোল সৃষ্টি করে পরিশেষে তাকে মারামারিতে পরিণত করেছিলেন তাঁরাই সেই ঘটনাসমূহের বিবরণকে মাত্র পরদিনই সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে স্বীকার করলেন এ ব্যাপারে যতই আশ্চর্যজনক হোক অকারণঘটিত নয়। তা হলো পূর্ব রাত্রিতে লীগ কর্তৃপক্ষ, মন্ত্রীবর্গ ও লীগ

সভাপতির 'সাংগঠনিক' তৎপরতারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

আবদুল্লা হিল বাকী তাঁর বক্তৃতা শেষ করে পাকিস্তান মুসলিম লীগ সভাপতি চৌধুরী খালিকুজ্জামানকে ভাষণ দেওয়ার জন্যে আহ্বান করেন। কিন্তু তার পূর্বে তিনি ঘোষণা করেণ যে খালিকুজ্জামানের বক্তৃতার সময় সংবাদিকদেরকে সভাগৃহ পরিত্যাগ করতে হবে। তিনি বলেন যে পাকিস্তান লীগ সভাপতি এবং কাউন্সিলারদের ইচ্ছানুসারেই সেই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। পূর্বদিন যে কাউন্সিলাররা সাংবাদিকদেরকে সভাগৃহে উপস্থিত রাখার জন্যে প্রায় চার ঘণ্টা ধরে দারুণ বাকবিতণ্ডা ও বিতর্ক চালিয়েছিলেন পরদিন তাঁরা প্রাদেশিক লীগ সভাপতির এই ঘোষণার কোনো প্রতিবাদ করা তো দূরে থাকুক শান্তভাবে তার প্রতি নিজেদের সমর্থনই জ্ঞাপন করেছিলেন।[৩৭]

কাউন্সিলারদের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিবাদ না হওয়ায় আবদুল্লা হিল বাকী সাংবাদিকদেরকে সভাগৃহ ত্যাগ করতে নির্দেশ দেন এবং তাঁরা সেই নির্দেশ অনুসারে সভাগৃহ পরিত্যাগ করেন। এর পর তাঁরা অধিবেশনের সভাপতির কাছে প্রেরিত এক স্মারকলিপিতে তাঁদের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। তাতে তাঁরা বলেন যে চৌধুরী খালিকুজ্জামানের বক্তৃতার সময় সাংবাদিকদেরকে উপস্থিত থাকতে দেওয়া হবে না একথা পূর্বাহ্নে তাঁদেরকে জানানো উচিত ছিলো। প্রথমে সংবাদিকদেরকে উপস্থিত থাকার জন্যে অনুমতিপত্র প্রদান করে পরে আবার তাঁদেরকে সভাকক্ষ ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া মোটেই সমীচীন হয়নি। লীগ কর্তৃপক্ষের এই আচরণে সাংবাদিকগণ দুঃখ প্রকাশ করেন।[৩৮]

চৌধুরী খালিকুজ্জামান তাঁর বক্তৃতায় কাশ্মীর, আফগানিস্তান এবং অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের অবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ বৃটিশ ও আমেরিকার তল্পিবাহকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এই সব রাষ্ট্রের জনগণ মুষ্টিমেয় লোকের শোষণের কবলে পড়ে স্বাধীনতার আস্বাদ থেকে বঞ্চিত রয়েছে। তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেন যে মধ্যপ্রাচ্যের জনগণকে শোষণকারী 'বে' ও 'পাশা'দের কবল থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব পাকিস্তানী জনসাধারণকেই গ্রহণ করতে হবে। এই ভাবণে লীগ সভাপতির বক্তব্য প্রায় সম্পূর্ণভাবে মধ্যপ্রাচ্যের 'জনগণের শোষণ' এবং তাদেরকে 'মুক্ত' করার বিবরণ ও আবেদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।[৩৯] দেশীয় কোনো সমস্যা সম্পর্কে কোনো বক্তব্যই তিনি লীগ কাউন্সিলারদের সামনে পেশ করার প্রয়োজন বোধ করেননি।

খালিকুজ্জামানের এই ভাষণের উপর সাপ্তাহিক নওবেলাল 'চৌধুরী সাহেবের ভাষণ' নামে একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয়[৪০] প্রকাশ করেন। সেই সম্পাদকীয়টির উপসংহারে বলা হয়:

চৌধুরী সাহেব মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলির অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হইয়া অপরকেও সেই সম্বন্ধে সচেতন করাইবার যে সাধু প্রয়াস পাইয়াছেন সেই জন্য আমরা তাঁহাকে জানাই মোবারকবাদ!

জনাব চৌধুরী সাহেবের ভাষণের 'স্বেচ্ছাতন্ত্রের অবসান', 'নির্যাতিত মানবাত্মার মুক্তি', 'স্বাধীন, সুখী, গণতন্ত্রী সরকার গঠনের আহ্বান' পাকিস্তানের জনসাধারণের মনে যতখানি সাড়া জাগাইবার কথা ততখানি আলোড়ন আনিতে পারে নাই—আনিতে পারে না। অতি ক্ষোভের সহিত এই কথা না বলিয়াও আমরা পারিতেছি না, চৌধুরী সাহেবের এই ভাষণে কোথায় যেন ফাঁক—কোথায় যেন আন্তরিকতার অভাব রহিয়াছে। এক মধুর স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বাস্তবের রূঢ়তায়। এই স্বপ্নের আবেশ হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও আর আসিবে না—তাই যেন চৌধুরী সাহেব আর এক স্বপ্নের মধুরতায় জনসাধারণকে টানিয়া লইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। লীগ কাউন্সিলের তিন তিনটি দিন অধিবেশনের পরেও জনসাধারণের জীবন ধারণের সমস্যার সমাধানের ঘোর ব্যর্থতা আমাদের চিন্তাধারাকে এই গতিপথে পরিচালিত করিতেই বাধ্য করে। চৌধুরী সাহেব লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনের ব্যর্থতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া প্রতিনিধিদের মনকে অন্যপথে পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্যেই সুচতুরভাবে যেন এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া ভগ্নতরীকে কোনোরূপে তীরে ভিড়াইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন—লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনের প্রহসনের উপর কোমল, মধুর যবনিকা টানিবার চেষ্টা করিয়াছেন। জীবন যাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন সমস্যার চাপে জনসাধারণের নাভিশ্বাস উপস্থিত হইয়াছে তাহাদের একটির মাত্র সমাধান করিলেও বা সমাধানের ইঙ্গিত দিলেও চৌধুরী সাহেবের ভাষণ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে করিত উদ্বেলিত—যে নির্যাতিত মুসলিম জনসাধারণের জন্য চৌধুরী সাহেবের আহ্বান তাহারা একান্ত আগ্রহে চাহিয়া রহিত পাকিস্তানের প্রতি। চৌধুরী সাহেবের ভাষণ গণতন্ত্রী মনকে উদ্‌বুদ্ধ ও আনন্দিত করিলেও সে আনন্দ নিঃসংশয় নহে, সংশয়ে সে আনন্দ ম্লান। এখানেই চৌধুরী সাহেবের ভাষণের ব্যর্থতা।

খালিকুজ্জামানের বক্তৃতার পর তুমুল বাকবিতণ্ডার মধ্যে আবদুল মোনেম

খান কর্তৃক উত্থাপিত সরবরাহ বিভাগ সম্বন্ধীয় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে সরবরাহ বিভাগের তিনটি শাখা—সংগ্রহ, চলাচল ও বণ্টন, উঠিয়ে দিয়ে সেগুলিকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসা এবং সরবরাহ বিভাগ যথাশীঘ্র তুলে দেওয়ার জন্যে সুপারিশ করা হয়। প্রস্তাবটির সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন এবং অর্থমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী বক্তৃতা দেন। হামিদুল হকের বক্তৃতার সময় কাউন্সিলারদের মধ্যে অনেক ঘন ঘন বাধা সৃষ্টি করেন। প্রাক্তনমন্ত্রী শামসুদ্দীন আহমদ একটি সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করার পর কাউন্সিলারদের ভোটে তা বাতিল হয়ে যায়। সেদিনের অধিবেশন মধ্যরাত্রিতে শেষ হয়।[৪১]

শেষ পর্যন্ত আকরাম খানের পদত্যাগপত্র কাউন্সিল অধিবেশনে আলোচিত হয়নি। প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটি কেন্দ্রীয় লীগ সভাপতি খালিকুজ্জামানের উপর সে বিষয়ে সিদ্ধান্তের দায়িত্ব অর্পণ করেন। সেই অনুসারে খালিকুজ্জামান ১৯শে জুনের অধিবেশনে কাউন্সিলারদেরকে জানান যে, যে সব কারণে আকরাম খান পদত্যাগ করেছেন সে সম্পর্কে উপযুক্ত অনুসন্ধান করে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।[৪২] কাউন্সিল অধিবেশনের পর খালিকুজ্জামান তাঁর 'অনুসন্ধান' কার্য শেষ করেন এবং তিনি ঢাকা পরিত্যাগের পূর্বেই আকরাম খানের পদত্যাগপত্র যথারীতি প্রত্যাহার করা হয়।[৪৩]

প্রাদেশিক লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন তৃতীয় দিন, ২০শে জুন, বেলা দশটায় ডিস্ট্রীক্ট বোর্ড হলে আরম্ভ হয়।[৪৪] এই সভায় বহুসংখ্যক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেগুলির মধ্যে রমজান মাসে সর্বপ্রকার নাচগান, সিনেমা ও মদ্যপান নিষিদ্ধ করা, নোতুন শাসনতন্ত্র রচনা করা, অতি শীঘ্র পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করা, পরিষদে উপস্থাপিত জমিদারী ক্রয় বিল আইনে পরিণত করা দাবী জ্ঞাপক প্রস্তাবসমূহ উল্লেখযোগ্য।[৪৫] শেষোক্ত প্রস্তাবের এক সংশোধনী প্রস্তাবে বিনা খেসারতে আগামী ১৯৫০ সালের মধ্যে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের সুপারিশ করা হয় কিন্তু সেই সংশোধনী প্রস্তাবটি ৬০।৬৯ ভোটে কাউন্সিলাররা বাতিল করে দেন।[৪৬]

পাকিস্তানের সর্বপ্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের প্রাদেশিক কাউন্সিলের তিনদিনের এই অধিবেশনের পর সদস্যদের অনেকেরই মন হতাশায় আচ্ছন্ন হয় এবং তাঁরা খোলাখুলিভাবে অন্তরের এই ভাব পরস্পরের কাছে ব্যক্ত করেন।[৪৭]

৫ ॥ রোজ গার্ডেনের মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলন

মৌলানা ভাসানী ধুবড়ী জেল থেকে মুক্তি লাভের পর ঢাকা এসে আলী আমজাদ খানের বাসায় কয়েকদিন অবস্থান করেন। সেই সময় তিনি ঢাকার রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে অনেককেই তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকেন। আলোচনা প্রসঙ্গে শওকত আলী প্রমুখ ১৫০ নম্বর মোগলটুলীর কয়েকজন কর্মী তাঁকে একটি কর্মী সম্মেলন আহ্বানের এবং তার জন্যে উপযুক্ত প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।[১]

আলী আমজাদ খানের বাড়িতে এই আলোচনার পর ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে একটি কর্মী বৈঠক আহ্বান করা হয়। তাতে এমন কয়েকজন এসে উপস্থিত হন যাদেরকে বৈঠকে যোগদানের জন্যে কোনো আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এঁদের মধ্যে কুষ্টিয়ার শামসুদ্দীন আহমদ এবং চেম্বার অব কমার্সের সাখাওয়াৎ হোসেনের নাম উল্লেখযোগ্য।[২] সাখাওয়াৎ হোসেন টাঙ্গাইল নির্বাচনের জন্যে ইতিপূর্বেই কিছু অর্থ সাহায্যও করেছিলেন।

বৃহত্তর কর্মী সম্মেলনের প্রস্তুতি হিসাবে সেই বৈঠকে মৌলানা ভাসানী আলী আমজাদ খানকে সভাপতি এবং ইয়ার মুহম্মদ খানকে সম্পাদক করে একটি অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করেন। কিন্তু বৈঠকটিতে বহু অবাঞ্ছিত ব্যক্তির উপস্থিতিতে এমনিতেই কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কর্মীর মধ্যে রীতিমতো বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এঁদের মধ্যে শওকত আলী ছিলেন অন্যতম। তিনি বৈঠকের আলোচনা এবং অভ্যর্থনা কমিটির অবস্থা দেখে ভয়ানক বিরক্ত হয়ে উপরের তালায় চলে যান এবং সম্মেলনটির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার সিদ্ধান্ত নেন। এই মানসিক অবস্থায় তাঁর সাথে উপরের ঘরে খোন্দকার আবদুল হামিদের দেখা হয়। তিনি শওকত আলীকে বলেন যে এ ব্যাপারে রাগারাগি না করে স্থিরভাবে নীচে গিয়ে নিজের বক্তব্য স্পষ্টভাষায় এবং সোজাসুজি পেশ করা দরকার।[৩]

খোন্দকার আবদুল হামিদের পরামর্শ মতো শওকত আলী এর পর নীচে গিয়ে উপস্থিত সকলকে এবং বিশেষ করে মৌলানা ভাসানীকে বলেন যে অভ্যর্থনা কমিটি যেভাবে তৈরী হয়েছে তাতে অভ্যর্থনা হয়তো হবে কিন্তু সম্মেলন হবে না। প্রসঙ্গটিকে আবার এইভাবে উত্থাপন করার পর অনেকেই শওকত আলীর কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করেন এবং শেষ পর্যন্ত মৌলানা ভাসানীকে সভাপতি, ইয়ার মহম্মদ খানকে সম্পাদক এবং মুস্তাক আহমদকে অফিস সম্পাদক করে অন্যান্যদের সহ একটি নোতুন কমিটি গঠিত হয়।[৪]

সেই সময় ১৫০ নম্বর মোগলটুলীর কর্মীদের মধ্যে শওকত আলী ছিলেন অত্যন্ত উদ্যোগী। তিনি দবিরুল ইসলামের মামলা পরিচালনার জন্যে শহীদ সুহরাওয়ার্দীকে ট্রাঙ্ককলযোগে ঢাকা আসার জন্যে অনুরোধ জানান এবং তাঁর অনুরোধ মতো শহীদ সুহরাওয়ার্দী জুন মাসে ঢাকা এসে ক্যাপ্টেন শাহজাহানের 'নূরজাহান বিল্ডিংস্থ' বাসায় এগারো দিন অবস্থান করেন। মামলা শেষ হওয়ার পর সুহরাওয়ার্দী কলকাতা ফেরত যাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলায় শওকত আলী তাঁকে বলেন যে তাড়াতাড়ি কলকাতা ফেরত না গিয়ে তাঁর ঢাকাতেই থাকা উচিত। কারণ ঢাকাতে না থেকে শুধু যাওয়া আসা করলে তার দ্বারা কোনো সমস্যার সমাধান হবে না। সুহরাওয়ার্দী এর উত্তরে শুধু তাঁদেরকে মুসলিম লীগ রাজনীতি বর্জন করে তার পরিবর্তে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আওয়ামী লীগের মতো আওয়ামী লীগ নামে একটি নোতুন প্রতিষ্ঠান গঠনের পরামর্শ দেন। সুহরাওয়ার্দীর এই পরামর্শ মতো শওকত আলীরা মৌলানা ভাসানীর সাথে নোতুন রাজনৈতিক সংগঠনের ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করেন।[৫]

২৩শে এবং ২৪শে জুন, ১৯৪৯, মৌলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে গঠিত অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে সারা পূর্ব বাঙলা প্রদেশের মুসলিম লীগ কর্মীদের এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। অন্য কোনো সুবিধাজনক জায়গা না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত কাজী বশীরের (হুমায়ুনের) আমন্ত্রণে তাঁর স্বামীবাগস্থ বাসভবন 'রোজ গার্ডেনে' সম্মেলনের স্থান নির্দিষ্ট হয়।[৬]

সম্মেলনের প্রস্তুতি চলাকালে মৌলানা ভাসানী ১৫০, মোগলটুলীতে অবস্থান করছিলেন। ২০শে জুনের দিকে মুস্তাক আহমদ এবং অন্যান্যেরা খবর পান যে সম্মেলনের পূর্বে সরকার ভাসানীকে গ্রেফতারের পরিকল্পনা করছেন। এই সংবাদ পাওয়ার পরই মোস্তাক আহমদ কাজী বশীরের সাথে পরামর্শ করে শওকত আলীর সহায়তায় সেই রাত্রেই মৌলানা ভাসানীর গায়ে একটা কম্বল জড়িয়ে ঘোড়ার গাড়িতে করে তাঁকে রোজ গার্ডেনে পৌঁছে দেন এবং সম্মেলন শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানেই থাকেন।[৭]

২৩শে জুন বিকেল তিনটে থেকে রোজ গার্ডেনের দোতলার হল ঘরে সম্মেলন শুরু হয়। তাতে প্রায় আড়াইশো থেকে তিনশো কর্মী উপস্থিত হন।[৮] সম্মেলন সেদিন সন্ধ্যা রাত্রি পর্যন্ত চলে।[৯]

প্রথম অধিবেশনে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: শামসুল হক, আবদুল জব্বার খদ্দর, খয়রাত হোসেন, আনোয়ারা খাতুন,

আলী আহমদ খান, খোন্দকার মুস্তাক আহমদ, শওকত আলী, ফজলুল কাদের চৌধুরী, শামসুদ্দীন আহমদ (কুষ্টিয়া) আতাউর রহমান খান, আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, আলী আমজাদ খান, ইয়ার মহম্মদ খান। এ ছাড়া মৌলানা মহম্মদ আরিফ চৌধুরী, পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের সহ-সভাপতি মওলানা শামসুল হক, যুগ্ম সম্পাদক মৌলানা এয়াকুব শরীফ এবং ঢাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরীর মালিক আবদুর রশিদের নামও উল্লেখযোগ্য। রেলওয়ে শ্রমিক প্রতিষ্ঠান, ছাত্র প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য নানা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরাও এই সম্মেলনে যোগদান করে।[১০]

ফজলুল হকও সেদিন অল্প কিছুক্ষণের জন্যে সম্মেলনের প্রথমদিকে উপস্থিত থাকেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেন। তাতে তিনি জনগণের চরম দুর্ভোগ এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার সংকটের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে ক্ষুধিত জনগণকে সংঘবদ্ধ করার জন্যে যুব-সমাজ এবং লীগ কর্মীদের কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া উচিত। পরিষদের যে সমস্ত সদস্য দলীয় প্রভাবের চাপে বিভিন্ন গণদাবীকে আইন সভায় উত্থাপন করতে অক্ষম, জনমতের চাপ সৃষ্টি দ্বারা তাঁদেরকে নিজেদের দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা উচিত বলেও তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সর্বশেষে জনগণের পক্ষে সংগ্রামের জন্যে নিজের প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করে তিনি সম্মেলন কক্ষ পরিত্যাগ করেন।[১১]

সেদিনকার সভায় বক্তৃতা ছাড়াও শামসুল হক পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ সম্মেলনে বিবেচনার জন্য 'মূলদাবী' নামে পুস্তিকা আকারে ছাপা বক্তব্যে কর্মসূচী বিষয়ক কতকগুলি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাঁর এই প্রস্তাব সমূহই সম্মেলনের পর সামান্য পরিবর্তিত অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম খসড়া ম্যানিফেস্টো রূপে প্রকাশিত এবং প্রচারিত হয়।[১২]

সুদীর্ঘ আলোচনার পর পূর্ব প্যাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে নোতুন একটি সংগঠনের মধ্যে লীগকে গণ-প্রতিষ্ঠান হিসাবে পুনর্গঠন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ ছাড়া আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম নরনারীকে লীগের সভ্য হিসাবে গণ্য করা হবে। তার জন্যে তাঁদেরকে কোনো চাঁদা দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানেরা শুধু একটা 'ক্রীডে' স্বাক্ষর দিলেই তাঁরা নোতুন প্রতিষ্ঠানের সভ্যরূপে বিবেচিত হবেন।[১৩]

বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রতিনিধি স্থানীয় কর্মীদের এই সম্মেলনে অনেকগুলি সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো বিনা খেসারতে অবিলম্বে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, প্রাপ্ত বয়স্কদের

ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন, মন্ত্রীমণ্ডলীর বিবিধ কার্যকলাপ তদন্তের জন্যে বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা, কারারুদ্ধ ছাত্র নেতাদের মুক্তি, ছাত্রদের উপর থেকে শাস্তিমূলক আদেশ প্রত্যাহার, অবিলম্বে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন, বিক্রয়কর প্রত্যাহার। এ ছাড়া খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি বিশেষ প্রস্তাবে দাবী করা হয় যে, খাদ্য সংকট দূর করার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে সরকারী উদ্যোগে একটি সর্বদলীয় খাদ্য সম্মেলন আহ্বান, প্রাদেশিক, জেলা মহকুমা ও ইউনিয়ন খাদ্য কমিটি গঠন এবং অবিলম্বে খাদ্য অভিযান শুরু করা হোক। লেভী সম্পর্কে যে সব সরকারী অন্যায় ও অবিচার অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো সেগুলির প্রতিকারের জন্যেও বিশেষভাবে দাবী জানানো হয়।[১৪]

২৩শে তারিখের অধিবেশনের শেষ পর্যায়ে মৌলানা ভাসানী সাংগঠনিক কমিটি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে প্রত্যেক জেলা এবং প্রতিষ্ঠান থেকে একজন করে প্রতিনিধি কমিটিতে রাখা দরকার। তাঁর এই প্রস্তাবে কর্মীদের মধ্যে অনেকেই এই বলে আপত্তি করেন যে, সেভাবে কমিটি গঠিত হলে তা এতো বড় হবে যে তার মাধ্যমে কোনো সাংগঠনিক কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্ভব হবে না।[১৫]

এই সমস্ত আলোচনার পর সকলে মৌলানা ভাসানীকে অনুরোধ করেন তিনি যেন নিজে কমিটির নাম স্থির করে আধ ঘণ্টার মধ্যে তাঁদেরকে সেই নামগুলি জানান। এইভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে ভাসানী পরামর্শের জন্যে কয়েকজনকে সাথে নিয়ে একটি ঘরের মধ্যে ঢোকেন এবং কিছুক্ষণ পর বাইরে এসে প্রায় ৪০ জন নিয়ে গঠিত একটি কমিটি প্রস্তাব করেন। সেই কমিটিতে মৌলানা ভাসানী সভাপতি, শামসুল হক সম্পাদক এবং শেখ মুজিবর রহমান ও খোন্দকার মুস্তাক আহম্মদ যুগ্ম-সম্পাদক হিসাবে প্রস্তাবিত হন। ভাসানীর প্রস্তাবিত সেই কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।[১৬]

সম্মেলনের পরদিন সকালে ভাসানী শওকত আলীকে বলেন যে কমিটির মধ্যে তিনি, শামসুল হক, মুজিবর রহমান, মুস্তাক আহমদ সকলেই ১৫০ মোগলটুলীর লোক একথা বলে অনেকেই তাঁদের সমালোচনা করছে। শওকত আলী তাঁকে এর জবাবে বলেন যে তাতে কোনো ক্ষতি হবে না, তবে অসুবিধা হবে আজেবাজে লোক নিয়ে গঠিত ৪০ জনের বড়ো কমিটি নিয়ে। এর উত্তরে মৌলানা ভাসানী আবার তাঁদেরকে বলেন যে বড়ো কমিটিতে কোনো অসুবিধা হবে না। তিনি ঘন ঘন কমিটির বৈঠক ডাকবেন এবং তাতে পর পর তিনবার অনুপস্থিত থাকলেই যে কোনো সদস্যকে বাদ

দিয়ে দেওয়া হবে। কমিটির গঠন নিয়ে এর পূর্বে শওকত আলীরা শামসুল হকের সাথেও আলাপ করেন।[১৭]

২৪শে তারিখে বিকেল ৫-৩০ মিঃ মৌলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে আরমানীটোলা ময়দানে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সর্বপ্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এবং তাতে প্রায় চার হাজার মানুষ উপস্থিত থাকেন। সভা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে কালু মিঞা, আলাউদ্দীন, ইব্রাহীম প্রভৃতি মুসলিম লীগের লোকদের নেতৃত্বে একদল গুণ্ডা সভা ভেঙে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সেখানে হাজির হয়ে কিছু চেয়ার টেবিল চুরমার করে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাড়াতাড়ি উধাও হয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সভার কাজ বিঘ্নিত না হয়ে সমবেত জনতার মধ্যে মুসলিম লীগ বিরোধী মনোভাবের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।[১৮]

৬॥ শামসুল হকের প্রস্তাব এবং আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম ম্যানিফেস্টো

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলনে বিবেচনার জন্যে শামসুল হক 'মূলদাবী' নামে একটি ছাপা পুস্তিকাতে লিপিবদ্ধ তাঁর বক্তব্য পাঠ করেন। পুস্তিকাটির মুখবন্ধের প্রারম্ভে তিনি বলেন :

> ১৯৪৯ সনের ২৩শে ও ২৪শে জুন তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত "পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলন" মনে করে যে, সব কালের সব যুগের, সব দেশের যুগ প্রবর্তক ঘটনাবলীর ন্যায় লাহোর প্রস্তাবও একটা নূতন ইতিহাসের সৃষ্টি করিয়াছে। বিরুদ্ধ পরিবেশে মানবের দেহ, মন ও মস্তিষ্কের উন্নতি ও পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। মানুষ পরিবেশের দাস একথা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকার করেন। বিরুদ্ধ পরিবেশে পূর্ণ ইসলামিক মনোভাব এবং সমাজ বিধান গড়িয়া তোলা সম্ভব নয়। ভারতের মুসলমানগণ বহু শতাব্দীর সঞ্চিত অভিজ্ঞতা হইতে এই মহা সত্য উপলব্ধি করিয়াই বিরুদ্ধ পরিবেশে বা দারুল হরবের পরিবর্তে ইসলামিক পরিবেশ বা দারুল ইসলাম কায়েম করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র হইলেও শুধু মুসলমানের রাষ্ট্র বা শুধু মুসলমানের জন্য প্রতিষ্ঠিত করিবার এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষা প্রভাবান্বিত ইসলাম-বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী, ধনতান্ত্রিক ও আত্মকেন্দ্রিক পরিবেশ গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা তাহাদের ছিল না।[১]

এই সম্মেলনের কিছুদিন পূর্বে ১৯৪৮ সালে শামসুল হক বর্ধমানে গিয়ে আবুল হাশিমের বাড়িতে কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করেন এবং তাঁর Creed of Islam নামক পুস্তকের প্রথম খসড়ার শ্রুতিলিখনের পর তার একটি অনুলিপি তৈরী করে সেটি সাথে নিয়ে ঢাকা আসেন। সেই অনুলিপিকে ভিত্তি করে 'বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ইসলাম' নামে তিনি একটি পুস্তকও রচনা করে তা প্রকাশ করেন। এ ছাড়া সেই সময় আবুল হাশিম তাঁর অনুরোধে পূর্ব পাকিস্তানে একটি নোতুন পার্টির ম্যানিফেস্টোর খসড়াও তাঁকে প্রস্তুত করে দেন।[২]

শামসুল হকের লিখিত 'মূলদাবীর' মধ্যে আবুল হাশিমের তত্ত্বগত চিন্তার প্রভাব সহজেই লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ :

> রব বা স্রষ্টা হিসাবেই সৃষ্টির বিশেষ করিয়া সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের সাথে আল্লার সবচাইতে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বস্তুতঃ রব বা স্রষ্টা, পালন বা পোষণকর্তা হিসাবে, বিশ্ব ও সৃষ্টিকে ধাপের পর ধাপ, স্তরের পর স্তর, পরিবর্তনের ভিতর দিয়া কতকগুলি স্থায়ী ও সাধারণ ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে এক অবস্থা হইতে অপর অবস্থার ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিতরূপে চরম সুখ, শান্তি ও পূর্ণতা প্রাপ্তির দিকে আগাইয়া নিবেন। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গীতে আল্লাহ শুধু মুসলমানের নয়—জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানবের। রবই আল্লার সত্যিকার পরিচয়। রব হিসাবে রবুবিয়াৎ বা বিশ্ব-পালনই তাঁর প্রথম ও প্রধান কাজ। সুতরাং দুনিয়ার উপর আল্লার খলিফা বা প্রতিভূ হিসাবে মানব এবং খেলাফত হিসাবে রাষ্ট্রের প্রথম এবং প্রধান কাজ ও কর্তব্য হইল আল্লার উপায় ও পদ্ধতি অনুসারে বিশ্বের পালন করা এবং জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের সামগ্রিক সুখ, শান্তি, উন্নতি, কল্যাণ ও পূর্ণ বিকাশের জন্য চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রাম করা।[৩]

মুসলিম লীগ সম্পর্কে শামসুল হক পুস্তিকাটিতে বলেন :

> নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কখনও দল বিশেষের প্রতিষ্ঠান ছিল না; ইহা ছিল ভারত উপমহাদেশের মুসলিম জনগণের জাতীয় প্লাটফর্ম বা মঞ্চ। ইহার উদ্দেশ্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানের মূল নীতিগুলিকে কার্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে প্রয়োজন নোতুন চিন্তাধারা, নোতুন নেতৃত্ব এবং নোতুন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নীতি ও কর্মসূচী এবং মুসলিম লীগকে মুসলিম জনগণের সত্যিকার জাতীয় প্ল্যাটফর্ম মঞ্চ হিসাবে গড়িয়া তোলার।...

কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমান পকেট লীগ নেতৃবৃন্দ উপরোক্ত কর্মপন্থা অনুসরণ না করিয়া তাঁহাদের নিজেদের কায়েমী স্বার্থ এবং প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য লীগের মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা ভাঙাইয়া চলিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যেই তাহারা মুসলিম লীগকে দলবিশেষের প্রতিষ্ঠান করিয়া ফেলিয়াছেন। শুধু তাহাই নয় মানবের প্রতি আশীর্বাদ স্বরূপ ইসলামকেও ব্যক্তি, দল ও শ্রেণী বিশেষের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অন্যায় এবং অসাধুভাবে কাজে লাগান হইতেছে। কোনও পাকিস্তান প্রেমিক এমন কি মুসলিম লীগের ঝানু কর্মিগণ পর্যন্ত নীতি ও কর্মসূচী সম্পর্কে কোনোরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে অথবা প্রস্তাব করিতে পারে না। কেহ যদি এইরূপ করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহাদিগকে পাকিস্তানের শত্রু বলিয়া আখ্যাত করা হয়।[8]

আলোচ্য মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলনে নোতুন দল গঠনের উদ্যোগ সত্ত্বেও সেই দলের নেতৃবৃন্দ যে মূলতঃ মুসলিম লীগের 'আদর্শ' ইত্যাদির প্রভাব বিন্দুমাত্র উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হননি তার পরিচয় শামসুল হকের সাংগঠনিক বক্তব্যের মধ্যেও স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়:

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলন মনে করে যে মুসলিম লীগকে এইসব স্বার্থান্বেষী মুষ্টিমেয় লোকদের পকেট হইতে বাহির করিয়া সত্যিকার জনগণের মুসলিম লীগ হিসাবে গড়িয়া তুলতে হইলে, মুসলিম লীগকে সত্যিকার শক্তিশালী মুসলিম লীগ বা মুসলিম জাতীয় প্ল্যাটফর্ম বা মঞ্চে পরিণত করিতে হইলে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিমকে ইহার সদস্য শ্রেণীভূক্ত করিতে হইবে, অন্যথায় মুসলিম লীগকে পাশ্চাত্য সভ্যতা, গণতন্ত্র ও সাংগঠনিক নীতি প্রভাবান্বিত দলবিশেষের পার্টি বলিয়া ঘোষণা করিয়া অপরাপর সবাইকে সাধ্যমতো দল গঠন করিবার সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার দিতে হইবে। মুসলিম লীগের ভিতর প্রত্যেক ব্যক্তি, দল ও উপদলের স্বাধীন মতামত আদর্শ, নীতি ও কর্মসূচী ব্যক্ত এবং তার পিছনে সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার দিতে হইবে। তদুপরি ছাত্র, যুবক, মহিলা, চাষী, ক্ষেত মজুর, মজদুর প্রভৃতি শ্রেণী সংঘ গড়িয়া তুলিবার স্বাধীনতা থাকিবে।[৫]

শামসুল হকের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে মনে হয় মুসলিম লীগকে একটি পার্টি হিসাবে গঠনের পরিকল্পনা তাঁর চিন্তার মধ্যে তখন ছিলো না। তিনি মুসলিম লীগকে একটি ব্যাপক গণফ্রন্ট হিসাবে গঠন করার চিন্তাই করেছিলেন।

কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাঁর দ্বারা লিখিত এবং প্রচারিত খসড়া ম্যানিফেস্টোতে তিনি এই চিন্তা বর্জন করে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগকে একটি দল হিসাবে গঠন করার কথাই ঘোষণা করেন।

'মূলনীতি'তে অবশ্য শামসুল হক বস্তুতপক্ষে একটি পার্টি ম্যানিফেস্টোর খসড়াই পেশ করেন। এই খসড়া ম্যানিফেস্টোর সাথে আবুল হাশিম কর্তৃক প্রচারিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লিগের খসড়া ম্যানিফেস্টোর সাদৃশ্য সহজেই লক্ষণীয়। সামান্য সংশোধিত হয়ে মূলনীতির অন্তর্গত এই খসড়াটিই পরবর্তী-কালে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম খসড়া ম্যানিফেস্টোরূপে প্রকাশিত এবং প্রচারিত হয়।

'মূল দাবী'তে উত্থাপিত প্রস্তাবগুলিতে বয়স্কদের ভোটাধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা, আইনের চোখে সমতা, ধর্মের স্বাধীনতা, সংখ্যালঘুদের ন্যায্য অধিকার, দেশরক্ষার অধিকার, বৈদেশিক নীতি, মানুষের সমান অধিকার, কাজ করার অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার, নারীর অধিকার ছাড়াও ইসলামী রাষ্ট্র এবং কৃষি-পুনর্গঠন ও শিল্প বিপ্লব সম্পর্কে যা বলা হয় তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইসলামী রাষ্ট্রের রূপ সম্পর্কে তাতে বলা হয়:

১। পাকিস্তান খেলাফত অথবা ইউনিয়ন অব পাকিস্তান রিপাবলিকস্ বৃটিশ কমন ওয়েলথের বাহিরে একটি স্বাধীন সার্বভৌম ইসলামী রাষ্ট্র হইবে।

২। পাকিস্তানের ইউনিটগুলিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ব অধিকার দিতে হইবে।

৩। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আল্লার প্রতিভূ হিসাবে জনগণের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

৪। গঠনতন্ত্র হইবে নীতিতে ইসলামী গণতান্ত্রিক ও আকারে রিপাবলিকান।[৬]

কৃষি-পুনর্গঠন প্রস্তাবে বলা হয়:

১। জমিদারী প্রথা ও জমির উপর অন্যান্য কায়েমী স্বার্থ বিনা খেসারতে উচ্ছেদ করিতে হইবে।

২। সমস্ত কর্ষিত ও কৃষি উপযোগী অকর্ষিত জমি কৃষকদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে।

৩। তাড়াতাড়ি অর্ডিনান্স জারী করিয়া 'তেভাগা' দাবী মানিয়া লইতে হইবে।

৪। রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে অবিলম্বে সমবায় ও যৌথ কৃষিপ্রথা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।...

৫। নিম্নলিখিত বিষয়ে কৃষকদের অবিলম্বে সাহায্য করিতে হইবে :

(ক) সেচ ব্যবস্থার সুবিধা ও সার প্রস্তুতের পরিকল্পনা।

(খ) উন্নত ধরনের বীজ ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি।

(গ) সহজ ঋণ দান ও কৃষি ঋণ হইতে মুক্তি।

(ঘ) ভূমি-করের উচ্ছেদ না হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভূমিকর শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কমান।

(ঙ) ভূমি-করের পরিবর্তে কৃষি-আয়কর বসানো।

(চ) খাদ্য শস্য প্রভৃতি জাতীয় ফসলের সর্বনিম্ন ও সর্ব-উর্ধ্ব দর নির্ধারণ করিয়া দিতে হইবে এবং পাটের সর্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দিতে হইবে।

(ছ) খাদ্যশস্যের ব্যবসা সরকারের হাতে একচেটিয়া থাকা উচিত। পাট ব্যবসা ও বুনানীর লাইসেন্স রহিত করিতে হইবে।

(জ) সকল রকমের সমবায়সমিতিগুলিকে সাহায্য ও উৎসাহ দিতে হইবে।

৬। কালে সমস্ত ভূমিকে রাষ্ট্রের জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে এবং সরকারের অধিনায়কত্ব ও তত্ত্বাবধানে যৌথ ও সমবায় কৃষিপ্রথা খুলিতে হইবে।[৭]

দেশীয় শিল্পকে নানা বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে 'মূল দাবী'তে নিম্নলিখিত কর্মসূচীর উল্লেখ করা হয় :

১। প্রাথমিক শিল্পগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে যেমন—যুদ্ধশিল্প, ব্যাঙ্ক, বীমা, যানবাহন, বিদ্যুৎ সরবরাহ, খনি, বন-জঙ্গল ইত্যাদি; এবং অন্যান্য ছোটখাট শিল্পগুলিকে পরিকল্পনার ভিতর দিয়া সরাসরি রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে আনিতে হইবে।

২। পাট ও চা শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে এবং পাট ও চা ব্যবসা সরকারের হাতে একচেটিয়া থাকিবে।

৩। কুটির শিল্পগুলিকে সুচিন্তিত পরিকল্পনার ভিতর দিয়া বিশেষভাবে সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতে হইবে।

৪। বিল, হাওর ও নদীর উপর হইতে কায়েমী স্বার্থ তুলিয়া দিয়া সরকারের কর্তৃত্বাধীনে মৎস্যজীবীদের মাঝে যৌথ উপায়ে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে—এবং সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৎস্যের চাষ ও মৎস্য ব্যবসার পত্তন করিতে হইবে। ফিশারী বিভাগের দ্রুত উন্নয়ন করিয়া এই সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা প্রসার করিতে হইবে ও উন্নত ধরনের গবেষণাগার খুলিতে হইবে।

৫। শিল্প ও ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত একচেটিয়া অধিকার থাকিবেনা।

৬। বৃটিশের নিকট হইতে স্টার্লিং পাওনা অবিলম্বে আদায় করিতে হইবে এবং তাহা দ্বারা যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে হইবে ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৭। দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবার ভার রাষ্ট্র গ্রহণ করিতে হইবে।

৮। সমস্ত বৃটিশ ও বৈদেশিক ব্যবসাকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে।

৯। শিল্পে বৈদেশিক মূলধন খাটানো বন্ধ করিতে হইবে।

১০। শিল্পে মুনাফার হার আইন করিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে।[৮]

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ম্যানিফেস্টোর অনুকরণেই শামসুল হকের প্রকাশিত এই মূল দাবীর খসড়াটিও সর্বশেষে নিম্নোক্ত আহ্বান জানায়:

মানবতার চূড়ান্ত মুক্তি সংগ্রাম যাতে বিলম্বিত না হয়, সেজন্য জনতাকে তাহাদের সমস্ত ব্যক্তিগত এবং দলগত বিভেদ বিসর্জন দিয়ে এক কাতারে সমবেত হইতে মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলন আবেদন জানাইতেছে। সাম্রাজ্যবাদী সরীসৃপের ফোঁস-ফোঁস শব্দ আজ সমাজের আনাচে-কানাচে সর্বত্র শোনা যাইতেছে—সেই ফোঁস-ফোঁস শব্দই যেন এই যুগের সঙ্গীত। আমাদের কওমী প্রতিষ্ঠান এই সরীসৃপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া তাহাদের বিষদাঁত উৎপাটন করিতে বদ্ধপরিকর। হজরত আবু বকর সিদ্দিকী (রাঃ) বলিয়াছিলেন: 'যদি আমি ঠিক থাকি, তবে আমাকে অনুসরণ কর, আমি যদি ভ্রান্ত হই তবে আমাকে সংশোধন কর।' সেই অমর আদর্শকেই সামনে ধরিয়াই কওমী প্রতিষ্ঠান সমস্ত দেশবাসীকে সমতালে আগাইয়া আসিতে আহ্বান জানাইতেছে; আসুন আমরা কোটি কোটি নর-নারীর সমবেত চেষ্টায় গণ-আজাদ হাসিল করিয়া সোনার পূর্ব পাকিস্তানকে সুখী, সমৃদ্ধ ও গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গড়িয়া তুলি।[৯]

আওয়ামী মুসলিম লীগের সাথে ১৫০ নম্বর মোগলটুলীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্বেও সেখানকার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের মধ্যে অনেকেই এই নোতুন সংগঠনটির সাথে যুক্ত না হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আওয়ামী লীগের সাম্প্রদায়িক চরিত্রই তার প্রধান কারণ। সে সমস্ত নেতৃস্থানীয় কর্মীরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে কমরুদ্দীন আহমদ, মহম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, তাজউদ্দিন আহমদ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

অষ্টম পরিচ্ছেদ । আরবী হরফ প্রবর্তনের ষড়যন্ত্র

১ ॥ ফজলুর রহমানের উদ্যোগ

উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলা ভাষা বিরোধী চক্রান্ত সীমাবদ্ধ ছিলো না। বাংলাকে ধ্বংস করার অন্যতম উপায় হিসাবে তাঁরা বাংলা ভাষায় আরবী হরফ প্রবর্তনের উদ্যোগ ১৯৪৭ সাল থেকেই শুরু করেছিলেন। বাঙলাদেশের প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফজলুর রহমানই ছিলেন এই হরফ পরিবর্তন প্রচেষ্টার 'দার্শনিক' এবং মূল প্রবক্তা।

নানা বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে তিনি বাংলা ভাষার হরফ পরিবর্তনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে ক্রমাগতভাবে প্রচার করেন যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সংহতি এবং জনগণের মধ্যে অর্থপূর্ণ ঐক্য রক্ষা ও সুদৃঢ় করার জন্যে পাকিস্তানের সকল ভাষার অক্ষর এক হওয়া উচিত। সিন্ধী, পুশ্‌তু, পাঞ্জাবী ইত্যাদির হরফ আরবীর মতো অথবা অনেকাংশে সেই রকম। কাজেই সেখানে বিশেষ কোনো অসুবিধা নেই। যত অসুবিধা বাংলার ক্ষেত্রে। কারণ বাংলা ভাষার অক্ষর দেবনাগরী থেকে উদ্ভূত এবং তার সঙ্গে আরবী হরফের কোনো সাদৃশ্য নেই। কাজেই বাংলার ক্ষেত্রে পরিবর্তনটা একেবারে মৌলিক। কিন্তু তা হলেও আরবী অক্ষর প্রচলন ব্যতীত বাংলাভাষীদের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানবাসীর যথার্থ সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ঐক্য সম্ভব নয়। সেদিক দিয়ে এই পরিবর্তন অবশ্য প্রয়োজনীয়। ১৯৪৭ সাল থেকে শুরু হলেও আরবী হরফ প্রবর্তনের এই ষড়যন্ত্র ভালভাবে দানা বাঁধে ১৯৪৯ সালে।

২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮, করাচীতে নিখিল পাকিস্তান শিক্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে[১] পাকিস্তানের শিক্ষা সচিব ফজলুর রহমান পাকিস্তানের শিক্ষাকে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন এবং বাংলা ভাষায় আরবী হরফ প্রচলনের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে বলেন যে তার দ্বারা আঞ্চলিক ভাষাগুলির সংরক্ষণের কাজ সাধিত হবে। এছাড়া আরবী বর্ণমালা পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষাগত সামঞ্জস্য বিধানেও সহায়তা করবে।

আরবী হরফ সম্পর্কে নিজের এই বক্তব্য ফজলুর রহমান ৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯-এ পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত একটি সভায়

আরও বিষদভাবে পেশ করেন।

সহজ এবং দ্রুত যে হরফের মারফত ভাষা পড়া যায় সেই হরফই সব চাইতে ভাল। কোন্ হরফটা ভাল তাহা ঠিক করার পূর্বে একবার বিভিন্ন প্রদেশের হরফের বিচার প্রয়োজন। সিন্ধু ভাষা হইতেছে সিন্ধী কিন্তু তার হরফ আরবী। পশ্চিম পাঞ্জাবের ভাষা উর্দু হইলেও তার হরফ 'নাসতালিক'। পূর্ববঙ্গের ভাষা ও হরফ দুই বাংলা। কিন্তু সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের ভাষা পুষ্তু হইলেও বহুলাংশে আরবী। বাংলায় বহু সংযুক্ত অক্ষর-এর স্বরবর্ণের নানা চিহ্ন থাকায় উহা টাইপ রাইটিং বা সর্ট হ্যাণ্ডে ব্যবহার করা যায় না। নাসতালিক হরফ সম্বন্ধেও অসুবিধা। ঐ অবশিষ্ট হরফসমূহের মধ্যে আরবীই সহজ এবং টাইপ রাইটিংয়েও ব্যবহার করা যাইতে পারে। রোমান হরফের ন্যায় ইহার ষোলটি মূলরূপ আছে। সুতরাং দ্রুত লিখন ও পঠনের পক্ষে সুবিধাজনক বলিয়া আরবীকেই পাকিস্তানের হরফ করা উচিত। আমাদের দেশবাসীর শতকরা মাত্র দশ ভাগ লেখাপড়া জানে এবং অবশিষ্ট ৯০ ভাগ লিখিতে বা পড়িতে পারে না। হরফ আরবীই হউক বা আর যাহা হউক তাহাতে তাদের কিছু যায় আসে না। তবে সহজ হরফ প্রবর্তিত হইলে দেশের নিরক্ষরতা দূর করার পথ সুগম হইবে।[২]

ফজলুর রহমানের উপরোক্ত বক্তব্যকে মোটামুটি চার ভাগে বিভক্ত করা চলে। (ক) যে হরফের মাধ্যমে যত সহজে ও তাড়াতাড়ি পড়া যায় সেই অক্ষর তত ভালো। (খ) বাংলায় বহু সংযুক্ত অক্ষর ইত্যাদি থাকায় টাইপ রাইটারে এবং শর্ট হ্যাণ্ডের কাজে তা ব্যবহারের অসুবিধা। (গ) এ সব দিক দিয়ে আরবী হরফই সর্বাপেক্ষা সহজ এবং উপযোগী। (ঘ) আমাদের দেশের শতকরা ৯০ ভাগ নিরক্ষর কাজেই তাদেরকে আরবী হরফে শিক্ষা দিলে জনগণের নিরক্ষরতা দূর করা বহুলাংশে সহজ হবে। আরবী হরফের মাধ্যমে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন সহজতর হবে এই যুক্তি পূর্বে অনেক ক্ষেত্রে উল্লেখ করলেও এই বক্তৃতার মধ্যে তার কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই শেষোক্ত বক্তব্যটির উপর পরবর্তীকালে অনেক বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

বাংলা ভাষায় আরবী প্রবর্তনের পক্ষে ফজলুর রহমানের উদ্যোগ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলেও অন্যান্য বাঙালী মন্ত্রী এবং আমলাদের কৃতিত্বও এক্ষেত্রে কম ছিলো না। এমনকি হাবিবুল্লাহ বাহার পর্যন্ত বাংলাতে আরবী হরফ প্রবর্তনের

প্রভাবকে 'বিজ্ঞান সম্মত' উপায়ে বিচার করার পরামর্শ দিয়ে এ ব্যাপারে ভাবাবেগের দ্বারা বাঙালীদেরকে চালিত না হওয়ার পরামর্শ দান করেন।[৩]

১৯৪৮ সালে ফজলুর রহমান সৈয়দ আলী আহসান এবং অন্যান্য কয়েকজনের সাথে মওলা সাহেবের বাসায় আরবী হরফ প্রবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করেন। আলী আহসান তাঁকে বলেন যে পরিকল্পনাটির সম্ভাব্যতা পরীক্ষার জন্যে ডক্টর শহীদুল্লাহই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি। কাজেই তাঁকে সেই দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। এর পর ফজলুর রহমান সরাসরি ডক্টর শহীদুল্লাহর সাথে কোনো যোগা-যোগ না করে তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা মাহমুদ হাসানকে দিয়ে তাঁর কাছে একটা চিঠি দেন। সেই চিঠিতে মাহমুদ হাসান ডক্টর শহীদুল্লাহকে লেখেন যে সরকার সিদ্ধান্ত করেছেন পাকিস্তানকে ইসলামী মতে গঠন করতে এবং সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা বাংলা ভাষায় আরবী অক্ষর প্রবর্তন করতে চান। এবং এর জন্যে তাঁর সাহায্য পেলে তাঁরা উপকৃত হবেন।[৪]

ডক্টর শহীদুল্লাহ মাহমুদ হাসানের এই চিঠির কোনো উত্তর না দিয়ে চিঠিটির সারমর্ম প্রেসের কাছে প্রকাশ করেন এবং তা কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকায় ছাপা হয়। এর কিছুকাল পরে ১৯৪৯-এর ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকাতে শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হলে সেই সময় ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর তাঁদের সম্মানার্থে নিজের বাসভবনে একটি চা-চক্রের আয়োজন করেন। মাহমুদ হাসান এবং ডক্টর শহীদুল্লাহ উভয়েই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের উল্লেখ করে হাসান ডক্টর শহীদুল্লাহকে বলেন যে তিনি আসলে দেশদ্রোহী। তা না হলে সরকার থেকে তাঁর কাছে একটা জরুরী ব্যাপারে পত্র দিলে যথাস্থানে তার উত্তর না দিয়ে প্রেসের কাছে, বিশেষতঃ বিদেশী প্রেসের কাছে তিনি কখনই তার বিবরণ প্রকাশ করতে পারতেন না। ডক্টর শহীদুল্লাহ এর জবাবে বলেন যে তাঁর চিঠির উত্তর দেওয়ার কোনো প্রয়োজন তিনি বোধ করেননি এবং প্রেসের লোকেরা তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করায় তিনি তাদেরকে সেটা জানিয়ে দিয়েছেন।[৫]

প্রাদেশিক শিক্ষা দফতরের সেক্রেটারী ফজলে আহমদ করিম ফজলী ছিলেন বাংলাতে আরবী হরফ প্রবর্তনের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। তিনি এবং ফজলুর রহমান উভয়ে চট্টগ্রামের মৌলানা জুলফিকর আলীকে দিয়ে 'হুরুফুল কোরান সমিতি' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করে তার মাধ্যমে আরবী হরফ বাংলাতে প্রবর্তনের আন্দোলন গঠনের চেষ্টা করেন। ঐ প্রচেষ্টার সাথে টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ওসমান গণি এবং আরমানীটোলা ইস্কুলের 'মৌলভী'

মৌলানা আবদুর রহমান বেখুদও যুক্ত ছিলেন।[৬] জুলফিকর আলী 'পূর্ব বাঙলা ভাষা কমিটির' উর্দু হরফ সাব কমিটির সদস্যও মনোনীত হয়েছিলেন এবং সেই হিসাবে মূল কমিটির কাছে বাংলা ভাষায় উর্দু হরফ প্রবর্তনের সুপারিশও তিনি করেন।[৭]

এ সম্পর্কে পূর্ব বাঙলার শিক্ষা বিভাগের প্রাক্তন ডিরেক্টর আবদুল হাকিম বলেন :

জনৈক বাঙালী উষীর সাহেবের* নিজের উর্দু জ্ঞান সম্পর্কে ঢাকাতে কিছু কিছু হাস্যোদ্দীপক কিংবদন্তী শ্রুত হয়।...ইনি কেন্দ্রের সর্বশক্তিমান উর্দু মহলে বাহবা পেতে চেয়ে বাংলা ভাষাকে "হুরুফুল কুরআন" দ্বারা সুশোভিত করবার জন্য তাঁর উদগ্র আকাঙ্ক্ষাকে কার্যকরী করতে চেয়েছিলেন। এজন্য বই-পুস্তক প্রকাশনার জন্য বার্ষিক ৩৫ হাজার টাকার একটা কেন্দ্রীয় মঞ্জুরীও তিনি পূর্বোক্ত প্রাদেশিক শিক্ষা সেক্রেটারীর** হাতে দেবার ব্যবস্থা করেন।

এদিকে শিক্ষা সেক্রেটারী পূর্বে চাটগাঁয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে তথাকার জনৈক স্কুল-মৌলবীকে হাত করেছিলেন। মৌলবী সাহেব বৃদ্ধ ও নিতান্তই ভাল মানুষ। তিনিই "হুরুফুল কুরআন" নামের উদ্ভাবক ও এ বিষয়ে কতগুলি বই-পুস্তকের রচক। তিনি তাঁর সরল, কিন্তু ভ্রান্ত বিশ্বাস মতে মনে করতেন যে মুসলমানদের জন্য শুধু "হুরুফুল কুরআন" হবে একমাত্র লিখন পদ্ধতি; তাদের অন্য কোনো হরফ শেখবার দরকার নেই। তিনি একদিন আমাকে এ বিষয়ে কিছু উপদেশ দিতে চেষ্টা করেছিলেন। শিক্ষা-বিভাগীয় সেক্রেটারী এই ব্যক্তির "হুরুফুল কুরআন" পরিকল্পনা সম্পর্কে বেনামে ইংরেজী ভাষায় পুস্তিকা প্রচার করে অবুঝ বাঙালীদেরকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে একমাত্র "হুরুফুল কুরআনই" আমাদের পূর্ব বাঙলার ভাষা সমস্যা সমাধান করবে। এই পরহেজগার, নিঃস্বার্থ কিন্তু একাদশদর্শী বাঙালী মৌলবীকে সামনে রেখে বাংলা ভাষা নিধন ব্রতে পূর্বোক্ত চক্র অগ্রসর হতে থাকে। এই চক্রের বিরোধিতা করার জন্য তৎকালীন বাঙালী শিক্ষা ডিরেক্টর (ডি.পি.আই.) নানা বাহানায় প্রদেশের বাইরে স্থানান্তরিত হন এবং তাঁর স্থলে জনৈক উর্দুভাষী অবাঙালীকে† ডিরেক্টর করা হয়।

*ফজলুর রহমান—ব. উ.

**ফজলে আহমদ করিম ফজলী—ব. উ.

†উত্তর প্রদেশের ফজলুর রহমান—ব. উ.

এই শেষোক্ত ব্যক্তির হঠাৎ অকাল মৃত্যু ঘটে বাংলা-ভাষা-আন্দোলনকালে (১৯৫২ ফেব্রুয়ারি) হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হবার ফলে। তার পর আমি কয়েকদিনের জন্য ঐ পদে বসি। তখন তাঁর পরিত্যক্ত কাগজ-পত্রের ভেতর দেখা গেল যে তিনি প্রাদেশিক সরকারকে একটি প্রস্তাবে বলেছিলেন যে বাঙালী মুসলমানদের ভাষা উর্দুরই একটি রূপান্তর মাত্র এবং উর্দু হরফে লিখলে ইহা উর্দু বলেই মনে হবে।[৮]

২॥ কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

১৯৪৯ সালের গোড়ার দিকেই কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড বাংলা ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা আরবী হরফে লেখার ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ পেশ করেছেন বলে একটি খবর প্রচারিত হয়। পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন চলাকালে ২৯শে মার্চ মনোরঞ্জন ধর পরিষদে এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী আবদুল হামিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এর জবাবে মন্ত্রী একটি লিখিত বিবৃতিতে বলেন যে, শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড পূর্ব বাংলা অথবা অন্য কোনো প্রাদেশিক সরকারের কাছে অনুরূপ কোনো প্রস্তাব বা সুপারিশ পেশ করেন নাই।[১]

সরকারীভাবে প্রাদেশিক মন্ত্রী আরবী হরফ প্রবর্তনের ষড়যন্ত্রকে অস্বীকার করলেও সে বিষয়ে ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্দেহের অবসান ঘটেনি। এই সন্দেহের মূল কারণ প্রশ্নটি শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের বিবেচাধীন ছিলো। আরবী হরফকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে বাঙালীদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ছাত্র সম্প্রদায় এবং জনসাধারণকে সাবধান করার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের 'ভাষা কমিটির' পক্ষ থেকে নঈমুদ্দীন আহমদ সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করেন :

> পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত গত বছরের প্রস্তাবটি উর্দু চাপানোর চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল। আর একই পরিষদে গৃহীত প্রস্তাবকে বাতিল করতে পারে না। ভবিষ্যতে নব নির্বাচিত পরিষদও এ প্রস্তাবকে নাকচ করবার সাহস করবে না। কাজেই উর্দুর জন্য সামনের দুয়ার যখন রুদ্ধ তখন আরবী বর্ণমালার জিগীর তুলে পশ্চাৎ দুয়ার দিয়ে উর্দু প্রবর্তনের চেষ্টা হচ্ছে এবং পরিষদে গৃহীত প্রস্তাব ও বাংলা ভাষাকে খতম করবার ষড়যন্ত্র চলছে। যখনই আলেম সমাজ আরবীকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানিয়েছেন তখনই এঁরা নীরবতা অবলম্বন করেছেন। আরবীকে

বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় ভাষা করার ব্যাপারেও এঁদের মুখে কথা নেই।

সে জিনিসটা পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীদের মনে সবচেয়ে বেশী আলোড়নের সৃষ্টি করেছে সেটা হচ্ছে এই যে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত লোকের হার শতকরা ১২ থেকে ১৫ জন; কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে শতকরা ৫ জনেরও কম। আরবী বর্ণমালার দোহাই দিয়ে শতকরা এই ১৫ জন শিক্ষিতকে কলমের খোঁচায় অশিক্ষিতে পরিণত করবার চেষ্টা চলেছে। এমনিভাবে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকারও ইংরেজী প্রচলন করে ভারতের আরবী-পারশী শিক্ষিত মুসলমানকে কলমের এক খোঁচায় অশিক্ষিতে পরিণত করবার ষড়যন্ত্রে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। আরবী বর্ণমালা প্রচলিত হলে পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষিতের হার ঠিকই থাকবে। পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিতের হার শতকরা ১৫ থেকে নেমে আসবে নগণ্য ভগ্নাংশে। শিক্ষক অভাবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমান অবস্থাতেই অচল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। এমতাবস্থায় সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় অশিক্ষিত বলে পরিগণিত হোলে পূর্ব পাকিস্তানের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই বানচাল হয়ে যাবে।

কাজেই 'তোগলকী' প্ল্যানের উদ্যোক্তাদের আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই যে আরবী বর্ণমালার ধূয়া তুলে গত বছরের ভাষা প্রস্তাবকে নাকচ করার ষড়যন্ত্রকে আমরা কোনোমতেই সহ্য করে নেব না।[২]

এর পর ভাষা সংস্কার কমিটি প্রসঙ্গে নঈমুদ্দীন আহম্মদ বলেন :

আফসোসের বিষয় পরিষদের এ সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার জন্য গত তের মাসের মধ্যে সরকারের তরফ হইতে কোনো চেষ্টা হয় নাই। অন্ততঃ চার বার ভাষা সংস্কার কমিটি গঠনের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে এবং জনাব মওলানা মহম্মদ আকরাম খাঁ সাহেব প্রত্যেকবারেই এ সংবাদ অস্বীকার করিয়াছেন। প্রকাশ শিক্ষা দফতর হইতে ভাষা সংস্কার কমিটি নিয়োগ সম্পর্কীয় ফাইলটা গত বার মাস নিখোঁজ থাকে এবং আজও নাকি তাহা পাওয়া যায় নাই। বর্তমান বাজেট অধিবেশনের পূর্ব মুহূর্তে ভাষা সমস্যা বিশেষ করিয়া বর্ণমালা সম্পর্কীয় আন্দোলন যখন দানা বাঁধিয়া উঠিতে শুরু করে ঠিক সেই সময় উহা বন্ধ করার জন্যই একটা কমিটির নাম প্রচার করা হয়। সত্যিকার ভাষাবিদদের বাদ দিয়া যিনি বাংলা ভাষার জন্য জেহাদ করিতে চাহিয়া পরে চুপ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাকেই সভাপতি এবং জনৈক উর্দু সমর্থককে কমিটির সেক্রেটারী নিযুক্ত করা

হইয়াছে। কমিটির সদস্যদের মধ্যে চক্ষু ও ক্ষত চিকিৎসকও আছেন। কমিটিতে দুইজন ভাষাবিদ্‌কে অবশ্য লওয়া হইয়াছে, সম্ভবতঃ সে শুধু লোক দেখানোর জন্যই।

আমরা দ্বিধাহীন ভাষায় জানাইয়া দিতে চাই যে আরবী বর্ণমালার ধূয়া তুলিয়া গত বছরের ভাষা প্রস্তাবকে নাকচ করার চেষ্টা, ছাত্র সম্প্রদায় ও জনসাধারণ বরদাস্ত করিবে না।[৩]

এর পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় নিম্ন-কর্মচারী ধর্মঘট শুরু হওয়ার ঠিক পরই ফজলুল হক হল মিলনায়তনে ৫ঠা মার্চ বিকেল ৪-৩০ মিঃ 'পূর্ব পাকিস্তানের হরফ সমস্যা' এবং 'সোজা বাংলা' প্রবর্তন সম্পর্কে তমদ্দুন মজলিসের সাহিত্য শাখার উদ্যোগে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত স্থায়ী সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ আবদুর রহমান খান। 'সোজা বাংলা'র উপর ডক্টর শহীদুল্লাহ্ একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এর পর আলোচনা করেন কাজী মোতাহার হোসেন এবং সৈনিক সম্পাদক শাহেদ আলী। চাটগাঁ সরকারী কলেজের অধ্যাপক ফেরদৌস খানের লেখা একটি ইংরেজী পুস্তিকার সহজ বাংলা অনুবাদ পাঠ করে সকলকে শোনান। পরিশেষে সভায় বাংলা ভাষার হরফ নির্ধারণের দায়িত্ব সত্যিকার ভাষা বিশেষজ্ঞদের উপর ছেড়ে দেওয়ার দাবী জানিয়ে শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দাসূচক একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।[৪]

পূর্ব বাঙলার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌দের প্রতিবাদ জ্ঞাপনের সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও এ ব্যাপারে সুষ্ঠুভাবে চিন্তা ভাবনা শুরু করেন এবং ১৯৪৯-এর এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে হরফ প্রশ্ন সম্পর্কে পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড ও বর্ণমালা বিবেচনার বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়।[৫] এই স্মারকলিপিটিতে তাঁরা বলেন:

আমরা মনে করিতেছি যে, আরবী হরফ প্রণয়ন প্রচেষ্টার দ্বারা পৃথিবীর ষষ্ঠ স্থানাধিকারী বিপুল ঐশ্বর্যময়ী ও আমাদের জাতীয় জীবনের গৌরবের ঐতিহ্যবাহী বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর হামলা করা হইতেছে। পাকিস্তানের জাতীয়তার ভিত্তি দৃঢ়তর করিতে, জাতীয় সংস্কৃতিকে অগ্রগামী করিতে এবং দুনিয়ার অন্যান্য জাতির সহিত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় ইহাকে আত্মনির্ভরশীল ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হইয়া বাংলার মতো একটি আঞ্চলিক প্রগতিশীল ভাষা,

সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর এই প্রকার নির্বোধ আক্রমণ কেবলমাত্র আমাদের জাতীয় জীবনের বন্ধ্যাত্ব এবং পশ্চাদ্‌গতিই টানিয়া আনিবে না বরং ইহার অপমৃত্যুই ডাকিয়া আনিবে। এতএব সংস্কার মোহ এবং স্বার্থশূন্য দৃষ্টিতে আমরা আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ আইন পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ এবং জাগ্রত জনসাধারণকে বিষয়টি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ হইতে ধীর ও স্থির মস্তিষ্কে বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে আরজ জানাইতেছি। নিঃসন্দেহে বাংলায় আরবী হরফ প্রণয়ন যে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনের অগ্রগতিকে চিরতরে রুদ্ধ করিয়া দিবে তাহার স্বপক্ষে আমরা নিম্নলিখিত বৈজ্ঞানিক ও পক্ষপাতশূন্য যুক্তি উপস্থাপিত করিতেছি :

'পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড পাকিস্তানের প্রাদেশিক ভাষাগুলির জন্য আরবী হরফের যে সুপারেশ করিয়াছেন একমাত্র বাংলার উপরই তাহার আঘাত তীব্র এবং ব্যাপকভাবে পড়িবে। পাঞ্জাবী, সিন্ধী, ব্রাহুই, বেলুচী, পুষ্‌তু এবং বাংলা—পাকিস্তানের এই প্রাদেশিক ভাষাগুলির মধ্যে একমাত্র বাংলাই সাহিত্য সম্পর্কে ভাব ঐশ্বর্যে, প্রকাশভঙ্গীর ঔৎকর্ষে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলির মধ্যে অন্যতম। অন্যান্যগুলির সাহিত্যে কোনো চর্চা নেই এবং বর্তমানে এই মৃতকল্প ভাষাগুলি উর্দু হরফেই লিখিত হইতেছে। কাজেই হরফ পরিবর্তনের আঘাত পাকিস্তানের সর্বপ্রধান এবং অধিক সংখ্যক লোকের ভাষা বাংলার উপরই পড়িবে। অনভিজ্ঞ এবং মূর্খ লোকেই শুধু বলিতে পারে হরফ পরিবর্তনে ভাষার কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। পাকিস্তানের প্রদেশগুলির এবং মুসলিম দেশগুলির সাংস্কৃতিক ঐক্যের অজুহাত কি হরফ পরিবর্তনের প্রধান যুক্তি। কিন্তু সাংস্কৃতিক ঐক্যের উপায় কি হরফ? ইহা যাহারা বলে, হয় তাহারা কিছুই বুঝে না, না হয় লোককে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করে।

রাজনৈতিক 'ভুঁইফোড়েরা' বা সাংস্কৃতিক অপগণ্ডের দল হরফকে ঐক্যের উপায় মনে করিতে পারে, কিন্তু সাংস্কৃতিক ঐক্যের উপায় পারস্পরিক সাংস্কৃতির প্রতি দরদ। পাকিস্তানের সংস্কৃতি যদি সর্বাঙ্গীন বিকাশ এবং পরিপূর্ণ উৎকর্ষ লাভ করে তাহা হইলেই মাত্র অন্যান্য মুসলিম দেশগুলির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া সাংস্কৃতিক ঐক্যের পথ পরিষ্কার করিতে পারে। পাকিস্তানের প্রতিটি অঞ্চল, প্রতিটি শহর, গ্রাম যদি পরিপূর্ণভাবে আত্ম-প্রকাশ করিতে পারে তবেই পাকিস্তানের সুস্থ সবল সর্বাত্মক-সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিতে পারে। কিন্তু অবাঞ্ছনীয় জেদ এবং ক্ষুদ্র স্বার্থের বশবর্তী

হইয়া যদি পাক-বাঙলার আত্ম-সংস্কৃতির উৎকর্ষের পথ বন্ধ করা না হয়, তাহা হইলে পাকিস্তানের সামগ্রিক সংস্কৃতিকেই আঘাত করা হইবে, মুসলিম জাহানের ঐক্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে, ।···

পাক-বাঙলার শতকরা ৯৫ জন অশিক্ষিত লোকের মধ্যে দ্রুত শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন। বহুসংখ্যক শিক্ষিত লোককে এই কার্যের জন্য অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু বাংলা হরফ পরিবর্তনের মধ্য দিয়া পাক-বাঙলার শিক্ষিত সমাজকে অশিক্ষিতের শ্রেণীতে পরিণত করার চক্রান্ত সফল হইলে কে তাহাদিগকে শিক্ষা দান করিবে? এ পর্যন্ত যে লক্ষ লক্ষ পুস্তক বাংলা ভাষায় ছাপা হইয়াছে কে কবে সেগুলিকে আরবী হরফে রূপান্তরিত করিবে? হরফ পরিবর্তনের পশ্চাতে আছে শিক্ষা বিস্তারকে ব্যাহত করিবার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র।

হরফ পরিবর্তনের মধ্য দিয়া পাক-বাঙলার শিক্ষিত সমাজের উপরও ঘৃণিত আঘাত নামিয়া আসিতেছে। হরফ পরিবর্তনের বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিশাহারা শিক্ষিত সমাজ সৃষ্টির অনুপ্রেরণাকে স্থায়ীরূপ দান করিতে পারিবে না। আজাদীর মধ্য দিয়া লব্ধ পাক-বাঙলার নূতন জীবন চেতনাকে যদি হরফ পরিবর্তনের অছিলায় ব্যর্থ করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক জীবনের অপূরণীয় ক্ষতি হইবে। আঞ্চলিক প্রভুত্ব লাভের দুরাকাঙ্খা এমনিভাবে পাকিস্তানের শত্রুতা করিতে যাইতেছে। পাক-বাঙলার মনে নূতন পরাধীনতার আশঙ্কাকে কায়েম করিয়া তুলিতেছে। সংস্কারমুক্ত মন লইয়া মুক্তির আলোকে বিচার করিয়া দেখা যায়।

এর পর বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা নিজের বক্তব্যকে আরও সরাসরি-ভাবে উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে বলেন :

(১) বাংলাকে আরবী হরফে লিখিতে হইলে নূতন যে প্রতীকগুলি গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা শিখিবার জন্য একজন আরবী জানা লোকের যে পরিমাণ শ্রম ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা অনেক কম শ্রম অধ্যবসায়ে বাংলা হরফ শিক্ষা করা সম্ভব।

(২) কাজেই কোরান তেলাওয়াতের জন্য আরবী হরফ শিখিতে হয় বলিয়া আরবী হরফে বাংলা লিখিত হইলে লোকের শ্রম লাঘব হইবে তাহা বলা চলে না।

(৩) লিখন পঠনে আরবী হরফ বাংলা হরফ হইতে অধিক সময় লয়।

(৪) বাংলা হরফকে অতি সহজে টাইপ লিথো-টাইপ প্রভৃতির উপযোগী

করিয়া লওয়া যাইতে পারে। আরবী হরফে তাহা সম্ভব নহে।

(৫) নূতন শিক্ষার্থীর পক্ষে আরবী হরফ (বাংলা ধ্বনি-তত্ত্বের অনুযায়ী) শিক্ষা অপেক্ষা বাংলা হরফ শিক্ষা সহজ।

(৬) হরফ পরিবর্তনের ভিতর শিক্ষার দ্রুত প্রসার ব্যাহত হইবে।

(৭) পাক বাঙলার শিক্ষিত লোকের উপর যে আঘাত আসিবে, তাহাতে সারা পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক পুষ্টি অবাঞ্ছনীয়ভাবে ব্যাহত হইবে।

(৮) বাংলা-ভাষার সর্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টি ও উন্নত বাচনভঙ্গীর সহিত হরফ পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে পাক-বাঙলার ভাষা-সাহিত্য-বিজ্ঞান প্রভৃতির গভীর ভাব প্রকাশের অনুপযোগী হইয়া পড়িবে।

(৯) বাংলাকে আরবী হরফে লিখিলেই উহার সহিত আরবী হরফ জানা লোকের পরিচয় স্থাপিত হইবে না।

উপরোক্ত বক্তব্য পেশ করিবার পর স্মারকলিপিটির শেষে তাঁরা নিম্নলিখিত দাবী উত্থাপন করেন :

এই সকল বিবেচনা করিয়া, পাকিস্তানকে সম্পদ ও সংস্কৃতিতে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র হিসাবে দেখিতে চাই বলিয়া আমাদের দাবী অন্ধ সংস্কার ও ক্ষুদ্র স্বার্থের উর্ধ্বে উঠিয়া হরফ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। বাংলা হরফকে পরিবর্তন করা চলিবে না। পাক-বাঙলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর কসাইয়ের মতো ছুরি চালনা করা চলবে না। পাক-বাঙলার তাহজীব ও তমদ্দুনকে পাকিস্তানের সামগ্রিক তমদ্দুনের একটি সবল অংশ হিসাবে গড়িয়া উঠিবার সুযোগ দিতে হইবে। শিক্ষা বিস্তারকে সহজতর করিতে হইবে।

আমরা আশা করি পাকিস্তানেরর শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড আমাদের দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া পাকিস্তানের ঐক্য এবং উন্নতির প্রতি তাঁহাদের নিষ্ঠার পরিচয় দিবেন।

বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের স্মারকলিপি প্রেরণের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের প্রতিবাদ সীমাবদ্ধ ছিলো না। বিভিন্ন সভা-সমিতির মাধ্যমেও তাঁরা শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটির নানা সুপারিশের বিরুদ্ধাচরণ করেন। ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সংসদের কার্যকরী পরিষদের এক সভায় আরবী হরফে বাংলা ভাষা লিখিবার তীব্র বিরোধিতা করা হয়। সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে বলা হয় যে, আরবী হরফে বাংলা ভাষা লিখিবার পরিকল্পনা পূর্ব বাঙলার জনসাধারণের উন্নতির একান্ত পরিপন্থী। ঐরূপ

পরিকল্পনা যাতে কখনই কার্যকরী না হয় তার জন্য প্রস্তাবটিতে পূর্ব বাঙলা সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়।[৬]

সে দিনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা একটি পৃথক সভায় আরবী হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাবের বিরোধিতা করে একটি প্রস্তাবে দাবী জানান যে পরবর্তী ১৪ই থেকে ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের যে অধিবেশন হবে তাতে বাংলা ভাষার হরফ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত যেন গৃহীত না হয়।[৭]

১১ই ডিসেম্বর বেলা ২টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন প্রাঙ্গণে এক ছাত্র সভায় আরবী হরফে বাংলা লেখার প্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোচনা হয়। সভায় বিভিন্ন বক্তা উক্ত প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেওয়ার পর একটি প্রস্তাবে তাঁরা বলেন যে আরবী হরফ প্রবর্তিত হলে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে নিরক্ষরতা বৃদ্ধি পাবে এবং তার ফলে শিক্ষা ও রাজনীতি ক্ষেত্রে পূর্ব বাঙলার অপমৃত্যু ঘটবে। এ সম্পর্কে তাঁরা ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ ছাড়া অন্য একটি প্রস্তাবে বাংলার বিরুদ্ধে উর্দুর প্রচার কার্যের প্রতিবাদ করায় ইডেন কলেজের দু-জন ছাত্রীকে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ শাস্তি দেওয়ার যে হুমকি দেখান তারও নিন্দা করা হয়।

ঐ একই দিনে ইকবাল হলের ছাত্রবৃন্দ একটি সভায় আরবী হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। আরবী হরফে বাংলা লেখা হলে সাধারণভাবে সমগ্র পাকিস্তানে এবং বিশেষভাবে পূর্ব বাঙলায় অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হবে এই মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। জাতির সাংস্কৃতিক ও ব্যবহারিক উন্নতির স্বার্থে আরবী হরফে বাংলা পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে বাংলা হরফ ভাষা সাহিত্য ও শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে তোলার জন্যে এই সভার গৃহীত একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মহলকে অনুরোধ জানানো হয়।[৯]

একটি ছাত্র প্রতিনিধি দল ১১ই ডিসেম্বর পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁদেরকে বাংলা হরফের পক্ষ সমর্থনের জন্যে অনুরোধ জানান। এই সাক্ষাৎকারের পর জানা যায় যে অধিকাংশ পরিষদ্ সদস্যই আরবী হরফে বাংলা লেখার বিরোধী।[১০] শুধু ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেদের কর্মসূচীকে সীমাবদ্ধ না রেখে ছাত্রেরা এই সময় আরবী হরফ প্রচলনের বিরোধিতা করে বিভিন্ন এলাকায় জনসারণের স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু করেন।[১১]

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ছাড়া জগন্নাথ কলেজ, ইডেন কলেজ প্রভৃতি শিক্ষায়তনগুলিতেও আরবী হরফ প্রবর্তনের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। শুধু ঢাকা শহরেই নয়, প্রদেশের অন্যান্য স্থানেও এই ধরনের

বহু সভা-সমিতির খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।[১২] এই সমস্ত সভাগুলিতেই আরবী হরফ প্রচলনের প্রচেষ্টা থেকে বিরত হওয়ার জন্যে শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের কাছে তারা দাবী জানান।

ঢাকা এবং প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরবী হরফ প্রবর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভের ফলে সে সম্পর্কে পূর্ব বাঙলা সরকার ১৫ই ডিসেম্বর একটি প্রেসনোট[১৩] জারী করে তাতে বলেন যে বাংলা ভাষা বাংলা হরফে লেখা হবে, না আরবী হরফে লেখা হবে সেটা পূর্ব বাঙলার জনসাধারণই তাদের স্বাধীন মতামতের দ্বারা নির্ধারণ করবে। পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের অধিবেশনে এ সম্পর্কে কোনো আলোচনাই অনুষ্ঠিত হবে না। প্রেস নোটটিতে আরও বলা হয়:

> বাংলা ভাষায় আরবী হরফ চাপাইয়া দেওয়ায় ব্যবস্থা করা হইতেছে এবং এই উদ্দেশ্যেই পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের ঢাকা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতেছে—এইরূপ মিথ্যা গুজব রটাইয়া এক বিশেষ মহলের লোকেরা ঢাকার ছাত্র সমাজের মধ্যে যে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে তৎপ্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সভায় এ সম্পর্কে কোনো আলোচনাই হইবে না। কাজেই বাংলা ভাষার উপর কোনো হরফ চাপাইয়া দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। বাংলা ভাষা বর্তমান চালু হরফে লিখিত হইবে, কি আরবী হরফে লিখিত হইবে প্রদেশবাসীর স্বাধীন মতামতের দ্বারাই তাহা নির্ধারিত হইবে। যে সকল লোক স্বীয় স্বার্থসসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ছাত্র সমাজকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের এই সকল ভিত্তিহীন গুজবে বিভ্রান্ত না হইবার জন্য সরকার এতদ্বারা ছাত্রগণকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন।

কিন্তু এই সরকারী প্রেসনোট প্রকাশিত হওয়ার দিনই পাকিস্তান সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান ঢাকায় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের বৈঠকে এক বক্তৃতায়[১৪] ইসলামী নীতির ভিত্তিতে শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন এবং জাতীয়ভাষা উর্দুর সর্ববিধ উন্নতি সাধনের জন্যে দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানান। ইসলামী শিক্ষা প্রবর্তন সম্পর্কে তিনি বলেন:

> ইসলামের নীতি যে কোনো দৃষ্টিভঙ্গী হইতে পরীক্ষা করিলে ইহায় সহিত আধুনিক যুগের সর্বাধিক উন্নত বোধশক্তির নিখুঁত মিল দেখা যাইবে। সুতরাং বিশ্বের নব বিধান প্রতিষ্ঠার কার্যে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ইসলামের নীতি ও আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে।

বর্তমানে অবিলম্বে যে সমস্যার সমাধান করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন তাহা হইতেছে উৎকৃষ্টভাবে ইসলামের নীতির ভিত্তিতে শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করা।

উর্দুকে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষারূপে বর্ণনা করে তার উন্নতি সাধন সম্পর্কে ফজলুর রহমান বলেন :

উর্দুর দ্রুত উন্নতির জন্য ব্যাপক অভিযান প্রয়োজন। পল্লী অঞ্চলে প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, জনপ্রিয় সাহিত্য সৃষ্টি, অভিধান রচনা, এবং বৈজ্ঞানিক ও টেকনিক্যাল শব্দের অনুবাদ প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে একান্ত অপরিহার্য। ··সিন্ধু ব্যতীত পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র উর্দুর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। শিক্ষার মাধ্যমিক অবস্থায় সিন্ধু ও পূর্ব পাকিস্তানে বাধ্যতামূলকভাবে উর্দু শিখিতে হইবে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ইংরেজীর স্থলে উর্দুর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার প্রশ্নটি ইহার সহিত জড়িত। শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের বিভিন্ন বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তেও এ সম্পর্কে মতবিরোধ রহিয়া গিয়ছে। এই কারণে সরকারও এই প্রশ্নটি সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করিতে পারেন নাই। এতদুপরি, কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসসমূহের কার্য পরিচালনার জন্য উর্দুকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

উর্দুর সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড একটি কমিটি গঠন করুন এই আমার অভিমত। প্রাদেশিক সরকারও উর্দু ভাষার জন্য উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত কাজ করিবেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।

ঐ একই দিনে শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের বৈঠকের উদ্বোধনকালে পূর্ব বাঙলার গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক বোর্ন বলেন[৫] যে শিক্ষার সকল স্তরে বাংলা ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত। পাকিস্তানে সাধারণ ভাষা হিসাবে উর্দু প্রত্যেক সরকারী এবং বেসরকারী বিদ্যালয়ে অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণী হইতে উর্ধ্বতন শ্রেণীতে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষণীয় ভাষা হওয়া উচিত।

১৬ই ডিসেম্বর ঢাকাতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের তৃতীয় অধিবেশন শেষ হয়। শিক্ষা বোর্ডের এই তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত বৈঠকসমূহে বাংলা ভাষা সম্পর্কে কোনো আলাপ আলোচনার সূত্রপাত না হলেও উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের উপায় উদ্ভাবনের জন্যে বোর্ড একটি উচ্চ ক্ষমতাশালী কমিটি নিয়োগের সুপারিশ করেন। যেহেতু উর্দুতে সরকারী ও ব্যবসায় সংক্রান্ত কার্যাবলী পরিচালনার

জন্যে এ জাতীয় শব্দাবলীর প্রয়োজন সেজন্যে উল্লিখিত কমিটি উর্দু অভিধান ও বিশ্বকোষ প্রণয়ন এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ও টেকনিক্যাল শব্দাবলীর উর্দু প্রতিশব্দও তৈরী করবেন।

এর পর অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বাংলা ভাষায় আরবী হরফ প্রচলনের ষড়যন্ত্র হিসাবে তাঁরা শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের এই অধিবেশনে বলেন যে যদি কোনো ছাত্র তার মাতৃভাষার হরফে লিখিত পুস্তকাদি পাঠে আপত্তি করেন তাহলে তার সেই আপত্তিকে বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে।[১৬]

উর্দু ভাষার সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্যে ফজলুর রহমানের উদ্যোগে ১৯৫০ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড কর্তৃক একটি কমিটি যথারীতি গঠিত হয়।[১৭] ১৯ জন সদস্য নিয়ে গঠিত এই কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন 'বাবায়ে উর্দু' ডক্টর আবদুল হক।

৩॥ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আরবী হরফ প্রচলনের উদ্যোগ

কেন্দ্রীয় শিক্ষা দফতরের উদ্যোগে ১৮ই এপ্রিল, ১৯৫০, থেকে পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন জেলায় মোট ২০টি কেন্দ্রে আরবী হরফে বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার কাজ শুরু করা হয়। সরকারী মহলের সূত্রে জানা যায় যে প্রত্যেক শিক্ষা কেন্দ্রে ২৫ থেকে ৩৫ জন ছাত্র শিক্ষা গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে এবং ছয় মাসকাল তারা ঐ সব কেন্দ্রে শিক্ষা লাভে নিযুক্ত থাকবে।[১]

১৯৪৯ সালে প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা দান পরিকল্পনা খাতে কেন্দ্রীয় সরকার মোট ৩৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। কিন্তু ১৯৫০ সালে সেই টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে তাঁরা এই খাতে ব্যয় বরাদ্দ করেন ৬৭ হাজার ৭৬৩ টাকা।[২] এই সমস্ত টাকাই অবশ্য পূর্ব বাঙলার ক্ষেত্রে খরচ হয় আরবী হরফে বাংলা প্রচলনের প্রচেষ্টায়। প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য অস্থায়ীভাবে গৃহীত পাঠ্য তালিকানুযায়ী কেন্দ্রীয় খরচে তাঁরা আরবী হরফে বাংলা বই ছাপান এবং সেই সমস্ত বই বিনামূল্যে ছাত্রদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেন।[৩] এ ছাড়া আরবী হরফে বাংলা পাঠ্য পুস্তক রচনাকারীদেরকে পুরস্কার দান করা হবে, এই মর্মে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তিও প্রচার করা হয়।[৪]

আরবী হরফে বাংলা ভাষা শিক্ষা দানের এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে পূর্ব বাঙলা ভাষা সংস্কার কমিটির সদস্য ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এক বিবৃতি[৫] প্রসঙ্গে বলেন:

এছলামী ভাবধারায় উর্দু বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। কাজেই পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের মাতৃভাষা যাহাই হউক না কেন, উর্দু শিক্ষার মারফত তাঁহারা বিশেষ লাভবান হইবেন। কিন্তু উর্দু হরফের সাহায্যে বাংলা শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করিয়া অর্থ অপব্যয়ের কি মানে থাকিতে পারে?

আশ্চর্যের কথা এই যে, উহার সহিত পূর্ব বঙ্গ সরকারের কোনো সম্পর্ক নাই। এই অর্থহীন ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন। আমার আশঙ্কা হয়, উহা বন্ধ করা না হইলে সরকারী টাকা অপব্যয় করা হইবে।

এর পূর্বেই সেপ্টেম্বর মাসে মৌলানা আকরাম খানের সভাপতিত্বে গঠিত পূর্ব বাঙলা ভাষা কমিটি তার চূড়ান্ত রিপোর্টে বাংলা ভাষায় আরবী হরফ প্রচলন অন্ততঃ বিশ বৎসর স্থগিত রাখার জন্যে সুস্পষ্টভাবে সুপারিশ করেন। ডক্টর শহীদুল্লাহ তাঁর বিবৃতিতে এই সুপারিশের প্রতিও সরকার এবং জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

পাকিস্তান সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান কিন্তু সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে বাংলা ভাষায় আরবী হরফ প্রচলনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ১১ই অক্টোবর, ১৯৫০, কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তীর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন[৬] যে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাঙলার প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা কেন্দ্রগুলির জন্যে ইতিমধ্যে প্রায় ৩১ হাজার টাকা ব্যয় করেছেন। তিনি আরও বলেন যে উপদেষ্টা বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী আরবী হরফে লিখিত বাংলা ভাষায় শিক্ষা দান পরিকল্পনার যে কাজ শুরু হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার তা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে কাজ চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিসের একজন স্থায়ী অফিসারকে স্পেশাল অফিসার হিসাবে নিযুক্ত করেছেন। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে পূর্ব বাঙলা সরকারের শিক্ষা ও রেজিস্ট্রেশন সেক্রেটারীকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার একটি স্ট্যাণ্ডিং কমিটিও গঠন করেছেন।

ফজলুর রহমান এ প্রসঙ্গে দাবী করেন যে উপরোক্ত শিক্ষা কেন্দ্রগুলি প্রাপ্ত বয়স্কদেরকে আরবী হরফে বাংলা ভাষা শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি করে চলেছে এবং জনসাধারণের কাছে অত্যন্ত পরিচিত হয়ে উঠছে। এর প্রমাণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন যে সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে স্থানীয়

জনগণের প্রচেষ্টায় ইতিমধ্যে ৩৭টি অনুরূপ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করেছে।

এর প্রায় এক বছর পর পূর্ব বাঙলা সরকার আরবী হরফে শিশুদেরকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[৭] ১৯শে সেপ্টেম্বর তাঁরা জানান যে পূর্ব বাঙলায় মুসলমান শিশুদেরকে প্রাথমিক অবস্থায় আরবী হরফের মাধ্যমে তাঁরা শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং সেই সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার জন্যে প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসারদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নোতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী শিশুরা ১ম এবং ২য় শ্রেণীতে আরবী অক্ষর পরিচয় শিক্ষা করবে এবং ৩য় শ্রেণীতে তাদেরকে আমপারা (কোরানের প্রথম পাঠ) শিক্ষা দেওয়া হবে।

এ ছাড়া প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষা পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে ২৩ জন সদস্য নিয়ে প্রাদেশিক সরকার 'পূর্ব বাঙলা শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার কমিটি' নামে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। মৌলানা আকরাম খান এই কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে দেশের পরিবর্তিত অবস্থা ও ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে পুনর্গঠনের কাজে সরকারকে পরামর্শ দানই এই কমিটি নিয়োগের উদ্দেশ্য বলে নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানান হয়।[৮]

এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার মাত্র কয়েকদিন পরই 'শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিটির' সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আকরাম খান ২৪শে সেপ্টেম্বর এক বিবৃতি[৯] প্রসঙ্গে আরবী হরফে শিশুদেরকে শিক্ষাদানের সরকারী উদ্যোগে বিস্ময় প্রকাশ করে তার প্রতিবাদে বলেন :

> প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রথম শ্রেণী হইতে বালকবালিকাদিগকে আরবী হরফ শিক্ষাদান এবং চতুর্থ শ্রেণী হইতে উর্দু অবশ্য পাঠ্য বিষয় হিসাবে প্রবর্তন করার জন্য পূর্ব পাকিস্তান সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া এ. পি. পি. যে খবর পরিবেশন করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে প্রাদেশিক সরকার পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিটি নামক একটি ব্যাপক শক্তিসম্পন্ন কমিটি গঠন করেন। প্রদেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক মাদ্রাসা এবং মহিলা ও সংখ্যালঘুদের শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন করা সম্পর্কে পরামর্শ দান করার জন্যই এই কমিটি গঠন করা হইয়াছিল। প্রদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। সদস্যদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি, আলীয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল খান-

বাহাদুর জিয়াউল হক, শামসুল উলেমা মওলানা আবু নাসের ওয়াহিদ ও মওলানা জাফর আহমদ ওসমানীর নাম অন্যতম।

১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই কমিটি প্রাদেশিক সরকারের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সোপারেশ করিয়াছিলেন। শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কীয় অন্যান্য বিষয়ের চূড়ান্ত সোপারেশও ১৯৫১ সালের জুন মাসে প্রাদেশিক সরকারের নিকট পেস করা হইয়াছে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ কি জন্য জানি না, এই সোপারেশ সরকার জনসাধারণের খেদমতে প্রকাশ করেন নাই। কি জন্য এই সোপারেশ করা হয় নাই তাহা সরকারই ভালভাবে জানেন। ইহা প্রকাশ করা হইলে প্রদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কমিটি যে সোপারেশ করিয়াছেন, প্রদেশবাসী তাহা প্রত্যক্ষ জানিবার সুযোগ লাভ করিতে পারিতেন। উপরোক্ত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কমিটির সভাপতি হিসাবে সরকারের সাম্প্রতিক প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কীয় সিদ্ধান্ত এবং কমিটির প্রকৃত অবস্থা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে কর্তব্য বলিয়া আমি মনে করি। যথাযোগ্য বিবেচনা ও কমিটির সদস্যবর্গের ব্যাপক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত বহু প্রশ্নের উত্তর হিসাবে প্রাপ্ত জনগণের মতামতের উপর নির্ভর করিয়া যে সব সোপারেশ করা হইয়াছে, ইহার মধ্যে কয়েকটি নিম্নে প্রকাশ করা হইল :

(ক) প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত হইবে না। প্রাথমিক পর্যায়ে কেবলমাত্র মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়ার নীতি সর্বজনস্বীকৃত। এই নীতি ১৯৪৭ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা সচিব জনাব ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে করাচীতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে গৃহীত হইয়াছিল। উপরন্তু পাকিস্তানের শিক্ষা সম্বন্ধীয় পরামর্শ বোর্ডও এই নীতি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

(খ) আরবী বর্ণমালা শিক্ষাদান এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে কোরান ও দীনিয়াত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা তৃতীয় শ্রেণী হইতে কায়েম করা উচিত। পঞ্চম শ্রেণী হইতে আরবী শিক্ষা দান সম্পর্কীয় সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, গভীরভাবে বিবেচনার পর গৃহীত কমিটির সোপারেশ সরকার কর্তৃক সরাসরি বাতেল এবং উপরে উল্লিখিত দুইটি অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের নির্দেশকে বরখেলাপ করা হইয়াছে।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সরকারী উদ্যোগে গঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও

কমিটির সুপারিশ এবং জনগণের সুস্পষ্ট ইচ্ছাকে উপেক্ষা করেই কেন্দ্রীয় সরকার নিজেদের প্রয়োজনমতো পূর্ব বাঙলার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নেন। কখনো তাঁরা সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীনে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেন এবং কখনও বা প্রাদেশিক সরকারের মাধ্যমে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলের উদ্যোগ নেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের এই সব প্রচেষ্টা মাঝে মাঝে এত নগ্ন হামলার আকার ধারণ করে যে সরকারের বশংবদ ব্যক্তিরাও তার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হন। মৌলানা আকরাম খানের উপরিউদ্ধৃত বিবৃতি তারই অন্যতম উদাহরণ।

৪॥ আরবীকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব

বাংলা ভাষায় আরবী হরফ প্রচলনের ষড়যন্ত্রের পাশাপাশি আরবীকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে দেশের বিভিন্ন স্তরের কিছু ব্যক্তি নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেন। এঁদের মধ্যে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ভূমিকাই সব থেকে উল্লেখযোগ্য এবং ভাষা সম্পর্কে তাঁর অন্যান্য বক্তব্যের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। তিনি উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করার এবং বাংলা ভাষায় আরবী হরফ প্রবর্তনের ঘোর বিরোধিতা সত্ত্বেও ধর্মীয় কারণে আরবীর প্রতি একটা বিশেষ দুর্বলতা এর পূর্বেও ব্যক্ত করেছেন। কয়েক বছর পূর্বে তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, 'সেদিন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম সার্থক হইবে, যেদিন আরবী সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে গৃহীত হইবে।'[১]

পূর্ব পাকিস্তান আরবী সংঘ নামে একটি প্রতিষ্ঠানের কার্যকারী সমিতি ডক্টর শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তান গণ-পরিষদে পেশ করার জন্য একটি খসড়া স্মারকলিপি[২] অনুমোদন করেন। তাতে আরবীকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ এবং শহরের বিভিন্ন কেন্দ্র ও মফঃস্বলে 'দরসে কোরানে'র ব্যবস্থা করার জন্যে সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়।

এর পর ১৮ই জানুয়ারি, ১৯৫০, রাজশাহী কলেজের কিছু সংখ্যক ছাত্র আরবীকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে কলেজ কমনরুমে একটি সভা আহ্বান করেন। সেখানে প্রাদেশিকতা দূর করার উপায় হিসাবে আরবীকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করা হয়। আরবী ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে আইন মোতাবেক আন্দোলন

চালানো হবে বলে সেই সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৩]

স্টেট ব্যাঙ্কের গভর্নর জাহিদ হোসেনও আরবীকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করেন এবং তাঁর এই প্রস্তাব সিন্ধু আইন পরিষদের সদস্য এবং সিন্ধু আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর সৈয়দ আকবর শাহ কর্তৃক সমর্থিত হয়। এই প্রসঙ্গে এক বিবৃতিতে[৪] তিনি বলেন যে আরবী ভাষা প্রবর্তন করলে মুসলিম জাহানের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে এবং তার ফল-স্বরূপ রাজনৈতিক দিক দিয়ে এ দেশ লাভবান হবে।

এর পর ১৯৫১ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি করাচীতে বিশ্ব মুসলিম সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে ইসমাইলী সম্প্রদায়ের নেতা আগা খান বলেন[৫] যে আরবীকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা হলে আরব জাহান, উত্তর আফ্রিকা এবং ইন্দো-নেশিয়ার মুসলমানদের মধ্যে সাধারণ যোগাযোগ স্থাপিত হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন :

আমি খেয়ালের বশে কোনো কিছু বলিতেছি না। আমি যাহা বলিতেছি তাহা জনসাধারণের এক বিরাট অংশের নিকট অপ্রিয়। কিন্তু তবুও দুনিয়ার মুসলমানদের সম্মুখে আমার মতামত প্রকাশ না করিলে আমার কর্তব্য অসমাপ্ত থাকিবে এবং এছলামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে।

আরবীকে রাষ্ট্রভাষা করার এই সব প্রস্তাব অবশ্য পাকিস্তানের কোনো অংশেই তেমন কোনো সমর্থন লাভ করে নাই। তবে এই দাবী ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশের প্রশ্নের সাথে জড়িত থাকায় তা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রভাষা উর্দু এবং বাংলা ভাষায় আরবী হরফ প্রবর্তনের দাবীকে কতকগুলি মহলে জোরদার করে।

বিভিন্ন মহলে আরবীকে রাষ্ট্রভাষা করার যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয় তার বিরোধিতা করে পাকিস্তান বৌদ্ধ লীগের সেক্রেটারী রবীন্দ্রনাথ বর্মী ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫১, এক বিবৃতি দেন। কিন্তু এক্ষেত্রে আরবীর প্রতিবাদ করে ক্ষান্ত না হয়ে তিনি উর্দুর সমর্থনে ওকালতিও করেন :

পাকিস্তান মোছলেম লীগ কাউন্সিল সম্প্রতি এক প্রস্তাবে আরবীকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করিবার জন্য সোপারেশ করিয়াছেন। পাকিস্তানের স্রষ্টা মরহুম কায়েদে আজম এই ঢাকা শহরে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে। কারণ ইংরেজী ভাষার পর উপ-মহাদেশের অধিকাংশ লোকে উর্দু ভাষা সহজে বুঝিতে পারে। কিন্তু পাকিস্তানের কোথাও আরবী ভাষায় কথাবার্তা বলা হয় না। পাকিস্তানের সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রাদিও উর্দুতে প্রকাশিত

হয়। আমাদের মনে হয় আরবীর পরিবর্তে উর্দুই রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত।[৬]

সংখ্যালঘু বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধির পক্ষে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ওকালতি নিতান্তই অস্বাভাবিক। একদিকে রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যা লাভের ভয়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে দাবী করার অক্ষমতা এবং অন্যদিকে আরবীর মতো একটি সম্পূর্ণ বিদেশী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করার বিপদ এ দুইয়ের ফলেই খুব সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ বর্মীর উর্দু সমর্থন। কিন্তু কারণ যাই হোক অমুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধির পক্ষে এ জাতীয় বক্তব্য পেশ যে চরম সুবিধাবাদ ও মেরুদণ্ডহীনতার পরিচায়ক সে বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র কারণ নেই।

নবম পরিচ্ছেদ ॥ পূর্ব বাঙলা ভাষা কমিটি

১॥ পূর্ব বাঙলা ভাষা কমিটির প্রতিষ্ঠা

'পূর্ব বাঙলায় প্রচলিত বাংলা ভাষা প্রমিতকরণ ও সহজীকরণ ও সংস্কারের প্রশ্ন' পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ৯ই মার্চ, ১৯৪৯, পূর্ব বাঙলা সরকার 'পূর্ব বাঙলা ভাষা কমিটি' নামে একটি কমিটি স্থাপন করেন।[১] ঐ একই সরকারী প্রস্তাবে (পূর্ব বাঙলা সরকার প্রস্তাব নং ৫৯০ ইডেন) নিম্নলিখিতভাবে কমিটির শর্তনির্দেশ করা হয়:

(১) পূর্ব বাঙলার জনগণের ভাষা (বাংলার ব্যাকরণ, বানান ইত্যাদি সহ) সহজীকরণ, সংস্কার ও প্রমিতকরণের প্রশ্ন বিবেচনা করিয়া সে বিষয়ে সুপারিশ করা।

(২) যে সমস্ত বিদেশী টেকনিক্যাল এবং অন্যান্য শব্দের পরিভাষা উপরোক্ত ভাষায় নেই সেগুলির জন্য নোতুন শব্দ ও ফ্রেজ কিভাবে গঠন করা যায় এবং সেগুলিকে কিভাবে যতদূর সম্ভব অনুবাদ করা যায় তার উপায় নির্দেশ করা।

(৩) উপরোক্ত ভাষাকে কিভাবে পাকিস্তান এবং বিশেষ করে পূর্ব বাঙলার প্রতিভা ও সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যায় সে বিষয়ে কমিটি অন্য যা কিছু প্রয়োজনবোধ করেন সেই অনুসারে পরামর্শ দান।[২]

মৌলানা আকরাম খানের সভাপতিত্বে সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত এই কমিটির সদস্যদের নাম নীচে উল্লিখিত হলো:

১। মৌলানা মহম্মদ আকরাম খান—সভাপতি

২। হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী, প্রাদেশিক মন্ত্রী

৩। ডক্টর আবদুল মোতালেব মালিক, প্রাদেশিক মন্ত্রী

৪। ডক্টর মোয়াজ্জেম হোসেন, ভাইস-চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৫। মৌলানা আবদুল্লাহ আল বাকী, এম. এল. এ.

৬। ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহ, অধ্যক্ষ বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৭। আবুল কালাম শামসুদ্দীন, এম. এল. এ. সম্পাদক, দৈনিক আজাদ

৮। সৈয়দ আবুল হাসনাত মহম্মদ ইসমাইল, ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিস, পূর্ব বাঙলা সরকার, ঢাকা

৯। মীজানুর রহমান, ডেপুটি সেক্রেটারী, শিক্ষা বিভাগ, পূর্ব বাঙলা সরকার

১০। মাজউদ্দিন আহম্মদ, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, মুরারীচাঁদ কলেজ, সিলেট

১১। শইখ শরাফউদ্দিন, অধ্যক্ষ ইসলামী ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ

১২। এ. কিউ. এম. আদমউদ্দিন, অধ্যাপক, ইসলামিক ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ, নওগাঁ, রাজশাহী

১৩। মৌলভী জুলভিকার আলী, স্বত্বাধিকারী, আলাবিয়া প্রেস, চট্টগ্রাম

১৪। গণেশচন্দ্র বসু, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৫। মোহিনীমোহন দাস।

১৬। গোলাম মুস্তাফা, হেড মাস্টার—সেক্রেটারী[৩]

উপরোক্ত সদস্যরা ছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদেরকে কমিটির সদস্য করা হয়:

১। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, অধ্যক্ষ বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ

২। আবদুল মজিদ, পূর্ব বাঙলা সরকারের বাংলা অনুবাদক

৩। অজিতকুমার গুহ, অধ্যাপক জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা[৩]

কমিটির কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে কমিটির মধ্যে আরও কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়। গোলাম মোস্তফা সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করতে অক্ষম হওয়ায় তাঁর পরিবর্তে ইসলামী ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ শইখ শরাফুদ্দীন ৯ই মে, ১৯৪৯, সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন। এর পর শইখ শরাফুদ্দীনের স্থানে চট্টগ্রামের বিভাগীয় স্কুল পরিদর্শক নজমুল হোসেন চৌধুরী সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। তিনি ২১শে মে, ১৯৪৯, নোতুন পদে যোগদান করে সে বছরই ৩০শে জুন অবসর গ্রহণ করেন। এর পর শিক্ষা বিভাগের আবু সাঈদ মাহমুদ ১৯শে জুলাই, ১৯৫৯, পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটির সেক্রেটারী-রূপে কার্যভার গ্রহণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যান। এ ছাড়া শিক্ষা বিভাগের আহমদ হোসেনকে অংশকালীন সেক্রেটারী হিসাবে নিযুক্ত করা হয়।[৪]

১৯৪৯-এর ডিসেম্বর মাসে ডক্টর মালেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে করাচীতে চলে যান এবং তাঁর স্থানে বেসামরিক বিভাগের মন্ত্রী সৈয়দ মহাম্মদ আফজল কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন।[৫]

গণেশচন্দ্র বসু কমিটির প্রথম বৈঠকে উপস্থিত থাকার পর আর সদস্য হিসাবে থাকতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় ১৯৫০-এর মে মাসে তাঁর স্থানে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হরনাথ পালকে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু এর পর হরনাথ পালও কমিটির সদস্য হিসাবে থাকতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় ঢাকার জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক অজিতকুমার গুহ ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন।[৬]

গোলাম মোস্তফা পর পর কমিটির অনেকগুলি বৈঠকে উপস্থিত না হওয়ার জন্যে তাঁর পরিবর্তে বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদকে ১৯৫০-এর জুন মাসে কমিটির সদস্য নিযুক্ত করা হয়।[৭] সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মোহিনীমোহন দাসের মৃত্যুর পর তাঁর স্থানে ১৯৫০-এর মার্চ মাসে কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন পূর্ব বাঙলা সরকারের তফশিলী শিক্ষার স্পেশাল অফিসার অম্বিকাচরণ দাস।[৮]

কবি গোলাম মোস্তফার সাথে পূর্ব বাঙলা কমিটির সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারে পূর্ব বাঙলা সরকারের প্রাক্তন শিক্ষা ডিরেক্টর আবদুল হাকিম বলেন:

> কবি এই সময় একটা শক্তিশালী বাংলা ভাষা বিরোধী মিশ্রচক্রের সান্নিধ্যে এসে তাদের বেড়াজালে আটকা পড়বার মতো হয়েছিলেন। চক্র নানা-ছলে রটাতে চেষ্টা করছিল যে এত বড় জনপ্রিয় বাঙালী কবিও তাদের সাথে রয়েছেন এবং বাংলা ভাষাকে উর্দু হরফে লিখবার প্রস্তাবে রাজী হয়েছেন। কবি যে ভাষা সংস্কার কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন তদ্বারা উক্ত মতের পরিপোষক সুপারিশ করাবার জন্য ঐ চক্র থেকে পীড়াপীড়ি শুরু হয়।[৯] কবিকে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন তাঁরা কখনই বিশ্বাস করতে পারতেন না যে তিনি বাংলা ভাষা বিরোধী উক্ত চক্রের সঙ্গে সহযোগিতা করে তাদের কার্যসিদ্ধির সহায়ক হতে পারেন।[১০]

এ সম্পর্কে ভাষা কমিটির অন্যতম সদস্য এবং গোলাম মোস্তফার পরবর্তী সেক্রেটারী শইখ শরাফুদ্দীন বলেন:

> আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত না হলেও কুরআন মজিদ পাঠ ও তরজমা উপলক্ষে আরবী ভাষার প্রতি তিনি বিশেষভাবে ঝুঁকে পড়েন। এমন কি তিনি বাংলা ভাষাতেও আরবী ব্যবহারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এই কারণে কেউ কেউ তাঁকে বাংলায় আরবী হরফের উদ্যোক্তা এডুকেশন সেক্রেটারী ফজলী সাহেবের ধামাধরা বলে বিদ্রূপ করতেন। কিন্তু তাঁরা বোধহয় জানেন না যে, প্রকৃত ব্যাপারটি এর বিপরীত। কারণ গোলাম মোস্তফা সাহেবকে পূর্ববঙ্গ ভাষা কমিটির সেক্রেটারী নিযুক্ত করার পরপরই ফজলী সাহেবের সঙ্গে মতবিরোধের ফলেই তিনি ঐ কমিটির

সেক্রেটারী পদ ত্যাগ করেন; এমন কি এই উপলক্ষে তাঁর আসল সরকারী চাকরি হেডমাস্টারী পদেও ইস্তফা দিয়ে তিনি নিবিষ্টভাবে সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হন।[১১]

উপরোক্ত দুইজনের বক্তব্য থেকে একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে কবি গোলাম মোস্তফা আরবী হরফ প্রবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে সরকারের সাথে বহুভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। কিন্তু একথাও আবার সত্য যে ভাষা কমিটির সেক্রেটারী হিসাবে কর্তৃপক্ষ মহলের সাথে তাঁর একটা মতানৈক্য ঘটে, যার ফলে তিনি সরাসরি ইস্তফা না দিলেও কমিটির বৈঠকগুলিতে যোগদানে বিরত থাকেন এবং সেজন্যে পরিশেষে কমিটির সদস্যপদ থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। গণেশচন্দ্র বসু এবং হরনাথ পালও যে কমিটির সাথে একমত হতে না পারার জন্যে তার থেকে বিদায় গ্রহণ করেন সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ বাংলা ভাষাকে ইসলামী করার এবং বাংলা ভাষায় আরবী অক্ষর প্রবর্তনের নানা প্রচেষ্টার তোলপাড়ের মধ্যে অমুসলমান হিসাবে কমিটির আবহাওয়া তাঁদের পক্ষে রীতিমতো অস্বস্তিকরই ছিলো।

২২শে ও ২৩শে জুন, ১৯৪৯, মৌলানা আকরাম খানের সভাপতিত্বে পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থাপক সভার কমিটি রুমে ভাষা কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ২২ তারিখে অনেকগুলি প্রশ্নের উপর বিস্তারিত আলোচনার পর স্থির হয় যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলের মতামত সংগ্রহের জন্যে একটি প্রশ্নমালা প্রস্তুত করে সেটিকে ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা দরকার। এর পর দিনের বৈঠকে প্রশ্নমালাটির একটি খসড়া পেশ করা হয় এবং সেটি বহুক্ষণ আলোচনার পর পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত অবস্থায় গৃহীত হয়।[১২]

২॥ কমিটির কার্যপ্রণালী

২৩শে জুন যে প্রশ্নমালাটি কমিটির দ্বারা গৃহীত হয় সেটি প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদ্ ও কেন্দ্রীয় সংবিধান সভার সদস্য; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও কোর্টের সদস্য; ঢাকা মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সদস্য ও কর্মচারী; সেক্রেটারিয়েট ও শিক্ষা ডাইরেক্টরেটের কর্মচারী; সকল জেলা ও বিভাগীয় কর্মচারী. মাদ্রাসা ও কলেজের অধ্যক্ষ; সমস্ত সরকারী মাধ্যমিক স্কুল এবং কয়েকটি বাছাবাছা বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল; সমস্ত জেলা বোর্ড, লোকাল

বোর্ড, জেলা স্কুল বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি; এবং সকল শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক এবং গণ্যমান্য ব্যক্তির কাছে মতামতের জন্যে পাঠানো হয়।[১]

সর্বমোট ১২০০ কপি প্রশ্নমালা উপরোক্ত ব্যক্তিদের কাছে পাঠানো হয় এবং তার মধ্যে ৩০৪ জন সেগুলি ফেরত পাঠিয়ে তার মাধ্যমে কমিটিকে নিজেদের মতামত জানান। এই উত্তরগুলির সারাংশ তৈরী করে একটি ছোট পুস্তিকা ছাপা হয় এবং পর্যালোচনার জন্যে কমিটির সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।[২]

এছাড়া রেডিও পাকিস্তান এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রশ্নমালাটি প্রচার করা হয় এবং জনসাধারণকে সে সম্পর্কে তাঁদের মতামত কমিটির কাছে পাঠানোর জন্যে তাঁরা অনুরোধ জানান। এর ফলে সংবাদপত্রে ও সাময়িক পত্রিকাদিতে কিছু বিতর্ক সৃষ্টি হয় এবং কমিটি এই ভাবে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধের মতামতও বিবেচনা করেন।[৩] অনেকে সরাসরিভাবে কমিটির কাছে লিখিতভাবে তাঁদের মতামত জানান। কমিটি তাঁদের রিপোর্টে এ প্রসঙ্গে তিনজনের নাম উল্লেখ করেন: ইব্রাহীম খাঁ, ঢাকা মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি; ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, রাজশাহী কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ; এবং আবদুল মজিদ, পূর্ব বাঙলা সরকারের বাংলা অনুবাদক ও রেজিস্ট্রার অব পাবলিকেশন।[৪]

কমিটি রিপোর্টে বলেন যে তাঁরা তাঁদের মতামত গঠনের ক্ষেত্রে অনেকগুলি বইপত্রের দ্বারাও উপকৃত হন। এ সমস্ত বইয়ের লেখকদের মধ্যে কতকগুলি নাম তাঁরা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। যেমন: ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সৈয়দ আবুল হাসনাত মহম্মদ ইসমাইল, ফিরদৌস খান, মৌলভী জুলফিকার আলী, 'হেকমতী হুরুফে'র লেখক জাফর আলী। এ ছাড়া 'Farsight' ছদ্মনামে লিখিত একটি রচনা এবং তমদ্দুন মজলিস কর্তৃক প্রকাশিত অপর একটি পুস্তিকার কথাও উল্লেখ করেন।[৫]

৩॥ ভাষা কমিটির বৈঠক

২৩শে জুন, ১৯৪৯, ভাষা কমিটির বৈঠকে কয়েকজন সদস্য বলেন যে সরকার ভাষা কমিটির যে শর্ত নির্দেশ করেছেন তাতে হরফ পরিবর্তনের কোনো কথা নেই এবং সেই হিসাবে হরফ পরিবর্তনের সম্পর্কে আলোচনা কমিটির এখতেয়ার বহির্ভূত। কিন্তু অন্যেরা বলেন যে 'সংস্কার' এবং 'সহজীকরণে'র কথা যখন

বলা হয়েছে তখন তার মধ্যেই হরফের প্রশ্নও এসে যেতে পারে এবং সেটাও বিবেচনা করা দরকার। কিছুক্ষণ এ বিষয়ে আলোচনার পর সভাপতি আকরাম খান এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন যে সরাসরি হরফের কথা উল্লিখিত না হলেও হরফের প্রশ্নটি পূর্ব বাঙলার লোকের 'প্রতিভা ও সংস্কৃতি'র সাথে জড়িত, কাজেই সেটি কমিটির আলোচনার এখতেয়ারভুক্ত।[১]

এ সময় একজন সদস্য জানতে চান যে কমিটির কাজের সাথে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ জড়িত আছে কিনা। এর উত্তরে সভাপতি বলেন যে শর্তনির্দেশের ১ এবং ৩ ধারায় 'পূর্ব বাঙলার জনগণ' এই ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে কাজেই সংখ্যালঘুরাও তার অন্তর্গত।[২] এই প্রশ্ন খুব সম্ভবতঃ গণেশচন্দ্র বসু উত্থাপন করেন এবং মৌলানা আকরাম খানের ব্যাখ্যায় তাঁর সন্দেহভঞ্জন না হওয়ায় তিনি কমিটির সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে নিজের অসম্মতির কথা তাঁদেরকে জানান। এই বৈঠকের পর তিনি কমিটির কোনো পরবর্তী বৈঠকে আর যোগদান করেননি।

১৯৫০-এর ১০ই মার্চের বৈঠকে অনেকেই অনুপস্থিত ছিলেন কাজেই সেদিন বিশেষ কোনো আলোচনা হয়নি। তবে মোটামুটিভাবে তাঁরা স্থির করেন যে ভাষা সমস্যার বিভিন্ন দিক বিস্তারিতভাবে বিবেচনার জন্যে কয়েকটি সাব কমিটি গঠন করা প্রয়োজন।[৩]

৩রা মে কমিটির তৃতীয় বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে হরফ পরিবর্তনের প্রশ্নে রোমান হরফের কথা বিবেচনার কোনো প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে উর্দু হরফই প্রাসঙ্গিক। কাজেই উর্দু হরফ এবং সহজীকৃত বাংলা হরফের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা দরকার।[৪]

হরফ প্রশ্নের উপর অনেক আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে সহজীকৃত বাংলা হরফ অথবা উর্দু হরফ প্রবর্তনের প্রশ্নটি আপাততঃ স্থগিত রেখে এই দুই হরফের উপযোগিতা প্রথমে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। তার জন্যে উপরোক্ত দুই হরফের অক্ষরজ্ঞান বিস্তারের উপর বিস্তৃতভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজনের উপরেও তাঁরা গুরুত্ব আরোপ করেন।[৫]

এই পর্যায়ে কয়েকজন সদস্য উল্লেখ করেন যে উর্দু হরফের মাধ্যমে প্রাপ্ত-বয়স্কদের শিক্ষার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার একটা পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। কাজেই সে বিষয়ে নোতুনভাবে আর কিছু করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আলোচার.পর কমিটি স্থির করেন যে কেন্দ্রীয় সরকার যে পরীক্ষা কার্য হাতে নিয়েছেন তার নির্ভরতা যাচাই করার জন্যে তাঁরা যে অবস্থায় এবং যে

বিষয়গুলি নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছেন সেই বিষয়গুলি নিয়েই আরো পরীক্ষা চালানো দরকার।[৬]

এই সিদ্ধান্তের পর ডক্টর শহীদুল্লাহ প্রস্তাব করেন যে এই জাতীয় পরীক্ষা শুধু উর্দু এবং সহজীকৃত বাংলা হরফে না চালিয়ে প্রচলিত বাংলা অক্ষরেও চালানো দরকার। তাঁর প্রস্তাব অন্য কোনো সদস্য সমর্থন না করায় সেটি বাতিল হয়ে যায়।[৭]

সেদিনের বৈঠকে কমিটি বাংলা ভাষার সংস্কার ও সহজীকরণের জন্যে একটি সাব-কমিটি নিযুক্ত করেন। সেই কমিটিতে থাকেন—মৌলানা আকরাম খান (সভাপতি), হাবিবুল্লাহ বাহার, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সৈয়দ আবুল হাসনাত মহম্মদ ইসমাইল, অজিতকুমার গুহ, ডক্টর এনামুল হক এবং আবদুল মজিদ।[৮]

১৯শে ও ২০শে অগাস্ট ভাষা কমিটির চতুর্থ বৈঠকে আরো দুটি সাব-কমিটি গঠিত হয়। বিদেশী শব্দ বাংলায় শব্দান্তরিত করার জন্যে যে সাব-কমিটি তাঁরা গঠন করেন তাতে থাকেন ; মৌলানা আকরাম খান (সভাপতি), আবুল হাসান ইসমাইল, শইখ শরাফুদ্দীন, এ. কিউ. এম. আদমউদ্দীন এবং আবু সাঈদ মাহমুদ (কনভেনর)।[৯] উর্দু হরফ সাব কমিটির সদস্য থাকেন: মৌলানা আকরাম খান (সভাপতি), শইখ শরাফুদ্দীন, এ. কিউ. এম. আদমউদ্দীন, জুলফিকর আলী এবং আবু সাঈদ মাহমুদ (কনভেনর)।[১০]

১৯শে সেপ্টেম্বর ভাষা কমিটির পঞ্চম বৈঠকে হরফ প্রশ্নের উপর কতকগুলি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে কমিটি উর্দু হরফ সাব-কমিটির রিপোর্টটি আলোচনা করেন। সাব কমিটির রিপোর্টতে বলা হয়:

> সুতরাং যেহেতু আরবীতে কোরান পাঠ সকল মুসলমানের জন্যে বাধ্যতামূলক ও সেই হিসাবে প্রস্তাবিত প্রাথমিক শিক্ষা স্কীমে পাঠ্যতালিকাভুক্ত এবং বাংলা ও উর্দু (উর্দু হচ্ছে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা) উভয় ভাষাই প্রস্তাবিত মাধ্যমিক স্কীমে উর্দুভাষী ও বাংলাভাষী শিশুদের জন্যে অবশ্য পাঠ্য বিষয় এবং যেহেতু সহজীকৃত অবস্থাতেও বাংলা হরফ একাধিক হরফের ভার লাঘব করবে না উপরন্তু চিরকালের জন্যে আমাদের জনগণের উপর একটা নিষ্প্রয়োজনীয় এবং গুরুতর বোঝা চাপিয়ে দিবে—তাই হরফ, বানান ও ব্যাকরণের মধ্যে বাস্তবতঃ যতখানি সম্ভব ঐক্য বিধান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সেই হিসাবে উর্দু হরফ সাব-কমিটি সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহকারে সুপারিশ করছে বাংলা হরফের পরিবর্তে উর্দু (অর্থাৎ ফারসী ও উর্দু

অক্ষর সংযোজিত আরবী হরফ) ব্যবহার অবশ্য প্রয়োজনীয়।[১১]

এ ছাড়া নিজেদের মূল সুপারিশকে কার্যকরী করার জন্যে তাঁরা যে পথ নির্দেশ করেন তার মধ্যে বিভিন্ন স্থানে উর্দু হরফে লেখা বই পড়তে শেখানোর জন্যে শিক্ষকদের শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন এবং মুদ্রক, প্রকাশক ও সংবাদপত্র মালিকদের কাছে উর্দু হরফ চালু করার আবেদন উল্লেখযোগ্য।[১২]

উর্দু ভাষা সাব কমিটির উপরোক্ত সুপারিশগুলি আলোচনার পর ভাষা কমিটি খুব দৃঢ়ভাবে অভিমত প্রকাশ করেন যে সে পর্যায়ে বাংলা ভাষায় উর্দু হরফ প্রবর্তন বাঞ্ছনীয় অথবা সম্ভব কোনোটিই নয়। এ প্রসঙ্গে যুক্তি দিতে গিয়ে তাঁরা বলেন :

(ক) সহজীকৃত ও সংস্কারপরবর্তী অবস্থায় বাংলা হরফ যে রূপ নেবে তাতে সেটা উর্দু অথবা অন্য যে কোনো হরফ থেকে পড়া, লেখা, ছাপান অথবা টাইপের কাজের পক্ষে অনেক সহজ হবে।

(খ) বাংলা শব্দের উচ্চারণের মধ্যে যে বিশেষত্ব আছে তা উর্দু হরফের মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

(গ) বাংলাতে উর্দু হরফ গ্রহণ করলে বিগত ৫০০ বছরের বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সাথে ভবিষ্যৎ বংশধরদের সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হবে। বাংলা সাহিত্যের বিশাল সম্পদ, যার একটা বড়ো অংশ মুসলিম সাহিত্যিক, কবি ও চিন্তাবিদ্‌দের দ্বারা গঠিত, উর্দু হরফে রূপান্তরিত করা এবং সেটা ছাপার ব্যবস্থা করা এক দারুণ কঠিন ব্যাপার।

(ঘ) উর্দু হরফের আশু প্রবর্তন প্রদেশের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে লণ্ডভণ্ড করে দেবে এবং সেই হিসাবে সেটা শিক্ষার প্রগতির পক্ষে হয়ে দাঁড়াবে ভয়াবহ। এর দ্বারা যে শুধু যাবতীয় পাঠ্যপুস্তক নোতুন হরফে রূপান্তরিত করার প্রয়োজন দেখা দিবে তাই নয়। এই প্রয়োজন মেটানো প্রায় অসম্ভব এবং তা প্রদেশের সাধ্যের বাইরে। শুধু তাই নয়, এতে করে ৫০,০০০ প্রাথমিক শিক্ষকদের (যারা উর্দু হরফের সাথে পরিচিত নয়) মধ্যে শতকরা ৯০ জন বেকারে পরিণত হবে। তাদেরকে নোতুনভাবে শিক্ষা দেওয়া অথবা তাদের পরিবর্তে অন্যদেরকে নিয়োগ করা সম্ভব হবে না এবং তাতে করে শতকরা ৯০টি স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে। এ ছাড়া লেখক, বইপুস্তক রচয়িতা, সাংবাদিক, মুদ্রক, কম্পোজিটর প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের লোকের রুজি-রোজগার এর ফলে বন্ধ হবে এবং প্রদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে তা ডেকে আনবে বিশৃঙ্খলা।[১৩]

এই সব কারণে তাঁরা বাংলা ভাষায় উর্দু হরফ প্রবর্তন না করার সুপারিশ করেন। শইখ শরাফুদ্দীন এই সুপারিশের বিরোধিতা করায় প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয়। মৌলানা আকরাম খানসহ আটজন সদস্য প্রস্তাবের সপক্ষে ভোট দেন। বিরোধিতা করেন শইখ শরাফুদ্দীন এবং জুলফিকার আলী। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে শইখ শরাফুদ্দীন নিজের বক্তব্য পৃথকভাবে রেকর্ড করেন।[১৪]

কমিটি এর পর অবশ্য উর্দু ভাষার প্রচলনের জন্যে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে একটি পৃথক প্রস্তাব নেন, যাতে তাঁরা বলেন যে স্কুলে মাধ্যমিক পর্যায় থেকে বাধ্যতামূলকভাবে উর্দু শিক্ষার প্রবর্তন করা দরকার। এই প্রসঙ্গে উর্দু ভাষার সংস্কারের প্রয়োজনের কথাও অবশ্য তাঁরা উল্লেখ করেন।[১৫]

১৯শে সেপ্টেম্বরের এই বৈঠকে ভাষা সংস্কার সাব-কমিটির রিপোর্টও আলোচিত হয় এবং সে বিষয়ে ভাষা কমিটি তাঁদের প্রস্তাবে সাব-কমিটির সুপারিশগুলিকে অনুমোদন করেন। সেগুলিকে কার্যকরী করার জন্যে সরকারের কাছে তাঁরা নিজেরাও কতকগুলি বিশেষ সুপারিশ জানান।[১৬]

বাংলা ভাষা, বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা বর্ণমালা, বানান পদ্ধতি ও হরফ নোতুন টেকনিক্যাল ও বিদেশী শব্দ বাছাই এবং বিদেশী শব্দের শব্দান্ত-করণ ইত্যাদি বিষয়ে কমিটি অনেক রকম সুপারিশ করে।

ভাষা সংস্কার সাব-কমিটির রিপোর্টটিকে প্রায় হুবহু অনুমোদন করে সর্বত্র সহজ বাংলার দ্রুত প্রচলনের জন্যে তাঁরা প্রাদেশিক সরকারকে ভালোভাবে তাগিদ দেন।[১৭] 'সাধু ভাষা' ও 'চলিত ভাষা' আধুনিক বাংলার এই দুই ঢংকেই স্বীকৃতি দেন। কিন্তু সেই স্বীকৃতি অনেকাংশে শর্তাধীন এবং সেই শর্তগুলি হলো নিম্নরূপ :

১। পূর্ব বাঙলায় প্রচলিত সরল শব্দবিন্যাস ও সহজ বাক্যরীতির ব্যবহার দ্বারা ভাষায় সংস্কৃত প্রভাব যথাসম্ভব এড়িয়ে যেতে হবে ;

২। মুসলিম লেখকদের প্রকাশভঙ্গী ও ভাবসমূহ ইসলামী আদর্শের সাথে stricty confirm করা উচিত, এবং

৩। পূর্ব বাঙলায় সাধারণভাবে ব্যবহৃত শব্দ idiom, phrase, বিশেষতঃ পুঁথি ও বহুল প্রচলিত সাহিত্যে যেগুলি ব্যবহৃত হয় সেগুলি ভাষাতে আরও স্বাধীনভাবে প্রবর্তন করতে হবে।[১৮]

উপরিনির্দেশিত নিয়মকানুন অনুসারে কিভাবে বাক্য রচনা করতে হবে সাব কমিটির রিপোর্টে তার কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া হয়। উদাহরণগুলি নীচে উদ্ধৃত করা হলো :

(ক) অরণ্য, বিহঙ্গম-কাকলীতে মুখরিত ও নির্ঝরণীর কলনাদে নন্দিত = পাখীর গানে ও ঝরনার গানে বন গমগম করিতেছে।

(খ) তিনি যাবতীয় বিষয় আনুপূর্বিক অবগত হইয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন = তিনি সববিছু আগাগোড়া শুনিয়া তাজ্‌জব হইলেন।

(গ) যতদিন পৃথিবীতে জীবন ধারণ করিব, ততদিনে তোমায় বিস্মৃত হইব না = তোমাকে সারা জীবন মনে রাখিব।

(ঘ) আমি তোমায় জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলিব না = আমি তোমায় কেয়ামতের দিন পর্যন্ত ভুলিব না।

(ঙ) হে কায়িদ-ই-আজম, আমরা তোমার পদে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করি = কায়িদ-ই-আজম, আমরা তোমায় মন-প্রাণে সম্মান করি আর তোমায় সালাম জানাই।

(চ) মাসের পরিসমাপ্তিতে ঋণ শোধ করিব = মাস কাবারিতে দেনা (করজ) আদায় করিব।

(ছ) আমায় দুটো ভাত দাও = আমায় চারটা ভাত দাও।

(জ) হিল্লোলিত সমীরে তরঙ্গিনী আন্দোলিত হইতে লাগল = লীলুয়া বাতাসে নদী নাচিতে লাগিল।[১৯]

উপরোক্ত উদাহরণগুলি যে কত যান্ত্রিকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে সংস্কৃত প্রভাবিত বলে যে বাক্যগুলি উল্লেখ করা হয়েছে সে রকম বাক্য এখন কেউ ব্যবহারই করে না। এমনকি পশ্চিম বাঙলার হিন্দু সাহিত্যিকেরা পর্যন্ত সে রকম ভাষার ব্যবহার এখন তো করেনই না। বরং তার ব্যবহার হিন্দুরা বহু দিন পূর্বেই বাদ দিয়েছেন। কাজেই সাব কমিটি এক্ষেত্রে কতকগুলি কাল্পনিক উদাহরণ ইচ্ছামতভাবে গঠন করে সেগুলিকে সহজ করার আপ্রাণ চেষ্টায় চলতি শব্দ এবং দু-চারটে আরবী ফারসী শব্দ আমদানী করে ভাষায় বিপ্লব সৃষ্টি করছেন বলে যে দাবী করেছেন তার কোনো সত্যিকার ভিত্তি নেই। উপরন্তু যাঁরা সাহিত্য রচনা করবেন তাঁদের উপর হুকুমদারী করার প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে কমিটির অধিকাংশ সদস্য নিজেদের মুৎসুদ্দী চরিত্র সমগ্র রিপোর্টটির মধ্যে খুব ভালভাবেই জাহির করেছেন।

বিভিন্ন পর্যায়ে ভাষা কমিটির বৈঠকগুলিতে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সেগুলিই সুপারিশ হিসাবে সরকারের কাছে পেশ করা হয়। কমিটির অধিকাংশ সুপারিশের সাথেই শইখ শরাফুদ্দীনের মতানৈক্য ঘটায় মূল

রিপোর্টটির সাথে নিজের অভিমতও তিনি রেবর্ড করেন এবং সেটিও কমিটির রিপোর্টের সাথে সরকারের কাছে পেশ করা হয়। শইখ শরাফুদ্দীন তাঁর সুপারিশে অন্যান্য অনেক কিছুর সাথে বলেন যে দেশের বিপুল সংখ্যক লোক আরবী হরফে বাংলা লেখার পক্ষপাতী কাজেই আরবী হরফ প্রচলনের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তার সাথে প্রাদেশিক সরকারের উচিত ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করা। তিনি আরও বলেন যে উর্দু যেহেতু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা তাই সকল পাকিস্তানীকেই উর্দু শিখতে হবে।[২১]

৭ই ডিসেম্বর, ১৯৫০, পূর্ব বাঙলা ভাষা কমিটি তাঁদের মূল রিপোর্টকে চূড়ান্ত আকার দেন[২২] এবং তাতে নিম্নলিখিত সদস্যেরা স্বাক্ষর প্রদান করেন:

১। মহম্মদ আকরাম খান
২। আবদুল্লাহ আল-বাকী
৩। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
৪। সৈয়দ মহম্মদ আফজল
৫। হবিবুল্লাহ চৌধুরী
৬। মীজানুর রহমান
৭। সৈয়দ আবুল হাসনাত মহম্মদ ইসমাইল
৮। অজিতকুমার গুহ
৯। এ. কিউ. এম. আদমউদ্দীন
১০। আবুল কালাম শামসুদ্দীন
১১। শামসুন্নাহার মাহমুদ
১২। শইখ শরাফুদ্দীন—অনৈক্যমূলক নোটসহ।[২৩]

যে দিন ভাষা কমিটির রিপোর্টটি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয় সেদিনই সেটি কমিটির সভাপতি মৌলানা আকরাম খান কর্তৃক পূর্ব বাঙলা সরকারের শিক্ষা দফতরের সেক্রেটারীর কাছে প্রেরিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাদেশিক সরকার সেটিকে জনসাধারণের অবগতির জন্যে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন। কমিটি ভাষা সংস্কার ইত্যাদি প্রশ্নে বহু প্রতিক্রিয়াশীল সুপারিশ পেশ এবং অনাবশ্যক প্রশ্নের অবতারণা সত্ত্বেও তাঁরা আরবী হরফ প্রচলন ইত্যাদির বিরুদ্ধে দৃঢ় মত পোষণ করেন।

ভাষা কমিটি স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো আরবী হরফ প্রচলনের পক্ষে একটা সুপারিশ আদায় করা। ফজলে আহমদ করিম ফজলী এবং অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদের সেই চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ায় তাঁরা ভাষা কমিটির অন্য সুপারিশ-

গুলির প্রতি কোনো গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজন আর বোধ করেননি। উপরন্তু সেই রিপোর্টকে চেপে রেখে তার সুপারিশের বিরুদ্ধে সমগ্র পূর্ব বাঙলায় আরবী হরফ প্রচলনের উদ্দেশ্যে সরকারীভাবে এর পরও তাঁদের উদ্যোগ তাঁরা অব্যাহত রাখেন।

পাকিস্তানে সামরিক শাসন কায়েম হওয়ার পরই সর্বপ্রথম ভাষা কমিটির এই রিপোর্ট ১৯৫৮ সালেই প্রকাশিত হয়। পূর্বে যে কারণে সরকার রিপোর্টটি প্রকাশ করেননি, ঠিক সেই কারণেই আইয়ুব সরকার সেটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন।

পূর্বে আরবী হরফ প্রচলন সম্ভব না হওয়ায় সরকার রিপোর্টটি প্রকৃতপক্ষে বাতিলই করে দেন। কিন্তু আইয়ুবের সময়ে আরবী হরফ প্রচলনের প্রশ্ন উত্থাপন ছিলো একেবারেই অসম্ভব। কাজেই সেই কারণে রিপোর্টটি তাঁদের পক্ষে চাপা দেওয়ার কোনো কারণ ছিলো না। তাঁরা সেটির অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল সুপারিশগুলিকে সেই পর্যায়ে কার্যকরী করার প্রতিই ছিলেন অধিকতর আগ্রহী এবং সেই আগ্রহের ফলেই তাঁরা রিপোর্টটিকে তাড়াতাড়ি প্রকাশ করে দেন।

আইয়ুবের স্বৈরাচারী শাসনকালে পূর্ব বাঙলার সাংস্কৃতিক স্বাধিকারের ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন হামলা এসেছিলো ভাষা কমিটির রিপোর্টের উপর গুরুত্ব প্রদান ছিলো তারই প্রথম পদক্ষেপ।

দশম পরিচ্ছেদ ॥ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস ও পরবর্তী পর্যায়

১ ॥ মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদ ও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে রণনীতি ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় সেগুলি ভারত ও পাকিস্তান উভয় অংশেই কমিউনিস্ট পার্টির পরবর্তী ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সেই হিসাবে এই কংগ্রেসের তাৎপর্য পাক-ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসেও খুব উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু দ্বিতীয় কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তসমূহ এবং তার পরবর্তী পর্যায়ের কমিউনিস্ট কার্যকলাপের চরিত্র সম্পর্কে কোনো সুষ্ঠু আলোচনা উপমহাদেশের তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মহলের পর্যালোচনাকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। এর প্রধান কারণ দ্বিতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহ একদিকে দেশীয় রাজনীতিতে পরিবর্তন এবং অন্যদিকে আন্তর্জাতিক, বিশেষতঃ সোভিয়েট ও যুগোশ্লাভ কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্রদের রচনা এবং বক্তব্য এই উভয়ের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছিলো।

৩রা জুন, ১৯৪৭, মাউণ্টব্যাটেন রোয়েদাদ ঘোষিত হওয়ার পর জুন মাসের শেষ সপ্তাহে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি বোম্বাইয়ে একটি বৈঠকে মিলিত হন। সেখানে মাউণ্টব্যাটেন রোয়েদাদ, ভারতীয় বুর্জোয়া, নেহরু ইত্যাদি প্রশ্ন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর তাঁরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে তাঁরা বলেন যে সত্য অর্থে তা ভারতীয় উপমহাদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তিকে টিকিয়ে রাখাই এক নিশ্চিত চক্রান্ত।[১] সেই হিসাবে সমগ্র পরিকল্পনাটি ভারতীয় জাতীয় স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই কারণে মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদকে স্বীকার করে নেওয়ার জন্যে তাঁরা নেহেরু সরকারের সমালোচনাও করেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাঁরা একই প্রস্তাবে আবার একথাও বলেন যে সব দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও পরিকল্পনাটি ভারতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট পদক্ষেপ। এই বিবেচনা অনুসারে তাঁরা নেহরু সরকারকে তাঁদের সমর্থন জ্ঞাপনের সিদ্ধান্ত নেন।[২]

ভারতীয় সামন্ত স্বার্থ এবং বৃহৎ ব্যবসার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে বৃটিশ সরকার কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করবে একথা স্বীকার করা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁদের প্রস্তাবে বলেন যে এই দক্ষিণপন্থীরা আসলে কংগ্রেসের মধ্যে তুলনায় অনেকখানি দুর্বল। কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলির মধ্যেও তারা তেমন প্রভাবশালী নয়। কাজেই কংগ্রেসের বামপন্থীদের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে তাঁরা তাদের গণতান্ত্রিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহায়তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটি একটি প্রস্তাবে বলেন :

গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রকে গড়ে তোলার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টি সগর্বে জাতীয় নেতৃত্বের সাথে পুরোপুরি সহযোগিতার মাধ্যমে ভারতীয় ঐক্যের পথ প্রশস্ত করবে।[৩]

কমিউনিস্ট পার্টি একথাও মনে করে যে ভারতবর্ষে কোনো গণতান্ত্রিক কর্মসূচীকে কার্যকরী করতে হলে কংগ্রেস লীগের অন্তর্গত বামপন্থী এবং অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তিসমূহের ঐক্যজোটের মাধ্যমেই তা সম্ভব।[৪]

ঐক্যের উপর এই গুরুত্ব আরোপের ফলে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি বস্তুতপক্ষে বিভিন্ন 'জাতির' আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রতি তাঁদের পূর্ব গুরুত্বকে অনেকখানি খর্ব করেন। কিন্তু তৎকালীন সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করলে অবশ্য তাঁদের এই ঐক্য প্রস্তাবের তাৎপর্য কিছুটা বোঝা যাবে।

সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির ক্রমশঃ অবনতির ফলে হিন্দু-মুসলমান এবং অন্যান্য সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর পারস্পরিক ঐক্য সে সময়ে যে কোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে হয়ে দাঁড়ায় অপরিহার্য। পার্টির নেতা ও কর্মীদের চিন্তা এই পরিস্থিতির দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হয়। দ্বিতীয় কংগ্রেসে পার্টির নীতির একটি আত্মসমালোচনামূলক পর্যালোচনায় ভালচন্দ্র ত্রিম্বক রণদীভেও একথা স্বীকার করেন।[৫]

মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদ এবং নেহরু ও কংগ্রেসের সাথে সহযোগিতার প্রশ্নে বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টির রজনী পাম দত্তও একটি প্রবন্ধে[৬] কেন্দ্রীয় কমিটির বক্তব্যের অনুরূপ মত প্রকাশ করেন। তিনিও যথারীতি উপরোক্ত রোয়েদাদের সমালোচনা করার পর তাকে গণতন্ত্রের পথে দৃঢ় পদক্ষেপ হিসাবে বর্ণনা করে তৎকালীন অবস্থায় কংগ্রেসের সাথে সহযোগিতার পরামর্শ দেন। শুধু তাই নয়। মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদকে স্বীকার করে নেওয়ার জন্যে নেহেরু সরকারকে

দোষারোপ করা থেকে পর্যন্ত তিনি বিরত থাকেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে পূর্ববর্তী পর্যায়ের তীক্ষ্ণ বিরোধের পরিবর্তে তখন কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট পার্টি উভয়ের মধ্যেই একটা গণতান্ত্রিক কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে একত্রে এগিয়ে যাওয়ার তাগিদ অনুভূত হচ্ছিলো। সর্ব ভারতের গণতান্ত্রিক ঐক্য, আর্থিক ও সামাজিক দাবীসমূহ পূরণ, ভূমি সংস্কার, শিল্প জাতীয়করণ ও পরিকল্পিত শিল্পোন্নয়ন ইত্যাদি একমাত্র সেই যৌথ এবং ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার দ্বারাই সম্ভব বলেও তিনি প্রবন্ধটিতে তাঁর মত প্রকাশ করেন। মোটামুটিভাবে বলা চলে যে রজনী পাম দত্ত আলোচ্য প্রবন্ধটিতে যা কিছু বলেন তার মধ্যে নেহরু সরকারকে একটি প্রগতিশীল সরকার হিসাবে চিত্রিত করার প্রচেষ্টা খুবই স্পষ্ট।

রজনী পাম দত্তের এই প্রবন্ধের মধ্যে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্গত সংস্কারপন্থীরা নিজেদের বক্তব্যের সপক্ষে সমর্থন লাভ করেন এবং তাঁদের পথ যে নির্ভুল একথা চিন্তা করে নিশ্চিন্ত হন। সোভিয়েট অথবা অন্য কোনো দেশী পার্টির সুস্পষ্ট নির্দেশ অথবা বক্তব্যের অভাবে নিজেদের অনুসৃত নীতির প্রতি তাঁদের আস্থাও স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পায়।

কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেস লীগের সাথে একত্রে স্বাধীনতা দিবস পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং ১৫ই অগাস্টকে 'জাতীয় উৎসবের' দিন হিসাবে ঘোষণা করে কংগ্রেস লীগভুক্ত এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক কর্মীদের সাথে এ ব্যাপারে সহযোগিতার নির্দেশ দেয়।[৭] নবগঠিত কংগ্রেস-লীগ সরকারের প্রতি সমর্থন অবশ্য তৎকালীন জরুরী অবস্থায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। স্বাধীনতার প্রাক্কালেই পাঞ্জাবে বিস্তৃত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাকে আয়ত্তে আনার জন্যে কংগ্রেস লীগ এবং প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতা হয় অপরিহার্য। কমিউনিস্ট পার্টি সেই দাঙ্গাকে নেহরু সরকারের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ এবং তার অনুচরদের চক্রান্ত বলে বর্ণনা করে।[৮] এবং বলে যে সেই চক্রান্তকে দ্রুত নিশ্চিহ্ন করতে হলে তা প্রগতিশীল শক্তিসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই সম্ভব।[৯] এ প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির তদানীন্তন সম্পাদক পূরণচন্দ্র যোশী অক্টোবর ১৯৪৭-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বলেন:

> জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় ১৫ই অগাস্ট দেশ জুড়ে আনন্দের বান ডেকেছিলো—১৫ই অগাস্ট আমাদের দেশের জনগণের সম্মুখে এক নতুন স্বাধীন জীবনের সম্ভাবনা খুলে দিয়েছে। কিন্তু ১৫ই অগাস্টের পর ঠিক দুই সপ্তাহের মধ্যেই আবার পাঞ্জাবের আকাশে যে কালো ভয়ঙ্কর মেঘ দেখা

দিয়েছে তাতে করে সমস্ত জাতিই আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে।...[১০]

কারা এই আগুন জ্বালিয়েছে? কারা আমাদের দেশের মানুষের মন বিষিয়ে তুলেছে আমাদের সকলের সেকথা জানা দরকার। পাঞ্জাব আজ আমাদের সমস্ত জাতির পক্ষে মর্মন্তুদ অভিশাপ। এ অভিশাপ থেকে আমাদের সকলের শিক্ষা নিতে হবে।[১১]

পাঞ্জাবের দাঙ্গার ভিত্তি স্থাপন করেছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এবং তাদেরই অনুচরেরা আগুন জ্বালিয়েছে। আজ এর সুযোগে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে পাকিস্তান ও ভারতীয় ইউনিয়ন উভয় রাষ্ট্রেই। এখন দুটি রাষ্ট্রকে অপদস্থ ও চ্যালেঞ্জ করে চলেছে তারা; দুটি রাষ্ট্রকেই প্রতিক্রিয়াশীল করে গড়ে তুলতে চাইছে।...[১২]

ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রকেই অপদস্থ করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ পাঞ্জাবের দাঙ্গাকে ব্যবহার করতে চায়। দেখাতে চায় শাসনব্যবস্থা চালাবার যোগ্যতা আমাদের নেই।[১৩]

সর্বশেষে যোশী ভারত এবং পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রে প্রগতিশীল দল ও কর্মীদের উদ্দেশ্যে দাঙ্গার বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিকদের ঐক্য জোট গঠন এবং সাধারণ ভাবে 'জাতীয় সরকার'কে সক্রিয় সমর্থন জ্ঞাপনের আহ্বান জানান :

ভারতীয় ইউনিয়নের ভিতর আমরা যারা দেশকে ভালবাসি, প্রগতির জন্য দাঁড়াই, গণতন্ত্রের সংগ্রামের জন্য সংগ্রাম করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, আমাদের সকলের কর্তব্য হল সাম্প্রদায়িকতার প্রেতশক্তিগুলোর বিরুদ্ধে, পাঞ্জাবের রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ এবং আকালী বাহিনীর বিরুদ্ধে, অন্যান্য প্রদেশে যে সমস্ত শক্তি প্রতিহিংসার আগুন জ্বালাতে চেষ্টা করবে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের জনগণকে জাগিয়ে তোলা।

পাকিস্তানের ভিতর প্রগতিশীল লীগপন্থীদের ওপর আমরা আস্থা রেখেছি, তাঁরা সমস্ত জনপ্রিয় শক্তিগুলির সহযোগিতায় নুনপন্থীদের সাথে মোকাবেলা করবেন, মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডকে নিরস্ত্র করবেন, এবং ধর্মের অসং জিগীরের বিরুদ্ধে পীরদের সতর্ক করবেন।...

পাঞ্জাবের ঘটনায় আমাদের এখনি হুঁশিয়ার হয়ে যাওয়া দরকার। প্রদেশের বাইরে প্রত্যেকটি জনপ্রিয় সংগঠনের কর্তব্য—জাতীয় সরকারকে পূর্ণভাবে সমর্থন করা, পাঞ্জাবকে রক্ষা করার জন্য প্রাণপণ সাহায্য পাঠান। এবং নিজেদের এলাকায় শান্তি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য মিলিত প্রচেষ্টায় সর্বশক্তি নিয়োগ করা।

এই শিক্ষাই আমাদের পাঞ্জাবের ঘটনা থেকে নিতে হবে—এই সত্যই ঘোষণা করতে হবে নতুন করে।[১৪]

পাক-ভারতীয় উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতে দাঙ্গা রোধ করার জন্যে যে ঐক্যের প্রয়োজন দেখা দেয় তার ফলেই যোশী এবং অপরাপর সংস্কারপন্থী কেন্দ্রীয় নেতাদের পক্ষে কংগ্রেস লীগ সরকারকে সাধারণভাবে সমর্থনের আহ্বান জানানো সহজ হয়। এবং সেই প্রয়োজনের তাগিদে কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্গত বামপন্থীরাও স্বাধীনতা-উত্তর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারতীয় এবং পাকিস্তানী 'জাতীয়' সরকারের সাথে নিজেদের সম্পর্ক যথাযথ-ভাবে নির্ণয় করতে ব্যর্থ হন। এই ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতেই যোশীর পক্ষে সম্ভব হয় 'জাতীয় সরকারকে পূর্ণভাবে সমর্থনের' কর্মসূচীর সপক্ষে পার্টির নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা। দ্বিতীয় কংগ্রেসে রণদীভে পার্টি নীতির পর্যালোচনা-কালে একথা উল্লেখ করেন।[১৫]

কংগ্রেস লীগ সরকারের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার ঠিক পরবর্তী পর্যায়ে কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত অনুসৃত তাদের সমস্ত কর্মসূচীকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেয়। বাঙলাদেশে তেভাগা আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাদের এই ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৬ সাল থেকেই দুই-তৃতীয়াংশ ফসলের দাবীতে বর্গাদারেরা বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষতঃ দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, পাবনা, যশোর, খুলনা অর্থাৎ প্রধানতঃ উত্তর বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এক শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলে। ফসল-ভাগের এই সংগ্রাম জোতদার ও সরকারের প্রতিরোধকে অতিক্রম করে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে চলেছিলো এক বৈপ্লবিক কৃষক আন্দোলনের। কিন্তু সেই আন্দোলনকে ১৯৪৭ সালের শেষ দিকে কমিউনিস্ট পার্টি প্রত্যাহার করে নিলো। বাঙলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ভবানী সেন তাই কৃষকদের প্রতি আবেদন জানিয়ে নভেম্বর মাসে বললেন যে 'গত বছরের মতো এ বছরে তাঁরা যেন কোনো প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে না যান।' কারণ নোতুন সরকারকে 'আইনের মাধ্যমে তার প্রতিশ্রুতি পালনের একটা সুযোগ দেওয়া দরকার'।[১৬]

এর পূর্বে সেপ্টেম্বর ১৯৪৭-এ, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ঢাকা জেলা কমিটির পক্ষে মধু ব্যানার্জি কর্তৃক ১৫ নং কোর্ট হাউস স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত 'পূর্ব পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ' নামে একটি পুস্তিকাতে ভবানী সেন অবশ্য বলেন:

গত বৎসর লীগ মন্ত্রিমণ্ডলী নির্মম অত্যাচার দ্বারা ৬০ লক্ষ ভাগ-চাষীর তে-ভাগা আন্দোলন দমন করিয়াছেন।

সরকারী সশস্ত্র বাহিনী যে ধান জোর করিয়া বর্গাদারের বাড়ি হইতে লইয়া জোতদারের গোলায় তুলিয়া দিয়াছে সেই ধান এখন চোরাবাজারে। সরকারী সরবরাহ বিভাগের গুদামও শূন্য। অথচ এখন আর সরকারী সশস্ত্র বাহিনী জোতদারের গোলা হইতে সে ধান সরকারী সরবরাহ বিভাগের গুদামে আনিতেছে না, আর ঠিক সেই জন্যই পূর্ব বঙ্গের জেলায় জেলায় দুর্ভিক্ষের দ্রুত পদধ্বনি শোনা যাইতেছে।

পাকিস্তান যদি এমনিভাবে জমিদার জোতদারের পক্ষপুটে আবদ্ধ থাকে তাহা হইলে উহাকে গোরস্থানে পরিণত করিতে দেরী লাগিবে না। কিন্তু পাকিস্তানের জনগণকে বাঁচিতে হইবে এবং স্বাধীন মানুষের মতোই বাঁচিতে হইবে। এরূপভাবে বাঁচা সম্ভব যদি হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধভাবে পাকিস্তানকে জমিদার জোতদারের পক্ষপুট হইতে মুক্ত করিয়া জনগণের স্বাধীন পাকিস্তানে পরিণত করেন।[১৭]

পণ্ডিত নেহরুর প্রতি মোহগ্রস্ত হওয়ার ফলেই কমিউনিস্ট পার্টির সংস্কার-পন্থী নেতৃত্ব 'জাতীয় সরকার' এবং কংগ্রেস লীগ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও নানা বিভ্রান্তিকর বক্তব্য উপস্থিত করেন। তাঁরা বস্তুতঃপক্ষে নেহরু এবং ভারতীয় বুর্জোয়ার মধ্যে একটি গুণগত পার্থক্য কল্পনা করে নেহরুর প্রগতিশীল হাতকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে নিজেদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে উদ্যোগী হন। এজন্যে নেহরুকে তাঁরা 'জনতার কণ্ঠ' আখ্যায় ভূষিত[১৮] করেন এবং 'পণ্ডিত নেহরু থেকে সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট পর্যন্ত যুক্ত ফ্রন্ট' গঠনের প্রস্তাব দেন।[১৯] যোশীর নেতৃত্বে এই পর্যায়ে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি মনে করেছিলেন যে নেহেরুর সাথে 'বামপন্থী' ঐক্যজোটের মাধ্যমে তাঁরা ভারতে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের যথার্থ অগ্রগতি সাধন করতে সক্ষম হবেন। এখানেও রজনী পাম দত্তের তত্বগত বক্তব্য এবং পরামর্শ তাঁদের চিন্তাকে অনেকাংশে গঠন করে।

কিন্তু এক্ষেত্রে বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি এবং তাদের উপদেষ্টা বৃটিশ পার্টির রজনী পাম দত্ত যখন নেহরু এবং তাঁর সরকারকে সমর্থনের মাধ্যমে ভারতে গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে জোরদার করার চিন্তা করছিলেন তার কয়েক মাস পূর্বে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি নেহরুকে 'ধনী ব্যক্তি' এবং তাঁর সরকারকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' আখ্যা দিয়ে তৎকালীন অবস্থায় ভারতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলো। শুধু সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি নয়, যুগোশ্লাভ এবং কমিনফর্মের নেতারাও উপনীত হয়েছিলেন অনুরূপ সিদ্ধান্তে।

অধিকতর বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে উপরোক্ত সিদ্ধান্তের খবর অনেকদিন পর্যন্ত ভারতীয়দের কাছে ছিলো সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

২ ॥ সোভিয়েট এবং যুগোশ্লাভ পার্টির মুখপাত্রদের বক্তব্য

মাউণ্টব্যাটেন রোয়েদাদ ঘোষিত হওয়ার পর দিয়াকভ 'নিউ টাইমস্'-এ প্রকাশিত 'ভারতে নূতন বৃটিশ পরিকল্পনা' নামে একটি প্রবন্ধে সমগ্র পরিকল্পনাটির কঠোর সমালোচনা করেন।[১] সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে মাউণ্টব্যাটেনের প্রস্তাবটি আসলে ভারতীয় উপমহাদেশে সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখারই একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্ত। সেই চক্রান্তের কাছে নতি স্বীকার করে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বস্তুতঃপক্ষে সাম্রাজ্যবাদের সাথে একটা আপোষ রফায় উপনীত হয়েছেন এবং ভারতীয় বৃহৎ ব্যবসাই তাঁদেরকে এই আপোষের দিকে পা বাড়াতে বাধ্য করেছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ এবং উপমহাদেশের বৃহৎ ব্যবসা দেশীয় বাজারকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে বিপ্লবকে বানচাল করতে উদ্যোগী হয়েছে।[২]

কংগ্রেস লীগের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র সম্পর্কে প্রবন্ধটিতে স্পষ্ট অভিমত সত্ত্বেও দিয়াকভ কিন্তু ভারতীয় পার্টিকে সরাসরিভাবে মাউণ্টব্যাটেন রোয়েদাদের বিরুদ্ধে কোনো আশু কর্মপন্থা নির্ণয়ের পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত হন। সেদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে এই পর্যায়ে সোভিয়েট মতামত ছিলো অনেকাংশে দোদুল্যমান, তার মধ্যে নির্দেশজ্ঞাপক অথবা নিশ্চিত সিদ্ধান্তসূচক কোনো বক্তব্য ছিলো না।

কিন্তু এর পর জুলাই মাসে এশিয়া সম্পর্কে সোভিয়েট বিশেষজ্ঞ ই. জুকভ 'ভারতীয় পরিস্থিতি প্রসঙ্গে' নামে এক প্রবন্ধে নেহেরু সরকারের চরিত্র সম্পর্কে আরও সুস্পষ্টভাবে সোভিয়েট পার্টির মতামত ব্যক্ত করেন।[৩] তাতে সোজাসুজি বলা হয় যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়া অর্থাৎ একচেটিয়া পুঁজির প্রতিনিধি ছাড়া আর কিছুই নয় এবং মাউণ্টব্যাটেন রোয়েদাদকে স্বীকার করে কংগ্রেস প্রকৃতপক্ষে প্রতিক্রিয়াশীলদেরই দলভুক্ত হয়েছে। জুকভ তাঁর প্রবন্ধে আরও বলেন যে বৃহৎ বুর্জোয়ারা বৃটিশের থেকে জনগণকেই বেশী ভয় করে। সেজন্যে তারা পূর্ণ স্বাধীনতার পরিবর্তে পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে একটি মাঝামাঝি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে।

জুকভ অবশ্য একথাও বলেন যে কংগ্রেস লীগ উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই কিছু

কিছু গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল কর্মী আছেন যাঁরা বৃহৎ বুর্জোয়া নিয়ন্ত্রিত সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে প্রস্তুত হবেন। পাকিস্তান প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব এবং মুসলিম জনগণের কাছে পাকিস্তানের অর্থ এক নয়। সাধারণ মুসলমানেরা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হিসাবেই পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছে।

জুকভ শ্রমিক শ্রেণীর উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে তৎকালীন ভারতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তারাই সব থেকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। তাদের তুলনায় কৃষকেরা অনেক বেশী অনগ্রসর। কারণ অশিক্ষা, বর্ণপ্রথা এবং সামন্তবাদের অবশেষসমূহের চাপে তাদের মধ্যে একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মোটামুটিভাবে বলা চলে যে জুকভ তাঁর প্রবন্ধে সাম্রাজ্যবাদ এবং তার সহযোগী সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে একটা নির্দিষ্ট রণনীতি গ্রহণের প্রস্তাব করেন। এবং সেই রণনীতি অনুসারে ভারতে নেহরু সরকার এবং পাকিস্তানে মুসলিম লীগ সরকারের উপর আক্রমণ হয়ে দাঁড়ায় অবধারিত।

নেহরুকে বৃহৎ বুর্জোয়ার প্রতিনিধি হিসাবে চিহ্নিত করে সোভিয়েট মুখপাত্রেরা সকলেই নেহেরু এবং তাঁর সরকার সম্পর্কে একটি সাধারণ কর্মপন্থা নির্দেশ করতে সমর্থ হতেও সামগ্রিকভাবে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্পর্কে তাঁরা কোনো সুস্পষ্ট নীতি তখনো পর্যন্ত নির্ধারণ করতে পারেননি। কিন্তু প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তার সমাধান ব্যতীত নেহরু সরকারের বিরুদ্ধে বাস্তবক্ষেত্রে কর্মসূচী প্রণয়ন ও তাকে সঠিকভাবে কার্যকর করা সম্ভব ছিলো না।

এই অসুবিধা দূর করার জন্যে ইতিপূর্বে সোভিয়েট বিশেষজ্ঞরা ১৯৪৭-এর জুন মাসে বিজ্ঞান একাডেমীর এক বিশেষ অধিবেশনে ভারতীয় পরিস্থিতি পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে মিলিত হন।[৪] মূল আলোচনার সূত্রপাত করে সেখানেও জুকভ তাঁর উপরোক্ত বক্তব্য উপস্থিত করেন। দিয়াকভ ও ব্যালাবুশেভিচ দুজনেই সেই বক্তব্যের বিরোধিতা করে বক্তৃতা দেন। তাঁরা দুজনেই বলেন যে নেহরু সরকার শুধুমাত্র বৃহৎ বুর্জোয়ারই প্রতিনিধিত্ব করে তাই নয়, তারা মাঝারি বুর্জোয়াদেরও প্রতিনিধি। এই মাঝারি বুর্জোয়াদেরকেও তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল হিসাবে চিহ্নিত করেন।

ব্যালাবুশেভিচ বলেন যে ভারত বিভাগ ভারতীয় বুর্জোয়া ও জমিদারদের সাথে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের একটা বোঝাপড়ারই প্রত্যক্ষ ফল। যে ভারতীয় বুর্জোয়ারা কংগ্রেসের নেতৃস্থানে থেকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটা গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা পালন করেছিলো তারাই অবশেষে সমগ্র ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীকে নিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্রাজ্যবাদের শিবিরে চলে গেছে। দিয়াকভ ও ব্যালাবুশেভিচ উভয়েই বলেন যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কংগ্রেস লীগের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাতকেই জোরদার করে এবং তার ফলে নানাদিক দিয়ে তারা সাম্রাজ্যবাদীদের অনেক সুবিধা করে দেয়।

কিন্তু পরস্পরের এই মতানৈক্য থাকলেও জুকভের মতো ব্যালাবুশেভিচও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর উপর গুরুত্ব আরোপ সত্বেও কৃষকের ভূমিকাকে খুব ছোট করে দেখেন। তিনি বলেন যে একমাত্র সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই কৃষকেরা সব থেকে বেশী সক্রিয় যেখানে তাদের সাথে শহরের শ্রমিকদের একটা প্রত্যক্ষ যোগ আছে। কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে ব্যালাবুশেভিচের এই বক্তব্য যে তেলেঙ্গানা এবং উত্তর বাঙলার শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে মোটেই প্রযোজ্য নয় সেকথা বলাই বাহুল্য। শুধু তাই নয় ১৯৪৭ সালে অনুষ্ঠিত ভারতীয় পরিস্থিতির এই পর্যালোচনা সভায় দক্ষিণ ভারতের তেলেঙ্গানা এবং উত্তর বাঙলার কৃষক আন্দোলনের কোনো উল্লেখই তাঁরা প্রয়োজন মনে করেননি।

ব্যালাবুশেভিচ তাঁর বক্তৃতার শেষে ঘোষণা করেন :

> ভারতের মেহনতী জনগণ ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণী এবং তাদের পার্টি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পূর্ণ স্বাধীনতা, সামন্তবাদের অবশেষসমূহ নিশ্চিহ্ন এবং জনগণতন্ত্রের জন্যে সাম্রাজ্যবাদ, বুর্জোয়া শ্রেণী এবং ভূমি মালিকদের বিরুদ্ধে এক দৃঢ় সংগ্রাম পরিচালনা করছেন।

পর্যালোচনা ক্ষেত্রে জুকভের সাথে মত-পার্থক্যের ফলে দিয়াকভ ও ব্যালাবুশেভিচের নির্দেশিত রণনীতির মধ্যেও অনেক পার্থক্য দেখা দেয়। সেই অনুসারে জুকভের তুলনায় তাঁরা নেহরু সরকারের বিরুদ্ধে অধিকতর চরমপন্থী কর্মসূচীর পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

ভারতীয় পরিস্থিতি আলোচনার ক্ষেত্রে চীনের অভিজ্ঞতা অথবা মাও সেতুঙ-এর চিন্তাধারার উপর কোনো গুরুত্ব আরোপ তো দূরের কথা তার কোনো উল্লেখ পর্যন্ত তাঁরা কেউ করেননি।

ভারতীয় কমিউনিজমের পরবর্তী লক্ষ্য ভারতে জনগণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা একথা সোভিয়েট বিশেষজ্ঞরা ঘোষণা করলেও জনগণতন্ত্রের চরিত্র সম্পর্কে তাঁদের মধ্যেও যথেষ্ট মতবিরোধ ছিলো। অন্যান্য দেশীয় কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে যুগোস্লাভ পার্টি অবশ্য সরাসরিভাবে জনগণতন্ত্রের বিরোধিতা

করে[৫] এবং সেজন্যে কৃষি বিপ্লবের রণনীতিকে তারা মনে করেন সর্বাংশে ভ্রান্ত।

ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে প্রতিষ্ঠিত জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রণনীতি অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ বিদেশী পুঁজি এবং তার সহযোগী দেশীয় বৃহৎ বুর্জোয়া এবং বৃহৎ সামন্ত শক্তির বিরুদ্ধেই সেখানে গৃহীত হয় ব্যাপক রাজনৈতিক কর্মসূচী। সেই হিসাবে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বুর্জোয়া অথবা সমাজতান্ত্রিক নয়, সে দুইয়ের মধ্যবর্তী এক পরিবর্তনশীল পর্যায়।

১৯৪৭ সাল থেকেই যুগোশ্লাভ পার্টির মুখপাত্রেরা জনগণতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁদের বক্তব্য উপস্থিত করেন। তাতে তাঁরা বলেন যে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে একটি মধ্যবর্তী অবস্থা হিসাবে না দেখে আরও জঙ্গী কর্মসূচীর মাধ্যমে বুর্জোয়া ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে একই সূত্রে গ্রথিত করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করতে হবে। কাজেই যুগোশ্লাভ তাত্ত্বিকেরা শুধুমাত্র একচেটিয়া পুঁজি এবং সামন্তবাদের বিরুদ্ধে কর্মসূচীকে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে একটি চরম সংগ্রামের পথে চালনা করতে বলেন। সেজন্যে তাঁরা বুর্জোয়া শ্রেণীর সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে এক সর্বাত্মক বৈপ্লবিক কর্মসূচী নির্ধারণের পরামর্শ দেন।

জনগণতন্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে যুগোশ্লাভ মুখপাত্রেরা কেবলমাত্র পূর্ব ইউরোপের জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রেই তাঁদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেননি। কমিনফর্মের বৈঠকে তাঁরা এ বিষয়ে ফরাসী ও ইটালিয়ান উভয় পার্টিকেই আক্রমণ করেন। জানুয়ারি ১৯৪৭-এ যুগোশ্লাভ কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক মুখপত্রে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে এডওয়ার্ড কার্দেজ ঘোষণা করেন যে উপনিবেশগুলিতে 'জাতীয় বুর্জোয়া' সর্বক্ষেত্রেই প্রতিক্রিয়াশীল, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের মুৎসুদ্দী, কাজেই উপনিবেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে সফল করতে হলে অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সাথে বুর্জোয়া শ্রেণীকেও সম্পূর্ণভাবে পরাজিত না করে তা সম্ভব নয়। এবং এক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন শুধুমাত্র সশস্ত্র বিপ্লবের পথেই সম্ভব।

তত্ত্বগত দিক থেকে কার্দেজের এই বক্তব্য এবং ১৯৪৭-এর জুন মাসে অনুষ্ঠিত সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদের সভায় ব্যালাবুশেভিচ ও দিয়াকভের বক্তব্যের কোনো মৌলিক প্রভেদ নেই। সে প্রভেদ তাঁদের ক্ষেত্রে দেখা দেয় রণনীতি

ও পদ্ধতির প্রশ্নে। কার্দেজ যেখানে সরাসরিভাবে সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের কথা বলেন সোভিয়েট বিশেষজ্ঞেরা সেখানে প্রশ্নটিকে রেখে দেন অনেকাংশে অমীমাংসিত।

৩॥ নেহরু সম্পর্কে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নোতুন সিদ্ধান্ত

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার ফলে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির চরমপন্থীরা অল্প সময়ের জন্যে যোশীর আপোষপন্থী সংস্কারবাদী নেতৃত্বের কাজে নতি স্বীকার করলেও সে অবস্থার অবসান ঘটতে বিলম্ব হয়নি। যোশীর আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব সত্ত্বেও বামপন্থীদের বক্তব্য প্রথম দিকেও পার্টির মধ্যে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে। স্বাধীনতা উৎসবের মধ্যেও তাই রণদীভে পার্টি মুখপত্র 'পিপল্‌স্ এজ'-এর পাতায় নেহরু সরকারের দক্ষিণপন্থী ও আপোষমুখী চরিত্র সম্পর্কে সকলকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে নিজের বক্তব্য পেশ করেন।[১] শুধু তাই নয়, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক মুখপত্র 'কমিউনিস্ট'-এর পাতায় অগাস্ট মাস থেকেই যুগোশ্লাভ পার্টি নেতাদের প্রবন্ধও প্রকাশিত হতে শুরু করে।[২] ১৯৪৭ সালের শেষের দিকে 'আন্তর্জাতিক উন্নয়নের সমস্যাবলী' : 'একটি মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণ' এই নামে এডওয়ার্ড কার্দেজের একটি লেখা তাঁরা পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করেন।[৩] বুর্জোয়া শ্রেণী সামগ্রিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরভুক্ত হয়েছে প্রবন্ধটিতে কার্দেজের এই বক্তব্য ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির বামপন্থীদের জঙ্গী মনোভাবকে অধিকতর জোরদার করে। এর ফলে তাঁরা নেহরু সরকারের প্রতি আনুগত্যের নীতি পরিহারের জন্যে ক্রমশঃ আভ্যন্তরীণ চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন।

কিন্তু শুধু আন্তর্জাতিক বক্তব্যই যে কমিউনিস্ট পার্টির বামপন্থীদের নোতুন রণনীতি গ্রহণ ও সাংগঠনিক রদবদলের প্রেরণা যুগিয়েছিলো তা নয়। আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির পরিবর্তন এক্ষেত্রে ছিলো অধিকতর প্রভাবশীল। যোশীর 'আনুগত্যে'র নীতিকে প্রথম থেকেই পার্টির অসংখ্য সদস্য স্বীকার করে নিতে পারেননি। বহুদিনের সংগ্রামী প্রস্তুতি এবং তেলেঙ্গানা ইত্যাদির অভিজ্ঞতার পর তাঁরা যে সময় নোতুন রাজনৈতিক উদ্যোগের চিন্তা করছিলেন সে সময় তাঁদের কাছে আপোষের রাজনীতি প্রথম থেকেই মনে হয়েছিলো ঘটনাপ্রবাহের সাথে সামঞ্জস্যহীন।

ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতি ক্ষেত্রে কংগ্রেসের তৎপরতার ফলে এই অবস্থা

বেশ প্রকট হয়ে ওঠে। তারা কমিউনিস্ট প্রভাবিত নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রভাবকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে, ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস নামে একটি নোতুন সংস্থা খাড়া করে এবং তার ফলে পার্টির কর্মীরা ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে ভয়ানক অসুবিধার সম্মুখীন হন। সেখানে কংগ্রেসের প্রভাবকে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে অধিকতর জঙ্গী কর্মসূচীর প্রয়োজন অনুভূত হয়, কিন্তু পার্টির আপোষ ও আনুগত্যের নীতি হয়ে দাঁড়ায় সেদিক দিয়ে মস্ত বাধাস্বরূপ। সেই বাধাকে অতিক্রম করার জন্যে পার্টির মধ্যে আভ্যন্তরীণ চাপ ক্রমশঃ দারুণভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ভারতীয় রাজনীতিতে নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের যে প্রগতিশীল ভূমিকার কথা যোশী বিবৃত করেছিলেন কংগ্রেস বস্তুতঃ সে ভূমিকা পালনে প্রথম থেকেই ব্যর্থ হয়। শুধু তাই নয়, সাম্রাজ্যবাদের সাথে ভারত সরকারের একটা আঁতাতের প্রস্তুতিও চলতে থাকে প্রথম থেকেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে যোশীর বিরুদ্ধে পার্টির অভ্যন্তরে বিক্ষোভ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তাঁকে 'পেটি বুর্জোয়া সংস্কারবাদী' ইত্যাদি বলে অভিহিত করে সম্পাদকের দায়িত্বশীল পদ থেকে অপসারণের জন্যে সাধারণভাবে দাবী ওঠে। কেন্দ্রীয় কমিটিতে রণদীভে এবং অন্যান্য চরমপন্থীরা অবস্থার এই পরিবর্তনকে রণনীতি ও সাংগঠনিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হন।

১৯৪৭-এর সেপ্টেম্বর মাসে পোল্যাণ্ডে কমিনফর্মের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে জাদনভ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। সাম্রাজ্যবাদের তৎকালীন ভূমিকা বর্ণনা প্রসঙ্গে উপনিবেশগুলিতে তারা যে সংকট সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করে চলেছে তিনি তার উল্লেখ করেন। ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েৎনাম ইত্যাদি দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সাম্রাজ্যবাদীরা ধ্বংস করার চেষ্টায় কিভাবে লিপ্ত হয়েছে তিনি তাঁর ভাষণে তারও বর্ণনা দেন। জাদনভ আরও বলেন যে 'ভারত ও চীনকে সাম্রাজ্যবাদের আওতাভুক্ত এবং নিরবচ্ছিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখতে' সাম্রাজ্যবাদ তার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নিজের শক্তিকে খাটো করে এবং শত্রুর শক্তিকে বড়ো করে দেখা শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে একটা বিপজ্জনক ব্যাপার বলে তিনি উপনিবেশ অঞ্চলের শ্রমিক পার্টিগুলিকে সাবধান করে দেন এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটা দৃঢ় প্রতিরোধ আন্দোলন গঠন ও পরিচালনার জন্যে সংশ্লিষ্ট কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের প্রতি আহ্বান জানান।[৪]

কিন্তু এসব সত্ত্বেও জাদনভ তাঁর বক্তৃতায় উপনিবেশগুলিতে বুর্জোয়া শ্রেণীকে

সামগ্রিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল হিসাবে বর্ণনা করে তার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কথা সরাসরিভাবে উল্লেখ না করে কমিউনিস্ট পার্টিকে 'গণতান্ত্রিক' সাম্যবাদী লক্ষ্য অনুসরণের পরামর্শ দেন।

কমিনফর্মের এই অধিবেশনে কার্দেজ তাঁর ভাষণে 'গণতান্ত্রিক' ও 'সমাজতান্ত্রিক' বিপ্লবকে একই সূত্রে গ্রথিত করে এমন এক অখণ্ড রণনীতি নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন যা বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে সামগ্রিকভাবে পরিচালিত হবে। কার্দেজের এই ভাষণ এবং তার সাথে যুগোশ্লাভ কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে মার্শাল টিটোর মূল রিপোর্টটিও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক মুখপত্র 'কমিউনিস্ট'-এ প্রকাশিত হয়।

একদিকে ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কংগ্রেসের আক্রমণাত্মক ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এবং অন্যদিকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের জঙ্গী বক্তব্যসমূহের প্রভাবে যোশীর নেতৃত্ব এক দারুণ সংকটের সম্মুখীন হয়। নেহরু সরকারের 'অনুগত বিরোধিতার' পরিবর্তে তার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামের জন্যে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির এক প্রভাবশীল অংশ রণদীভের নেতৃত্বে নোতুনভাবে পার্টির মধ্যে নিজেদেরকে সংহত করতে সচেষ্ট হন।

এই সময় কমিউনিস্ট পরিচালিত নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতা শ্রীপত অমৃত ডাঙ্গে ওয়ার্লড্ ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস্-এর অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে প্রাগ্ যান এবং সেখান থেকে পূর্ব ইউরোপ এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন সফরের পর ভারতে ফিরে আসেন। সফরকালে ভারতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর সাথে কমিনফর্ম ও সোভিয়েট পার্টির নেতাদের আলাপ আলোচনা হয়। এবং সম্ভবতঃ তাঁরা ভারতে টিটোপন্থী নীতি অনুসরণকে পরোক্ষ অনুমোদন দান করেন। এ সম্পর্কে সঠিক ও নিশ্চিতভাবে কিছু জানা না গেলেও রজনী পাম দত্ত এই প্রসঙ্গে ডাঙ্গেকে ভারতে 'টিটোপন্থী প্রভাবের অন্যতম প্রধান ধারক' হিসাবে আখ্যায়িত করেন।[৫]

১৯৪৭ সালে ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বোম্বাইয়ে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক অধিবেশন বসে। তার ঠিক এক সপ্তাহ পূর্বে বোম্বাই প্রদেশের কংগ্রেসী সরকার পার্টির মুখপত্র 'পিপল্স্ এজ'-এর উপর অনেক রকম নিষেধাজ্ঞা জারী করেন।[৬] এর ফলে কেন্দ্রীয় কমিটিতে আলোচনাকালে চরমপন্থীদের আর সুবিধা হয় এবং তাঁরা রণদীভের নেতৃত্বে যোশীর 'অনুগত বিরোধিতার' নীতি ও কর্মসূচীকে দারুণভাবে আক্রমণ করেন।

অধিবেশনে যোশীর আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব বজায় থাকলেও কেন্দ্রীয় কমিটিতে

পার্টি কর্মসূচীর মধ্যে আমূল পরিবর্তনের সপক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলেন যে সারা দুনিয়া দুটি পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়েছে এবং নেহরু সরকার বৃহৎ বুর্জোয়া প্রভাবে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের তাঁবেদার ব্যতীত আর কিছুই নয়। সেই হিসাবে যোশী এবং রজনী পাম দত্তের সমালোচনা প্রসঙ্গে তাঁরা বলেন যে কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীল দলগুলির কাজকর্ম এবং গণচাপের মাধ্যমে নেহরু সরকারকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নীতি অনুসরণে বাধ্য করার নীতি সুবিধাবাদেরই নামান্তর। কাজেই সেই সরকার এবং তার মূল ভিত্তি ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে সামগ্রিক সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যে তাঁরা পার্টির সদস্যদের আহ্বান জানান।

নেহরু এবং বৃহৎ বুর্জোয়াকে ভারতীয় জনগণের শত্রু হিসাবে নির্দেশ করা সত্ত্বেও এই পর্যায়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একমাত্র যুগোশ্লাভ পার্টি ব্যতীত অন্য কোনো পার্টি ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামের পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকেন।

৪ ॥ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস

কেন্দ্রীয় কমিটির উপরোক্ত বোম্বাই অধিবেশনে নেহরু এবং ভারতীয় বুর্জোয়া সম্পর্কে পার্টি একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয় ও সামগ্রিক ধনতন্ত্র বিরোধী রণনীতির অনুমোদন এবং প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এক কংগ্রেস আহ্বানের সিদ্ধান্ত নেয়।

এই কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই রণদীভে এবং অন্যান্য চরমপন্থীরা কেন্দ্রীয় কমিটিতে প্রাধান্য লাভ করেন এবং পার্টির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে যোশী সমর্থকদেরকে অপসারণ করতে তৎপর হন। ডিসেম্বর মাসের অধিবেশনে কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টি সভ্যদের জন্যে একটি রাজনৈতিক রিপোর্টের খসড়া তৈয়ীর উদ্দেশ্যে একটি সাব-কমিটি গঠন করেন। এ ছাড়া কংগ্রেসের সামনে পেশ করার জন্যে কেন্দ্রীয় কমিটি নোতুন সদস্যদের একটি তালিকাও প্রস্তুত করেন।

রাজনৈতিক রিপোর্টটির উপর আলোচনা এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক কমিটি নিজেদের সম্মেলন আহ্বান করেন। রাজনৈতিক রিপোর্টের খসড়া রচনা থেকে প্রাদেশিক সম্মেলন পর্যন্ত সবকিছুই

অতি অল্পকালের মধ্যেই দ্রুতভাবে সম্পন্ন হয় এবং ডিসেম্বর মাসের কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনের মাত্র আড়াই মাস পরে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮, কলকাতাতে মিলিত হয়।[১]

'পিপল্‌স্ এজ'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ৯১৯ জন নির্বাচিত প্রতিনিধির মধ্যে ৬৩২ জন কংগ্রেসে উপস্থিত হন। এঁদের মধ্যে ৫৬৫ জন ছিলেন সার্বক্ষণিক কর্মী অর্থাৎ প্রধানতঃ পার্টি সংগঠক। তেলেঙ্গানা থেকে ৭৫ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেও শেষ পর্যন্ত উপস্থিত হতে পারেন মাত্র চার-পাঁচজন। অস্ট্রেলিয়া, বর্মা, সিংহল এবং যুগোশ্লাভিয়ার প্রতিনিধিরাও এই কংগ্রেসে উপস্থিত থাকেন। বৃটিশ অথবা সোভিয়েট পার্টি দ্বিতীয় কংগ্রেসে কোনো প্রতিনিধি পাঠাননি।[২]

কংগ্রেসে অস্ট্রেলিয়া, বর্মা এবং সিংহলের প্রতিনিধিরা মোটামুটিভাবে নীরব দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করলেও যুগোশ্লোভ পার্টির প্রতিনিধি ভ্লাদিমির দেদিয়ের এবং রাদোভেন হকোভিক উভয়েরই ভূমিকা সেখানে ছিলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। ধনতন্ত্রীবিরোধী রণনীতির অধীনে সমসূত্রে গ্রথিত গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে নিজেদের বক্তব্য তাঁরা কংগ্রেসে এত বলিষ্ঠভাবে উত্থাপন ও আলোচনা করেন যাতে করে সকলের মনে এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে তাঁরা কমিনফর্মের পূর্ণ অনুমোদনক্রমে তা করছেন। অস্ট্রেলীয় পার্টির প্রতিনিধি শার্কী যুগোশ্লাভদের এই পরামর্শ সম্পর্কে কোনো আপত্তি করেননি। এবং কোনো দিক থেকে সেই বক্তব্যের কোনো বিরোধিতা না হওয়ায় ভারতীয় পার্টির মধ্যে টিটোপন্থী রণনীতি অপ্রতিহত প্রাধান্য লাভ করে। এখানে সব থেকে বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে মাও সেতুঙ-এর তত্ত্বগত চিন্তা অথবা চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অনুসৃত রণনীতির কোনো উল্লেখই সেখানে কেউ প্রয়োজন মনে করেননি।[৩]

যুগোশ্লোভদের তাত্ত্বিক বক্তব্যের সাথে রণদীভের পূর্ব পরিচয় ছিলো এবং প্রধানতঃ তার উপর ভিত্তি করেই তিনি নিজের বক্তব্যকে দাঁড় করিয়েছিলেন। কংগ্রেসে যুগোশ্লাভ প্রতিনিধিদের উপস্থিতি ও সক্রিয় ভূমিকা রণদীভের হাতকে অনেকখানি বেশী শক্তিশালী করে এবং প্রথম থেকেই তিনি কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হন।

খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাবের উপর রণদীভে যে রিপোর্ট পেশ করেন সেটাই কংগ্রেসের পরবর্তী আলোচনার দিক নির্ণয় করে। আলোচ্য রিপোর্টটিতে তিনি বলেন যে ভারতীয় বুর্জোয়ারা ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে একজোট হওয়ার ফলে সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিক

শিবিরের সাথে তারা এক অখণ্ড দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে। কাজেই জনগণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের রণনীতিকে একই সঙ্গে গ্রথিত করে পার্টিকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম করে যেতে হবে। তার জন্যে প্রয়োজন হবে সামগ্রিকভাবে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপুল জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত ও পরিচালনা করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে রণদীভে শ্রমিক কৃষক পেটি বুর্জোয়া এবং প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে এক 'জনগণতান্ত্রিক মোর্চা' গঠনের প্রস্তাব করেন।[৪]

তেলেঙ্গানার অভিজ্ঞতাকে যোশী তাঁর চিন্তার মধ্যে প্রাধান্য দেওয়া তো দূরের কথা নিজের সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে সে বিষয়ে তিনি ছিলেন উদাসীন। রণদীভে কিন্তু তাঁর রিপোর্টে তেলেঙ্গানার অভিজ্ঞতার উপর জোর দিয়ে বলেন যে ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে তা একটা 'গুণগত' পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে। শুধু তাই নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আজ তেলেঙ্গানার অর্থ কমিউনিস্ট এবং কমিউনিস্টের অর্থ তেলেঙ্গানা'।[৫]

কংগ্রেসের বক্তাদের মধ্যে রণদীভের পরই ভবানী সেনের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেস-লীগ সরকারের সাথে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে তিনি বাঙলাদেশে তেভাগা আন্দোলন স্থগিত রাখার পরামর্শ[৬] দেওয়া সত্ত্বেও ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারি-মার্চে তিনি হয়ে দাঁড়ান চরমপন্থী রাজনীতির অন্যতম মুখপাত্র!

রণদীভের বক্তব্যকে আরও বিশদভাবে বর্ণনা করে তিনি কংগ্রেসে এক দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। তাতে ১৯৩২ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত পার্টি অনুসৃত 'জাতীয়তার নীতি'কে বর্জন করে বলা হয় যে তৎকালীন অবস্থায় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার কোনো একটি বিশেষ জাতির সমগ্র জনগণের দ্বারা অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়; সত্যিকার আত্মনিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে হলে শ্রমিক শ্রেণী ও তার মিত্রদের বৈপ্লবিক সংগ্রামের মাধ্যমেই তা সম্ভব। কাশ্মীর সম্পর্কে তাঁদের পূর্ব অনুসৃত নীতির সমালোচনাকালে তিনি বলেন যে কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সমর্থন করে পার্টি এক মস্ত ভুল করেছিলো। ভবানী সেনও এই প্রসঙ্গে তেলেঙ্গানার উল্লেখ করে বলেন যে আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্যে সংগ্রামের সত্যিকার পথ হচ্ছে তেলেঙ্গানার পথ।[৭]

এ ছাড়া সমগ্র পাক-ভারতীয় উপমহাদেশে বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে তিনি বলেন:

এ প্রশ্নের সত্যিকার সমাধান যুদ্ধক্ষেত্রে। তেলেঙ্গানার বীর জনগণ

স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের মহান উদাহরণের দ্বারা শুধুমাত্র দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে কি ঘটবে তাই দেখায় না, ভারত ও পাকিস্তানের সত্যিকার ভবিষ্যতের কি হবে সেটাও দেখিয়ে দেয়। সেই পথেই বিজয়ী জনগণকে স্বাধীনতা ও সত্যিকার গণতন্ত্র অর্জনের জন্যে এগিয়ে যেতে হবে।[৮]

রণদীভে, ভবানী সেন প্রভৃতির বক্তৃতার পর তেলেঙ্গানা আন্দোলনের সপক্ষে কংগ্রেসের মনোভাব এত প্রবল হয়ে ওঠে যে তাঁরা সেই আন্দোলনের সমর্থনে একটি পৃথক প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[৯] মূল রিপোর্টগুলি পঠিত হওয়ার পর যোশী এক আত্ম-সমালোচনামূলক বক্তৃতায় নিজে সমস্ত দোষ-ত্রুটি স্বীকার করে বলেন যে তিনি 'কাপুরুষতা', 'পেটি বুর্জোয়া দোদুল্যমানতা', 'আমলাতান্ত্রিক মনোভাব' এবং 'দক্ষিণ সংস্কারবাদী' চিন্তার দ্বারা নানা প্রকার বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে প্রকৃতপক্ষে পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছেন।[১০]

বিদায়ী কেন্দ্রীয় কমিটি নোতুন কমিটি নির্বাচনের জন্যে যে মনোনয়ন দেন তাতে পুরাতন কমিটির বহু সদস্যের সাথে যোশীর নামও ছিলো। কিন্তু যোশীর কার্যকলাপের সমালোচনা এবং তাঁর নিজের আত্মসমালোচনামূলক বক্তৃতা তাঁর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের মনে এরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিলো যে কেন্দ্রীয় কমিটির মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে একমাত্র যোশীই নির্বাচনে পরাজিত হন। এর পরই নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি রণদীভেকে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত করে নোতুন রাজনীতিকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক নেতৃত্ব স্থাপন করেন।[১১]

কংগ্রেসের অধিবেশনে নোতুন নেতৃত্ব একটি 'রাজনৈতিক থিসিস' পেশ করেন এবং সেই থিসিসের উপর এক দীর্ঘ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ববর্তী খসড়া সম্পর্কে পার্টির অভ্যন্তরে নানা আলোচনার সময় সেটিকে অনেকাংশে পরিবর্তিত করলেও কংগ্রেসে তার উপর আরও অনেক মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। রাজনৈতিক থিসিসটির উপর আলোচনা শেষ হওয়ার পর সেটিকে অপরিবর্তিত অবস্থায় গ্রহণ করার জন্যে রণদীভে কংগ্রেসের প্রতি আহ্বান জানান এবং তাঁদের আলোচনার আলোকে সেটিকে সংশোধন করার জন্যে কেন্দ্রীয় কমিটিকে ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব করেন। তাঁর সেই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।[১২]

এই রাজনৈতিক থিসিসটিতেই ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নোতুন রণনীতি ও কর্মসূচী ঘোষিত হয়। বৈপ্লবিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা প্রসঙ্গে তাতে বলা হয় যে ভারত সশস্ত্র বিপ্লবের পর্যায়ে আছে এবং সেই বিপ্লবকে সকল

করার জন্যে সর্বাত্মক সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া প্রয়োজন। এই বৈপ্লবিক সংগ্রামের মাধ্যমেই ভারতে গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজ একই সাথে সাধিত হবে। তার জন্যে পার্টিকে শ্রমিক, কৃষক, পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীকে ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত ও পরিচালনা করা প্রয়োজন। নেহরু সরকার প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় বুর্জোয়ারই প্রতিনিধি, কাজেই সংগ্রামী জনগণের গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মাধ্যমে সেই সরকারকে আক্রমণ করতে হবে। কংগ্রেসের অধিবেশন চলাকালে কেন্দ্রীয় কমিটি নিজেদের একটি পৃথক প্রস্তাবে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এর পরই সেখানে সরাসরিভাবে বলেন যে 'জনগণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের' অর্থ সর্বহারার একনায়কত্ব ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। কাজেই নেহরু সরকারের বিরুদ্ধে তাঁদের বৈপ্লবিক সংগ্রাম অত্যাসন্ন।[১৩]

যুগোশ্লাভ পার্টির পরামর্শ শুধু যে ভারতীয় পার্টিকে গণতান্ত্রিক ও সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবকে সমসূত্রে গ্রথিত করার টিটোবাদী নীতিতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো তাই নয়। পরবর্তী অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে বার্মা, মালয়, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশেও সেই একই নীতির অনুসরণে এক সর্বাত্মক গৃহযুদ্ধ প্রায় ঐ সময় থেকেই শুরু হয়। বার্মা কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক থাকিন থান টুন ব্যক্তিগত-ভাবে দ্বিতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কংগ্রেসে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বার্মায় আসন্ন বিপ্লবের ইঙ্গিত দিয়ে বলেন যে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা যদি গৃহযুদ্ধ বাধাতে চায় তাহলে তাদেরকে গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে। এর পর তিনি বলেন, "কমরেডগণ, মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে ১৯৪৮ সাল একটি চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ বছর। এ বছরেই দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে মুক্তি আন্দোলনের ভাগ্য নির্ধারিত হবে।"[১৪]

দ্বিতীয় কংগ্রেসের ঠিক পূর্বেই কলকাতায় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই সম্মেলনে ভারত, পাকিস্তান, বার্মা, মালয়, ভিয়েৎনাম, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন এবং উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। সোভিয়েট প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে পর্যবেক্ষক হিসাবে উপস্থিত থাকেন। এ ছাড়া দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোগদানের জন্যে আগত যুগোশ্লাভ প্রতি-নিধিরাও সেই সময় কলকাতাতে সমবেত হন। অনেকে মনে করেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিপ্লবের পতাকা তোলার সত্যিকার নির্দেশ মস্কো থেকেই এসেছিলো এবং এই যুব সম্মেলনেই সেই নির্দেশ সংশ্লিষ্ট পার্টিসমূহের কাছে তাঁরা পৌছে দিয়েছিলেন। যোশী অবশ্য পরবর্তীকালে প্রকাশিত তাঁর একটি বিবৃতিতে বলেন যে দ্বিতীয় কংগ্রেসে যুগোশ্লাভ প্রতিনিধিরা ব্যক্তিগতভাবে যে

রণকৌশলের পরামর্শ দিয়েছিলেন সেই অনুসারেই কেন্দ্রীয় কমিটি তেলেঙ্গানায় কৃষক বিপ্লব পরিচালনা করে।[১৫]

৫ ॥ পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগ সহ কোনো প্রতিষ্ঠানই আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ব পাকিস্তান ভিত্তিতে গঠিত হয়নি। কমিউনিস্ট পার্টিরও তখনো পর্যন্ত কোনো পূর্ব পাকিস্তান কমিটি ছিলো না।

সেপ্টেম্বর মাসে ভবানী সেন, আবদুল্লাহ রসুল এবং মনসুর হাবিব ঢাকা আসেন এবং করোনেশন পার্কে একটি জনসভায় বক্তৃতা দেন। এই সফরের সময়ে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন তাঁদের তিন জনকেই সাক্ষাতের জন্যে আমন্ত্রণ জানান এবং সরকারের সাথে তাঁরা সহযোগিতা করে যাবেন বলে আলোচনাকালে নাজিমুদ্দীন আশা প্রকাশ করেন। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারত ও পাকিস্তান সরকারের সাথে সহযোগিতার নীতিই তাঁরা অনুসরণ করে চলেছিলেন। সেই হিসাবে নাজিমুদ্দীনের সাথে ভবানী সেন প্রভৃতির আলাপ মোটামুটি সৌহার্দ্যপূর্ণ হয়েছিলো।[১]

দ্বিতীয় কংগ্রেসের পূর্বে আবদুল্লাহ রসুল এবং মনসুর হাবিব আবার ঢাকা আসেন। আবদুল্লাহ রসুল সে সময় ঢাকাতে মোটামুটি স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্যে বাসাও ঠিক করেছিলেন। মুজাফফর আহমদও সেই সময় ঢাকাতে আসেন এবং রথখোলায় ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সীর দোকান ও অফিস ঘর উদ্বোধন করেন।[২]

দেশভাগের পর সরকারী কর্মচারীদেরকে চাকরির এলাকা বেছে নেওয়ার যে সুযোগ দেওয়া হয় তার ফলে পার্টির অনেক অসুবিধা হয়ে পড়ে। পূর্ব বাঙলায় বিপুল অধিকাংশ পার্টি সভ্য ছিলেন 'হিন্দু'। তাঁদের মধ্যে অনেকেই নানা পারিবারিক অসুবিধার জন্যে পশ্চিম বাঙলায় যেতে বাধ্য হন। কিন্তু পার্টির পক্ষে আসল অসুবিধা দেখা দেয় অন্য দিক থেকে। পূর্ব বাঙলার অধিকাংশ লোকই মুসলমান এবং পার্টি সভ্যদের অধিকাংশ 'হিন্দু' হওয়ার ফলে খোলাখুলি কাজের ক্ষেত্রে তাঁরা বহু অসুবিধার সম্মুখীন হন। সেই অসুবিধা আংশিকভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় 'মুসলমান' পার্টি সভ্যের পশ্চিম বাঙলা থেকে পূর্ব বাঙলায় আসার প্রয়োজন দেখা দেয়।[৩] আবদুল্লাহ রসুল এবং মনসুর হাবিব পূর্ব বাঙলায় কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন।[৮]

কিন্তু আবদুল্লাহ রসুল অল্প কিছুদিন থাকার পরই আবার কলকাতা ফিরেযান।

দ্বিতীয় কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি একটি পৃথক সংগঠন হিসাবে কাজ করে যাবে। পুরাতন পার্টি নেতৃত্বের মধ্যে যাঁরা পাকিস্তান অংশের মধ্যে পড়লেন তাঁরা কলকাতাতেই বসে সাজ্জাদ জাহীরকে সম্পাদক করে একটি কমিটি গঠন করেন। এছাড়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটিকে ভেঙ্গে দিয়ে তার স্থানে পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলার জন্যে পৃথক কমিটিও গঠিত হয়।[৪]

কার্যক্ষেত্রে নিখিল পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান পার্টির তেমন কোনো সাংগঠনিক সম্পর্ক ছিলো না। তার মাধ্যমে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে কিছুটা যোগাযোগ রক্ষা হতো মাত্র।[৫]

যদিও ১৯৫৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ব পাকিস্তানে বেআইনী ঘোষিত হয়নি তবু দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর স্থির হয় যে অল্প কিছু সংখ্যক কর্মী ও নেতা প্রকাশ্যে কাজ করলেও অধিকাংশই গোপন কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। সেই হিসাবে এর পর থেকে পার্টির অধিকাংশ কর্মী আত্মগোপন করে থাকেন। এঁদের মধ্যে দুই-একজন ব্যতীত কেন্দ্রীয় কমিটির প্রায় সব সদস্যই ছিলেন।[৬]

১৯৪৮-এর মার্চ মাসে কোর্ট হাউস স্ট্রীট এবং কাপ্তেন বাজারে* যথাক্রমে পার্টির শহর ও কেন্দ্রীয় অফিস খোলা হয়। প্রকাশ্য কাজের যতটুকু সুযোগ সুবিধা ছিলো সেটা ব্যবহারের জন্যেই উপরোক্ত অফিস দুটি চালু রাখা হয়। কাপ্তেন বাজারে পার্টি অফিসের পাশেই পূর্ব পাকিস্তান রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের অফিসও স্থাপিত হয়। এই ইউনিয়নটি তখন পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবাধীন ছিলো।[৭]

১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় ১২ই মার্চ মুসলিম লীগের গুণ্ডারা কাপ্তেন বাজার এবং কোর্ট হাউস স্ট্রীটে অবস্থিত পার্টির প্রাদেশিক ও শহর অফিস আক্রমণ করে। কিছু বইপত্র ব্যতীত অন্য কোনো কাগজপত্র সেখানে না থাকায় আসবাবপত্র এবং বইগুলি তছনছ করে তারা চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়।[৮] ১৩ই মার্চ রণেশ দাশগুপ্ত এবং ধরনী রায়কে গ্রেফতার করা হয় কিন্তু ভাষা আন্দোলনে অন্যান্য বন্দীদের সাথে তাঁরা দুজনেও ১৫ই তারিখে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। এর পর ঢাকা শহরে পার্টির দুটি অফিসই আবার চালু করা হয়।[৯]

জুন মাসের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির কার্যসূচী নির্ধারিত হয় এবং সেই কার্যসূচীকে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে ৩০শে জুন তাঁরা

*১৯৬৯ সাল পর্যন্ত এখানেই ন্যাশানাল আওয়ামী পার্টি অফিস ছিলো।

করোনেশন পার্কে একটি জনসভায় সিদ্ধান্ত নেন। এই সভার পূর্বে সাত দিন পথ সভা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচারকার্য চালিয়ে যাওয়া হয়। অন্যান্যদের মধ্যে মুনীর চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম প্রভৃতি চোঙ্গা নিয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকায় বক্তৃতা এবং শ্লোগান দিয়ে ৩০শের সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে প্রচারকার্য চালান।[১০]

৩০শের জুন করোনেশন পার্কে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে সভাপতিত্ব করেন মুনীর চৌধুরী। রণেশ দাশগুপ্ত এবং সরদার ফজলুল করিম এই দুই জনের বক্তৃতা দেওয়ার কথা স্থির হয়।[১১] আরও স্থির হয় যে সরদার ফজলুল করিম সাধারণ কার্যসূচী আলোচনা প্রসঙ্গে স্থানীয় সমস্যার উপর বিস্তৃত আলোচনা করবেন এবং রণেশ দাশগুপ্ত বলবেন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা সম্পর্কে।[১২]

প্রায় এক হাজার লোকের উপস্থিতিতে সভা আরম্ভ হয়। এই সময় শাহ আজিজুর রহমানও তাঁর দলবল নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। শুরু থেকেই গণ্ডগোলের আশঙ্কায় সভার মধ্যে একটা থমথমে ভাব বিরাজ করতে থাকে। প্রথম বক্তা সরদার ফজলুল করিম তাঁর বক্তৃতা আরম্ভ করার অল্প কিছুক্ষণ পর থেকেই শাহ আজিজের দল সভাপতির কাছে একের পর এক চিরকুট পাঠিয়ে নানারকম প্রশ্নের উত্তর দাবী করতে থাকেন এবং মাঝে মাঝে চীৎকার করে বাধা দানের চেষ্টাও করেন। রণেশ দাশগুপ্ত তাঁর বক্তৃতায় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির আলোচনা ছাড়া পাকিস্তানের কমনওয়েল্থ্ ত্যাগের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন।[১৩]

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টোটি সভাতে সরাসরি পাঠ করা হয়নি। কিন্তু সেই কার্যসূচীকে দুজন বক্তাই নিজেদের বক্তৃতায় ব্যাখ্যা করে সকলকে বোঝান। কথা ছিলো তাঁদের দুজনের পর মুনীর চৌধুরী বক্তৃতা করবেন। কিন্তু সভায় শাহ আজিজুর রহমানদের কার্যকলাপের ফলে পরিস্থিতি বেশ আশঙ্কাজনক মনে হওয়ায় তাঁরা এর পর তাড়াতাড়ি সভা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেন। কাজেই মুনীর চৌধুরী সভাপতি হিসাবে দুই এক কথা সাধারণভাবে বলার পর সেদিনকার মতো তাঁরা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।[১৪]

এই ঘোষণার পরই শাহ আজিজেরা চীৎকার করে সভা ভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁদের বক্তব্য পেশ করার দাবী করেন এবং তার পরই কিছু ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে যায়। এই গণ্ডগোলের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরা সভাস্থল পরিত্যাগ করে তাঁদের অফিসের দিকে চলে যান। কারণ মুসলিম লীগ গুণ্ডাদের দ্বারা তাঁদের অফিস আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। তাঁরা সভাস্থল

ত্যাগ করার পর শাহ আজিজেরা ময়দান দখল করে কিছুক্ষণ কমিউনিস্ট পার্টিকে নানা গালাগালির পর নিজেদের সভা শেষ করেন।[১৫]

৩০শে জুন করোনেশন পার্কের সভার পর সন্ধ্যার দিকে প্রায় এক হাজার লোক কোর্ট হাউস স্ট্রীটের পার্টি অফিস ঘেরাও করে আক্রমণ চালায় এবং তাদের সাথে অফিসের লোকেদের প্রায় আধঘণ্টাব্যাপী তুমুল খণ্ডযুদ্ধ হয়। বিনয় বসু, অমূল্য সেন, রণেশ দাশগুপ্ত, মুনীর চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম ছাড়াও প্রায় জনকুড়ি যুবক তখন অফিসের মধ্যে ছিলেন।[১৬] এই মারামারি ও গণ্ডগোলের সময় প্রধান মন্ত্রী নাজিমুদ্দীন 'শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে কমিউনিস্ট পার্টি অফিসে দুইজন পুলিশ পাঠিয়ে দেন!'[১৭] পার্টি সভ্যেরা বেশ কিছুক্ষণ সেই আক্রমণ প্রতিহত করার পর গুণ্ডারা স্থান ত্যাগ করে এবং সেবারের মতো পার্টি অফিসের ভেতরে প্রবেশ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।[১৮]

এই পর্যায়ে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করার কোনো পরিকল্পনা সরকারের ছিলো না। কিন্তু অন্যান্য উপায়ে এবং নির্যাতনের মাধ্যমে পার্টির কাজে সর্বতোভাবে বাধা প্রদানের সিদ্ধান্ত তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন ও সেই সিদ্ধান্তকে কার্যকর করতে তাঁদের চেষ্টা এবং উদ্যোগের ক্রটি ছিলো না।

৭ই জুলাই রণেশ দাশগুপ্ত এবং ধরনী রায়কে গ্রেফতার করা হয়। এর পরই মোটামুটিভাবে সকলকে খোলাখুলি কাজ বন্ধ করে গোপনীয়তা রক্ষা করে চলার সিদ্ধান্ত নেন।[১৯]

দ্বিতীয় কংগ্রেসের সময় পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য সংখ্যা ছিলো প্রায় দশ-বারো হাজার। কিন্তু এই সংখ্যা মার্চের পর থেকেই দ্রুত কমে আসতে থাকে।[২০] পূর্বে ঢাকা শহরে এবং পার্টির বিভিন্ন জেলা অফিস-গুলিতে ছাত্র এবং কর্মীদের যে ভীড় দেখা যেতো পরবর্তী পর্যায়ে তাও পাতলা হয়ে আসে এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাঁদের সংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় নগণ্য।[২১]

এর কারণ দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত নোতুন রণনীতি এবং পরবর্তী রণকৌশলের ভিত্তিতে পার্টি যে কার্যসূচী গ্রহণ করেছিলো তাকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে পার্টি সভ্য এবং দরদীদের উপর যে দায়িত্ব বাস্তবতঃ অর্পিত হয় অথবা অর্পিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় তা পালনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ও মনোবলের অভাব। বহুদিন যাবৎ সংসদীয় আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে পার্টি সভ্যেরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্যে উচিতমতোভাবে

প্রস্তুত ছিলেন না। এই অবস্থা আরও ঘোরতর আকার ধারণ করে তাঁদের অধিকাংশের শ্রেণীগত দুর্বলতার জন্যে। পেটিবুর্জোয়া আধিপত্যের ফলে সভ্য হওয়াও তখন তেমন কঠিন ছিলো না এবং সেই সুযোগে এমন অনেকে পার্টির মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে সমর্থ হন যাঁদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো বৈপ্লবিক সম্ভাবনাই ছিলো না। প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে জড়িত থেকে পেটি বুর্জোয়া আত্মপ্রসাদ এবং জনপ্রিয়তার জন্যেই তাঁরা পার্টির সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন। কাজেই সত্যকার সংগ্রাম এবং সশস্ত্র বিপ্লবের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার মতো অবস্থা তাঁদের ছিলো না। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই প্রথম দিকে উধাও হন এবং অনেকে কোনো প্রকারে মুখ রক্ষা করে পার্টির সাথে সম্পর্ক ছেদের উপায় অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকেন।[২২]

৬॥ জননিরাপত্তা আইন ও সরকারী দমননীতি

শুধু কমিউনিস্ট পার্টি নয়, সামগ্রিকভাকে সমস্ত বিরোধীদলকে দমনের উদ্দেশ্যে সরকার জননিরাপত্তা আইনসহ অন্যান্য বহু নির্যাতনমূলক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। এই নির্যাতন অবশ্য প্রধানতঃ কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়।

সরকারের এই দমননীতির বিরুদ্ধে অন্যান্য মহল তো দূরের কথা এমনকি সরকারের অনুগত সংবাদপত্র দৈনিক 'আজাদ' পর্যন্ত প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হয়। ১১ই মার্চ ১৯৪৯ তারিখের দৈনিক আজাদের এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়:

> আমাদের কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া দিতে চাই যে, আতঙ্কগ্রস্ততা ও দমননীতির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল না হইয়া তাঁরা দেশ হইতে দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও সামাজিক ভেদবৈষম্য দূর করিবার কাজকে তরান্বিত করুন। ইহা করিতে পারিলেই পাকিস্তানে কমিউনিজমের প্রবেশের দূরতম এবং ক্ষীণতম সম্ভাবনাও চিরদিনের জন্য দূর হইয়া যাইবে।

কেবলমাত্র সরকারই নয়, প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা ভাবনায় অভ্যস্ত কিছু সংখ্যক ব্যক্তিও দমনমূলক ব্যবস্থার পক্ষে খোলাখুলিভাবে তাঁদের মত প্রকাশ করেন। এ সম্পর্কে 'নওবেলালের' ১৭ই মার্চ, ১৯৪৯ তারিখের একটি সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> আজ জনসাধারণের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক যাহারা কঠোর দমননীতি

চালাইয়া যাইবার জন্য সরকারকে চাপ দিতেছেন তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে কমিউনিজমের কাজ আগাইয়া দিতেছেন। তাঁহারা যদি সত্য সত্যই কমিউনিজম বিরোধী হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাদের উচিত দেশের প্রধান প্রধান সমস্যা যথা—শিক্ষা সমস্যা, খাদ্য সমস্যা—মানুষ মানুষের মতো বাঁচিয়া থাকিবার সমস্যা ইত্যাদির আশু এবং উপযুক্ত সমাধান করিবার জন্য সরকারকে বাধ্য করা।

১৯৪৯-এর মে মাসে পূর্ব বাঙলা সরকার চট্টগ্রামের দৈনিক "পূর্ব পাকিস্তানের" নিকট থেকে ৩০০০ টাকা জামানত তলব এবং "পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উত্তেজনামূলক সম্পাদকীয় ও সংবাদ প্রকাশের" ওপর সেন্সরশীপ জারী করেন।[১] এ ছাড়া ঐ একই মাসে ঢাকায় ইংরেজী সাপ্তাহিক "ইস্টার্ন স্টারে"র ওপরও তাঁরা ১৯৪৬ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন বলে সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশের পূর্বে সেগুলি সরকারকে দেখানোর জন্যে তাঁদের ওপর এক নির্দেশ জারী করেন।[২]

এই দুই পত্রিকার ওপরই উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞা জারীর পর অনেক প্রতিবাদ সত্ত্বেও সরকার সেই নিষেধাজ্ঞাগুলিকে প্রত্যাহার করার কোনো ব্যবস্থা না করে সেগুলিকে বহাল রাখেন। এই সরকারী মনোভাব ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নওবেলাল ১৯৪৯-এর ২রা জুন সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেন:

> সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সকল স্বাধীনতাকামী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানই প্রতিবাদ জানাইয়া অবিলম্বে এই আদেশ প্রত্যাহার করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত সরকার তাহাদের আদেশ বলবত রাখিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তানে সংবাদপত্রের সংখ্যা পাকিস্তানের অন্য প্রদেশের তুলনায় খুবই অল্প। এই প্রদেশে শক্তিশালী সংবাদপত্র যাহাতে ত্বরিত গড়িয়া ওঠে সরকারের উচিত ছিল সে ব্যবস্থা করা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সরকার তার বিপরীত পন্থাই অবলম্বন করিতেছেন। দেশের জাগ্রত জনমত তাহা কোনোমতেই অনুমোদন করিতে পারে না এবং করেও নাই। জনমতের প্রতিধ্বনি করিয়া আমরা সরকারকে আরও একবার অনুরোধ করিব—আপনাদের আদেশ প্রত্যাহার করুন।

২রা জুন, ১৯৪৯-এর নওবেলাল-এ প্রকাশিত একটি খবরে জানা যায় যে চট্টগ্রামের দৈনিক 'পূর্ব পাকিস্তান'-এর সম্পাদক জনাব আবদুস সালাম তাঁর পত্রিকার বিরুদ্ধে সরকারী দমননীতির প্রতিবাদে ১লা জুন থেকে অনশন শুরু

করেন। শুধু পূর্ব পাকিস্তানেই নয়, পশ্চিম পাকিস্তানেও পশ্চিম পাকিস্তান জন-নিরাপত্তা আইন ও পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ওঠে এবং সেই প্রতিবাদে মুসলিম লীগের নেতারা পর্যন্ত শরীক হন। ১৯৪৯-এর অক্টোবর মাসে পশ্চিম পাঞ্জাব প্রাদেশিক লীগ কাউন্সিলের পরবর্তী অধিবেশনে প্রাদেশিক লীগের সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ ইকবাল চীমা পশ্চিম পাকিস্তান জননিরাপত্তা আইন এবং পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিনান্স রহিত করার জন্যে এক প্রস্তাবের নোটিশ দেন।[৩]

সে সময় পশ্চিম পাঞ্জাব প্রাদেশিক লীগের কাউন্সিল সদস্য মোহাম্মদ আবদুল্লাহ খানকে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধেও চীমা ও লাহোর মুসলিম লীগের সভাপতি জাফরুল্লাহ পৃথক পৃথক বিবৃতিতে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।[৪]

পশ্চিম পাঞ্জাব সাংবাদিক সংঘের কার্যকরী কমিটিও জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স-এর তীব্র নিন্দা করে এক প্রস্তাব নেন এবং তাতে তাঁরা ঐ অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করার জন্যে পাকিস্তানের সাংবাদিকদের কাছে আবেদন জানান।[৫]

এ ছাড়া ১০ই অক্টোবর, তারিখে লাহোরে এক বিরাট জনসভায় পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে এক প্রস্তাব পাস করা হয়। সেই প্রস্তাবে বেগম শাহ নওয়াজ মালিক ফিরোজ খান নুন, খান ইফতেখার হোসেন খান (মামদোত), মিঞা মমতাজ দৌলতানা, প্রভৃতি পাকিস্তান বিধান সভার সদস্য এবং মুসলিম লীগের পাণ্ডা ব্যক্তিরাও স্বাক্ষর দান করেন। এই প্রস্তাবটিতে তাঁরা বলেন:

> দেশের মধ্যে এমন কোনো অবস্থার সৃষ্টি হয় নাই যাহার জন্য এই যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা আবার নোতুন করিয়া গ্রহণ করিবার কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে। স্বাধীনতা অর্জনে দেশবাসী আশা করিয়াছিল যে নাগরিক অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু সরকার দেশবাসীর আশা ভঙ্গ করিয়া এই "ফ্যাসিস্ট" ব্যবস্থা আবার নূতন করিয়া দেশের উপর চাপাইয়া দিতেছেন।[৬]

জননিরাপত্তা আইনের বলে সরকার সংবাদপত্র সম্পাদক থেকে শুরু করে রাজনৈতিক কর্মী পর্যন্ত সকলকে ব্যাপকভাবে ধরপাকড় শুরু করে। সংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহও এই সরকারী হামলার শিকারে পরিণত হয়। পূর্ব পাকিস্তান প্রগতি লেখক সংঘকে সরকার একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঘোষণা

করে তার বিরুদ্ধে নানা প্রকার দমন ও নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এ সম্পর্কে ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫০ করাচীর লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, ছাত্র, যুবক ও কৃষকদের এক সভায়[৭] প্রগতি লেখক সংঘকে সরকার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলে যে ঘোষণা করেছিলেন তা বাতিল করার জন্যে দাবী জানানো হয়। উক্ত সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে তাঁরা সরকারের এই ঘোষণাকে শুধু সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক কার্যাবলীর উপর আক্রমণ বলে অভিহিত করেন।

৭ই এপ্রিল, ১৯৫০, করাচীতে পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্পাদকদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[৮] সেই সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের কোনো প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেননি। সম্মেলনে পাকিস্তান সরকারের জননিরাপত্তা আইন সম্পর্কে সভ্যদের মধ্যে তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা চলে। এবং সেখানে সরকার কর্তৃক জননিরাপত্তা আইনের প্রয়োগ সংবাদপত্রের উপর যাতে না হয় সে বিষয়ে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। কিন্তু সম্মেলন সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করায় পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের সাতজন সম্পাদক অধিবেশন গৃহ পরিত্যাগ করেন। এ প্রসঙ্গে ২৭শে এপ্রিল নওবেলাল 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা' শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে বলেন :

> সম্প্রতি করাচীতে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের অধিবেশন হইতে লাহোরের কয়েকজন বিশিষ্ট সাংবাদিক সম্মেলনের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন। পাকিস্তান সরকারের জননিরাপত্তা আইনের কবল হইতে সংবাদপত্র ও সাংবাদিগকে অব্যাহতি দিবার জন্য যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল তাহা সম্মেলনে অগ্রাহ্য হইয়া যাওয়ায়ই তাঁহারা এই পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই আইন অনুযায়ী সরকার কোনো কারণ না দর্শাইয়াই যে কোনো সময়ে যে কোনো সংবাদপত্র বন্ধ করিয়া দিতে বা যে কোনো সংবাদপত্র সম্পাদককে কারা প্রাচীরের অন্তরালে নিক্ষেপ করিতে পারেন। দেশে জরুরী অবস্থাধীনে এই ধরনের আইনের প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে কিন্তু সাধারণ অবস্থায় এইরূপ বিশেষ ক্ষমতার ব্যবস্থাকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের নামান্তর ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।

করাচীর সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনে সাতজন সম্পাদক যে প্রস্তাব আনেন তাতে জননিরাপত্তা আইন বাতিলের কোনো দাবী ছিলো না। আইনটি যাতে সংবাদিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হয় এই ছিলো তার সুপারিশ। কিন্তু এই

সুপারিশও সম্পাদকদের নিজেদের দ্বারাই অগ্রাহ্য হয়!

পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন জননিরাপত্তা আইনের অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি দিলেও কার্যক্ষেত্রে তা পালন করা হয় নাই। ঐ সম্পর্কে ঢাকার অন্যতম ইংরেজী দৈনিক 'পাকিস্তান অবজার্ভার' মন্তব্য করে:

> এই ধরনের প্রতিশ্রুতির কোনো অর্থই হয় না। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কাইয়ুম মন্ত্রিসভা, মন্ত্রিসভার রদবদল সম্পর্কে এক সংবাদ প্রকাশ করার জন্যে 'সরহদ' পত্রিকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তানেও এইরূপ বা ইহার চেয়েও নগণ্য কারণে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। সমগ্র পাকিস্তান জুড়িয়া এবং বিশেষ করিয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পূর্ব পাকিস্তানে বিশিষ্ট মুসলিম লীগ পন্থীদের পর্যন্ত এই আইনের আওতায় ফেলিয়া বিনা বিচারে আটক রাখা হইয়াছে এবং হইতেছে।[৯]

পূর্ব বাঙলার কথা উল্লেখ করে ঢাকার কুখ্যাত ইংরেজী দৈনিক 'মর্নিং নিউজ' পর্যন্ত ১৮ই এপ্রিল, ১৯৫০, এক সম্পাদকীয়তে লেখে:

> এখানে কর্তৃপক্ষ জনকল্যাণমূলক সমালোচনা সহ্য করিতেও প্রস্তুত নহেন। প্রাদেশিক প্রেস কনসালটেটিভ কমিটির এগারজন সদস্যের মধ্যে চারিজনই সরকারী কর্মচারী। এই কমিটিকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই সম্পাদকদেরকে গ্রেফতার করা হইতেছে। জামানত তলব দেওয়া হইতেছে। এবং সংবাদপত্র বন্ধ করা হইতেছে।

সরকার জননিরাপত্তা আইনের বলে একের পর এক পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং পত্রিকা সম্পাদকের বিরুদ্ধে হামলা চালায়। সরকারের সাথে সামান্য মতবিরোধ পর্যন্ত তারা দমন করতে বদ্ধপরিকর হয়ে নির্বিচারে তাদের দমননীতি প্রয়োগ করে। শুধু ঢাকা, লাহোর এবং অন্যান্য বড়ো শহর থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র পত্রিকার উপরই তাদের এই হামলা সীমাবদ্ধ ছিলো না। মফস্বলের সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির মধ্যে বহুসংখ্যক পত্রিকাই সরকারের জননিরাপত্তা আইনের কবলে পড়ে। ফেনী থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "সংগ্রাম" সম্পাদক ফয়েজ আহমদ এই আইনে গ্রেফতার হওয়ার পর ২রা নভেম্বর, ১৯৫০, 'দুর্ভাগা সাংবাদিক' নামে একটি সম্পাদকীয়তে নওবেলাল বলেন:

> জনাব আহমদ 'নিরাপত্তা আইন'-এর কবলে পড়িয়াছেন। আমরা প্রকাশ্য আদালতে তাঁহার সুবিচার চাই। যদি সরকার জনমতের ধার ধারিয়া

থাকেন—দোষী হইলে নিশ্চয়ই আহমদ সাহেব শাস্তি বরণ করিয়া নিবেন—নির্দোষী হইলে তাঁহার মুক্তি চাই।—'পূর্ব পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্পাদক সংঘ' একবার সরকারকে জিজ্ঞাসা করুন সরকার কি তাঁহার অলঙ্ঘনীয় দোষের কথা তাঁহাদিগকে অবহিত করাইবেন? 'নিখিল পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্পাদক সঙ্ঘের' স্ট্যাণ্ডিং কমিটির রীতি অনুযায়ী সংগ্রাম সম্পাদকের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখুন। কোথায় সম্পাদক সাহেব রাষ্ট্রদ্রোহিতা করিয়াছেন? বৃটিশ আমলের তৈরী একজন কর্মচারীর খেয়ালের বলেই কি এমনিভাবে সাংবাদিকেরা জননিরাপত্তার নামে কারা প্রাচীরের অন্তরালে থাকিবেন?—আমরা সত্যকারের বিচার চাই।—নির্দোষীর মুক্তি চাই।

কমিউনিস্ট পার্টিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বেআইনী ঘোষণা না করলেও জন-নিরাপত্তা আইনের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের দ্বারা পাইকারী হারে কমিউনিস্টদেরকে গ্রেফতার করে তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। এর ফলে বহু পার্টি সদস্য আত্মগোপন করেন এবং অনেকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিশ্চিন্ত জীবন গঠনে নিযুক্ত হন।

৭॥ জেল নির্যাতন ও অনশন ধর্মঘট

বৃটিশ আমলে রাজবন্দীদের জন্যে ১৯৪০ সালের যে Security Prisoners Rules ছিলো ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর East Bengal Special Powers Ordinance পাস করার সময় সেটাকে বাতিল করা হয়।[১] এর পর থেকে রাজবন্দীদেরকে পূর্বের মতো মর্যাদা না দিয়ে জেলা শাসক ইচ্ছেমতো তাদেরকে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করে রেখে যখন যা খেয়াল সেই অনুসারে তাদের সাথে ব্যবহার করতেন। এই ক্ষমতা জেলা শাসকদেরকে আইনগত-ভাবেই দেওয়া ছিলো। একথা ১৯৪৯-এর ৫ই এপ্রিল পূর্ব বাঙলা পরিষদে রাজবন্দীদের অনশন সম্পর্কে একটি বিতর্ক চলাকালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মুফিজউদ্দীন আহমদের পক্ষ থেকে কাজী আবুল মাসুদ স্বীকার করে বলেন যে রাজবন্দীদের মধ্যে কাকে দ্বিতীয় শ্রেণী এবং কাকে তৃতীয় শ্রেণী দেওয়া হবে সেটা সম্পূর্ণভাবে জেলা শাসকের হাতেই ন্যস্ত আছে।[২]

ঐ একই বিতর্কের সময় মন্ত্রী মুফিজউদ্দীন আহমদ বলেন যে প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দীদের মধ্যে আসলে তেমন কিছুই তফাত নেই। প্রথম শ্রেণীর

বন্দীরা অন্যদের থেকে সাক্ষাৎকারের এবং চিঠিপত্র লেখালেখির সুযোগ বেশী পান। কিন্তু খাদ্য এবং অন্যান্য ব্যাপারে এ দুই শ্রেণীর মধ্যে কোনো তফাত নেই।[৩] অন্যদিকে মন্ত্রী আবার একথাও স্বীকার করেন যে Security Prisoners Rules বাতিল হওয়ার পর রাজবন্দীদেরকে সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারে কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম ছিলো না। তাঁরা সেক্ষেত্রে পূর্বোক্ত বাতিলকৃত Security Prisoners Rules-কে অনেকাংশে অনুসরণ করেই বিশেষ বিশেষ অবস্থায় নিজেদের করণীয় স্থির করতেন। কিন্তু পূর্বের Rules সমূহ এ ব্যাপারে পুরোপুরি অনুসরণ করা হতো না।[৪]

Jail Code অনুসারেই তাদের সুযোগ-সুবিধা মোটামুটি নিয়ন্ত্রিত হতো এবং সেখানে রাজবন্দীদের কোনো পৃথক ব্যবস্থার কথা যে ছিলো না একথাও মুফিজউদ্দীন স্বীকার করেন।[৫]

মন্ত্রী মুফিজউদ্দীনের এই বিতর্ককালীন উক্তিগুলো থেকেই একথা প্রমাণিত হয় যে রাজবন্দীদেরকে কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে এবং তাঁদের সাথে কি ধরনের ব্যবহার করা হবে সে বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট ব্যবস্থা ছিলো না। এর অনেকখানি তাই জেলা শাসকের খামখেয়ালী এবং ইচ্ছে-অনিচ্ছের ওপরই নির্ভর করতো। আইনের অবর্তমানে জেলা শাসক ছাড়া জেলার, জেল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট এবং জেলের অন্যান্য কর্মকর্তারাও অনেক সময় ইচ্ছামতোভাবে রাজবন্দীদের সাথে দুর্ব্যবহার করতে দ্বিধাবোধ করতো না।

তৎকালীন রাজবন্দীদের থেকে জানা যায় যে সে সময় রাজবন্দীদের কোনো মর্যাদাই দেওয়া হতো না। প্রথম দিকে জেল ভাতা, পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি, খবরের কাগজ ইত্যাদির কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। আইনতঃ তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী না হলেও পরের দিকে তাঁদেরকে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের খাদ্য দেওয়া হতো, নিজেদের কাপড়ের পরিবর্তে জেলের কুর্তা পরতে হতো এবং সন্ধ্যের পর তাঁদের ঘরে বাতি দেওয়া হতো না।

জেলের অভ্যন্তরে এই নির্যাতন ছাড়াও ১৯৪৯-৫০ সালে রাজবন্দীদের অনশনের আর একটি প্রধান কারণ এই অনশন ধর্মঘট সম্পর্কে তৎকালীন পার্টির সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী। এর সাথে প্রথম দিকে রণদীভে থিসিসের কোনো প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই সে সময় অনশনকে বৈপ্লবিক সংগ্রামের একটি পদ্ধতি হিসাবে ধরে নিয়েছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিলো যে জেলের মধ্যে নিজেদের অধিকার নিয়ে সংগ্রাম শুরু করলে জেলের বাইরে যাঁরা আছেন তাঁরা এর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হবেন এবং তার ফলে দেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম

সামগ্রিকভাবে অনেকখানি এগিয়ে যাবে। রণদীভে থিসিস পুরোপুরিভাবে প্রয়োগ করার নির্দেশ আসার পর এই লাইনকে আরও জোরালোভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। তখন জেলখানার কয়েদীদেরকেও অনশনের দিকে টেনে এনে তাদেরকেও বিপ্লবের দিকে চালনা করার চেষ্টা চলতে থাকে।

এ সময় সাধারণ কয়েদীদেরকে এইভাবে অনশনের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করার নীতির বিরুদ্ধে অনেকে জেলের মধ্যেই বক্তব্য পেশ করেন। তাঁরা বলেন যে এই কয়েদীরা প্রধানতঃ লুনপেন প্রলেটারিয়েট।* এই লুনপেন প্রলেটারিয়েটদেরকে দিয়ে কোনো বিপ্লব হতে পারে না, বিশেষ করে জেলের মধ্যে। এই বক্তব্য যাঁরা দেন তাঁদেরকে সংস্কারপন্থী আখ্যা দিয়ে তাঁদের সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করা হয়।[৬]

পূর্ব বাঙলায় জেলের মধ্যে অনশন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত যখন নেওয়া হয় তখন ভারতের বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষতঃ পশ্চিম বাঙলাতেও, জেলের মধ্যে অনশন ধর্মঘট শুরু হয়েছে। সেখানেও অনশন ধর্মঘটকে সংগ্রামের একটা পদ্ধতিহিসাবে স্বীকার করে নিয়ে তার দ্বারা ব্যাপক জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। সেই হিসাবে দমদম, আলীপুর ইত্যাদি কেন্দ্রীয় কারাগারগুলিতে অনশন ধর্মঘটকে তাঁরা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এর জবাবে পশ্চিম বাঙলা সরকার কর্তৃক দমদম এবং আলীপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে এই সময় রাজবন্দীদের ওপর অকথ্য এবং নির্মম নির্যাতন চালানো হয়।

১৯৪৯ সালের গোড়ার দিকেই সর্বপ্রথম অনশন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং পূর্ব বাঙলার সমস্ত জেলাগুলিতে একই সময় সেই ধর্মঘট শুরু করার জন্যে বিভিন্ন জেলের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা চলতে থাকে। এই যোগাযোগ প্রধানতঃ বদলীকৃত কয়েদীদের মাধ্যমেই স্থাপিত হতো।

যোগাযোগ মোটামুটিভাবে স্থাপিত হওয়ার পর ঢাকা এবং রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারসহ পূর্ব বাঙলার সমস্ত জেলগুলিতে কমিউনিস্ট রাজবন্দীরা ১১ই মার্চ, ১৯৪৯, থেকে আমরণ অনশন শুরু করেন।

ঢাকা জেলে সে সময় প্রায় ১০০ জন রাজবন্দী ছিলেন; তাঁদের পক্ষ থেকে রণেশ দাশগুপ্ত জেল কর্তৃপক্ষকে ধর্মঘটের নোটিশ দেন।[৭] এই সময় একজন পাঞ্জাবী I.M.S. (ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস) ছিলো ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজন্স। সে প্রথমে রণেশ দাশগুপ্তের নোটিশের জবাবে তাঁদেরকে পাল্টা নোটিশ পাঠিয়ে জানায় যে তাঁদের অনশন ধর্মঘট সম্পূর্ণ বেআইনী।

নোটিশ যখন রণেশ দাশগুপ্তের কাছে সার্ভ করতে আসে তখন অন্যান্য

*লুনপেন প্রলেটারিয়েট : ভবঘুরে সর্বহারা

সকলে তাঁকে ঘিরে ধরেন এবং নোটিশটা না নেওয়াই স্থির করেন। এর পর নোটিশ সার্ভ করবার জন্যে তারা রণেশ দাশগুপ্তকে জেল গেটে নিয়ে যায়। সেখানেও তিনি সেটি নিতে অস্বীকার করায় তারা জোর করে তাঁর হাতে নোটিশটি দিয়ে দেয়।[৮]

এর পর উপরোক্ত আই. জি. প্রিজন্স নিজে জেলখানায় এসে রাজবন্দীদের সাথে দেখা করে তাঁদের বলে যে, তাঁরা দেশদ্রোহী, দেশপ্রেমিক নন। তাঁরা এখন আর ইংরেজদের কারাগারে নেই। কাজেই কোনো রকম বিবেচনা তাঁদের প্রতি করা হবে না।[৯] এর পর সে উপস্থিত রাজবন্দীদের জিজ্ঞেস করলো তাঁরা তাঁদের অনশন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে রাজী আছেন কিনা। এর জবাবে সকলেই না, না, বলে চীৎকার করে আই. জি.কে তাঁদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন।[১০]

ঢাকা জেলে ১১ই মার্চ, ১৯৪৯, সকাল থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু হলে ৪৯ জন সেই ধর্মঘটে শরীক হন। সেই দিন সন্ধ্যাবেলাতেই এঁদের মধ্যে ৪ জন অনশন ত্যাগ করেন। ১২ই মার্চ আরও ৩ জন এবং তার পর আরও ৩ জন অনশন ত্যাগ করেন।[১১]

এই সময় জেল কর্তৃপক্ষ এবং সরকারী লোকজন ঘন ঘন অনশন ধর্মঘটীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতে আসতেন এবং তাঁদের দাবী মেনে নেওয়া হবে ইত্যাদি মৌখিক আশ্বাস দিয়ে তাঁদেরকে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিতে বলতেন।[১২] ধর্মঘটীদের মধ্যেও কেউ কেউ এই সময় অনেকখানি দুর্বল হয়ে পড়েন এবং কর্তৃপক্ষের এইসব আশ্বাসের ওপর আস্থা রেখে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়ার সপক্ষে মত প্রকাশ করেন। এই অবস্থা ছাড়াও তিন চার দিনের মধ্যে দশজন ধর্মঘটী ইতিমধ্যেই নিজেদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনশন ত্যাগ করায় ধর্মধট পরিস্থিতির অনেকখানি অবনতি ঘটে। কাজেই শেষ পর্যন্ত ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৫ই মার্চ বাকী ৩৯ জন ধর্মঘটী অনশন ত্যাগ করেন।[১৩]

অনশন ধর্মখটের সময় জেলের মধ্যে গিয়ে জেল কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য সরকারী কর্মচারীরা ধর্মঘটীদের দাবীদাওয়া মেনে নেওয়া সম্পর্কে যে সমস্ত আশ্বাস দিয়েছিলেন সেগুলির কোনোটিই কার্যকর করা হয়নি। উপরন্তু এ প্রসঙ্গে পূর্ব বাঙলা বিধান পরিষদে এক বিতর্ককালে ৫ই এপ্রিল মন্ত্রী মুফিজউদ্দীন ঘোষণা করেন যে ঢাকা জেলের অনশন ধর্মঘটীদেরকে কোনো রকম আশ্বাসই দেওয়া হয়নি এবং তাঁরা বিনাশর্তে তাঁদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছেন।[১৪]

মৌখিক আশ্বাস যতই দেওয়া হোক আইনতঃ এবং লিখিত কোনো বোঝা-পড়া দুই পক্ষে হয়নি, কাজেই মন্ত্রীর এই উক্তি। অনশন ধর্মঘটীরা যে বিনাশর্তে তাঁদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছিলেন তা সত্যি। সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে তাদের থেকে অধিকার আদায় করার মতো মনোবল এবং সাংগঠনিক শৃঙ্খলা তাঁরা ধর্মঘটীদের নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারেননি। কাজেই ঢাকা জেলে প্রথম ধর্মঘটটি ১১ই মার্চ থেকে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত মাত্র ৪ দিন স্থায়ী হয়।

সরকার রাজবন্দীদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ধর্মঘটের ঠিক পরেই তাদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়। পূর্বে যেটুকু অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা তাদের ছিলো সেগুলি প্রায় সবই এর পর তারা হরণ করে। প্রথমেই তারা ব্যবস্থা করে রাজবন্দীদের একত্রে রাখার পরিবর্তে তাঁদের পৃথক সেলে রাখার। তারা ঘোষণা করলো যে এর পর থেকে তাদেরকে আর রাজবন্দীর মর্যাদা কোনোক্রমেই দেওয়া হবে না। সেই অনুসারে রাজবন্দীদের থেকে তাঁদের জামা কাপড় কেড়ে নিয়ে তারা তাঁদেরকে সাধারণ কয়েদীদের জন্যে বরাদ্দকৃত ডুরেকাটা কয়েদীদের পোশাক পরাতেও চেষ্টা করলো। এ ছাড়া চৌকি, মশারী ইত্যাদি ব্যক্তিগত জিনিসপত্রও তাঁদের থেকে কেড়ে নেওয়া হলো।[১৫]

ঢাকা জেলে এই ধর্মঘট মাত্র ৪ দিন স্থায়ী হলেও রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রথম ধর্মঘট আরও অনেক বেশীদিন স্থায়ী হয়। কিন্তু প্রায় ৩৮ দিন ধর্মঘটের পর সেখানেও অবশেষে কর্তৃপক্ষের সাথে কোনো বোঝাপড়া ব্যতীতই ধর্মঘট ভেঙে পড়ে। ধর্মঘট ভেঙে পড়ার পর সেখানেও রাজবন্দীদের থেকে ঢাকা জেলের অনুকরণে সমস্ত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নেওয়া হয়।[১৬]

কেন্দ্রীয় কারাগার দুটি ব্যতীত অন্যান্য জেলগুলিতেও প্রথম অনশন ধর্মঘটের পরিণতি মোটামুটি একই রকম হয়। তবে ঢাকার তুলনায় অন্যান্য জেলে ধর্মঘট কিছুটা বেশীদিন স্থায়ী হয়।

রংপুর জেলে ধর্মঘট চলার সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার জেল পরিদর্শন করে রাজবন্দীদের সাথে দেখা করেন। তিনি তাঁদেরকে বলেন যে নিজের ব্যক্তিগত দায়িত্বেই তিনি আলাপ করতে এসেছেন এবং ঢাকা গিয়ে অন্যান্য মন্ত্রীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে তিনি তারযোগে তাঁদেরকে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবেন। ইতিমধ্যে তিনি রাজবন্দীদেরকে অনশন প্রত্যাহার করতে অনুরোধ জানান। ধর্মঘটীরা তাঁকে বলেন যে তাঁদের অন্ততঃ ডিভিশন প্রিজনার

হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং দশ দিনের মধ্যে সেই সিদ্ধান্ত তাঁদেরকে জানিয়ে দিতে হবে। অন্যথায় দশদিন পর তাঁরা তাঁদের ধর্মঘট আবার শুরু করবেন।[১৭]

হাবিবুল্লাহ বাহারের সাথে উপরোক্ত আলাপ আলোচনা এবং দশ দিনের মধ্যে মন্ত্রী কর্তৃক নিজেদের সিদ্ধান্ত রাজবন্দীদেরকে জানানোর শর্তে রংপুর জেলের অনশন ধর্মঘটীরা ১৫ দিন ধর্মঘটের পর তাঁদের অনশন ত্যাগ করেন।[১৮]

কিন্তু হাবিবুল্লাহ বাহারের প্রতিশ্রুত টেলিগ্রাম রাজবন্দীদের কাছে এলো না। নয় দিন কেটে যাওয়ার পর আবার অনশন ধর্মঘটের প্রস্তুতি শুরু হলো। কিন্তু সে ধর্মঘট আর সম্ভব হলো না। কারণ দশম দিন সকালে অনেককে রংপুর জেল থেকে অন্যত্র বদলী করে দেওয়া হলো। এর মধ্যে অমূল্য লাহিড়ী ও সুধীন ধরকে যেতে হলো রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে এবং মারুফ হোসেন ও মুখলেসুর রহমানসহ আরও কয়েকজনকে যেতে হলো ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে।[১৯]

প্রথম অনশন ধর্মঘট এইভাবে ব্যর্থ হওয়ার পর ১৯৪৯-এর মে মাসে দ্বিতীয় দফা ধর্মঘট শুরু হয়।[২০] এবার শৃঙ্খলার ব্যাপারে আগের থেকে অনেক বেশী কড়াকড়ি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। সকলকে বলে দেওয়া হয় যে পার্টি সিদ্ধান্ত ছাড়াই কেউ যদি অনশন ভঙ্গ করেন তাহলে তাঁকে তৎক্ষণাৎ পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হবে। কাজেই সমস্ত জায়গায় খবর দেওয়া হলো যে মরে গেলেও কেউ নিজের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে অনশন ভঙ্গ করতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না কর্তৃপক্ষ দাবী-দাওয়া মেনে নিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত অনশন ধর্মঘটে সকলকে অটল থাকতে হবে।[২১]

ঢাকা জেলে দশ দিন পর্যন্ত কাউকে নাক দিয়ে খাওয়াতে চেষ্টা করেনি। কিন্তু দশদিন পর প্রত্যেকেই খুব দুর্বল হয়ে পড়ার জন্যে কেউই আর উঠতে পারতো না। সেই অবস্থায় জেল কর্তৃপক্ষ নাক দিয়ে তাদেরকে খাওয়াতে শুরু করে।

এই অনশন ধর্মঘট চলাকালে ১লা জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সরকারী জুলুমের প্রতিবাদে এবং ধর্মঘটীদের সমর্থনে একটি সভার অনুষ্ঠান করেন।[২২]

২৪ দিন এইভাবে অনশন ধর্মঘট চলার পর মন্ত্রী মুফিজউদ্দীন আহমদ এবং ফকির আবদুল মান্নান ও মনোরঞ্জন ধর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে রাজবন্দীদের সাথে দেখা করে তাঁদেরকে আশ্বাস দেন যে তাঁদের সমস্ত দাবী-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। তাঁরা অনশন ধর্মঘটীদেরকে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্যেও

অনুরোধ করেন। এবং আবার এই আশ্বাস এবং অনুরোধের ওপর ভিত্তি করে ঢাকা জেলের ধর্মঘটীরা তাঁদের অনশন ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন।[২৩]

রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে দ্বিতীয় ধর্মঘট স্থায়ী হয় ৪১ দিন। সেখানে এই ধর্মঘটের সময় অনশন ধর্মঘটীদের প্রত্যেককে আত্মহত্যা প্রচেষ্টার অভিযোগে জেল কর্তৃপক্ষ এক বৎসর করে সশ্রম কারাদণ্ড দেন। এর ফলে তাঁদের সকলকে ঘানি, তাঁত ইত্যাদিতে তারা সাধারণ কয়েদীদের মতো কাজে লাগিয়ে দেয়। এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ফলে নূরুল আমীন সরকারের আমলে রাজবন্দীরা বিভিন্ন চাকীতে কাজ করতে থাকেন।[২৪]

ঢাকা ও রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে এবং অন্যান্য জেলা কারাগার-গুলিতে দ্বিতীয় অনশন ধর্মঘট চলার সময় অনশন ধর্মঘটরত রাজনৈতিক নিরাপত্তা বন্দীদের সম্পর্কে পূর্ব বাঙলা সরকার এক প্রেস নোটে বলেন :

ভারত বিভক্ত হওয়ার পূর্বে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের হাত হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য তৎকালীন রাজবন্দীগণ আত্মত্যাগ করিতেন বলিয়া তাঁহা-দিগকে দেশ-সেবক ও আত্মত্যাগী হিসাবে পরিগণিত করা হইত এবং সেই জন্যই তাঁহাদিগকে জেলে পদমর্যাদা ইত্যাদি দেওয়া হইত। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাজনৈতিক পঞ্চম বাহিনীর দল নবলব্ধ পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ধ্বংস করিবার মানসে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং তাঁহাদিগকে সরকার রাষ্ট্রদ্রোহী বলিয়া বিবেচনা করেন। অতএব সরকারের মতে বর্তমানের রাজনৈতিক বন্দীরা কোনো পদমর্যাদা বা অন্য প্রকার সুবিধা লাভ করিতে পারেন না।[২৫]

এই সরকারী প্রেস নোটের সমালোচনা প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক নওবেলাল মন্তব্য করেন :

রাষ্ট্রদ্রোহীদের ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলানই উচিত এবং কে রাষ্ট্রদ্রোহী আর কে নয় উপযুক্ত কোর্টই তাহা বিচার করিবার অধিকারী—সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ নিশ্চয়ই নহে।

আর সাম্রাজ্যবাদী আমলের যে যুক্তি দেখান হইয়াছে তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে সরকার নিজেই দেখাইতেন না বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করিবার জন্য যাহারা সংগ্রাম করিয়া রাজবন্দী হইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে আদর করিয়া সাম্রাজ্যবাদী সরকার বন্দীশালায় পদমর্যাদা দান করিত তাহা সত্যই এক হাস্যাস্পদ ব্যাপার।[২৬]

কিন্তু শুধু মে মাসের দ্বিতীয় অনশন ধর্মঘটের সময় উপরোক্ত সরকারী

প্রেস নোটই নয়। পরবর্তী অনশন ধর্মঘটের সময় পূর্ব বাঙলা বিধান পরিষদে এক বিতর্ককালে প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন বলেন :

> আমি একথা জানাতে চাই যে স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে নিরাপত্তা বন্দীদের কাজকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা হতো। এখানে তখন একটি বিদেশী শাসন ছিলো এবং যারা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতো তাদেরকে দেশপ্রেমিক হিসাবে বিবেচনা করা হতো। আমরা এখন পাকিস্তান অর্জন করেছি, আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। কাজেই এখন যারা আমাদের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করতে চেষ্টা করে এবং যারা দেশে পাকিস্তান বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে তাদেরকে দেশপ্রেমিক হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। তাদেরকে বিবেচনা করা হয় রাষ্ট্রের দুশমন হিসাবে। কাজেই বৈদেশিক শাসনের থেকে তথাকথিত দেশপ্রেমিকরা যে সুযোগ-সুবিধা পেতো এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যখন দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে, তখন সেগুলি তারা আর পাওয়ার আশা করতে পারে না।[২৭]

উপরোল্লিখিত প্রেস নোট এবং "স্বাধীন" রাষ্ট্র পাকিস্তানের পূর্ব বঙ্গীয় মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য পাকিস্তানের সমগ্র রাষ্ট্রীয় কাঠামোর চরম প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র এবং জনগণ ও রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর তাদের নির্যাতনের মাত্রাকে নগ্নভাবেই চিত্রিত করে।

দ্বিতীয় ধর্মঘট শেষ হওয়ার পর ঢাকা জেলে দেবপ্রসাদ এবং নাদেরা বেগম বাইরে থেকে রাজবন্দী হিসাবে আসেন। তাঁদের মাধ্যমে নোতুন রণদীভে লাইন বাস্তবায়ন সম্পর্কে জেলের ভেতরকার কমিউনিস্ট রাজবন্দীরা কিছুটা অবহিত হন। এবং তার পর জেলকে কেন্দ্র করে প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ গঠন করার সিদ্ধান্ত আবার নোতুনভাবে নেওয়া হয়। এর পরই তাঁরা শুরু করেন তৃতীয় পর্যায়ের অনশন ধর্মঘট।[২৮]

এই সময় সাধারণ কয়েদীদের দাবী-দাওয়া নিয়ে কিছুটা আন্দোলনেরও সিদ্ধান্ত হয় এবং সেই আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁরা জেলের মধ্যে মারামারি করার সিদ্ধান্তও নেন। এই সিদ্ধান্ত অবশ্য শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি।[২৯]

তৃতীয় অনশন ধর্মঘট ঢাকায় শুরু হয় সেপ্টেম্বর মাসে এবং তা ৪০ দিন স্থায়ী হয়। এই ধর্মঘটও কর্তৃপক্ষের আশ্বাসের পর শেষ হয় এবং এবার রাজবন্দীরা নিজেদের পৃথক পৃথক সেল থেকে পূর্বের মতো আবার একত্রে থাকার জন্যে ওয়ার্ডে ফিরে আসেন।[৩০] রাজশাহীতে এই তৃতীয়

ধর্মঘট স্থায়ী হয় ৪৫ দিন।[৩১]

তৃতীয় ধর্মঘটের পর জেল-নিয়ম ভঙ্গ করবার জন্যে ঢাকা জেলে দেবেশ ভট্টাচার্য ও নারায়ণ বিশ্বাসসহ কয়েকজনের বিচার হয়। রাজবন্দীরা এর পর নিজেদের উকিলের পরামর্শমতো হাজিরা দিতে অপারগ বলে জেল কর্তৃপক্ষকে জানান। এর ফলে রনেশ দাশগুপ্তসহ কয়েকজনকে হাজিরা দিতে হলো না এবং সে সেজন্যে তাঁরা কোনো মেয়াদী সাজাও পেলেন না।[৩২]

কিন্তু নাদেরা বেগমের বিরুদ্ধে জেল নিয়ম ভঙ্গ করা ইত্যাদি অভিযোগ আনার পর ৩০শে নভেম্বর জেল গেটে একজন সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারের জন্যে তাঁকে হাজির করা হলো। এই বিচারের সময় নাদেরা বেগম কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করে বিচারক সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে নিজের জুতো ছুড়ে মারেন। এই ঘটনার পর নাদেরা বেগমের চুলের মুঠি ধরে তাঁকে মারতে মারতে জেল গেট থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।[৩৩]

নাদেরা বেগমকে এইভাবে মহিলা ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়ার সময় ওয়ার্ডের ভেতরে অন্যান্য মহিলা কয়েদীরা বোতল, কাঁচের গ্লাস ইত্যাদি ছুড়ে জেলের ওয়ার্ডারদের মারতে শুরু করেন। মারপিট ছাড়াও এর অন্য কারণও ছিলো। মহিলা ওয়ার্ডে মেয়ে ওয়ার্ডার ছাড়া কেবলমাত্র জমাদার ও জেলার ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষের ঢোকার নিয়ম ছিলো না। কাজেই পুরুষ ওয়ার্ডাররা যখন নাদেরাকে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে ভেতরে ঢোকালো তখন তাঁরা খুব বেশী ক্ষিপ্ত হয়ে ওয়ার্ডারদের আক্রমণ করলেন। এই আক্রমণের সাথে সাথে তাঁরা শ্লোগানও দিতে থাকলেন।[৩৪]

এই ঘটনা যখন ঘটে তখন রাজবন্দীরা জেলখানার মধ্যে ভলি খেলছিলেন।[৩৫] মহিলা ওয়ার্ডের শ্লোগান এবং আর্ত চীৎকারে তৎক্ষণাৎ খেলা পরিত্যাগ করে তাঁরাও শ্লোগান দিতে শুরু করলেন। এর পর পুলিশ খেলার মাঠেই রাজ-বন্দীদের ওপর লাঠি চার্জ শুরু করে তাঁদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ওয়ার্ডের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো। ইতিপূর্বে পাগলা ঘন্টী দিয়ে জেল কর্তৃপক্ষ অনেক পুলিশ হাজির করে ফেলেছিলো। তারা বললো রাজবন্দীরা এর পর বেশী গণ্ডগোলের চেষ্টা করলে তারা তাঁদের ওপর গুলি চালাবে।[৩৬]

এই পরিস্থিতিতে জোর করে একটা কিছু করতে অর্থাৎ পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে কেউ রাজী ছিলো না। তাছাড়া পাগলা ঘন্টী দিয়ে ওয়ার্ড ঘিরে ফেললেও অতিরিক্ত জেলার মাখলুকুর রহমানের প্রচেষ্টার ফলে পুলিশ শেষ পর্যন্ত গুলি না চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়।[৩৭]

এর পরদিন রাজবন্দীদের পক্ষ থেকে সরকারকে অনির্দিষ্টকালের জন্যে অনশন ধর্মঘটের নোটিশ দেওয়া হয়। অনেকেই এবার বললেন যে বারবার অনশন করে কোনো লাভ হচ্ছে না, উপরন্তু ক্ষতিই নানাভাবে বাড়ছে। তার চেয়ে এবার শেষবার শেষ পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়া দরকার।[৩৮] সিদ্ধান্তও এবার সেই অনুসারে নেওয়া হলো। রাজবন্দীরা নিজেদের দাবী-দাওয়া কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়ে বললেন যে তাঁদের প্রত্যেকটি দাবী মেনে না নেওয়া পর্যন্ত তাঁরা কোনো মতেই অনশন ত্যাগ করবেন না।[৩৯]

এই অনশন ধর্মঘটের দাবীগুলি মুখ্য মন্ত্রী নূরুল আমীন পূর্ব বাঙলা বিধান পরিষদের সামনে ১৯৪৯-এর ১৭ই ডিসেম্বর উল্লেখ করেন। তাঁর উল্লিখিত দাবীগুলি হলো :

১। সকল নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক বন্দীদেরকে বিনাশর্তে এবং তৎক্ষণাৎ মুক্তিদান।

২। অন্যথায় ব্যবস্থা করতে হবে :

(১) খাদ্যের জন্যে প্রতিদিন ৩—৪ টাকার।

(২) খাট, তোষক, হাঁড়িবাসন এবং আসবাবপত্র ছাড়াও ২৫০ টাকা প্রাথমিক ভাতা।

(৩) মাসে ৫০ টাকা ব্যক্তিগত ভাতা।

(৪) বিচার না হওয়া পর্যন্ত গ্রেফতারের তারিখ থেকে প্রত্যেক নিরাপত্তা বন্দীর ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদেরকে প্রতি মাসে ১০০ টাকা হারে পারিবারিক ভাতা দিতে হবে।

(৫) প্রত্যেক সপ্তাহে চারটি চিঠি বাইরে পাঠানো, দুই সপ্তাহ অন্তর সাক্ষাৎকার, উপযুক্ত থাকার জায়গা, খেলাধূলার ব্যবস্থা ইত্যাদি সুবিধা।

(৬) হাজং এবং অন্যান্য বিচারাধীন রাজনৈতিক বন্দীদেরকে প্রথম ডিভিশনের নীচে না রাখা।

(৭) অন্য সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য দ্বিতীয় ডিভিশনের মর্যাদা।

(৮) উন্নত খাদ্য ব্যবস্থা, উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা, দৈনিক খবরের কাগজ, পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা চালু, উন্নততর জীবনযাপন, সরকারী খরচায় ধূমপানের ব্যবস্থা, ওয়ার্ডে রেডিও বসানো এবং নির্দেশিত সমস্ত খবরের কাগজ ও পত্র-পত্রিকা সেন্সার না করে

দেওয়া এবং সেলে রেডিও বসানো।[৪০]

এই দাবীগুলি পরিষদে পড়ে শোনানোর সময়েই নূরুল আমীন পরিষদকে জানান যে তাঁদের মতে অনশনরত রাজবন্দীরা রাষ্ট্রের শত্রু, কাজেই তাঁদের এই সব দাবী স্বীকার করে নেওয়া তাঁর সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে জেলের নিয়মকানুনসমূহ তাঁরা আবার পুনর্বিবেচনা করে দেখবেন এ সম্পর্কে কতদূর কি করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব।

২রা ডিসেম্বর অনশন ধর্মঘট শুরু হলে রাজবন্দীরা জেল কর্তৃপক্ষকে জানান যে তাঁরা কোনো মতেই এবার ওয়ার্ড ছেড়ে সেলে যাবেন না। কিন্তু পর পর কয়েকবার দীর্ঘ অনশনের পর তাঁদের সকলেরই স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিলো এবং সে কারণে ধর্মঘটের পঞ্চম দিনেই তাঁরা সকলে খুবই কাহিল হয়ে পড়েন। এই দুর্বল অবস্থায় তাঁদেরকে জোর করে সেলে নিয়ে যাওয়া হয়। অ্যান্টি সেল নামে কথিত ছয়টি সেল খুবই খারাপ ছিলো। এই বিশেষ সেলগুলিতে মারুফ হোসেন, সত্য মৈত্র, সিরাজুর রহমান এবং শিবেন রায়কে রাখা হয়।[৪১] সেলের মধ্যে এই সময় রাজবন্দীদেরকে দাঁতের মাজন, বিছানাপত্র ইত্যাদি ব্যক্তিগত ব্যবহার্য কোনো জিনিসই নিতে দেওয়া হয় না।[৪২]

অনশনের ষষ্ঠ দিনে অর্থাৎ সেলে পাঠানোর পরই পাঞ্জাবী ওয়ার্ডার দিয়ে রাজবন্দীদেরকে জোর করে খাওয়ানো শুরু হলো। যে সমস্ত বাঙালী ওয়ার্ডারেরা তাঁদেরকে খাওয়াতে আসতো তারাও ছিলো ভয়ানক বদমাশ। এই খাওয়ানোর সময় তারা বুকের ওপর চড়ে নাকের মধ্যে দিয়ে জোর করে খাবার ঢুকিয়ে দিতো।[৪৩]

৮ই ডিসেম্বর এইভাবে জোর করে বুকের ওপর চড়ে খাওয়াতে যাওয়ার সময়ই ফুসফুস ছিদ্র হয়ে গিয়ে রাজবন্দী শিবেন রায় শহীদ হন। জোর করে তাঁর নাকের মধ্যে রড ঢুকিয়ে দেওয়াতে রডটি শিবেন রায়ের ফুসফুস ভেদ করে যায় এবং তিনি রক্ত বমি করতে থাকেন। সে সময় জেলের মধ্যে এক সেলের সাথে অন্য সেলের যোগাযোগের কোনো উপায় ছিলো না। তাছাড়া ফুসফুস ছিদ্র হয়ে গিয়ে দারুণভাবে অসুস্থ এবং অজ্ঞান হয়ে পড়ায় চীৎকার করে কাউকে ডাকাডাকি করাও শিবেন রায়ের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই অবস্থায় সেলের মধ্যে রাত্রিকালে তাঁর মৃত্যু ঘটে।[৪৪]

৯ই ডিসেম্বর খুব সকালে জেলের লোকজন এসে শিবেন রায়ের মৃতদেহ যখন সরিয়ে নিয়ে যায় তখন সে দৃশ্য দেখে মারুফ হোসেন, সত্য মৈত্র, সিরাজুর রহমান প্রভৃতি চীৎকার করে শ্লোগান দিতে থাকেন। এই

স্লোগানের শব্দে অন্য সকলে জেগে ওঠেন এবং ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেরে তাঁরা দারুণভাবে উত্তেজিত হন।[৪৫]

অনশনরত রাজবন্দীদের এই উত্তেজনা দেখে ৯ই ডিসেম্বর সারা দিন জেলখানার কোনো লোক তাঁদের সেলগুলোর ভেতরে আসতে সাহস করেনি। সেদিন দারুণ শীত পড়েছিলো। সেজন্যে তাঁরা কয়েদীদেরকে দিয়ে তোষক, কম্বল ইত্যাদি সেলের দরজার সামনে পাঠিয়ে দিলো।[৪৬]

শিবেন রায়ের মৃত্যু সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন প্রাদেশিক পরিষদে ১৭ই ডিসেম্বর নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন :

কুষ্টিয়া সাব-জেলে আটকবন্দী জনৈক শিবেন্দ্রমোহন রায়কে ১৬ই নভেম্বর, ১৯৪৯, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বদলী করা হয়। তিনি ১৯৪৯-এর ২রা ডিসেম্বর সন্ধ্যায় অনশন ধর্মঘটে যোগদান করেন এবং ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯ রাত্রিকালে মারা যান। যেদিন থেকে উক্ত রাজবন্দী অনশন ধর্মঘটে যোগ দেন সেদিন থেকেই তিনি চিকিৎসা নিতে অস্বীকার করেন এবং তাঁকে জোর-জবরদস্তি করে খাওয়াতে হয়। পোস্ট মর্টেম পরীক্ষার পর ডাক্তারের মত হচ্ছে ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া ঘটিত স্বাভাবিক কারণেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। এর পরদিন যথারীতি স্থানীয় হিন্দু সংকার সমিতির দ্বারা উক্ত নিরাপত্তা বন্দীর মৃতদেহের সংকার করা হয় এবং তারযোগে বন্দীর পিতাকেও খবর দেওয়া হয়।[৪৭]

নূরুল আমীনের এই বিবৃতির পর বিরোধীদলের নেতা বসন্তকুমার দাস মুখ্য মন্ত্রীর কাছে জানতে চান যে মৃত্যুর পূর্বে শিবেন রায়ের ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া ধরা পড়লো না কেন ? অনশন শুরু হয়েছিলো ২রা ডিসেম্বর এবং তিনি মারা গিয়েছিলেন ৯ই ডিসেম্বর। এজন্যে ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়ার ব্যাপারটিকে "খুবই অদ্ভুত" বলে বর্ণনা করে যে পরিস্থিতিতে শিবেন রায়ের মৃত্যু ঘটেছে তার ওপর বসন্ত দাস একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করেন।[৪৮]

বসন্তকুমার দাসের প্রশ্ন ও দাবীর জবাবে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন বলেন :

এই ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া পূর্বে কেন ধরা পড়েনি এ সম্পর্কে তদন্ত করার জন্যে বিরোধী দলের নেতা আমাকে বলছেন। এখন প্রশ্ন হলো এই যে প্রত্যেককেই এটা বুঝতে হবে যে এই সমস্ত ব্যক্তিরা এত উশৃঙ্খল ও বেপরোয়া যে কোনো ডাক্তারকে তারা নিজেদের দেহ স্পর্শ করতে দেয় না, তাদের কি অসুখ হয়েছে সেটা বের করার জন্যে কোনো স্টেথসকোপ ব্যবহার করতেও তারা দিতে চায় না। এই ব্যক্তিদেরকে জোর করে

খাওয়াতে হয় এবং ওষুধপত্রও তাদেরকে দিতে হয় জোর করেই। কাজেই তারা যদি নিজেদের দায়িত্ব নিজেরা উপলব্ধি না করে, যদি তাদের মধ্যে শুভবুদ্ধির উদয় না হয়, তাহলে তাদের মধ্যে হিতাহিত জ্ঞান আনা এবং এবং তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করার অন্য কোনো উপায় আমি দেখি না। সরকার তাদেরকে সব সময়েই খাদ্য এবং প্রয়োজনমতো ঔষধপত্র দিতে ইচ্ছুক কিন্তু এই সমস্ত ব্যক্তিরা সহযোগিতা করতে রাজী নয়। সুতরাং আমি আশা করি তাদের প্রতি যাদের দরদ আছে তারা যেন বাইরে থেকে এই ব্যক্তিদেরকে উপদেশ দেন যাতে তারা ঔষধ অথবা খাদ্য গ্রহণ করতে অস্বীকার না করে।[৪৯]

শিবেন রায়ের ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনের এই মিথ্যা তথ্যের ভিত্তি, অন্ততঃ তাঁর নিজের কথামতো, জেল ডাক্তারের পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট। কিন্তু এই রিপোর্টের ব্যাপারটিও কতদূর সত্য সে বিষয়ও কোনো নিশ্চিন্ত প্রমাণ নূরুল আমীন দাখিল করতে পারেননি।

অন্যদিকে ঢাকা জেলের অন্যান্য অনশনরত রাজবন্দীরা, যাঁদের সাথে দুদিন আগে পর্যন্ত শিবেন রায় একই ওয়ার্ডে একত্রে ছিলেন, তাঁরা কেউই তাঁর ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া হওয়ার কথা বলেন না। অন্যদের মতো শিবেন রায়ও সেদিক দিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থই ছিলেন। ৭ই ডিসেম্বর তাঁদের সকলকে পৃথক পৃথক সেলে বদলী করে দেওয়ার পর তাঁদের প্রত্যেককেই জোর করে খাওয়াতে চেষ্টা করা হয়। এবং সেই সময়েই নাকের মধ্যে দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া রডে ফুসফুস ছিদ্র হয়ে যাওয়ার ফলেই শিবেন রায়ের মৃত্যু ঘটে।

এই সত্য ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্যে নূরুল আমীনকে এক ঝুড়ি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অনেক বানানো কথা পরিষদের সামনে বলতে হয়। কিন্তু তৎকালীন পরিষদের বিতর্ক এবং পরবর্তীকালে তৎকালীন অনশন ধর্মঘটীদের জবানীতে জানা যায় যে, শিবেন রায়ের মৃত্যু সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনের উপরোক্ত বক্তব্যকে কেউই বিশ্বাস করেননি। তাঁকে তাঁর যোগ্য মর্যাদাই সকলে দিয়েছিলেন।

আর একটি ঘটনা এক্ষেত্রে খুবই উল্লেখযোগ্য এবং এর মাধ্যমেই তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকারের শয়তানী ও ভাঁওতাবাজীর পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে।

৭ই জানুয়ারি, ১৯৫০, কলকাতার পত্রিকা "দৈনিক সত্যযুগ" এই অনশন সম্পর্কে একটি সংবাদ প্রকাশ করে তাতে বলে যে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে

অনশন ধর্মঘটীদের মধ্যে ৬ই জানুয়ারি দুই জনের মৃত্যু ঘটেছে।

এই সংবাদের প্রতিবাদে পূর্ব বাঙলা সরকারের জেল মন্ত্রী মুফিজউদ্দীন আহমদ সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন :

> ৬ই জানুয়ারি চট্টগ্রাম হইতে প্রেরিত বলিয়া ৭ই জানুয়ারি কলিকাতার বাংলা দৈনিক "সত্যযুগে" প্রকাশিত একটি সংবাদের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ হইয়াছে। এই সংবাদে বলা হইয়াছে যে, ঢাকা কেন্দ্রীয় জেলে অনশন ধর্মঘটীদের মধ্যে দুইজন ৬ই জানুয়ারি তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এই সংবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।[৫০]

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অনশন ধর্মঘটীদের মধ্যে ৯ই ডিসেম্বর এক জনের মৃত্যু ঘটে। কাজেই মৃতের সংখ্যা এবং মৃত্যুর তারিখ এ দুই বিষয়েই "সত্যযুগের" সংবাদের মধ্যে ভুল ছিলো। কিন্তু তার থেকে আরও বেশী লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে কুখ্যাত জেলমন্ত্রী "এই সংবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন" বলে যে ভাবে সংবাদপত্রে উপরোক্ত বিবৃতিটি দেন তাতে ঢাকায় কেন্দ্রীয় কারাগারে কারো মৃত্যু আদৌ ঘটেছে তা মনে হয় না। এই বিবৃতির মাধ্যমে শিবেন রায়ের মৃত্যুর ঘটনাকে সম্পূর্ণভাবে ধামাচাপা দেওয়ার প্রচেষ্টার মধ্যে তৎকালীন ধোঁকাবাজ মুসলিম লীগ সরকারের সত্যিকার চরিত্র ভালভাবেই ধরা পড়ে।

শিবেন রায়ের মৃত্যুর পর সিভিল সার্জেন মহম্মদ হোসেন নিজে এসে রাজবন্দীদেরকে বলেন যে তখন থেকে তিনি নিজে সব কিছুর তদারক করবেন এবং কোনো গোলযোগ যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে জোর করে অনশন ধর্মঘটীদেরকে খাওয়ানোর সময় সেলগুলিতে কোনো ডাক্তার উপস্থিত থাকতো না, ওয়ার্ডারদের সহায়তায় জেল কর্তৃপক্ষ নিজেরাই সে কাজ করতো।[৫১] অথচ এ ব্যাপারে ইতিপূর্বে ডাক্তারের উপস্থিতিকে একটি নিয়ম হিসেবে মেনে চলা হতো।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে এই অনশন ধর্মঘট ৫৮ দিন স্থায়ী হয়। এর পূর্বে সরকারের পক্ষ থেকে ফকির আবদুল মান্নান এবং অন্যান্য কর্মচারীরা এসে আবার আলাপ-আলোচনা শুরু করে।[৫২] নূরুল আমীন ইতিমধ্যে কিছুটা দুর্বল হয়ে এসেছিলেন কাজেই বাধ্য হয়ে তিনি রাজবন্দীদের কিছু কিছু দাবী-দাওয়া স্বীকার করে নিতে রাজী হলেন।

কিন্তু সেক্ষেত্রে একটি প্রধান অসুবিধা হলো এই যে রাজবন্দীদেরকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হলো। যাঁরা কৃষক শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত

তাঁদেরকে দেওয়া হলো "খ" বিভাগ এবং যাঁরা পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত তাঁদেরকে দেওয়া হলো "ক" বিভাগ। এই শ্রেণী বিভাগের ফলে অসুবিধা দেখা দিলেও শেষ পর্যন্ত তাঁদেরকে এই শর্ত স্বীকার করে নিতে হয়। অন্যথায় ৫৮ দিন অনশনের পর কারো আর বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না। কাজেই সেই পর্যায়ে বিভিন্ন সেল থেকে এসে সকলে একত্রিত হয়ে অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেন।[৫৩]

পুরুষ রাজবন্দীদের এই সিদ্ধান্ত প্রথম দিকে মহিলারা মেনে নিতে অস্বীকার করেন। তাঁরা উপরোক্ত শর্তে অনশন প্রত্যাহার করতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু মহিলাদের এই আপত্তি অগ্রাহ্য করে পুরুষরা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন। এর ফলে পুরুষরা যখন ধীরে ধীরে দুধ পান করতে থাকেন তখনো মহিলারা নিজেদের ওয়ার্ডে এ ব্যাপারে অটল থাকেন। পরে পুরুষদের সমবেতভাবে অনশন ভঙ্গ করার খবর তাঁদের ওয়ার্ডে পৌছালে তাঁরাও নিজেদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করে দুধ পান করেন।[৫৪] রাজশাহীতে এই চতুর্থ অনশন ধর্মঘট স্থায়ী হয় ৬১ দিন।[৫৫]

ধর্মঘটের পর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে প্রায় ২৫ জন রাজবন্দীকে প্রদেশের অন্যান্য জেলে বদলী করে দেওয়া হয়। এর মধ্যে ঢাকা জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক ফণি গুহও ছিলেন। তিনি গ্রেফতার হন ১৯৪৯ সালে। চতুর্থ অনশন ধর্মঘটের ফলে ফণি গুহের নাড়ী ছিদ্র হয়ে যায় এবং ময়মনসিংহে বদলী হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই সেখানে তাঁর মৃত্যু ঘটে।[৫৬]

খুলনা জেলে বিষ্ণু বৈরাগীকে ১৯৫০ সালে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। এ সময় জেল কর্তৃপক্ষ পাগলা ঘন্টী বাজিয়ে একটা জরুরী পরিস্থিতির মহড়া দিয়ে আসল ঘটনাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে।[৫৭]

ঢাকা ও রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে এবং অন্যান্য কারাগারে বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা অনশন ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের নাম: অমূল্য লাহিড়ী বাবর আলী, গায়াসউল্লাহ সরকার, শিবেন ভট্টাচার্য, খবিরুদ্দীন, পি. রায়, আমিনুল ইসলাম, অজয় ভট্টাচার্য, শীতাংশু মৈত্র, ভূজেন পালিত, বিজন সেন, ডোমারাম সিংহ, কম্পরাম সিংহ, সুখেন ভট্টাচার্য, হানিফ শেখ, দোলায়ার হোসেন, আবদুল হক, আনোয়ার হোসেন, সুধীন ধর, মনসুর হাবিব, হাজী দানেশ, নূরুন্নবী চৌধুরী, শফিউদ্দীন আহমদ, আবদুশ শহীদ, শিবেন রায়, কমণীয় দাশগুপ্ত, নগেন সরকার, তকিউল্লাহ, জ্ঞান চক্রবর্তী, ফণি গুহ, সরদার ফজলুল করিম, নাসিম আহম্মদ, নাদেরা বেগম, নলিনী দাস,

মারুফ হোসেন, আনন্দ দেব, কালীপদ সরকার, আশুতোষ ভট্টাচার্য, অজিত নন্দী, সত্য মৈত্র, সিরাজুর রহমান, লুৎফর রহমান, দিলীপ সেন, হীরেন সেন, রণেশ দাশগুপ্ত, সুধীর মুখার্জী, গনেন্দ্রনাথ সরকার, কৃষ্ণবিনোদ রায়, মহম্মদ রশিদউদ্দীন, সুধীর সান্যাল, সত্যরঞ্জন ভট্টাচার্য, আরোরাম সিং, প্রিয়ব্রত দাস, শ্যামাপদ সেন, ফটিক রায়, সদানন্দ ঘোষ, প্রসাদ রায়, নাসিরুদ্দীন আহমদ, লালু পাণ্ডে, খবির শেখ, সতীন্দ্রনাথ সরকার, নূরুন্নবী, অনিমেষ ভট্টাচার্য।*

৮॥ পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন এলাকায় কৃষক সংগ্রাম

১৯৪৮-এ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর থেকে ১৯৫০-এর প্রথম দিক পর্যন্ত পূর্ব বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে অনেক খণ্ড খণ্ড কৃষক সংগ্রাম ও বিদ্রোহ ঘটে। কিন্তু এই খণ্ড বিদ্রোহ ছাড়াও ময়মনসিংহ জেলার হাজং প্রধান এলাকায় কৃষক সংগ্রাম একটানাভাবে কয়েক বছর চলে এবং শুধু পূর্ব বাঙলাতেই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে, এই সংগ্রামের কথা ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। পাক-ভারতের যে সমস্ত এলাকায় তখন বিপ্লবী সংগ্রাম দানা বাঁধে তার মধ্যে দক্ষিণ ভারতের তেলেঙ্গানাই ছিলো সব থেকে উল্লেখযোগ্য। এবং এই তেলেঙ্গানার পরই উল্লেখযোগ্য ছিলো ময়মনসিংহের নেত্রকোণা মহকুমার সুসং-দুর্গাপুরের হাজং প্রধান এলাকা।

সেখানে মণি সিংহ এবং নগেন সরকারের নেতৃত্বে কৃষক বাহিনী এক বিস্তৃত এলাকা জুড়ে নিজেদেরকে খুব ভালভাবে সংগঠিত করে। এইভাবে তারা দীর্ঘ দিন ধরে স্থানীয় জোতদার, মহাজন এবং সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও প্রতিরোধ আন্দোলন গঠন করতে এবং তাকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। ফলে তখন মণি সিংহের নাম পাক-ভারতীয় উপমহাদেশের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এবং হাজংদের সংগ্রাম অন্য এলাকার কৃষক শ্রমিকদেরকেও সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হতে সাহায্য করে।†

হাজং কৃষকরা ছাড়াও সে সময় সিলেট এবং খুলনা, যশোর, রাজশাহী প্রভৃতি উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলাতেও কৃষকরা সংগঠিতভাবে শোষক ও শাসকদের বিরুদ্ধে অনেক ছোটখাট বিদ্রোহ করেন। তার মধ্যে একটির কথা

* অনশন ধর্মঘটীদের পূর্ণ তালিকা দেওয়া এখানে সম্ভব হলো না।

† এ সম্পর্কে অন্যত্র বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হবে।

এখানে উল্লেখ করা হলো।

১৮ই অগাস্ট, ১৯৪৯, তারিখে সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার এলাকার সানেশ্বরে কমিউনিস্ট পরিচালিত কৃষকদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ ঘটে।[১] এই সংঘর্ষের সময়ে কৃষকরা লাঠি, বল্লম ইত্যাদি নিয়ে পুলিশের গুলির সামনে এগিয়ে যান। পুলিশ এই কৃষকদের ওপর ৪২ রাউণ্ড গুলি ছোড়ে এবং তার ফলে ৬ জন কৃষক নিহত হন এবং ৩ জন মহিলাসহ ৬০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।[২]

সিলেট জেলার এই অঞ্চলে সানেশ্বর, নিহারী, উলুরী ইত্যাদি ছয়-সাতটি গ্রামকে কমিউনিস্টরা একটি ঘাঁটি এলাকা হিসাবে গড়ে তোলেন। এই গ্রামগুলি বড়লিখা বিয়ানীবাজার থানা থেকে প্রায় সাত-আট মাইল দূরে অবস্থিত। রাস্তাঘাটের সুবিধা না থাকায় গ্রামগুলি অন্য এলাকা থেকে প্রায় বিচ্ছিন্নই বলা চলতো। এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন দাস, নমশূদ্র গোত্রের লোক। এই এলাকায় সুরত পাল, তরুণ মুল্লা প্রভৃতি কয়েকজনের নেতৃত্বে প্রায়ই সভা-সমিতি হতো এবং সেই সব সভা-সমিতিতে কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা কাস্তে হাতুড়ীওয়ালা লাল ঝাণ্ডা উড়তে দেখা যেতো।[৩]

১৪ই অগাস্ট এই ধরনের একটি সভায় যখন তারা পাকিস্তান পতাকার পরিবর্তে লাল ঝাণ্ডা ওড়ায় তখন তা কিছুসংখ্যক মুসলমান গ্রামবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তারা বিয়ানীবাজার থানায় পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ গ্রামবাসীর মনোবল এবং সংগঠিত শক্তির মোকাবেলা করতে না পেরে প্রথমে গ্রামে না ঢুকে বাইরে থেকেই ফিরে যায়।[৪]

এর পর ১৬ই অগাস্ট বহুসংখ্যক সশস্ত্র পুলিসসহ সিলেটের ডি. এস. পি. এবং জেলা শাসক খান সাহেব আবদুল লতিফের সানেশ্বর রওয়ানা হওয়ার খবর পেয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকার মুসলিম লীগ সমর্থক ও কর্মীরা অন্যান্য লোকজন এবং স্থানীয় আনসার বাহিনীকে সাথে নিয়ে তাদের সাথে সানেশ্বর বাজারে মিলিত হয়। সেখানে পৌঁছে তারা দেখে যে বাজারের পশ্চিম দিকের মাঠে কিছুসংখ্যক লোক লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো থেকে দলে দলে আরও অনেক লাঠি হাতে এগিয়ে এসে বাজারের কাছে সেই মাঠে এসে জড়ো হচ্ছে। গ্রামের পাশে যে ছোট নদীটি ছিলো তার পাশেও অনেক লোককে দ্রুতগতিতে জমা হতে দেখা যায়। পশ্চিমের মাঠে কৃষকদের সংখ্যা অনেকখানি বৃদ্ধি পাওয়ার পর পুলিশ বাহিনী এবং মুসলিম লীগ সমর্থক জনতা আক্রমণের আশঙ্কা করে। এই অবস্থায় পুলিশের লোকজন রাইফেল হাতে

কৃষকদের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে এবং বিদ্রোহী লাইন থেকে ঘন ঘন "ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ" ইত্যাদি ধ্বনি ওঠে।[৫]

এর পর ডি. এস. পি. নিজে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে হাতের লাঠি ইত্যাদি ফেলে দিয়ে বিদ্রোহীদেরকে আত্মসমর্পণ করতে বলেন। কিন্তু এর উত্তরে তাঁরা পুলিশের কাছে তাদের রাইফেল ফেলে দেওয়ার দাবী জানান। এর পর ডি. এস. পি. কিছুটা পিছিয়ে এসে রাইফেলের দুটি ফাঁকা আওয়াজ করেন এবং তার পর বিদ্রোহীরা পুলিশের দিকে আরও কিছুটা এগিয়ে আসেন। এই সময় পুলিশের অগ্রবর্তী দল থেকে প্রথম কৃষক বিদ্রোহীদের ওপর গুলি ছোড়া হয়।[৬]

এর পর পুলিশের গুলি বর্ষণের মাত্রা বাড়ে এবং সামান্য সংঘর্ষের পর বিদ্রোহীরা অনেকেই নিহত এবং আহত হন। বিদ্রোহী বাহিনীও এই আক্রমণের ফলে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং পুলিশ মুসলিম লীগ কর্মীদের সহায়তায় আহত ও পলায়মান অনেক কৃষককে ঘটনাস্থলেই গ্রেফতার করে। যাঁরা সেদিন গ্রেফতার হন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন মহিলাও ছিলেন। আহত এবং বন্দী কৃষকদেরকে এর পর বাহাদুরপুর আনসার ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়।[৭]

এই ঘটনার পর ১৯শে অগাস্ট স্থানীয় মুসলিম লীগের নেতারা বাহাদুরপুর ক্যাম্পে হাজির হয়ে জেলা শাসক খান সাহেব আবদুল লতিফের সাথে আলাপ-আলোচনা করেন এবং শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীদের গ্রামে গ্রামে গিয়ে তাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে "উদ্‌বুদ্ধ" করার ব্যবস্থা হয়।[৮]

এ প্রসঙ্গে লাউতার স্থানীয় জমিদার শ্যামাপদর উদ্যোগ খুবই উল্লেখযোগ্য। মুসলিম লীগ কর্মী ও পুলিশের সহযোগিতায় এই জমিদারটি গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষকদেরকে আত্মসমর্পণ করতে "উদ্‌বুদ্ধ" করে এবং তার পর বহু সংখ্যক গ্রামবাসী ধীরে ধীরে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন।[৯]

একই সাথে স্থানীয় মুসলিম লীগ কর্মীবৃন্দ এবং সামন্ত স্বার্থের খুঁটি উপরোক্ত হিন্দু জমিদার শ্যামাপদর উচ্চ প্রশংসা করে আরজদ আলী নামে উত্তর সিলেট মুসলিম লীগের একজন সহ-সভাপতি সানেশ্বরের ঘটনা সম্পর্কে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলে:

> এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই ব্যাপারে মুসলিম লীগ ও জনসাধারণ যে কর্তব্য নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন তাহার ফল সুদূর প্রসারী বলিয়াই মনে হয়। শ্যামাপদবাবু যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া এই শান্তি কাজে সাহায্য করিয়াছেন তাহাও প্রশংসনীয়।[১০]

সানেশ্বরের এই ঘটনার পরই স্থানীয় মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ নিজেদের উদ্যোগে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে এবং সেই তদন্তের রিপোর্ট সরাসরিভাবে সরকারের কাছে পেশ করা হয়।[১১]

পূর্ব বাঙলার অন্যান্য যে সমস্ত এলাকায় এ ধরনের কৃষক বিদ্রোহ হয় সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো খুলনা জেলার ধানিমুনিয়া, ডুমুরিয়া, যশোহর জেলার নড়াইল থানার বড়েন্দর দুর্গাপুর, চাঁদপুর এবং সদর থানার এগারোখান ইউনিয়ন ; এবং রাজশাহী জেলার নবাবগঞ্জ মহকুমার নাচোল থানা।

৯॥ নাচোল কৃষক বিদ্রোহ ও পরবর্তী নির্যাতন

রাজশাহী জেলার নবাবগঞ্জ মহকুমার নাচোল অঞ্চলে বহু সংখ্যক সাঁওতাল কৃষকের বাস। এই সাঁওতালদেরকে ইলা মিত্র, অনিমেষ লাহিড়ী আজহার হোসেন এবং ইলা মিত্রের স্বামী হাবোল মিত্র স্থানীয় জোতদারী মহাজনী এবং অন্যান্য শোষণের বিরুদ্ধে সংগঠিত করতে থাকেন।

১৯৫০ সালের জানুয়ারির প্রথম দিকে আমন ধান কাটার সময় এই সাঁওতাল কৃষকরা স্থির করেন যে চলতি প্রথা মতো তাঁরা জোতদারের ইচ্ছা-মতো তাদের ঘরে ফসল তুলতে দেবেন না, ফসলের ন্যায্য অংশ তাঁরা নিজেরাই জোর করে নিজেদের ঘরে তুলবেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে সমগ্র এলাকার কৃষকদেরকে, যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন সাঁওতাল, ইলা মিত্র এবং অন্যান্যরা সংঘবদ্ধ হয়ে ফসল তোলার জন্যে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানান। এই আহ্বান অনুসারে স্থানীয় কৃষকরা ৫ই জানুয়ারি দলে দলে সমবেত ও ঐক্যবদ্ধভাবে ফসল তুলতে উদ্যোগী হন।

স্থানীয় জোতদাররা এই উদ্যোগে আতঙ্কিত হয়ে থানায় খবর পাঠানোর পর নাচোল থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা তফিজউদ্দীন তিনজন কনস্টেবলসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়।[১]

সমবেত সাঁওতাল জনতা পুলিশের এই উপস্থিতিতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং তারা কৃষকদেরকে কিছুটা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে সেই উত্তেজনা ক্রমশঃ তীব্র আকার ধারণ করে। শেষ পর্যন্ত এই উত্তেজনা এত বেড়ে ওঠে যে কারো পক্ষেই জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না এবং পুলিশ তাদের ওপর গুলি বর্ষণ করে একজন সাঁওতালকে হত্যা করে।[২] এর পর সাঁওতালরা এ. এস. আই. সহ অন্য তিনজন কনস্টেবলকে বন্দী করে তাদের রাইফেল কেড়ে নেন এবং

পরে তাদেরকে হত্যা করে মাটিতে পুঁতে ফেলেন।

থানার দারোগা এবং কনস্টেবলদের নিরুদ্দেশ হওয়ার খবর পেয়ে রাজশাহী জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপার একদল সশস্ত্র পুলিশসহ দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং স্থানীয় সাঁওতাল ও কৃষকদের উপর নির্মম নির্যাতন শুরু করেন। মৃত চারজন পুলিশের লাশ তাঁরা স্থানীয় কিছু লোকের সহায়তায় মাটি খুঁড়ে বের করেন এবং রাজশাহী সদরে পাঠিয়ে দেন।[৪] এবং তার পরই শুরু হয় হয় তাঁদের আসল অত্যাচার।

পুলিশ সমস্ত এলাকার প্রতিটি কৃষক বাড়ির মধ্যে ঢুকে নারী-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে নির্মমভাবে তাদেরকে মারপিট শুরু করে। বহু নারীকে তারা ধর্ষণ করতে পর্যন্ত দ্বিধা বোধ করে না। পুলিশ হত্যার "উপযুক্ত" প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে তারা শুধু এখানেই ক্ষান্ত হয়নি। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের খোঁজ খবরের জন্যে তারা আরও বিস্তৃত এলাকা জুড়ে কায়েম করে একটা ত্রাসের রাজত্ব।[৫]

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা পরস্পরের থেকে এরপর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে হাবল মিত্র হেঁটে সীমান্ত পার হয়ে সোজা পশ্চিম বাঙলা চলে যান। আজহার হোসেন এবং অনিমেষ লাহিড়ী কয়েকদিন পর আজহার হোসেনের বাড়িতে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন।[৬] বদরপুর গ্রামে সাঁওতালদের সামনে বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে চিত্ত চক্রবর্তীকে পুলিশ ৮ই জানুয়ারি গভীর রাত্রিতে গ্রেফতার করে।[৭] ঐ একই দিন পুলিশের অত্যাচারে নাচোল এবং নবাবগঞ্জ পরিত্যাগ করে ট্রেনযোগে পলায়নের সময় একদল সাঁওতাল রাজশাহীর কাছাকাছি গ্রেফতার হন।

ইলা মিত্র নিজে দুই দিন আত্মগোপন করে থাকার পর ৭ই জানুয়ারি ট্রেনযোগে এলাকা পরিত্যাগের জন্যে সাঁওতাল স্ত্রীর বেশে রোহনপুর রেল স্টেশনের ওয়েটিং রুমের সামনে ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন। এই সময় নেতাদের খবরাখবরের জন্যে চারিদিকে অসংখ্য গোয়েন্দা নিযুক্ত করা হয় এবং রোহনপুর স্টেশনের ওপরেও তারা কড়া নজর রাখে। ইলা মিত্রের চেহারা বেশ এবং হাবভাব সব কিছুর মধ্যে একটা বেমানান ভাব ও অসামঞ্জস্য স্থানীয় পুলিশের সন্দেহ উদ্রেক করে। তাঁকে অল্প জিজ্ঞাসাবাদের পরই তাঁর পরিচয় সম্পর্কে তাদের আর কোনো সন্দেহ থাকে না এবং তার পর তারা তাঁকে নাচোল থানায় হাজির করে।[৯]

শুধু ইলা মিত্রকেই নয়, এর মধ্যে শত শত সাঁওতালকে নাচোল হাজতে

গ্রেফতার করে তাদের সকলকে একটা ছোট ঘরের মধ্যে খাদ্য এবং পানীয় ছাড়াই আটকে রাখা হয়।* অন্যদেরকে হাত পা বেঁধে বাইরে তারা ফেলে রাখে এবং সকলকেই পুলিশ কনস্টেবলরা প্রায় সারাক্ষণই নির্মম-ভাবে মারধোর করতে থাকে। ক্ষুধা তৃষ্ণায় এবং অমানুষিক প্রহারের ফলে প্রায় ২৪ জন সাঁওতাল নাচোল থানা হাজতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।[১০]

নবাবগঞ্জে যখন তাঁদেরকে স্থানান্তরিত করা হয় তখনও তাদের ওপর অত্যাচার সমানে চলতে থাকে এবং সেখানেও বহু সংখ্যক সাঁওতাল মারা যান।[১১] এর পর সাঁওতাল রাজবন্দীদের পুরো দলটিকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং সেখানে অত্যাচার তাঁদের ওপর অব্যাহত থাকে। রাজশাহীতেও একটি ছোট ঘরের মধ্যে বিনা চিকিৎসায় রেখে আধপেটা খাইয়ে এবং ক্রমাগত অত্যাচার করে অনেককে তারা হত্যা করে।[১২]

নাচোল থেকে রাজশাহী জেলের অভ্যন্তরে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ইলা মিত্র এবং এই সাঁওতালরা যে শুধু পুলিশের দ্বারাই নির্যাতিত নিগৃহীত হয়েছেন তাই নয়, স্থানীয় জনসাধারণ এবং জেলের অন্যান্য সাধারণ কয়েদীরা পর্যন্ত তাঁদের প্রতি অত্যন্ত নির্দয় ব্যবহার করেছে। পাকিস্তান বিরোধী, হিন্দুস্থানের বাহিনী এবং শত্রুপক্ষের লোক এই সরকারী প্রচারণার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত এবং মুসলিম লীগের লোকজনের দ্বারা উত্তেজিত হয়ে এই মৃত্যু পথযাত্রী দেশপ্রেমিক সাঁওতালদেরকে তারা খাওয়ার পানি পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে স্পর্শ করতে দেয়নি।

৭ই জানুয়ারি ইলা মিত্রকে রোহনপুর রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে গ্রেফতারের পরদিন তাঁকে নাচোল থানা হাজতে নিয়ে গিয়ে তাঁর ওপর পুলিশ যে চরম অত্যাচার করে পাকিস্তানের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত তার তুলনা নেই। ইসলামী রাষ্ট্রের নূরুল আমীন-লিয়াকত আলী সরকারের এই নির্যাতনের চিত্র রাজশাহী কোর্টে নিজের জবানবন্দীতেই বর্ণনা করেছিলেন।† নীচে সেই জবানবন্দীটি হুবহু তুলে দেওয়া হলো:

---

*সাঁওতালদের ওপর এই অত্যাচারের ব্যাপারে আমি নবাবগঞ্জের অনেক স্থানীয় লোকজনের সাথে আলাপ করেছি।—ব. উ.

† এই জবানবন্দীটি কোনো সংবাদপত্রে প্রকাশিত না হওয়ায় ইস্তাহারের আকারে ছাপিয়ে ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে সেটি পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন স্থানে বিলি করা হয়েছিলো। ইস্তাহারটির একটি ছবি এই বইয়ে দেওয়া হয়েছে। —ব. উ.

কেসটির ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। বিগত ৭.১.৫০ তারিখে আমি রোহনপুরে গ্রেফতার হই এবং পরদিন আমাকে নাচালে নিয়ে যাওয়া হয়। যাওয়ার পথে পুলিশ আমাকে মারধোর করে এবং তারপর আমাকে একটা সেলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সবকিছু স্বীকার না করলে আমাকে উলঙ্গ করে দেওয়া হবে এই বলে এস. আই. আমাকে হুমকি দেখায়। আমার যেহেতু বলার মতো কিছু ছিলো না, কাজেই তারা আমার সমস্ত কাপড়-চোপড় খুলে নেয় এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গভাবে সেলের মধ্যে আমাকে বন্দী করে রাখে।

আমাকে কোনো খাবার দেওয়া হয়নি, একবিন্দু জল পর্যন্ত না। সেদিন সন্ধ্যেবেলাতে এস. আই.-এর উপস্থিতিতে সেপাইরা তাদের বন্দুকের বাঁট দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করতে শুরু করে। সে সময়ে আমার নাক দিয়ে প্রচুর রক্ত পড়তে থাকে। এর পর আমার কাপড়-চোপড় আমাকে ফেরত দেওয়া হয় এবং রাত্রি প্রায় বারোটার সময় সেল থেকে আমাকে বের করে সম্ভবতঃ এস. আই.এর কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে এ ব্যাপারে আমি খুব নিশ্চিত ছিলাম না।

যে কামরাটিতে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো সেখানে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে তারা নানারকম অমানুষিক পদ্ধতিতে চেষ্টা চালালো। দুটো লাঠির মধ্যে আমার পা দুটি ঢুকিয়ে চাপ দেওয়া হচ্ছিলো এবং সে সময় চারিধারে যারা দাঁড়িয়েছিলো তারা বলছিলো যে আমাকে "পাকিস্তানী ইনজেকশন" দেওয়া হচ্ছে। এই নির্যাতন চলার সময় তারা একটা রুমাল দিয়ে আমার মুখ বেঁধে দিয়েছিলো। জোর করে আমাকে কিছু বলাতে না পেরে তারা আমার চুলও উপড়ে তুলে ফেলছিলো। সিপাইরা আমাকে ধরাধরি করে সেলে ফিরিয়ে নিয়ে গেলো কারণ সেই নির্যাতনের পর আমার পক্ষে আর হাঁটা সম্ভব ছিলো না।

সেলের মধ্যে আবার এস. আই. সেপাইদেরকে চারটে গরম সেদ্ধ ডিম আনার হুকুম দিলো এবং বললো, "এবার সে কথা বলবে"। তারপর চার-পাঁচজন সেপাই আমাকে জোরপূর্বক ধরে চিতকরে করে শুইয়ে রাখলো এবং একজন আমার যৌনঅঙ্গের মধ্যে একটা গরম সিদ্ধ ডিম ঢুকিয়ে দিলো। আমার মনে হচ্ছিলো আমি যেন আগুনে পুড়ে যাচ্ছিলাম। এর পর আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি।

৯.১.৫০ তারিখে সকালে যখন আমার জ্ঞান হলো তখন উপরোক্ত

এস. আই. এবং কয়েকজন সেপাই আমার সেলে এসে তাদের বুটে করে আমার পেটে লাথি মারতে শুরু করলো। এর পর আমার ডান পায়ের গোড়ালীতে একটা পেরেক ফুটিয়ে দেওয়া হলো। সে সময় আধা অচেতন অবস্থায় পড়ে থেকে আমি এস. আই.-কে বিড়বিড় করে বলতে শুনলাম: আমরা আবার রাত্রিতে আসছি এবং তুমি যদি স্বীকার না করো তাহলে সিপাইরা একে একে তোমাকে ধর্ষণ করবে। গভীর রাত্রিতে এস. আই. এবং সিপাইরা ফিরে এলো এবং তারা আবার সেই হুমকি দিলো। কিন্তু আমি যেহেতু তখনো কিছু বলতে রাজী হলাম না তখন তিন-চার জন আমাকে ধরে রাখলো এবং একজন সেপাই সত্যি সত্যি আমাকে ধর্ষণ করতে শুরু করলো। এর অল্পক্ষণ পরই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। পরদিন ১০.১.৫০ তারিখে যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন আমি দেখলাম যে আমার দেহ থেকে দারুণভাবে রক্ত ঝরছে এবং আমার কাপড়-চোপড় রক্তে সম্পূর্ণভাবে ভিজে গেছে। সেই অবস্থাতেই আমাকে নাচোল থেকে নবাবগঞ্জ নিয়ে যাওয়া হলো। নবাবগঞ্জ জেল গেটের সিপাইরা জোর ঘুঁষি মেরে আমাকে অভ্যর্থনা জানালো।

সে সময় আমি একেবারে শয্যাশায়ী অবস্থায় ছিলাম। কাজেই কোর্ট ইন্সপেক্টর এবং কয়েকজন সিপাই আমাকে একটা সেলের মধ্যে বহন করে নিয়ে গেলো। তখনো আমার রক্তপাত হচ্ছিলো এবং খুব বেশী জ্বর ছিলো। সম্ভবতঃ নবাবগঞ্জ সরকারী হাসপাতালের একজন ডাক্তার সেই সময় আমার জ্বর দেখেছিলেন ১০৫ ডিগ্রী। যখন তিনি আমার কাছে আমার দারুণ রক্তপাতের কথা শুনলেন তখন তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন যে একজন মহিলা নার্সের সাহায্যে আমার চিকিৎসা করা হবে। আমাকে কিছু ওষুধ এবং কয়েক টুকরো কম্বলও দেওয়া হলো। ১১.১.৫০ তারিখে সরকারী হাসপাতালের নার্স আমাকে পরীক্ষা করলেন। তিনি আমার অবস্থা সম্পর্কে কি রিপোর্ট দিয়েছিলেন সেটা আমি জানি না। তিনি আসার পর আমার পরনে যে রক্তমাখা কাপড় ছিলো সেটা পরিবর্তন করে একটা পরিষ্কার কাপড় দেওয়া হলো। এই এই পুরো সময়টা আমি নবাবগঞ্জ জেলের একটি সেলে একজন ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিলাম। আমার শরীরে খুব বেশী জ্বর ছিলো, তখনো আমার দারুণ রক্তপাত হচ্ছিলো এবং মাঝে মাঝে আমি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম। ১৬.১.৫০ তারিখে সন্ধ্যাবেলায় আমার সেলে একটা স্ট্রেচার নিয়ে আসা

হলো এবং আমাকে বলা হলো যে পরীক্ষার জন্যে আমাকে অন্য জায়গায় যেতে হবে। খুব বেশী শরীর খারাপ থাকার জন্যে আমার পক্ষে নড়াচড়া সম্ভব নয় একথা বলায় লাঠি দিয়ে আমাকে একটা বাড়ি মারা হলো এবং স্ট্রেচারে উঠতে আমি বাধ্য হলাম। এর পর আমাকে অন্য এক বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। আমি সেখানে কিছুই বলিনি কিন্তু সেপাইরা জোর করে একটা সাদা কাগজে আমার সই আদায় করলো। তখন আমি আধা-অচেতন অবস্থায় খুব বেশী জ্বরের মধ্যে ছিলাম। যেহেতু আমার অবস্থা ক্রমাগত খারাপের দিকে যাচ্ছিলো সেজন্যে পরদিন আমাকে নবাবগঞ্জ সরকারী হাসপাতালে পাঠানো হলো। এর পর যখন আমার শরীরের অবস্থা আরও সংকটাপন্ন হলো তখন আমাকে ২১.১.৫০ তারিখে নবাবগঞ্জ থেকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে এসে সেখানকার জেল হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হলো।

কোনো অবস্থাতেই আমি পুলিশকে কিছু বলিনি এবং উপরে যা বলেছি তার বেশী আমার আর বলার কিছুই নেই।

ইলা মিত্র রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে বদলী হওয়ার পরই খুলনার এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই বাঙলাতেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং রাজশাহী জেলের মধ্যেও তার প্রভাব বিস্তৃত হয়। এর ওপর আর এক উপসর্গ জোটার ফলে জেলের মধ্যে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অনেকখানি বেশী অবনতি ঘটে।

নাচোলে সাঁওতাল কৃষকদের সাথে সংঘর্ষে যে এ. এস. আই.-টি নিহত হয় তার স্ত্রী এই সময় প্রত্যেক দিন রাজশাহী জেল গেটে এসে বহুক্ষণ ধরে নিয়মিত ভাবে বসে থাকতো এবং হিন্দু ও সাঁওতালদেরকে গালাগালি করে কাঁদতে কাঁদতে নাচোলের ঘটনা সম্পর্কে নানাপ্রকার ভুল কাহিনী এবং বিকৃত তথ্য বিবৃত করতো। এ সবের দ্বারা সে জেলের সেপাই এবং বিশেষ করে কয়েদী ও অন্যান্য কর্মচারীদের এ কথাই বোঝাতে চাইতো যে হিন্দুরা একজোট হয়ে মুসলমান হত্যা করেছে। কাজেই তার প্রতিশোধ নেওয়া দরকার। এই সাম্প্রদায়িক প্রচারণা এবং উত্তেজনা বৃদ্ধির ব্যাপারে মান্নান নামে রাজশাহীর তৎকালীন জেলার সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করতো এবং নিহত দারোগার স্ত্রীটিকেও এ ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দিতো।[১৪]

ইলা মিত্রকেও এই সময় মাঝে মাঝে জেল গেটে নিয়ে গিয়ে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় হাজির করা হতো এবং কয়েদীদেরকে দেখিয়ে তারা বলতো, "তোমরা

রানী মাকে দেখো। ইনি আবার রানী হয়েছিলেন!"*[১৫]

এই সমস্ত কারণ মিলে জেলের মধ্যে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির এমন অবনতি ঘটে যে হিন্দু রাজবন্দীরা তখন নিজেদের ওয়ার্ডের বাইরে বের হতে পারতেন না। ঘরের সামনে সামান্য একটু বেড়ানোর যে সুযোগ ছিলো সেটাও তাঁদের জন্যে এইভাবে বন্ধ হয়ে গেলো।[১৬]

এই অসহ্য অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে রাজবন্দীরা তখন ১৫ দিনের নোটিশ দিয়ে মুখ্য মন্ত্রী নূরুল আমীনের কাছে একটা মেমোরেণ্ডাম দেন। তাতে বলা হয় যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা যদি বন্ধ করা না হয় তাহলে তাঁরা সেই অবস্থার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে অনশন ধর্মঘট করতে বাধ্য হবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নূরুল আমীনের কাছ থেকে কোনো জবাব না পেয়ে ১৯৫০ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের রাজবন্দীরা আবার অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। সেই ধর্মঘট চলার নবম দিনে অর্থাৎ ১০ই ফেব্রুয়ারি রাজশাহীর জেলা শাসক রাজবন্দীদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁদেরকে বলেন, "আপনারা নিশ্চিন্ত হোন। আমরা অবস্থা পরিবর্তনের ব্যবস্থা করছি।" এর পর তারা পূর্বোক্ত নিহত এ. এস. আই.-এর স্ত্রীর জেল গেটে আসা বন্ধ করে দিলো এবং সেই সাথে জেলার মান্নানও তার বিকৃত সাম্প্রদায়িক বক্তব্য জাহির করা থেকে বিরত হলো।[১৭]

নাচোলের ঘটনাবলী এবং তার পরবর্তী নির্যাতনের কাহিনী তৎকালীন কোনো সংবাদপত্রে তো প্রকাশিত হয়ইনি, এমনকি মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন প্রাদেশিক বিধান পরিষদে সে সম্পর্কে কোনো আলোচনা পর্যন্ত হতে দেননি।

প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী, গোবিন্দলাল ব্যানার্জী এবং মনোহর ঢালী এ ব্যাপারে কতকগুলি মুলতুবী প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারকে দিয়েছিলেন। ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫০, বিধান পরিষদে তাঁরা এই মুলতুবী প্রস্তাবের নোটিশের সম্পর্কে স্পীকারকে প্রশ্ন করেন। স্পীকার এই মুলতুবী প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে দেওয়ার ব্যাপারে খুব বেশী গররাজী ছিলেন না কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন সেটি উত্থাপনের বিরোধিতা করায় তিনি শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যান।[১৮]

নূরুল আমীন তাঁর বিরোধিতার যুক্তি দিতে গিয়ে বলেন যে একজন ভার-প্রাপ্ত অফিসার এবং তিনজন কনস্টেবলের মৃত্যু সম্পর্কিত ব্যাপারটি কোর্টের বিচারাধীন, কাজেই সে সম্পর্কে কোনো আলোচনা পরিষদে হতে পারে না।[১৯]

এর জবাবে প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী বলেন যে তিনি পুলিশ অফিসারের হত্যার

* সাঁওতালরা ইলা মিত্রকে রানী বলতো। ব. উ.

ব্যাপার আলোচনা করতে চান না। তিনি আলোচনা করতে চান ঘটনার পরবর্তী পর্যায়ে ঐ এলাকায় পুলিশ ও মিলিটারীর নির্যাতনের ব্যাপার।[২০] নূরুল আমীন কিন্তু তাঁর পূর্বোক্ত যুক্তি আঁকড়ে থেকে বলেন যে মূল ঘটনাকে বাদ দিয়ে পরবর্তী ঘটনার আলোচনা সম্ভব নয়, মূল ঘটনার প্রসঙ্গ আলোচনার মধ্যে এসেই পড়বে। কাযেই সে ধরনের কোনো বিতর্ক সেই অবস্থায় পরিষদে সম্ভব নয়।[২১]

বিরোধী দলের নেতা বসন্তকুমার দাস নূরুল আমীনের এই যুক্তির বিরোধিতা করে বলেন যে হত্যার পর পুলিশ, মিলিটারী, ই. পি. আর. এবং আনসাররা ঘটনাস্থলে গিয়েছিলো আইন শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে। তাঁদের অভিযোগ হলো এই যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নামে তারা জনসাধারণের ওপর দারুণভাবে অত্যাচার করেছে। এটা মূল ঘটনা থেকে একটি পৃথক ব্যাপার এবং সেই হিসেবেই তাঁরা সেটিকে আলোচনা করতে চান।[২২]

এর পর পরিষদের স্পীকার, শিক্ষা মন্ত্রী আবদুল হামিদ এবং অন্যান্যেরা নূরুল আমীনের স্বরে স্বর মিলিয়ে ক্রমাগতভাবে মুলতুবী প্রস্তাবগুলি আলোচনার বিপক্ষে নানা রকম কুযুক্তি দিতে থাকেন এবং মূল ঘটনাকে বাদ দিয়ে কোনো আলোচনা এ ব্যাপারে সম্ভব নয় এই যুক্তিকেই খুঁটি হিসেবে আঁকড়ে ধরেন।[২৩]

আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে পরিষদ্ সদস্যেরা বিভাগ-পূর্ব ভারতীয় এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক বিধান পরিষদে এ ধরনের ঘটনায় আলোচনার পূর্ব উদাহরণ উল্লেখ করেন কিন্তু তাদের কোনোটিই নাচোলের ঘটনার সাথে তুলনীয় নয় বলে নূরুল আমীন এবং স্পীকার স্পষ্ট রায় দেন।[২৪]

এক পর্যায়ে মনোরঞ্জন ধর প্রশ্ন তোলেন যে পুলিশ অফিসার এবং কনস্টেবলের মৃত্যু সংক্রান্ত ঘটনাটির ওপর পুলিশী তদন্ত চলছে তার অর্থ এই নয় যে সেটি কোর্টে বিচারাধীন আছে। পুলিশ তদন্ত এবং কোর্টের সামনে বিচার এক জিনিস নয়। ব্যাপারটি যে সত্যি সত্যিই কোর্টের বিচারাধীনের উপযুক্ত প্রমাণ দাখিলের জন্যে তিনি মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনকে আহ্বান জানান। কিন্তু অনুগত স্পীকার নূরুল আমীনকে সে রকম কোনো বিপদের মধ্যে না ফেলে সরাসরি বলেন যে তিনি নূরুল আমীনকে এ ব্যাপারে কোনো প্রমাণ দাখিল করার কথা বলতে পারেন না। সরকারের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য তাঁকে মানতেই হবে।[২৫] এইভাবে কিছুক্ষণ বিতর্ক চলার পর অবশেষে স্পীকার রায় দেন যে নাচোলের ঘটনা ও পুলিশ নির্যাতনের ব্যাপারে তিনি কোনো মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করতে ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হতে দেবেন না।

এইভাবেই সংবাদপত্র, এমনকি প্রাদেশিক বিধান পরিষদেরও টুঁটি টিপে নূরুল আমীন সরকার নাচোলের অসংখ্য সাঁওতালের নৃশংস হত্যাকাণ্ড, সমগ্র এলাকায় লুঠতরাজ, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ এবং নানা ধরনের নির্মম নির্যাতনের ঘটনাবলীকে জনসাধারণের থেকে লুকিয়ে রেখে নিজেদের "ভদ্র" চেহারাকে দেশের সামনে টিকিয়ে রাখার চেষ্টায় কোনো ত্রুটি রাখলো না!

১০॥ রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে গুলিবর্ষণ ও রাজবন্দী হত্যা

১৯৪৯ সালের মে-জুন মাসে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে দ্বিতীয় অনশন ধর্মঘটের পর 'আত্মহত্যার' অভিযোগে অনশনকারীদেরকে এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। সে সময় রাজবন্দীদেরকে বিভিন্ন চাকীতে সাধারণ কয়েদীদের সাথে কাজ করতে হতো। এই কাজের মাধ্যমে তাদের সাথে রাজবন্দীদের যোগাযোগ বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।[১]

সাধারণ কয়েদীদেরকে তখন বৃটিশ আমলের বন্দোবস্ত অনুসারেই নানারকম অতিরিক্ত নির্যাতন সহ্য করতে হতো। জেল কর্তৃপক্ষও তাদেরকে পশু হিসেবেই গণ্য করা করতো এবং গরুর পরিবর্তে তাদেরকেই সরষে মাড়া ঘানিতে জুড়ে খাটিয়ে নিতো। উপযুক্ত সহানুভূতি এবং সহযোগিতার অভাবে তারা এ সব কিছুই মুখ বুজে সহ্য করতো এবং কোনো ব্যাপারেই প্রতিবাদের সাহস পেতো না।[২]

রাজবন্দীদেরও যখন তাদের সাথে ঘানি ইত্যাদি বিভিন্ন চাকীতে জুড়ে দেওয়া হলো তখন তাঁদের সহানুভূতি এবং সহযোগিতার আশ্বাস পেয়ে তাদের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ এবং প্রতিবাদ ও প্রতিকারের আকাঙ্খা অনেকখানি জাগ্রত হলো। তারা ধীরে ধীরে এ সব নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে থাকলো। এবং প্রশ্ন তুললো পাকিস্তান হওয়ার পরও জেলের মধ্যে মানুষ দিয়ে ঘানি টানাবে কেন? এতো মারপিট হবে কেন? খাওয়া-দাওয়ার এতো অসুবিধা থাকবে কেন? তামাক খাওয়া বেআইনী থাকবে কেন? ইত্যাদি।[৩]

এই সব আলাপ আলোচনা অনেকখানি অগ্রসর হওয়ার পর এবং রাজবন্দীদের সক্রিয় সহযোগিতার ফলে সাধারণ কয়েদীরা কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের দাবী পেশ করার সিদ্ধান্ত নেয়। মনসুর-ই হাবিব এবং আরো দুই একজন মিলে তাদের দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে একটি মেমোরাণ্ডামের খসড়া তৈরী করেন এবং সেটি সাধারণ কয়েদীদের পক্ষ থেকে জেল কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা হয়।

জেল কর্তৃপক্ষ তাদের এই মেমোরাণ্ডামে কর্ণপাত না করায় তারা ৫ই এপ্রিল ১৯৫০, থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু করে। তাদের অনশনের সমর্থনে রাজবন্দীরাও ৭ই এপ্রিল থেকে অনশন ধর্মঘটে শরীক হন।[৪]

অনশন শুরু হওয়ার কয়েকদিন পর কয়েদীদের মধ্যে অনেকে ধর্মঘট ছেড়ে দেয়, কিন্তু তা সত্বেও প্রায় এক হাজার কয়েদী ধর্মঘটে অটল থাকে।[৫]

ধর্মঘটের পঞ্চম দিন অর্থাৎ ৯ই এপ্রিল ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজন্স আমীর হোসেন রাজশাহী জেল পরিদর্শন করতে আসে এবং ধর্মঘটী কয়েদীদের সাথে দেখা করে তাদেরকে অনশন পরিত্যাগ করতে বলে। কিন্তু ধর্মঘটীরা দাবী না মেনে নেওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট প্রত্যাহার করতে রাজী হয় না।[৬]

এর পর আমীর হোসেন এগারো-বারো তারিখের দিকে রাজবন্দীদের সাথে দেখা করে তাদেরকে যে সাধারারণ কয়েদীদের ধর্মঘট তাঁদের জন্যেই সম্ভব হচ্ছে কাজেই তাঁরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করলেই অন্যান্য কয়েদীরা তাদের ধর্মঘটও প্রত্যাহার করে নেবে। সেই বিবেচনায় ইন্সপেক্টর জেনারেল রাজবন্দীদেরকে ধর্মঘট প্রত্যাহার করতে অনুরোধ জানায়। কিন্তু রাজবন্দীদের পক্ষ থেকে ধর্মঘট প্রত্যাহারের কোনো প্রশ্নই ছিলো না, কাজেই তাঁরা আমীর হোসেনকে পরিষ্কারভাবে নিজেদের অনশন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। সুতরাং রাজবন্দীসহ সাধারণ কয়েদীদের অনশন ধর্মঘট অব্যাহত থাকে।

এই সময় ইন্সপেক্টর জেনারেল আমীর হোসেন জেল সুপারিনটেন্ডেণ্টকে নির্দেশ দেয় রাজবন্দীদের মধ্যে পনেরো-ষোল জনকে বিচ্ছিন্ন করে অন্যত্র অর্থাৎ ১৪নং কনডেম্ড্ সেলে সরিয়ে দিতে।[৭] এই ১৪নং ছিলো মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তদের সেল।

আমীর হোসেনের এই নির্দেশের বিরুদ্ধে রাজবন্দীদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। তাঁরা কেউই খাপরা ওয়ার্ড থেকে সরে গিয়ে উপরোক্ত কুখ্যাত সেলে বিচ্ছিন্নভাবে থাকতে রাজী ছিলেন না। কাজেই তাঁরা নিজেদের মধ্যে তখন আলোচনা করে স্থির করেন যে তাঁরা ঐ সেলে কিছুতেই যাবেন না।

মাত্র একজন রাজবন্দী, গণেন সরকার এই সিদ্ধান্ত খোলাখুলিভাবে পুনর্বিবেচনা করার কথা বলেছিলেন। যশোরের ফরওয়ার্ড ব্লক মার্কিস্ট পার্টির সদস্য হীরেন সেন বিরোধিতা না করলেও সকলকে সাবধান করে বলেছিলেন যে সেই সিদ্ধান্তের পরিণতি মারাত্মক হতে পারে।[১০] এই "মারাত্মক পরিণতি" বলতে তিনি লাঠি চার্জ পর্যন্তই আশঙ্কা করেছিলেন।[১১]

১৪ই এপ্রিল ইন্সপেক্টর জেনারেল আমীর হোসেন রাজবন্দীদের সকলকে

এবং সাধারণ কয়েদীদের বেশ কয়েকজন প্রতিনিধিকে জেল গেটে হাজির করে। সেখানে সে কয়েদীদেরকে অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করতে বলায় তারা জবাব দেয়: আগে দাবী মেনে নাও, পরে ধর্মঘট প্রত্যাহার।[১২]

১৫ই এপ্রিল তারা আবার সকলকে জেল গেটে উপস্থিত করলো এবং ধর্মঘটীদের দাবী মোটামুটিভাবে মেনে নেওয়ার কথা জানিয়ে বললো: মানুষ নিয়ে আর ঘানি টানানো হবে না। সরকারী পয়সায় তামাক দেওয়া সম্ভব হবে না, তবে যারা নিজের পয়সায় তামাক যোগাড় করতে পারবে তাদেরকে তামাক খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। এ ছাড়া মারপিট ইত্যাদিও বন্ধ করা হবে।[১৩]

রাজশাহী জেলের ফুটবল মাঠের মধ্যে সেদিনই বিকেল বেলা ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজন্স আমীন হোসেন জেলের প্রায় ২৫০০ কয়েদীকে হাজির করে তাদের সামনে এক বক্তৃতা দিয়ে বললো তারা যেন কমিউনিস্টদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকে।[১৪]

ফুটবল মাঠের এই মিটিং শেষ হওয়ার আগেই খাপরা ওয়ার্ডে রাজবন্দীদের লক আপ হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও সন্ধ্যের পর আমীর হোসেন তালা খুলে ওয়ার্ডের ভেতরে এসে রাজবন্দীদেরকে উদ্দেশ্য করে বললো: বাইরে আপনারা বিপ্লব করছেন। জেলের ভেতরেও এই সব কাণ্ড করলেন। এর প্রতিফল আপনাদেরকে পেতে হবে।[১৫]

১৫ই এপ্রিলের পর এলো ২৪শে এপ্রিল। ঐ সকাল ৯টার দিকে জেল সুপার বিল তাঁর সাপ্তাহিক পরিদর্শনের জন্যে আসে। সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বিলের সাথে জেলের ডাক্তার, জেলার মান্নান, দু-জন ডেপুটি জেলার, হেড ওয়ার্ডার প্রভৃতি আরও কয়েকজন ছিলো।[১৬] এর পূর্বেই খাপরা ওয়ার্ডে রাজবন্দীদের চা খাওয়া শেষ হয়েছিলো এবং ১৪ নম্বর সেলে বদলী ইত্যাদি নিয়ে হানিফ শেখ, মনসুর হাবিব, আবদুল হক, প্রভৃতি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন।[১৭]

সুপার বিল খাপরা ওয়ার্ডের বারান্দায় দাঁড়িয়েই রাজবন্দীদের সাথে আলাপ শুরু করে। সে সময় জেল ইউনিটের সেক্রেটারী আবদুল হক তাঁদের পক্ষ থেকে তাকে বলেন যে তাঁরা প্রতিদিন দুবেলা একইভাবে কুমড়োর ঘ্যাঁট আর খেতে পারবেন না। কাজেই জেল কর্তৃপক্ষকে তাঁদের খাদ্যতালিকা পরিবর্তন করতে হবে।[১৮]

এর উত্তরে বিল তাঁদেরকে বলে যে তাঁরা হচ্ছেন ক্রিমিন্যাল, কাজেই যা

তাঁদেরকে দেওয়া হচ্ছিলো তাই যথেষ্ট। তার বেশী তাঁদেরকে আর কিছু দেওয়া সম্ভব নয়। কনডেম্‌ড্‌ সেলে যাওয়ার ব্যাপারেও সুপার বিলকে তাঁরা বলেন যে সেখানে যেতে তাঁদের আপত্তি আছে।

এই ভাবে কথা কাটাকাটি হতে হতে এক পর্যায়ে বিল তার হাতের ছড়ি তুলে বন্দীদের মধ্যে একজনকে মারতে ওঠে। সে সময় তাঁদের মধ্যে একজন তার ছড়িসমেত হাত ধরে ফেলেন এবং টেনে তাকে বারান্দা থেকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে নেন। এই সময় সাধারণভাবে আলাপরত অবস্থায় দুজন ডেপুটি জেলারও ঘরের মধ্যে ছিলেন। যাই হোক জেল সুপার বিলকে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বারান্দায় দাঁড়ানো জেলার মান্নান হুইসিল বাজিয়ে দেয়। ঘরের মধ্যে এই সময় একটা ধস্তাধস্তি শুরু হয় এবং বন্দীদের হাত ছাড়িয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই বিল এবং অন্যেরা দৌড়ে বাইরে বেড়িয়ে পড়ে। দুজন ডেপুটি জেলার অবশ্য ভিতরেই আটকে পড়েন। এর পরই তারা পাগলা ঘণ্টা বাজিয়ে দেয় এবং তাদের সেপাইরা জানলার ফাঁক দিয়ে বন্দুক গলিয়ে ঘরের মধ্যে অবস্থিত রাজবন্দীদের ওপর ৬০ রাউণ্ড গুলি ক্রমাগতভাবে বর্ষণ করে।[২০]

বিল ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর এবং হুইসিল ও পাগলা ঘণ্টা বাজানোর সাথে সাথেই রাজবন্দীরা চৌকি, নারকেলের ছোবড়ার গদি ইত্যাদি খাড়া করে নিজেদের ঘরের দরজা যথাসাধ্য বন্ধ করে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু গুলির ধাক্কায় প্রায় তৎক্ষণাৎ তাঁরা প্রত্যেকেই এধার-ওধার ছিটকে পড়েন এবং নিজের নিজের আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঘরের মধ্যে কোনো আশ্রয়ই নিরাপদ ছিলো না। কাজেই তাঁরা প্রত্যেকেই গুলিবিদ্ধ হন এবং ঘরের মেঝে তাঁদের রক্তে ভিজে লাল হয়ে ওঠে।[২১] একমাত্র শফিউদ্দীন আহমদই প্রস্রাবের জন্যে রাখা একটি ড্রাম উল্টে তার মধ্যে আশ্রয় নেওয়ায় তাঁর শরীরেই সরাসরিভাবে গুলির কোনো আঘাত লাগেনি।[২২] খাপরা ওয়ার্ডের মধ্যে দুজন ডেপুটি জেলার আটকা পড়েছিলেন তাঁদের মধ্যেও একজন গুলিতে আহত হন।[২৩]

গুলিতে প্রথমেই মারা যান হানিফ শেখ। তার পর আনোয়ার হোসেন। মাথায় গুলি লেগে তাঁর মাথাটা সম্পূর্ণভাবে চুরমার হয়ে যায়।[২৪]

তারপর ঘরের মধ্যে একের পর এক মারা যান সুখেন ভট্টাচার্য, দেলওয়ার এবং সুধীন ধর। সুধীন ধর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও তাঁর সহজ ভাব পরিত্যাগ করেননি। গণ্ডগোল শুরু হওয়ার সময়েই তিনি তাড়াতাড়ি একটা বিড়ি

ধরিয়ে বলেন, "সবাই আজ লম্বা বিড়ি ধরাও। আজ আর কারো রক্ষে নেই।" এর অল্পক্ষণ পরেই গুলিতে তিনি নিহত হন।[২৫]

গুলি বর্ষণ শেষ হওয়ার পর পুলিশেরা ঘরের মধ্যে ঢুকে দুইবার লাঠি চার্জ করে। একজন রাজবন্দী তৃষ্ণার চোটে অস্থির হয়ে পানি পানি বলে চীৎকার করলে জেলার মান্নান একজন সেপাইকে দিয়ে তার মুখে প্রস্রাব করিয়ে দেয়। এই অবস্থায় তাঁরা পড়ে থাকার সময় রাজশাহীর পুলিশ সুপার একদল সশস্ত্র পুলিশ সাথে নিয়ে খাপরা ওয়ার্ডে হাজির হন।[২৬]

এর পূর্বে পাগলা ঘণ্টা দেওয়ার পর জেলার মান্নান ও বিল তাঁকে টেলিফোনে জানায় যে রাজবন্দীরা খাপরা ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এসে সাধারণ কয়েদীদেরকে সঙ্গে নিয়ে জেল গেট ভেঙে বাইরে বের হওয়ার চেষ্টা করছে। কাজেই তারা তাঁকে যত শীঘ্র সম্ভব সশস্ত্র পুলিশ দল নিয়ে জেলখানায় উপস্থিত হতে বলে। জেলখানায় উপস্থিত হয়ে পুলিশ সুপার কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে পড়েন। যে দৃশ্য তিনি খাপরা ওয়ার্ডে এসে দেখেন তা তিনি ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেননি। নিহত এবং আহত রাজবন্দীদেরকে রক্তগঙ্গার মধ্যে পড়ে থাকতে দেখে এবং জেল সুপারও জেলারের মিথ্যা রিপোর্ট দেওয়ার জন্যে তিনি তাদের দুজনকেই দারুণ গালাগালি করেন এবং গ্রেফতার করতে চান। পরে অবশ্য তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়নি।[২৭]

সেই পুলিশ সুপারের বাড়ি ছিলো হায়দরাবাদ (দক্ষিণ)। তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীতে ক্যাপ্টেন ছিলেন। তিনি রাজবন্দীদের ওপর এই নির্যাতন ও নৃশংস গুলি বর্ষণ দেখে ঘটনাস্থলেই বলেছিলেন যে যুদ্ধের সময় তিনি অনেক মৃত্যু দেখেছিলেন কিন্তু অসহায় লোকদেরকে ঘরের মধ্যে এভাবে গুলি করে মারার কোনো নজির তাঁর জানা নেই।[২৮]

গুলি বর্ষণ বন্ধের পর যাঁরা আহত অবস্থায় রক্তগঙ্গা মেঝেতে পড়ে থাকলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কম্পরাম সিংহ, বিজন সেন, মনসুর হাবিব, নুরুন্নবী চৌধুরী, আবদুল হক, ভূজেন পালিত, অমূল্য লাহিড়ী, বাবর আলী, আবদুশ শহীদ, আমিনুল ইসলাম প্রভৃতি ৩১ জন রাজবন্দী। এঁদের মধ্যে কম্পরাম সিংহ এবং বিজন সেনের অবস্থাই ছিলো সব থেকে সংকটাপন্ন।[২৯]

কিন্তু অবস্থা যতই সংকটাপন্ন হোক আহতদের চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা না করে তাঁদেরকে তারা প্রায় সারাদিন খাপরা ওয়ার্ডের মধ্যেই ফেলে রাখলো। বহু ঘণ্টা পরে আহতদেরকে চিকিৎসার নাম করে একবার জেল গেটে তারা নিয়ে গেলো। সে সময় জেল কর্তৃপক্ষ তাঁদেরকে রাজশাহী সদর হাসপাতালে

নিয়ে যাওয়ার একটা চিন্তা করছিলো কিন্তু পরে "নিরাপত্তা" ব্যবস্থার অসুবিধাঘটিত কারণে জেল গেট থেকেই ঐ অবস্থায় তাঁদেরকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে জেল হাসপাতালেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। সেই রাত্রেই বিনা চিকিৎসায় জেলের মধ্যে বিজন সেন এবং কম্পরাম সিংহের মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পূর্বে দিনাজপুর তেভাগা আন্দোলনের বীর যোদ্ধা কম্পরাম সিংহ আহত কমরেডদেরকে উদ্দেশ করে বলেন, যারা বেঁচে থাকবে তাদেরকে বলো লাল ঝাণ্ডার সম্মান রেখেই আমরা মারা গেলাম।'[৩০]

খাপরা ওয়ার্ডে গুলি বর্ষণের ফলে যে সাতজন শহীদ হন তাঁদের প্রত্যেকেরই লাশ পুলিশ গোপনে সরিয়ে ফেলে এবং আত্মীয়-স্বজনকে এ ব্যাপারে কোনো খবর না দিয়ে সেগুলি গুম করে দেয়।[৩১]

বিনা চিকিৎসায় বহুক্ষণ পড়ে থাকায় এবং পরবর্তী সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে আহতদের সকলেরই অতিরিক্ত নানা উপসর্গ দেখা দেয়। এর মধ্যে নুরুন্নবী চৌধুরীর পায়ে গ্যাংগ্রীন হয়ে যাওয়ার ফলে তাঁর একটি পা কেটে বাদ দিতে হয়।

জেল হাসপাতালে চিকিৎসা শেষ হওয়ার পরও কর্তৃপক্ষ প্রায় আড়াই বছর এই রাজবন্দীদেরকে পূর্বোল্লিখিত ১৪নং কনডেমড্ সেলেই তার কাঁটার বেড়ার মধ্যে আটকে রেখে[৩৩] নিজেদের জেদ এবং 'গণতান্ত্রিক' ও 'ইসলামী' ন্যায়নীতিকে বজায় রেখেছিলো।

১১॥ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির উপর ম:ও সেতুঙ ও চীনা লাইনের প্রভাব

১৯৩৮-এর ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই নোতুন পার্টি সম্পাদক রণদীভের সাথে অন্ধ্র পার্টি সেক্রেটারিয়েটের আভ্যন্তরীণ মতবিরোধ ও দ্বন্দ্ব অনেকখানি সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে। অন্ধ্র ছাড়া ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ, বিশেষতঃ এস.এ. ডাঙ্গেও এই সময় রণদীভে লাইনেই বিরোধিতা শুরু করেন।[১]

ছয় মাসের মধ্যে ভারতে বিপ্লব আসন্ন এই বক্তব্য এবং ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে তাঁদের অনুসৃত রণ-কৌশলের বিরুদ্ধে অজয় ঘোষ জেল থেকে দুটি চিঠি পাঠিয়ে প্রতিবাদ জানানোর জন্যে রণদীভে এই সময় তাঁকে বহিষ্কারের হুমকি দেখান।[২]

কিন্তু ভাঙ্গে, অজয় ঘোষ প্রভৃতির সমালোচনার তুলনায় অন্ধ্র পার্টির বক্তব্য ও সমালোচনা ছিলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং তেলেঙ্গানায় সশস্ত্র কৃষক আন্দোলনের অগ্রগতির ফলে তাদের বক্তব্য হুমকি দিয়ে বাতিল করার ক্ষমতাও প্রকৃতপক্ষে রণদীভের ছিলো না। এই সময় তেলেঙ্গানার পার্টির সাথে অন্ধ্র পার্টির খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিলো এবং অন্ধ্র পার্টির নেতা রাজেশ্বর রাওই ছিলেন তেলেঙ্গানা কৃষক সংগ্রামের সর্বপ্রধান প্রবক্তা।

হায়দরাবাদের নলগোণ্ডা ও ওয়ারাঙ্গল এই দুই জেলাতে কমিউনিস্টরা নিজেদের সর্বময় কর্তৃত্ব স্থাপন করে সমগ্র এলাকাটিকে মুক্ত এলাকা হিসেবে গঠন করতে থাকেন। গ্রামের পর গ্রামে তাঁরা গ্রাম্য "সোভিয়েট" স্থাপন করে পুরাতন জমিদার জোতদারদের তাড়িয়ে দিয়ে ও হত্যা করে সে সব জায়গায় নোতুন জমি বন্দোবস্ত করেন। নিজামের কর্মচারীদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে পার্টির নেতৃত্বেই তাঁরা নিজেদের এলাকার আর্থিক জীবন এবং রক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন। ঠিক এই সময়েই অর্থাৎ ১৯৪৮-এর গোড়ার দিকেই তেলেঙ্গানা এবং অন্ধ্রে মাও সেতুঙ-এর প্রভাব বিস্তৃত হতে শুরু করে এবং অন্ধ্র সেক্রেটারিয়েট তাঁদের নোতুন বক্তব্য বিবেচনা জন্যে তা পার্টির সামনে উত্থাপন করেন।[৩]

১৯৪৮-এর জুন মাসে অন্ধ্র পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে একটি চিঠিতে ঘোষণা করেন যে মাও সেতুঙ-এর "নয়া গণতন্ত্র"কে ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন। এ সম্পর্কে তাঁরা যে রণনীতির প্রস্তাব করেন তাতে সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়কে (গ্রামীণ বুর্জোয়া ও ধনী কৃষক সহ) শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে একতাবদ্ধ করে তাদেরকে চীনা লাইন অনুসারে গেরিলা যুদ্ধে নিয়োজিত করার কথা বলা হয়।[৪]

অন্ধ্র সেক্রেটারিয়েট সে সময়ে কেবলমাত্র বৃহৎ বুর্জোয়া ও বৃহৎ জমিদার-দেরকেই সত্যিকার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হিসেবে মনে করেন। মধ্যে কৃষক-দেরকে তাঁরা মনে করেন বিপ্লবের দৃঢ় মিত্র এবং ধনী কৃষকদেরকে মনে করেন নিরপেক্ষ ও ক্ষেত্রবিশেষে বিপ্লবের দোদুল্যমান মিত্র।[৫]

এই শ্রেণী বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে তাঁরা নিজেদের মতামতের সংক্ষিপ্ত সারাংশ দিতে গিয়ে বলেন:

ক্ল্যাসিক্যাল রুশ বিপ্লবের সাথে আমাদের বিপ্লবের অনেক দিক দিয়ে তফাত এবং চীন বিপ্লবের সাথে অনেক বেশী সাদৃশ্য। আমাদের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ ধর্মঘট, সাধারণ গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের মুক্তির সম্ভাবনা

নেই। এখানে যা ঘটবে তা হচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন প্রতিরোধ ও কৃষি বিপ্লবের আকারে সুদীর্ঘ গৃহযুদ্ধ এবং তার পরিণামে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল।[৬]

রণদীভের "অত্যাসন্ন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের" বক্তব্যের সাথে এই বক্তব্যের বিরোধিতা খুবই স্পষ্ট। অন্ধ্র সেক্রেটারিয়েটের উপরোক্ত বক্তব্যকে খণ্ডন করার চেষ্টায় রণদীভে পার্টির তাত্ত্বিক মুখপত্র "কমিউনিস্টে" জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি, এবং জুন-জুলাই সংখ্যায় পর পর চারটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।[৭]

এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে "জনগণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রাম" নামে চতুর্থ প্রবন্ধটিতে তিনি বলেন যে, "রুশ বিপ্লবের পুরো অভিজ্ঞতাই ভারতের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য" এবং রুশ ইতিহাসই হচ্ছে ভারতের আদর্শ।[৮]

এই প্রবন্ধটিতেই মাও সে তুঙকে আক্রমণ করে এবং একমাত্র কমিনফর্মের প্রতি নিজের আনুগত্য প্রকাশ করতে গিয়ে রণদীভে বলেন :

> প্রথমেই একথা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা দরকার যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্স, এঙ্গেলস্, লেনিন এবং স্ট্যালিনকেই মার্ক্সবাদের উৎস হিসেবে স্বীকার করেছে। এর বাইরে তারা কোনো নোতুন উৎস আবিষ্কার করেনি। তাছাড়া এমন কোনো কমিউনিস্ট পার্টি নেই যারা মাও-এর দ্বারা নির্মিত বলে কথিত নয়া গণতন্ত্রের তথাকথিত তত্ত্বের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছে এবং তাকে মার্ক্সবাদের একটা নোতুন সংযোজন বলে স্বীকার করেছে। এটাও খুব অদ্ভুত যে ইউরোপে নয় পার্টির (কমিনফর্ম) কনফারেন্সে মার্কসবাদের এই নোতুন সংযোজন সম্পর্কে কোনো উল্লেখ করা হয়নি।[৯]

কিন্তু এ সব সত্ত্বেও তেলেঙ্গানার সংগ্রাম এবং অন্ধ্র পার্টি সেক্রেটারিয়েটের বক্তব্যকে গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে রণদীভের উপায় ছিলো না। কারণ একমাত্র তেলেঙ্গানাতেই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে একটা সত্যিকার সংগ্রাম এই সময়ে পরিচালিত হচ্ছিলো এবং অন্ধ্র সেক্রেটারিয়েটই সে সময় ছিলো এই সংগ্রামের পার্টিগত মুখপাত্র।

ভারত সরকার কর্তৃক হায়দরাবাদ দখলের পর অবশ্য তেলেঙ্গানার এই সংগ্রামে অনেক বিপর্যয় ঘটে এবং পরিশেষে তা বহুধাবিভক্ত হয়ে ছোট ছোট খণ্ড আক্রমণ ও আন্দোলনে পরিণত হয়।

ভারতে মাও সেতুঙ-এর "নয়া গণতন্ত্রের" প্রয়োগ সম্পর্কে রুশ বিরোধিতার অবসান ঘটে ১৯৪৯-এর মাঝামাঝি। জুকভের সভাপতিত্বে জুন মাসে

সোভিয়েট অ্যাকাডেমিশিয়ানদের একটি সভায় "নয়া গণতন্ত্রকে" সারা এশিয়ার জন্যে একটা নীতি হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে ঘোষণা করা হয়। জুকভ তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় পূর্ব ইউরোপীয় এবং চীনা তত্ত্বের সাদৃশ্যের ওপর খুব জোর দেন এবং বলেন যে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সত্ত্বেও প্রাচ্যের জনগণতন্ত্রের সাথে পশ্চিমা জনগণতন্ত্রের মৌলিক চরিত্রের মধ্যে কোনো তফাত নেই। রণ কৌশলের ক্ষেত্রে জুকভ ভারত ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সর্বত্র সশস্ত্র বিদ্রোহকে সমর্থন জানিয়ে ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, মালয়, বার্মা, ও চীনের বিদ্রোহের সাথে "ভারতের কৃষক অভ্যুত্থানের" উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে এই এই সংগ্রামসমূহ প্রমাণ করে যে এই সব এলাকায় জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম একটা "নোতুন এবং উচ্চতর" পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।[১০]

ভারতের ওপর মূল রিপোর্টটি[১১] পেশ করেন ব্যালাবুশেভিচ। চীনা রণ-নীতি ও রণ-কৌশল ভারতে কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে এ বিষয়ে তিনি একটি বিস্তৃত বিবরণ দেন। তাতে তিনি বলেন যে মধ্য বুর্জোয়াদের একটি অংশকে বিপ্লবের "সহযাত্রী" হিসেবে পাওয়া যাবে। ভারতের অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ জাতিসত্তাসমূহ এবং বুর্জোয়াদের যে অংশটির স্বার্থ বিদেশী পুঁজির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তিনি সেগুলিকেই এক্ষেত্রে চিহ্নিত করেন। জুকভের মতো ব্যালাবুশে-ভিচও ভারতে সশস্ত্র সংগ্রামকে অভিনন্দন জানান এবং "ভারতে জনগণতন্ত্র কায়েমের প্রথম প্রচেষ্টা" হিসেবে তেলেঙ্গানার আন্দোলনের প্রশংসা করেন। এ ছাড়া তিনি তাকে "কৃষিবিপ্লবের অগ্রদূত" এবং মুক্তি আন্দোলনের "সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্বস্তু" হিসেবেও উল্লেখ করেন। এই পথকেই ভারতের পথ বলে ঘোষণা করে ভারতীয় কমিউনিস্টদেরকে তা নিষ্ঠার সাথে অনুসরণের জন্যে তিনি আহ্বান জানান। এভাবেই বস্তুতঃপক্ষে মাও সেতুঙ-এর তত্ত্বের দ্বারা উদ্বুদ্ধ অন্ধ্র সেক্রেটারিয়েটের কর্মসূচীই সোভিয়েট বিশেষজ্ঞ ও সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা এই পর্যায়ে স্বীকৃত ও সমর্থিত হয়।[১২]

এশীয় ও অস্ট্রেলীয় দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়নসমূহের কনফারেন্স উপলক্ষে ১৯৪৯-এর নভেম্বর মাসে যখন এশীয় পার্টির প্রতিনিধিরা পিকিং-এ সমবেত হন তখনই তাঁদেরকে চূড়ান্তভাবে এই নোতুন লাইন সম্পর্কে অবহিত করা হয়। চীনা নেতা লিউ শাও চী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে ঘোষণা করেন যে চীনা বিপ্লব যে পথ ধরে অগ্রসর হয়েছে সেই পথ ধরেই জাতীয় মুক্তি ও জনগণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঔপনিবেশিক এবং আধা ঔপনিবেশিক দেশগুলিকে অগ্রসর হতে হবে। এশীয় দেশগুলির জন্যে সশস্ত্র বিপ্লবকেই তিনি "সংগ্রামের

মূল রূপ" বলে মন্তব্য করেন। ভিয়েতনাম, বার্মা, ইন্দোনেশীয়া, মালয় ও ফিলিপাইনের গৃহযুদ্ধের উল্লেখ করে তিনি বলেন যে সেই সব দেশের পার্টিসমূহ সম্পূর্ণ সঠিকভাবেই কাজ করছে। ভারতের প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে সেখানেও মুক্তির জন্যে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়েছে। সর্বশেষে লিউ শাও চী সমবেত ডেলিগেটদের কাছে এই মর্মে আহ্বান জানান যাতে তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের দেশের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় "সংগ্রামের নির্দিষ্ট রূপ" সম্পর্কে আলোচনা করেন। ভারতের কোনো প্রতিনিধি পিকিং-এর সেই সম্মেলনে উপস্থিত না থাকায় ভারতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনো বিশেষ আলোচনা হয়নি এবং ভারত সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট রণকৌশলগত পরিকল্পনার সিদ্ধান্তও সেখানে নেওয়া হয়নি।[১৩]

১২॥ কমিনফর্ম থিসিস ও ভারতীয় পার্টির নেতৃত্বে রদবদল

অনুন্নত এশীয় দেশগুলির জন্যে চীনা পার্টি অনুসৃত কর্মসূচী অনুমোদন করে কমিনফর্মের মুখপত্রে* "Mighty Advance of the National Liberation Movement in the Colonial and Dependent Countries" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তবে এই প্রবন্ধে চীনা বিপ্লবের অনেক প্রশংসা করে অন্যান্য অনুন্নত দেশগুলির জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে তার প্রচণ্ড তাৎপর্যের বিষয় উল্লেখ করা সত্ত্বেও পিকিং-এ পূর্বোক্ত ট্রেডইউনিয়ন সম্মেলনে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন মুখপাত্র লিউ শাও চীর বক্তব্যকে অনেকাংশে তাঁরা পরিবর্তিতও করেন। লিউ শাও চী বলেছিলেন যে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির পথ "বিভিন্ন ঔপনিবেশিক ও নির্ভরশীল অনুন্নত দেশেরই" পথ। কিন্তু কমিনফর্মের মুখপত্রে বলা হয় যে চীনা লাইন "অনেক ঔপনিবেশিক ও নির্ভরশীল দেশের" পথ। চীনা মুখপাত্র যেখানে বোঝাতে চেয়েছেন "সমস্ত", কমিনফর্মের মুখপাত্ররা সেখানে বলেছেন "অনেক"। এর অর্থ হলো এই যে অনুন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে চীনা লাইনের "সার্বিক" প্রয়োগের ওপর কমিনফর্ম জোর না দিয়ে তার "সাধারণ" প্রয়োগের কথা উল্লেখ করেন। ভারতের প্রশ্নে কমিনফর্মের এই প্রবন্ধে বলা হয় যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে চীন এবং অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের কর্মসূচী নির্ধারণ করতে হবে।[১]

---

* For a Lasting Peace, For a People's Democracy.

পূর্ববর্তী রুশ মুখপাত্রেরা যেখানে সশস্ত্র উপায়ে ক্ষমতা দখলের কথা বলেছিলেন সেখানে কমিনফর্ম এক্ষেত্রে সশস্ত্র সংগ্রামের কোনো উল্লেখ থেকে বিরত থাকেন।[২]

এইভাবে কমিনফর্ম ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা ভারতের ক্ষেত্রে তৎকালীন পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রণনীতি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হওয়ার ফলে রণদীভের পক্ষে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে টিকে থাকা আর কিছুতেই সম্ভব হলো না। বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্বগত মুখপত্রে* এই সময় "ভারতীয় পরিস্থিতি" নামে একটি প্রবন্ধ ছাপা হওয়া সত্ত্বেও বৃটিশ অথবা অন্য কোনো বৈদেশিক কমিউনিস্ট পার্টিই রণদীভের বক্তব্যকে সমর্থন না করায় তাঁর পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে এবং ১৯৫০-এর মে মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির একটি বৈঠকে পুরাতন কমিটি রণদীভেকে সম্পাদকের পদ থেকে অপসারণ করে নিজেকে নোতুনভাবে গঠন করে এবং তার মধ্যে অন্ধ্রের সদস্য থাকেন চারজন। এই নোতুন কমিটি অন্ধ্র সেক্রেটারিয়েটের রাজেশ্বর রাওকে ভারতীয় কমিনিস্ট পার্টির নোতুন সম্পাদক নির্বাচিত করে রণদীভে লাইনকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেন।[৩]

এর পর পার্টির তাত্ত্বিক মুখপত্র 'কমিউনিস্ট'-এর সম্পাদকীয় পরিষদকে নোতুনভাবে সংগঠিত করা হয় এবং তার পরবর্তী সংখ্যাতেই তাঁরা রণদীভের লাইনকে "বামপন্থী বিচ্যুতি" ও "পুরোদস্তুর ট্রট্স্কীপন্থী থিসিস" বলে অভিহিত করেন। এ ছাড়া সম্পাদকীয় পরিষদ্ উনত্রিশতম বার্ষিকী উপলক্ষে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কাছে একটি অভিনন্দন পাঠিয়ে তাতে বলেন যে, "ঔপনিবেশিক দুনিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিসমূহ চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে তাদের আদর্শ হিসেবে মনে করে।"[৪]

১৩॥ কমিনফর্ম থিসিস ও পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি

কমিনফর্ম থিসিসে পাকিস্তান, বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তান, সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট বক্তব্য না থাকলেও পাকিস্তানী ও ভারতীয় পরিস্থিতির মধ্যে কোনো মৌলিক অথবা উল্লেখযোগ্য পার্থক্য না করায় উভয় ক্ষেত্রের জন্যে তাঁরা একই কর্মসূচীকে পরোক্ষভাবে অনুমোদন করেন। এজন্যেই ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহ সাধারণভাবে যেমন পূর্ব পাকিস্তানের

* Communist Review

ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিলো তেমনি পরবর্তী কমিনফর্ম থিসিসও প্রযোজ্য ছিলো ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশের কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে।

পূর্ব পাকিস্তানে রণদীভে থিসিস যে সব কারণে ব্যর্থ হয় তার মধ্যে প্রধান কয়েকটিকে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে :

১। পূর্ব বাঙলার শ্রেণীবিন্যাস এবং দেশভাগের ঠিক পরবর্তী পর্যায়ে "পাকিস্তানের" প্রতি জনগণের দৃষ্টিভঙ্গীকে সঠিকভাবে বোঝার অক্ষমতা। এবং এই অক্ষমতার ফলে পূর্ব বাঙলার বৈপ্লবিক পরিস্থিতিকে সঠিকভাবে বোঝার ব্যাপারে তাঁদের পুরোপুরি ব্যর্থতা।

২। পার্টির আন্দোলন এবং ছোটখাট অ্যাকশন মূলতঃ অমুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। এর ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান কৃষক শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত তাঁদের কার্যকলাপকে অনেকাংশে সাম্প্রদায়িক ভেবে তার থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন রাখেন। সরকারী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রচারণাও এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে ভুল ধারণার সৃষ্টি করে। কিন্তু পার্টির পক্ষ থেকে উপযুক্ত প্রচার ও কার্যসূচীর মাধ্যমে তাদের এই ধারণা পরিবর্তন করা সন্তোষজনকভাবে সম্ভব হয়নি। এর ফলে বৃহত্তর জনগণের স্বার্থের সাথে পার্টির রাজনীতি ও রণকৌশলের সম্পর্ককেও তাঁরা তুলে ধরতে সক্ষম হননি।

৩। গ্রামাঞ্চলে যে সব ছোটখাট অ্যাকশনের মধ্যে তাঁরা গিয়েছিলেন তার নেতৃত্ব ছিলো সব সময়েই পেটি বুর্জোয়াদের হাতে। এর ফলে অ্যাকশনের মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের নিতান্ত অভাব ছিলো। সে জন্যেই অ্যাকশনের পরবর্তী পর্যায়ে রণে ভঙ্গ দেওয়ার প্রবণতা তাদের মধ্যে অনেক বেশী দেখা দেয়।

৪। জেলখানা হচ্ছে শ্রেণীশত্রুর সবলতম ঘাঁটি। সেই ঘাঁটির মধ্যে তারা প্রায় সর্বশক্তিমান। সেখানে বিপ্লব সমাধা চেষ্টা অথবা শত্রুর সাথে একটা সরাসরি বোঝাপড়ার কার্যসূচী ছিলো নিতান্ত ভুল। শত্রুর এই সবলতম ঘাঁটিতে শত্রুকে আঘাত করতে গিয়ে সংগঠনের দিক থেকে পার্টি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৫। অনশন প্রকৃতপক্ষে গান্ধীবাদী ও সংস্কারবাদী প্রভাবের ফল। একদিকে সশস্ত্র বিপ্লবের রণনীতি এবং অন্যদিকে জেলখানার মধ্যে অর্থনৈতিক দাবী এবং ঐ জাতীয় অন্যান্য সুযোগ সুবিধার জন্যে অনশন, এ দুইয়ের মধ্যে ছিলো সামঞ্জস্যের একান্ত অভাব। এর দ্বারা তাঁদের চিন্তার অপরিচ্ছন্নতা এবং কর্মকৌশলের মূলগত ভ্রান্তিই ধরা পড়ে।

৬। জনগণ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে জেলখানার মধ্যে অনশন এবং নানা অ্যাকশনের ফলে বিপুল সংখ্যক পার্টিকর্মী ও নেতাদের মনোবল একেবারে ভেঙ্গে পড়ে এবং তার ফলে তাঁদের মধ্যে আসে চরম হতাশা। এই অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া হিসাবে পরবর্তী পর্যায়ে তাঁদের অধিকাংশই সশস্ত্র বিপ্লব অথবা অ্যাকশনের চিন্তাকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে কেবলমাত্র গণসংগঠনের মধ্যে নিজেদের কাজকে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করেন। পার্টির নীতি এবং কৌশলও সেই অনুসারে নির্ধারিত হয়

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির উপদেশ ও কমিনফর্মের নোতুন সিদ্ধান্ত এবং পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির নানা ব্যর্থতার পর পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টিও তাদের রণনীতি ও কার্যসূচী পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। এবং এই সিদ্ধান্ত পার্টিগতভাবে গৃহীত হয় ১৯৫১ সালে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন জেলার নির্ধারিত প্রতিনিধিদের একটি কনফারেন্সে।

এই কনফারেন্সের পর পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি গণসংগঠন ও গণসংযোগের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে এবং এই কর্মসূচীকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে পরবর্তী পর্যায়ে আওয়ামী লীগ প্রভৃতির মধ্যে উপদলীয় কাজ এবং যুব লীগ প্রভৃতি গণসংগঠনের মধ্যে ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশ করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেয়।

এইভাবে তারা প্রথম পর্যায়ে জনগণ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এবং পরবর্তী পর্যায়ে সশস্ত্র সংগ্রামের নীতিকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে পেটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

এই দুই ঝোঁকই ছিলো একই সংশোধনবাদী বিচ্যুতির দ্বিবিধ প্রকাশ। প্রথম পর্যায়ে জনগণ থেকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে গণসংগঠনের অর্থনীতিবাদী ও সংস্কারবাদী কার্যসূচীর বেড়াজালে আটকা পড়ে তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রায় বিলুপ্তির পথে এগিয়ে দেন। এবং এই অবস্থা কাটিয়ে উঠে সঠিক রণনীতি ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে তাঁদেরকে পরবর্তী পর্যায়ে দীর্ঘদিন ধরে অনেক নোতুন নোতুন অভিজ্ঞতা ও আভ্যন্তরীণ সংকট উত্তীর্ণ হতে হয়।

২১. ৭. ১৯৭০

তথ্য নির্দেশ

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ সূত্রপাত

১ ॥ গণ-আজাদী লীগ

১. আশু দাবী কর্মসূচী আদর্শ, পৃষ্ঠা. ১ প্রকাশক: কমরুদ্দীন আহমদ, কনভেনার গণ-আজাদী লীগ, পূর্ব পাকিস্তান পাবলিশিং হাউজ, জুমরাইল লেন, ঢাকা। প্রথম সংস্করণ: জুলাই, ১৯৪৭

২. বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিল মিটিং-এ আবুল হাশিমের রিপোর্ট, ১৭ ১১.৪৪ 'Peples' War', Bombay, 3.12.44

৩. আশুদাবী কর্মসূচী আদর্শ, পৃষ্ঠা. ২ ৪. ঐ: পৃষ্ঠা. ৬

৫. ঐ: পৃষ্ঠা. ৮ ৬. ঐ: পৃষ্ঠা ৪ ৭. ঐ: পৃষ্ঠা. ৭

৮. Draft Manifesto of the Bengal Provincial Muslim League by Abul Hashim M.L.A.,—Secretary B.P.M.L. P. 6. Published by Shamsuddin Ahmed, 150 Mogaltuli, Dacca.

৯. আশুদাবী কর্মসূচী আদর্শ, পৃষ্ঠা. ২২ ১০. ঐ: পৃষ্ঠা. ২৩

১১. কমরুদ্দীন আহমদ

২ ॥ ডক্টর শহীদুল্লাহর অভিমত

১. আজাদ ১২ই শ্রাবণ, ১৩৫৪। প্রবন্ধটি ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 'আমাদের ভাষা সমস্যা' নামক পুস্তিকাতে পুনর্মুদ্রিত।

২. আমাদের ভাষা সমস্যা। পৃষ্ঠা (৩২-৩৩) রেনেসাঁস পাবলিকেশন

৩. ঐ: পৃষ্ঠা. ৩২ ৪. ঐ: পৃষ্ঠা. ৩৪

৫. ঐ: পৃষ্ঠা (৩৪-৩৫) ৬. প্রবন্ধটি 'আমাদের ভাষা সমস্যা' নামক পুস্তিকাতে পুনর্মুদ্রিত। ৭. ঐ: পৃষ্ঠা. ৩৬ ৮. ঐ: পৃষ্ঠা (৩৬-৩৭)

৯. ঐ: পৃষ্ঠা (৩৭-৩৮) ১০. ঐ: পৃষ্ঠা. ৩৯

৩ ॥ গণতান্ত্রিক যুব লীগ

আতাউর রহমান (রাজশাহী), শহীদুল্লাহ কায়সার। ২. ঐ

৩. কমরুদ্দীন আহমদ, আতাউর রহমান, শহীদুল্লাহ্ কায়সার, অলি আহাদ।

৪. তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরি: ৩১.৭.৪৭, ৫.৮.৪৭। ৫. ঐ: ২৩.৮.৪৭।

৬. কমরুদ্দীন আহমদ, তাজউদ্দীন আহমদ, শহীদুল্লাহ কায়সার, আতাউর রহমান, অলি আহাদ, মহম্মদ তোয়াহা। ৭. ঐ।

৮. ঐ। ৯. অলি আহাদ, তাজউদ্দীন আহমদ, আবদুল মতিন।

১০. মহম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, আবদুল মতিন, তাজিউদ্দীন আহমদ।

১১. তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরি: ৩০.৮.৪৭।

১২. ঐ: ৩১.৮.৪৭। ১৩. ঐ। এবং জবানী সূত্র

১৪. তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরি: ৫.৯.৪৭ ও ৬.৯.৪৭।

১৫. শওকত আলী (১৫০ নং মোগলটুলী), আতাউর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদ।

১৬. তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরি: ৬.৯.৪৭। আতাউর রহমান, শহীদুল্লাহ কায়সার, কমরুদ্দীন আহমদ।

১৭. ডায়েরি: ৬.৯.৪৭। ১৮. ঐ: ৭.৯.৪৭। ১৯. আমরা গড়িব স্বাধীন সুখী গণতান্ত্রিক পাকিস্তান। ভূমিকা শামসুল হক। পৃষ্ঠা ১আ. পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলনের পক্ষে মিঃ শামসুল হক কর্তৃক ১৫০, মোগলটুলী, ঢাকা হইতে প্রকাশিত এবং বলিয়াদী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ঢাকা হইতে এ. এইচ. সৈয়দ দ্বারা মুদ্রিত। এই পুস্তিকাটির শেষ পৃষ্ঠায় তমদ্দুন মজলিস কর্তৃক সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত পুস্তিকা 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা—বাংলা না উর্দু' এর একটি বিজ্ঞাপনও প্রকাশিত হয়।

২০. ঐ: পৃষ্ঠা. ২ আনা। ২১. ঐ: পৃষ্ঠা. ৩ আনা। ২২. ঐ: পৃষ্ঠা. ২৪

২৩. ঐ: পৃষ্ঠা. ৩৩ ২৪. ঐ। ২৫. ঐ: ৩৪

২৬. আতাউর রহমান ২৭. ঐ। ২৮. আতাউর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদ, কমরুদ্দীন আহমদ। ২৯. মহম্মদ তোয়াহা, আবদুর রহমান চৌধুরী, শহীদুল্লাহ কায়সার, শাহ আজিজুর রহমান।

৪ ॥ তমদ্দুন মজলিসের প্রাথমিক উদ্যোগ

পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষা বাংলা—না উর্দু? পৃষ্ঠা. এক-দুই। প্রকাশক—অধ্যাপক এম. এ. কাসেম, এম. এসসি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তমদ্দুন অফিস, রমনা, ঢাকা। প্রিন্টার—এ. এইচ. সৈয়দ, বলিয়াদী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৩৭ নং বংশাল রোড, ঢাকা। ১ম সং. সেপ্টেম্বর '৪৭

২. ঐ: পৃষ্ঠা. তিন। ৩. ঐ: পৃষ্ঠা. ছয়। ৪. ঐ: পৃষ্ঠা. নয়
৫. ঐ: পৃষ্ঠা. নয়-দশ। ৬. ঐ: পৃষ্ঠা. এগার। ৭. ঐ: পৃষ্ঠা. দশ-এগার।
৮. ঐ: পৃষ্ঠা. আট। ৯. ঐ: পৃষ্ঠা. পনর।
১০. ঐ: পৃষ্ঠা. ষোল। ১১. ঐ: পৃষ্ঠা সতের। ১২. Before the Twenty-First by Farid Ahmed. The Concept of Pakistan, February 1966. p. 30. ১৩. ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস। পৃষ্ঠা ৫-৬ তমদ্দুন লাইব্রেরী। প্রকাশনায়: হাসান ইকবাল, ১৯, আজিমপুর রোড ঢাকা। প্রকাশ: জুন, ১৯৫২।
১৪. ঐ: পৃষ্ঠা. ৭।

৫ ॥ ভাষার দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রথম সভা

১. Morning News, 7.12.47. দৈনিক আজাদ, ৭.১২.৪৭।
২. Morning News, 7.12.47. ৩. ঐ: 6.12.47.
৪. ঐ: 10.12.47 ৫. ঐ। ৬. ঐ। ৭. ঐ।
৮. অলি আহাদ, আবদুল মতিন। ৯. Morning News, 10.12.47
১০. Before the Twenty-First by Farid Ahmed. The Concapet of Pakistan. p. 31 ১১. Morning News 10.12.47

৬ ॥ করাচীর শিক্ষা সম্মেলন

১. Morning News, 13.12.47 ২. ঐ: 17.12.47 ৩. ঐ।

৭ ॥ দুর্বৃত্তদের হামলা

১. তাজউদ্দীন আহমদের ব্যক্তিগত ডায়েরি। ৭.১২.৪৭ ২. ঐ।
৩. ডায়েরি—১২.১২.৪৭, আবদুল মতিন। ৪. আবদুল মতিন, আবুল, কাসেম, অলি আহাদ। ৫. আবদুল মতিন, অলি আহাদ, আবুল কাসেম (ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, ফেব্রুয়ারি—১৯৬৭। পৃষ্ঠা ২১ এবং ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, জুন, ১৯৫২। পৃষ্ঠা ১৪)
৬. শামসুদ্দীন আহমদ, অলি আহাদ, জহুর হোসেন চৌধুরী, আবুল কাসেম, ফরিদ আহমদ (The Concept of Pakistan, Feb. 66 p. 32) তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরি: ১২.১২.৪৭।
৭. Before the Twenty-First by Farid Ahmed. The

Concept. of Pakistan. p. 32 ৮. জহুর হোসেন চৌধুরী।

৯. Farid Ahmed. Concept of Paksitan, Feb. 1966 p. 32 ফরিদ আহমদ এখানে মন্ত্রী হাসান আলী সম্পর্কে যা বলেছেন সেটা ঠিক নয়। কারণ তিনি সে সময় করাচীতে ছিলেন। তাঁর ঢাকা ফেরার তারিখ ১৯শে ডিসেম্বর (মর্নিং নিউজ, ২১শে ডিসেম্বর।) আবুল কাসেম: ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস। পৃষ্ঠা ২১ তমদ্দুন মজলিসের পক্ষে মোহাম্মদ নুরন্নবী। মজলিস অফিস: ৩১।২ আজিমপুর রোড, ঢাকা-৯। ফেব্রুয়ারি—১৯৬৭। শামসুদ্দীন আহমদ, অলি আহাদ, জহুর হোসেন চৌধুরী।

১০. আবুল কাসেম (ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭। পৃষ্ঠা. ২১), শামসুদ্দীন আহমদ। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, জুন ১৯৫২। পৃষ্ঠা ১৪। ১১. আবুল কাসেম (ঐ: পৃষ্ঠা. ২১), অলি আহাদ, শামসুদ্দীন আহমদ। ১২. Farid Ahmed—Before the Twenty First. ১৩. জহুর হোসেন চৌধুরী।

১৪. Farid Ahmed-Before the Twenty First. ১৫. ঐ।

১৬. ঐ: P. 32-33। আবদুল ওয়াহাব। ১৭. জহুর হোসেন চৌধুরী।

১৮. ঐ। ১৯. Morning News, 13.12.47 ২০. শামসুদ্দীন আহমদ। ২১. তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরি: ১৩.১২.৪৭।

২২. ঐ। ২৩. Morning News. 17.12.47 ২৪. ঐ। সভার তারিখটি ভুলবশতঃ ১৬ই ডিসেম্বর ছাপা হয়েছে। সঠিক তারিখ ১৫ই ডিসেম্বর। ২৫. Morning News, 19.12.47 ২৬. তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরি: ৮.১:৪৮

৮ ॥ উর্দু সমর্থকদের তাত্ত্বিক বক্তব্য

Morning News, 19.12.47

৯ ॥ ওয়ার্কার্স ক্যাম্প ও রশিদ বই সমস্যা

১. খয়রাত হোসেন, কমরুদ্দীন আহমদ, তফজ্জল আলী, তাজউদ্দীন আহমদ, আবদুল মালেক, মোস্তাক আহমদ।

২. ইউসুফ আলী চৌধুরী, শাহ আজিজুর রহমান, মহিউদ্দীন আহমদ।

৩. কমরুদ্দীন আহমদ, মোস্তাক আহমদ। ৪. ইউসুফ আলী চৌধুরী,

শাহ আজিজুর রহমান, মহিউদ্দীন আহমদ, কমরুদ্দীন আহমদ, মোস্তাক আহমদ, খয়রাত হোসেন। ৫. মোস্তাক আহমদ, কমরুদ্দীন আহমদ, আতাউর রহমান খান। ৬. ঐ। ৭. কমরুদ্দীন আহমদ ঐ। ৯. মোস্তাক আহমদ। ১০. কমরুদ্দীন আহমদ, মোস্তাক আহমদ, খয়রাত হোসেন, শওকত আলী, আতাউর রহমান খান। ১১. কমরুদ্দীন আহমদ, খয়রাত হোসেন, মোস্তাক আহমদ, আতাউর রহমান খান। ১২. ঐ। ১৩. আবুল মনসুর আহমদ: আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর। পৃষ্ঠা (২৪৪-৪৫) প্রকাশক: আবদুল কাদির খান, নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলা বাজার, ঢাকা-১। প্রথম সংস্করণ—জুলাই ১৯৬৮ ১৪. ঐ: পৃষ্ঠা ২৪৫

১০ ॥ প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ্

১. অলি আহাদ, ফরিদ আহমদ, কমরুদ্দীন আহমদ, নূরুল হক ভূঞা (ভাষা আন্দোলনের গোড়ার কথা। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭। পৃষ্ঠা ৪, আবুল কাসেম (ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস। পৃষ্ঠা ১৬)। ২. নওবেলাল: ১৯. ২. ৪৮। ইত্তেহাদের সম্পাদকীয় 'ভুলের পুনরাবৃত্তির' পুনর্মুদ্রণ। ৩. ঐ।
৪. ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, জুন, ১৯৫২। পৃষ্ঠা ৮।
৫. নওবেলাল: ১৯. ২. ৪৮। 'ভুলের পুনরাবৃত্তি' ৬. ঐ।
৭. আবুল কাসেম: ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস। ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭। পৃষ্ঠা ১৭। ৮. নওবেলাল: ২২.১.৪৮। ১১.৩.৪৮, আবুল কাসেমের পত্র। ৯. নওবেলাল: ৮. ১. ৪৮। ১০. ঐ।
১১. ঐ: ৫. ২ ৪৮। ১২. ঐ: ২৯. ১. ৪৮। ১৩. ঐ: ৫. ২. ৪৮।
১৪. ঐ: ২৯.১.৪৮। ১৫. ঐ: ২৬.২.৪৮। ১৬. ঐ: ১১.৩.৪৮।
১৭. ঐ: ২৬. ২. ৪৮। ১৮. অধ্যাপক কাজী কমরুজ্জমান: ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, ফেব্রুয়ারি '৬৭, পৃষ্ঠা ৩৬। এই উদ্ধৃতিতে যে বানান ব্যবহার করা হয়েছে সেটা প্রবন্ধকারের। এক্ষেত্রে তিনি তমদ্দুন মজলিস এবং বাংলা কলেজের বানান পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন।

১১ ॥ কর্মী নির্যাতন

১. আবুল কাসেম: ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, ফেব্রুয়ারি '৬৭। পৃষ্ঠা ২০।

২. ঐ। পৃষ্ঠা ২১ ৩. ঐ। পৃষ্ঠা ২০ ৪. কাজী গোলাম মাহবুব।
৫. Farid Ahmed—Before the Twenty First. ৬. ঐ।
৭. মহম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, তাজউদ্দীন আহমদ, আবুল কাসেম, কমরুদ্দীন আহমদ। ৮. মহাম্মদ তোয়াহা, তাজউদ্দীন আহমদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ প্রথম রাজনৈতিক সংগ্রাম

১ ॥ গণ-পরিষদের ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব

১. আনন্দবাজার পত্রিকা : ২৬.২.৪৮ ; Amritabazar Patrika 27.2.48
২. Amrita Bazar Patrika (Town Ed.)—27. 2. 48
৩. নওবেলাল—৪. ৩. '৪৮ ৪. Patrika—27. 2. 48 ৫. ঐ।
৬. নওবেলাল—৪. ৩. ৪৮ ৭. ঐ। সম্পাদকীয়।

২ ॥ সংবাপত্রে সমালোচনা

১. দৈনিক ইত্তেহাদ : ১৭.২.৪৮

৩ ॥ সভা ও সাংগঠনিক উদ্যোগ

১. নওবেলাল—৪. ৩. ৪৮ ২. ঐ। আনন্দবাজার পত্রিকা (শেষ শহর সংস্করণ) : ২৭. ২. ৪৮ ৩. Amrita Bazar Patrika : 26. 2. 48 নওবেলাল—৪. ৩. ৪৮ ৪. আনন্দবাজার পত্রিকা (শেষ শহর সংস্করণ) : ২৭. ২. ১৯৪৮ ৫. তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরি—২. ৩. ৪৮ ৬. ঐ।
৭. ঐ। ৮. অলি আহাদ, কমরুদ্দীন আহমদ, তাজউদ্দীন আহমদ।
৯. অজিত গুহ ১০. ঐ। ১১. নওবেলাল—৪. ৩. ৪৮
১২. তাজউদ্দিনের ডায়েরি—৪. ৩. ৪৮ ও ৫.৩.৪৮ ১৩. ঐ। ৭.৩.৪৮

৪ ॥ সিলেটে প্রতিক্রিয়াশীলদের হামলা

১. ঘটনার পূর্ণ বিবরণ : নওবেলাল—১১. ৩. ৪৮ ২. ঐ।
৩. ঐ। ৪. ঐ। ৫. ঐ।

৫ ॥ ১১ই মার্চের সাধারণ ধর্মঘট

১. অলি আহাদ ২. ঐ। ৩. ঐ। ৪. অলি আহাদ, তাজউদ্দীন

আহমদ ৫. তাজউদ্দীন আহমদ ৬. তাজউদ্দীন, অলি আহাদ
৭. ঐ। ৮. তাজউদ্দীন আহমদ ৯. মহম্মদ তোয়াহা, তাজউদ্দীন আহমদ
১০. Amrita Bazar Patrika—12.3.48 ১১. Friends Not Masters by Mohammad Ayub Khan. P. 30
১২. Patrika—12.3.48 ১৩. ঐ। ১৪. শওকত আলী, মহম্মদ তোয়াহা ১৫. শওকত আলী ১৬. ঐ।
১৭. Amrita Bazar Patrika—12.3.48 ১৮. তোয়াহা, কমরুদ্দীন আহমদ ১৯. ঐ। ২০. তোয়াহা। ২১. ঐ। ২২. ঐ।
২৩. Amrita Bazar Patrika—12.3.48 ২৪. নওবেলাল—২৫.৩.৪৮
২৫. ঐ। ২৬. আবুল কাসেম। ২৭. জিয়াউল হক, সুলতানুজ্জামান
২৮. আতাউর রহমান। ২৯. এখানে যশোরের ঘটনার পূর্ণ বিবরণ হামিদা রহমান ও মজিদ খান থেকে প্রাপ্ত।

৬ ॥ ১১ই মার্চের নির্যাতনের প্রতিবাদ

১. Amrita Bazar Patrika—13.3.48 ২. ঐ। ৩. ঐ।
৪. কমরুদ্দীন আহমদ, তাজউদ্দীন আহমদ ৫. Patrika—13.3.48 (৭৯ পাতায় তারিখে ভুল আছে। সংবাদটি ১৩.৩.৪৮ তারিখে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়) ৬. ঐ—14.3.48 ৭. ঐ।
৮. নওবেলাল—১৯.৩.৪৮ ৯. তাজউদ্দীনের ডায়েরি—১৪.৩.৪৮; Amrita Bazar Patrika—16.3.48 ১০. আবদুল জাব্বার খদ্দর, তফজ্জল আলী।

৭ ॥ চুক্তি স্বাক্ষর ও পূর্ব বাঙলা ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশন

১. তোয়াহা, তাজউদ্দীন। ২. ঐ। ৩. তাজউদ্দীনের ডায়েরি—১৪.৩.৪৮।
৪. তাজউদ্দীন, তোয়াহা। ৫. ঐ। ৬. ডক্টর করিম, তাজউদ্দীন আহমদ।
৭. ডায়েরি—১৫.৩.৪৮ ৮. ঐ। ৯. কমরুদ্দীন আহমদ ১০. ঐ।
১১. তোয়াহা এর পূর্বে হাসপাতাল থেকে বাইরে আসেন—মহম্মদ তোয়াহা।
১২. আবদুর রহমান চৌধুরীর উপস্থিতির কথা আবদুর রহমান চৌধুরী ও আবুল কাসেম ব্যতীত অন্য কেউ স্মরণ করতে পারেন না।
১৩. কমরুদ্দীন আহমদ, আবুল কাসেম। ১৪. ঐ। ১৫. ঐ।
১৬. ঐ। ১৭. ঐ। ১৮. East Bengal Assembly

Proceedings Vol. No. I. Amrita Bazar Patrika 16.3.48.

১৯. অলি আহাদ, শেখ মুজিবর রহমান, মহম্মদ তোয়াহা, শওকত আলী, কমরুদ্দীন আহমদ। ২০. আবুল কাসেম, মহম্মদ তোয়াহা।

২১. মহম্মদ তোয়াহা, আবুল কাসেম। ২২. তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরি—১৫.৩.৪৮। ২৩. ঐ।

৮ ॥ পরিষদের অভ্যন্তরে

১. E. B. Assembly Proceedings, 15.3.48 Vol. I No. I.

২. ঐ। ৩. ঐ। ৪. ঐ। ৫. ঐ। ৬. ঐ। ৭. ঐ।

৮. Friends Not Masters, Ayub Khan P. 28-29. ৯. ঐ। P. 29. ১০. E. B. Assembly Proceedings, 15.3.48. Vol. I No. 1. ১১. ঐ। ১২. ঐ। ১৩. ঐ।

১৪. আবুল কাসেম, তাজউদ্দীন, শওকত আলী।

১৫. Friends Not Masters, Ayub Khan P. 29.

১৬. ঐ। P. 29 ; মহম্মদ তোয়াহা, কমরুদ্দীন।

১৭. ঐ। P. 30। ১৮. ঐ।

৯ ॥ বন্দীমুক্তি ও পরবর্তী বিক্ষোভ

১. মহম্মদ তোয়াহা, শওকত আলী। ২. মহম্মদ তোয়াহা, রণেশ দাশগুপ্ত। ৩. ঐ। ৪. শেখ মুজিবর রহমান, তোয়াহা, শওকত আলী, অলি আহাদ। ৫. শওকত আলী।

৬. মোহন মিঞা, আবদুল জব্বার খদ্দর। ৭. তাজউদ্দীন আহমদ, তোয়াহা। ৮. তাজউদ্দীনের ডায়েরি—১৬.৩.৪৮।

৯. কমরুদ্দীন আহমদ, তফজ্জল আলী। ১০. তোয়াহা, তাজউদ্দীন আহমদ। ১১. ঐ। ১২. Amrita Bazar Patrika—17.3.48. ১৩. ডায়েরি—১৬.৩.৪৮। ১৪. তোয়াহা, তাজউদ্দীন আহমদ। ১৫. ঐ। ১৬. তোয়াহা, তাজউদ্দীন, শামসুদ্দীন আহমদ। ১৭. তাজউদ্দীন আহমদ। ১৮. শওকত আলী। ১৯. ঐ। ২০. শামসুদ্দীন আহমদ, শওকত আলী, তোয়াহা। তাজউদ্দীনের ডায়েরি ১৬.৩.৪৮। ২১. শওকত আলী।

২২. Amrita Bazar Patrika—17.3.48.

২৩. ডায়েরি—১৬.৩.৪৮। ২৪. ঐ। ২৫. ঐ। ২৬. ঐ—১৭.৩.৪৮।

২৭. E. B. Assembly Proceedings 17.3.48, Vol. 1 No. 2
২৮. ঐ—17.3.48। ২৯. ঐ—24.3.48। ৩০. ঐ।
৩১. ঐ। ৩২. ডায়েরি—১৭.৩.৪৮। ৩৩. ঐ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ পূর্ব বাঙলায় কায়েদে আজম

১ ॥ মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী পার্টি

১. আজাদ—৬.৮.৪৭ (৯৯ পৃঃ ভুলবশতঃ জুলাই লেখা হয়েছে)।
২. ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিঞা)
৩. মোহন মিঞা, শাহ্ আজিজুর রহমান, মাহমুদ আলী।
৪. মাহমুদ আলী। ৫। নওবেলাল—৮.৪.৪৮।
৬. মোহন মিঞা, মাহমুদ আলী, শাহ্ আজিজুর রহমান।
৭. লেখকের কাছে এক সাক্ষাৎকারে। ৮. মোহন মিঞা, শাহ্ আজিজ।
৯. তাজউদ্দীন আহমদ, তোয়াহা, কমরুদ্দীন আহমদ।
১০. শেখ মুজিবর রহমান, তাজউদ্দীন, কমরুদ্দীন আহমদ, শওকত আলী
১১. তাজউদ্দীনের ডায়েরি—২০.১২.৪৭। ১২। ঐ।
১৩. ঐ। ১৪. তাজউদ্দীন আহমদ, শেখ মুজিবর রহমান, অলি আহাদ।
১৫. ডায়েরি—২১.১২.৪৭। ১৬. ঐ। ১৭. ডায়েরি—২২.১২.৪৭; ডক্টর মালেক। ১৮. ডক্টর মালেক। ১৯. ঐ। ২০. ঐ।
২১. ডক্টর মালেক, তফজ্জল আলী। ২২. ডক্টর মালেক। ২৩. তফজ্জল আলী। ২৪. কমরুদ্দীন আহমদ। ২৫. লেখকের কাছে সাক্ষাৎকারে। ২৬. ঐ। ২৭. তফজ্জল আলী। ২৮. খয়রাত হোসেন, মোহন মিঞা। ২৯. Amrita Bazar Patrika 16.3.48

২ ॥ কায়েদে আজমের ঢাকা আগমন ও রেসকোর্সের বক্তৃতা

১. তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরি ১৯.৪.৪৮। ২. নওবেলাল—১৯.৩.৪৮।
৩. ডায়েরি—১৯.৩.৪৮। ৪. ঐ। ৫. Quaid-I-Azam Mohammad Ali Jinnah's Speeches as Governor General, Pakistan Publications, Karachi, P. 85-86.
৬. ঐ। P. 87-88 ৭. ঐ। P. 89 ৮. ঐ। ৯. ঐ। P. 89-90

১০. ঐ। P. 90 ১১. ঐ। P. 87 ১২. তাজউদ্দীন, শহীদুল্লাহ কায়সার, সালাহুদ্দীন আহমদ, অলি আহাদ, তোয়াহা, আবদুল মতিন। ১৩. ঐ। ১৪. ঐ। ১৫. তাজউদ্দীনের ডায়েরি—১৯.৩.৪৮ ; শহীদুল্লাহ কায়সার। ১৬. মহম্মদ তোয়াহা, শহীদুল্লাহ কায়সার।

৩ ॥ কায়েদে আজমের সমাবর্তন বক্তৃতা

১. Quaid-I-Azam's Speeches as Governor General P. 92

২. ঐ। P. 94 ৩. ঐ। P. 94-95 ৪. আবদুল মতিন, আবুল কাসেম ৫. ঐ। ৬. ঐ। P. 95 ৭. ঐ। ৮. ঐ। P. 96

৪ ॥ রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সাথে সাক্ষাৎকার

১. কমরুদ্দীন আহমদ, তোয়াহা, তাজউদ্দীন, আবুল কাসেম, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, অলি আহাদ। ২. ঐ।

৩. তোয়াহা, অলি আহাদ, তাজউদ্দীন। ৪. ঐ।

৫. আবুল কাসেম, তাজউদ্দীন আহমদ, তোয়াহা, অলি আহাদ, কমরুদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

৬. তোয়াহা, অলি আহাদ, তাজউদ্দীন, কমরুদ্দীন আহমদ।

৭. ঐ। ৮. ঐ। ৯. ঐ। ১০. ঐ। ১১. ঐ।

১২. কমরুদ্দীন আহমদ, তাজউদ্দীন আহমদ।
পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান গভর্নর ভাইস অ্যাডমিরাল আহসান তখন কায়েদে আজমের মিলিটারী সেক্রেটারী ছিলেন। ১৩. কমরুদ্দীন আহমদ, অলি আহাদ, তোয়াহা। ১৪. অলি আহাদ, মহম্মদ তোয়াহা, তাজউদ্দীন আহমদ, কমরুদ্দীন আহমদ, আবুল কাসেম।

১৫. ঐ। ১৬. ঐ। ১৭. ডায়েরি—২৪.৩.৪৮। ১৮. যুগান্তর—২.৪.৪৮।

৫ ॥ ছাত্র প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা

১. মহম্মদ তোয়াহা, সৈয়দ নজরুল ইসলাম। ২. ঐ। ৩. তোয়াহা।

৪. তোয়াহা, সৈয়দ নজরুল ইসলাম। ৫. ঐ।

৬. তোয়াহা, নজরুল ইসলাম, কমরুদ্দীন আহমদ।

৭. তোয়াহা। সৈয়দ নজরুল ইসলাম শুধু এইটুকু স্মরণ করতে পারেন

যে দ্বিতীয়বার তাঁদের দুজনকে ভিতরে ডেকে নেওয়া হয়েছিল।

৮. ঐ। ৯. ঐ। ১০. তোয়াহা ১১. ঐ। ১২. শাহ আজিজুর রহমান। ১৩. তোয়াহা। ১৪. ঐ। ১৫. শাহ আজিজুর রহমান।

১৬. তোয়াহা, শাহ আজিজুর রহমান। ১৭. তোয়াহা, শাহ আজিজ।

১৮. তোয়াহা। ১৯. ডায়েরি—২৪.৩.৪৮; তোয়াহা, শাহ আজিজ, আবদুর রহমান চৌধুরী। ২০. তোয়াহা, আবদুর রহমান চৌধুরী।

২১. তোয়াহা। ২২. তোয়াহা, আবদুর রহমান চৌধুরী।

২৩. তোয়াহা, শাহ আজিজ, আবদুর রহমান চৌধুরী। ২৪. ঐ।

২৫. তোয়াহা। ২৬ তোয়াহা, আবদুর রহমান চৌধুরী।

২৭. তোয়াহা, শাহ আজিজ, আবদুর রহমান চৌধুরী।

২৮. তোয়াহা, আবদুর রহমান চৌধুরী। ২৯. ঐ।

৩০. তোয়াহা। ৩১. তোয়াহা, আবদুর রহমান চৌধুরী।

৩২. আবদুর রহমান চৌধুরী, শহীদুল্লাহ কায়সার।

৩৩. তোয়াহা, আবদুর রহমান চৌধুরী। ৩৪, তোয়াহা।

৩৫. ঐ। ৩৬. ঐ। ৩৭ তোয়াহা, আবদুর রহমান চৌধুরী।

৬ ॥ কায়েদে আজমের বিদায়বাণী ও পূর্ব বাঙলা সফরের ফলাফল

১. Quid-I-Azam Mohammad Ali Zinnah. Speeches as Governor General. P. 107. ২. ঐ। p. 109-10.

৩. ডক্টর মালেক, তফজ্জল আলী, কমরুদ্দীন আহমদ। ৪. ঐ।

৫. ডক্টর মালেক। ৬. ঐ। . তাজউদ্দীন আহমদ।

৮. তোয়াহা, কমরুদ্দীন আহমদ, আবুল কাসেম। ৯. ঐ।

১০. তোয়াহা। ১১. ঐ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ নাজিমুদ্দীন সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা

১ ॥ ব্যবস্থাপক সভায় খাজা নাজিমুদ্দীনের সরকারী প্রস্তাব

১. East Bengal Legislative Asaembly Proceedings. Vol I. No. 4. Thursday, the 6.4.48. P. 57. ২. ঐ। P. 58

৩. ঐ। ৪. ঐ। Tuesday, 8.4.48. P. 134-35

২॥ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সংশোধনী প্রস্তাব

১. East Bengal Legislative Assembly Proceedings Vol. I. No. 4. Thursday, 8.4.48. P. 135. ২. ঐ।
৩. ঐ। ৪. ঐ। ৫. ঐ। P. 136 ৬. ঐ। ৭. ঐ।
৮. ঐ। ৯. P. 136-37 ১০. ঐ। P. 137 ১১. ঐ।
১২. ঐ। P. 137-38 ১৩. ঐ। P. 138 ১৪. ঐ।
১৫. ঐ। P. 138-39

৩॥ অন্যান্য সংশোধনী প্রস্তাব

১. East Bengal Legislative Assembly Proceedings. Vol I No. 4. Thursday, 8.4.48. P. 139-40.

২. ঐ। P. 140 ৩. ঐ। P. 140-41
৪. ঐ। P. 141 ৫. ঐ।
৬. ঐ। ৭. ঐ। P. 142
৮. ঐ। P. 143 ৯. ঐ।
১০. ঐ। ১১. ঐ।
১২. ঐ। ১৩. ঐ।
১৪. ঐ। P. 144 ১৫. ঐ। ১৬. ঐ।
১৭. ঐ। ১৮. ঐ। ১৯. ঐ। P. 144-45
২০. ঐ। P. 145 ২১. ঐ। P. 146
২২. ঐ। P. 147 ২৩. ঐ।
২৪. ঐ। P. 148 ২৫. ঐ। P. 148-49
২৬. ঐ। P. 149 ২৭. ঐ। P. 150
২৮. ঐ। P. 150 ২৯. ঐ। P. 151
৩০. ঐ। P. 151-52 ৩১. ঐ। P. 152
৩২. ঐ। P. 153-54 ৩৩. ঐ। P. 154
৩৪. ঐ। P. 155-56 ৩৫. ঐ। P. 157
৩৬. ঐ। P. 157-58 ৩৭. ঐ। P. 158
৩৮. ঐ। P. 158 ৩৯. ঐ। P. 159
৪০. ঐ। ৪১. ঐ। P. 159-61

৪ ॥ বিতর্কের জবাবে নাজিমুদ্দীনের বক্তৃতা

১. East Bengal Legislative Assembly Proceedings. Vol. I No. 4 Thursday, 8.4.48. P. 161.
২. ঐ। ৩. ঐ। P. 162
৪. ঐ। P. 162-63 ৫. ঐ। P. 163
৬. ঐ। ৭. ঐ। P. 164
৮. ঐ। ৯. ঐ।
১০. ঐ। P. 165 ১১. ঐ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥ ভাষা আন্দোলন-উত্তর ঘটনাপ্রবাহ—১৯৪৮

১ ॥ সাধারণ অসন্তোষ ও সরকারী নীতি

১. তাজউদ্দীন আহম্মদের ডায়েরি—২৭.৪.৪৮
২. নওবেলাল—২২.৪.৪৮ ৩. ডায়েরি—২৭.৪.৪৮
৪. ডায়েরি—২৬.৪.৪৮ ৫. নওবেলাল—৬.৫.৪৮
৬. আজাদ—১০.১২.৪৮ ৭. আজাদ—১০.৬.৪৮
৮. আজাদ—১.৭.৪৮ ৯. ঐ ১০. ডায়েরি—১৪.৭.৪৮
১১. আজাদ—১৫.৭.৪৮ ১২. নওবেলাল—২৬.৮.৪৮
১৩. আজাদ—১৯.১১.৪৮, ২০.১১.৪৮ ১৪. আজাদ—১৯.১১.৪৮
১৫. আজাদ—২০.১১.৪৮ ১৬. আজাদ—২১.১১.৪৮
১৭. ঐ। ১৮. নওবেলাল—৯.১২.৪৮ ১৯. ঐ।
২০. আজাদ—২৭.১১.৪৮ ২১. ডায়েরি—২৭.১২.৪৮ ২২. ঐ।
২৩. ডায়েরি—২৭.১২.৪৮ ; কমরুদ্দীন আহম্মদ ২৪. কমরুদ্দীন আহম্মদ

২ ॥ ঢাকা শহরে ব্যাপক ছাত্রী বিক্ষোভ

১. আজাদ—১৬.১১.৪৮ ২. ঐ। ৩. ঐ। ১৮.১১.৪৮
৪. ঐ। ২৫.১৬.৪৮ ৫. ঐ। ৬. ঐ। ২০.১১.৪৮
৭. ঐ। ২৫.১১.৪৮ ৮. ঐ। ৯. ঐ। ২৬.১১.৪৮
১০. ঐ। ১১. ঐ। ১২. ঐ। ১৩. ঐ।
১৪. আজাদ—২৬.১১.৪৮ ১৫. ঐ। ২৭.১১.৪৮

১৬. ঐ। ১৭. ডায়েরি—২৭.১১..৮ ১৮. আজাদ—১.১২.৪৮
১৯. ঐ। ২.১২.৪৮ ২০. ঐ। ৪.১২.৪৮ ২১. ঐ। ৭.১২.৪৮

৩ ॥ পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন

১. অজিত গুহ, সৈয়দ আলী আহসান ২. আজাদ—৭.১২.৪৮
৩. ঐ। ৮.১২.৪৮ ৪. ঐ। ৫. ঐ। ৪.১২.৪৮
৬. অজিত গুহ ৭. অজিত গুহ, মুনীর চৌধুরী ৮. ঐ।
৯. এই সভার বিবরণ মূলতঃ অজিত গুহের থেকে প্রাপ্ত।
১০. অজিত গুহ ১১. ঐ। ১২. আজাদ—১.১.৪৯
১৩. ঐ। ১৪. শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা গ্রন্থ : মুহম্মদ সফিউল্লাহ্ সম্পাদিত। রেনেসাঁস প্রিণ্টার্স। মার্চ ১৯৬৭ পৃষ্ঠা : ৪১
১৫. ঐ। পৃষ্ঠা : ৪৫ ১৬. ঐ। পৃষ্ঠা : ৪৬
১৭. ঐ। পৃষ্ঠা : ৫৭ ১৮. আজাদ—১.১.৪৯
ডক্টর শহীদুল্লাহর অভিভাষণের এই অংশটি সবর্ধনা গ্রন্থে মুদ্রিত অভিভাষণের মধ্যে নেই। ডক্টর শহীদুল্লাহর জ্যেষ্ঠপুত্র এবং সংবর্ধনা গ্রন্থের সম্পাদক সফিউল্লাহ সাহেবকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি আমাকে বলেন যে ডক্টর শহীদুল্লাহর নির্দেশক্রমেই এই অংশটি তিনি বাদ দেন।—লেখক।
১৯. অজিত গুহ, সৈয়দ আলী আহসান। ২০. ঐ।
২১. অজিত গুহ ২২. অজিত গুহ, সৈয়দ আলী আহসান
২৩. অজিত গুহ ২৪. সৈয়দ আলী আহসান
২৫. সৈনিক—৯.১.৪৯ ২৬. সৈয়দ আলী আহসান
২৭. ঐ। ২৮. সৈনিক—৯.১.৪৯ ২৯. ঐ।
৩০. পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেসন, ১৯৫৪। উদ্বোধনী ভাষণ : ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আন্দোলনের অগ্রগতি

১ ॥ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ

১. মহম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, আবদুল মতিন (পাবনা)
২. ঐ। ৩. ঐ। ৪. আবদুল মতিন।
৫. ঐ। ৬. ঐ। ৭. সৈনিক। ৯.৯.৪৯

২ ॥ অসাম্প্রদায়িক ছাত্র রাজনীতি

1. Pakistan Student's Rally. Aims, Objects and Programme, Draft Constitution. Printed and Published by Md. Golam Kibrra at the Banijja Barta Press, Comilla.

২. ঐ। পৃষ্ঠা. ৫ ৩. ঐ। পৃষ্ঠা. ১০

৪. অলি আহাদ। এবং তাজউদ্দীনের ডায়েরি ২৮.১.৪৯—১৬.২.৪৯

৫. নওবেলাল। ২০.১.৪৯। ৬. তাজউদ্দীনের ডায়েরি। ৮.১.৪৯।

৭. নওবেলাল। ২০.১.৪৯ ৮. ঐ। ২৩.২.৪৯ ৯. ঐ। ৩১.৩.৪৯

৩ ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিম্ন-কর্মচারী ধর্মঘট

১. নওবেলাল ২৪.৩.৪৯। ২. ঐ।

৩. তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরি। ৫.৩.৪৯

৪. নওবেলাল। ২৪.৩.৪৯। ৫. ডায়েরি। ৫.৩.৪৯

৬. নওবেলাল। ২৪.৩.৪৯ ৭. ঐ। ৮. ঐ। ৯. ঐ।

১০. ডায়েরি। ৯.৩.৪৯। ১১. নওবেলাল। ২৪.৩.৪৯

১২. ডায়েরি। ৯.৩.৪৯। ১৩. ঐ।

১৪. নওবেলাল। ২৪.৩.৪৯ ১৫. ডায়েরি। ৯.৩.৪৯। নওবেলাল ২৪.৩.৪৯

১৬. নওবেলাল। ২৪.৩.৪৯। ১৭. ঐ ১৮. ডায়েরি। ১১.৩.৪৯। নওবেলাল। ১৭.৩.৪৯ এবং ২৪.৩.৪৯ ১৯. ডায়েরি। ১০.৩.৪৯ এবং নওবেলাল ঐ। ২০. ডায়েরি। ১০.৩.৪৯ ২১. ঐ।

২২. ঐ। ১১.৩.৪৯। ২৩. ঐ। ২৪. ঐ। ২৫. নওবেলাল ২৪.৩.৪৯

২৬. ডায়েরি। ১২.৩.৪৯ ২৭. ঐ। ২৮. নওবেলাল। ২৪.৩.৪৯

২৯. ঐ। ১৭.৩.৪৯ ৩০. ডায়েরি। ১৩.৩.৪৯ ৩১. ঐ। ১৪.৩.৪৯

৩২. নওবেলাল। ১৭.৩.৪৯ ৩৩. ঐ। ১৪.৪.৪৯ ৩৪. ঐ

৩৫. সৈনিক। ১৫.৪.৪৯ ৩৬. সত্যযুগ। ৪.৪.৪৯। The Statesman, 4.4.49 ও সৈনিক ১৫.৪.৪৯ ৩৭. অলি আহাদ।

৪ ॥ আন্দোলনের নোতুন পর্যায়

১. নওবেলাল। ৫.৫.৪৯ ২. ঐ। ৩. ঐ। ৪. ঐ। ৫. ঐ।

৬. তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরি। ১৮.৪.৪৯ ৭. নওবেলাল। ৫.৫.৪৯

৮. ঐ। এবং ডায়েরি। ১৮.৪.৪৯ ৯. ডায়েরি ১৮.৪.৪৯
১০. নওবেলাল ৫.৫.৪৯ ১১. ডায়েরি ১৮.৪.৪৯ ১২. ঐ।
১৩. নওবেলাল। ৫.৫.৪৯ ১৪. ডায়েরি। ১৯.৪.৪৯ ১৫. ঐ
১৬. ঐ। এবং নওবেলাল। ৫.৫.৪৯ ১৭. নওবেলাল। ৫.৫.৪৯
১৮. ঐ। এবং ডায়েরি। ২০.৫.৪৯ ১৯. নওবেলাল। ৫.৫.৪৯
২০. ঐ। ২১. ঐ। ২২. ঐ। এবং ডায়েরি। ২০.৪.৪৯
২৩. নওবেলাল। ৫.৫.৪৯ ২৪. ডায়েরি ২০.৪.৪৯ ২৫. ঐ।
২৬. ঐ ২৭. ঐ। ২৮. নওবেলাল ৫.৫.৪৯। এবং ডায়েরি ২৪.৪.৪৯
২৯. ডায়েরি। ২৫.৪.৪৯ ৩০. ঐ। ৩১. নওবেলাল। ৫.৫.৪৯
৩২. ঐ। এবং ডায়েরি। ২৫.৪.৪৯ ৩৩. ঐ। ৩৪. ঐ।
৩৫. ডায়েরি। ২৫.৫.৪৯ ৩৬. নওবেলাল। ৫.৫.৪৯ এবং ডায়েরি। ২৫.৫.৪৯ ৩৭. ডায়েরি। ২৫.৫.৪৯ ৩৮. ঐ। ২৬.৪.৪৯—৩.৫.৪৯ ৩৯. নওবেলাল। ২১.৪ ও ১২.৫.৪৯।
৪০. সৈনিক। ২২.৪.৪৯। ৪১. নওবেলাল। ২৬.৫.৪৯।
৪২. ডায়েরি। ৭.৬.৪৯—১৫.৬.৪৯ ৪৩. নওবেলাল। ৯.৬.৪৯।
৪৪. ডায়েরি ২১.১.৫০

সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের উত্থান

১ ॥ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ

1. Proceedings of the Annual Meeting of Bengal Provincial Muslim League, 1943.
2. Annual Report of the Bengal Provincial Muslim League, Branch Office, Dacca. 1944 by Shamsul Huq, Worker-in-charge. P. 1 ৩. ঐ। P. 1-2
৪. আবুল হাশিম, শামসুদ্দীন আহমদ, কমরুদ্দীন আহমদ।
৫. Draft Manifesto of the Bengal Provincial Muslim League by Abul Hashim, Secretary, Bengal Provincial Muslim League. Published by Shamsuddin Ahmad, Purba Pakistan Publishing House 150, Mogaltuli. P. 4.

৬. ঐ। P. 5 ৭. ঐ। ৮. ঐ। ৯. ঐ। P. 5-6
১০. ঐ। P. 6 ১১. ঐ। ১২. ঐ। P. 6-7 ১৩. ঐ। P. 7
১৪. ঐ। ১৫. ঐ। P. 8 ১৬. ঐ। P. 12
১৭. আবুল হাশিম। ১৮. আবুল হাশিম, কমরুদ্দীন আহম্মদ।

২ ॥ মোগলটুলীর শাখা অফিস

১। কমরুদ্দীন আহমদ ও তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরির বিভিন্ন অংশ, ১৯৪৭-৪৯।

৩ ॥ টাঙ্গাইল উপনির্বাচন

১. নওবেলাল ৫.৫.৪৯ ২. শওকত আলী। ৩. ঐ। ৪. ঐ।
৫. কমরুদ্দীন আহম্মদ, মোস্তাক আহমদ। ৬. কমরুদ্দীন আহমদ।
৭. ঐ। ৮. শওকত আলী, মোস্তাক আহম্মদ ৯. মোস্তাক আহমদ।
১০. আজাদ। ২০.৪।৪৯ ১১। আজাদ। ২৩।৩।৪৯।
১২. আজাদ। ২.৫.৪৯। ১৩. মোস্তাক আহম্মদ। ১৪. ঐ।
১৫. কমরুদ্দীন আহমদ, মোস্তাক আহমদ। ১৬. আজাদ। ৩.৫.৫০।
১৭. কমরুদ্দীন আহমদ। ১৮. ঐ। ১৯. ঐ।
২০. নওবেলাল। ২৭.৭.৫০। ২১। নওবেলাল। ২.৬.৪৯।

৪ ॥ মুসলিম লীগের আভ্যন্তরীণ সংকট

১. নওবেলাল। ৯.৬.৪৯ ২. ঐ। ১৬.৬.৪৯ ৩. সৈনিক। ২৪.৬.৪৯
৪. আজাদ। ৯.৬.৪৯ ৫. নওবেলাল। ২৩.৭.৪৯ ৬. আজাদ।
৭. ঐ. ৮. আজাদ ১৯.৬.৪৯ ও নওবেলাল। ২৩.৬.৪৯.
৯. আজাদ। ১৯.৬.৪৯. নওবেলাল ২৩.৬.৪৯. সৈনিক ২৪.৬.৪৯
১০. আজাদ। ১৯.৬.৪৯. ১১. ঐ। ১২. ঐ। ১৩. ঐ।
১৪. সৈনিক। ১৯.৬.৪৯. ১৫. ঐ। ১৬. আজাদ। ১৯.৬.৪৯
১৭. ঐ। ১৮. ঐ। ১৯. সৈনিক। ২৪.৬.৪৯. ২০. আজাদ। ১৬.৬.৪৯
২১. ঐ। ২২. ঐ এবং নওবেলাল, ২৩.৬.৪৯. ২৩. আজাদ। ১৯.৬.৪৯. সৈনিক। ২৪.৬.৪৯ ২৪. সৈনিক। ২৪.৬.৪৯.
২৫. ঐ। ২৬. ঐ। ২৭. আজাদ, ১৯.৬.৪৯. ২৮. সৈনিক ২৪.৬.৪৯ ২৯. ঐ। ৩০. ঐ। ৩১. ঐ। ৩২. ঐ

৩৩. আজাদ। ২০.৬.৪৯. ৩৪. দৈনিক আজাদ ২০.৬.৪৯ ৩৫. ঐ।
৩৬. ঐ। ৩৭. ঐ। ৩৮. ঐ। এবং নওবেলাল, ২৩.৬.৪৯
৩৯. নওবেলাল, ২৩.৬.৪৯। ৪০. ঐ। ৪১. ঐ। ৪২. আজাদ। ২০.৬.৪৯ ৪৩. সাপ্তাহিক সৈনিক। ২০.৬.৪৯ ৪৪. নওবেলাল। ২৩.৬.৪৯ ৪৫. ঐ। ৪৬. ঐ। এবং সৈনিক, ২৪.৬.৪৯.
৪৭. নওবেলাল। ২৩.৬.৪৯

৫ ॥ রোজ গার্ডেনের মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলন

১. শওকত আলী। ২. ঐ। ৩. ঐ। ৪. মুস্তাক আহমদ, শওকত আলী। ৫. ঐ। ৬. মুস্তাক আহমদ, শওকত আলী, কমরুদ্দীন আহমদ। ৭. শওকত আলী, মুস্তাক আহমদ।
৮. মুস্তাক আহমদ, শওকত আলী, খয়রাত হোসেন, আবদুল জব্বার খদ্দর, আবদুর রশিদ তর্কবাকীশ। ৯. শওকত আলী।
১০. শওকত আলী, আবদুল জব্বার খদ্দর, মুস্তাক আহমদ, আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ। এবং নওবেলাল, ৭.৬.৪৯ ১১. নওবেলাল, ৭.৭.৪৯
১২. শওকত আলী, মুস্তাক আহমদ। মূল দাবী এবং 'আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম খসড়া ম্যানিফেস্টো' এ ব্যাপারে তুলনীয়।
১৩. নওবেলাল, ৭.৭.৪৯ ১৪. ঐ। ১৫. শওকত আলী।
১৬. শওকত আলী, মুস্তাক আহমদ। ১৭. শওকত আলী।
১৮. তাজউদ্দীনের ডায়েরি। ২৪.৬.৪৯

৬ ॥ শামসুল হকের প্রস্তাব এবং আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম ম্যানিফেস্টো

১. মূল দাবী—পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলনে বিবেচনার জন্য প্রস্তাবক : শামসুল হক এম. এল. এ. পৃষ্ঠা, ১। ২. আবুল হাশিম, বদরুদ্দীন উমর। ৩. মূল দাবী। পৃষ্ঠা, ৭। ৪. ঐ। পৃষ্ঠা, ১০-১১। ৫. ঐ। পৃষ্ঠা, ১১-১২। ৬. ঐ। পৃষ্ঠা, ১৪।
৭. ঐ। পৃষ্ঠা, ২৪-২৫। ৮. ঐ। পৃষ্ঠা, ২৭-২৮। ৯. ঐ। পৃষ্ঠা, ৩০-৩১।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥ আরবী হরফ প্রবর্তনের ষড়যন্ত্র

১ ॥ ফজলুর রহমানের উদ্যোগ

১. আজাদ। ২৮.১২.৪৮ ২. ঐ। ১২.৩.৪৯ এ বইয়ের ১৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ৪. সৈয়দ আলী আহসান। ৫. ঐ। ৬. ঐ। ৭. Report E. B. Language Committee, 49. P. 112 ৮. কবি গোলাম মোস্তাফা। বাংলা একাডেমী : বর্ধমান হাউস, ঢাকা। ডিসেম্বর '৬৭। পৃষ্ঠা : ৭৮-৭৯

২ ॥ কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

১. নওবেলাল। ৭.৪.৪৯ ২. সৈনিক। ৮. ৪. ৪৯। ৩. নওবেলাল। ৭.৪.৪৯ ও সৈনিক ৮.৪.৪৯ ৪. সৈনিক। ১১.৩.৪৯ ও তাজউদ্দীনের ডায়েরি, ৪.৩.৪৯। ৫. পূর্ণ বিবরণ : সৈনিক, ২২.৪.৪৯ ৬. আজাদ। ১০.১২.৪৯। ৭। ঐ। ৮. আজাদ। ১২.১২.৪৯ ৯. ঐ। ১০. ঐ। ১১. ঐ। ১২. ঐ। ১৩. আজাদ। ১৪. ১২. ৪৯ ১৪. আজাদ। ১৫. ১২. ৪৯। ১৫. ঐ। ১৬. আজাদ। ১৭. ১২. ৪৯। ১৭. আজাদ। ১৭. ২. ৫০।

৩ ॥ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আরবী হরফ প্রচলনের উদ্যোগ

১. আজাদ। ২৪. ৫. ৫০ ২. ঐ। ৩. ঐ। ৪. ঐ। ৫. আজাদ। ৪. ১০. ৫০ ৬. আজাদ। ১২. ১০. ৫০। ৭. আজাদ। ২০. ৯. ৫১ ৮. ঐ। ৯. আজাদ। ২৫. ৯. ৫১

৪ ॥ আরবীকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব

১. এই বইয়ের পৃষ্ঠা ৫ দ্রষ্টব্য। ১. আজাদ। ২৭. ১২. ৪৯। ৩. আজাদ। ২৩. ১. ৫০ ৪. আজাদ। ২৯. ৪. ৫০ ৫. আজাদ। ১০. ২. ৫১ ৬. আজাদ। ১২. ২. ৫১

নবম পরিচ্ছেদ ॥ পূর্ব বাঙলা ভাষা কমিটি

১ ॥ পূর্ব বাঙলা ভাষা কমিটির প্রতিষ্ঠা

১. Report of the E. B. Language Committee, 1946. Officer

on Special Duty (Home Dept.) East Pakistan Govt. Press, Dacca. P. 2 ২. Report. পৃষ্ঠা : ২ ৩. ঐ। পৃষ্ঠা : ২-৩ ৪. ঐ। পৃষ্ঠা : ৩ ৫. ঐ। ৬. ঐ। ৭. ঐ।
৮. ঐ। পৃষ্ঠা : ৪ ৯. কবি গোলাম মোস্তফা। সংগ্রহ ও সম্পাদনা ফিরোজা খাতুন। বাংলা একাডেমী। ডিসেম্বর '৭১। পৃষ্ঠা : ৭৮ ১০. ঐ। পৃষ্ঠা : ৭৯ ১১. ঐ। পৃষ্ঠা : ৫২
১২. Report। পৃষ্ঠা : ৪

২ ॥ কমিটির কার্যপ্রণালী

১. Report। পৃষ্ঠা : ৫ ২. ঐ। ৩. ঐ। ৪. ঐ। পৃষ্ঠা : ৬। ৫. ঐ।

৩ ॥ ভাষা কমিটির বৈঠক

১. Report। পৃষ্ঠা : ৭৩ ২. ঐ। ৩. ঐ। পৃষ্ঠা : ৭৫। ৪. ঐ। পৃষ্ঠা : ৭৬। ৫. ঐ। পৃষ্ঠা : ৭৭। ৬. ঐ। ৭. ঐ। ৮. ঐ। ৯. ঐ। পৃষ্ঠা : ৮০। ১০. ঐ। পৃষ্ঠা : ৮১। ১১. ঐ। পৃষ্ঠা : ১১২। ১২. ঐ। পৃষ্ঠা : ১১৫। ১৩. ঐ। পৃষ্ঠা : ৮৫। ১৪. ঐ। ১৫. ঐ। পৃষ্ঠা : ৮৬। ১৬. ঐ। পৃষ্ঠা : ৮৬-৮৭। ১৭. ঐ। পৃষ্ঠা : ৭। ১৮. ঐ। ১৯. ঐ। পৃষ্ঠা : ১০২-৩। ২০. ঐ। পৃষ্ঠা : ১২। ২১. ঐ। পৃষ্ঠা : ১৫। ২২. ঐ। পৃষ্ঠা : ১৪। ২৩. ঐ।

দশম পরিচ্ছেদ ॥ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস ও পরবর্তী পর্যায়

১ ॥ মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদ ও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি

১. "Statement of Policy", Peoples Age, V (June 29, 1947) P. 6-7 ২. ঐ।
৩. ঐ। Quoted in 'Communism in India' by Gene D. Overstreet and Marshall Windmiller. P. 260 University of California Press. 1959 ৪. ঐ।

৫. Peoples Age : Supplement, VI (21, 3. 48) P. 4
৬. R. Palme Dutta., "The Mountbatten Plan for India, Labour Monthly, XXIX (July, 1947), P. 210-219 Referred in 'Communism in India', P. 262
৭. Peoples Age, VI (3.8.47, Pp. 1, 16
৮. Peoples Age (14.9.47), P. 1
৯. ঐ। 21.9.47. p. 4 ১০. রক্তক্ষয়ী পাঞ্জাব। ধন্বন্তরী ও পূরণচন্দ্র যোশী। ২২'১০.৪৭। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি। পৃষ্ঠা : ৪৫ অনুবাদ—প্রমথ চক্রবর্তী।
১১. ঐ। পৃষ্ঠা : ৪৬। ১২. ঐ। পৃষ্ঠা : ৫৩-৫৪।
১৩. ঐ। ১৪. ঐ। পৃষ্ঠা : ৬০। ১৫. Peoples Age : Supplement, VI 21.3.48) P. 4 ১৬. Peoples Age, VI (30.11.47), P. 10 ১৭. পূর্ব পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ, ভবানী সেন। পৃষ্ঠা : ৩-৪ ও পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি, ১৯৪৭।
১৮. Peoples Age 12.10.47 p. 5 ১৯. ঐ। 19.10 47 P. 1

২ ॥ সোভিয়েট এবং যুগোশ্লাভ পার্টির মুখপাত্রদের বক্তব্য

১. A. Dyakov, "The New British Plan for India." New Times (13.6.47), Pp. 12-15 ২. Communism in India. P. 253 ৩. E. Zhukov, 'On th Situation in India,' Mirovoc Khoziaistvo (July, 1947), Pp. 3-14. Quoted in The Communism in India. P. 254-55 ৪. Communism in India. Pp. 256-57 ৫. ঐ। Pp 258-59
৬. ঐ P. 529 ৭. ঐ P. 259

৩ ॥ নেহরু সম্পর্কে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নোতুন সিদ্ধান্ত

১. Peoples Age, VI (15.8.47) P. 20
২. Communism in India. P. 265
৩. Edvard Kardelj, Problems of International Development : A Marxist Analysis (Bombay : Peoples Publishing House, 1947 ৪. Commuuism in India.

P. 263 ৫. ঐ। P. 263 ৬. Peoples Age, VI (7.12.47) P. 1

৪ ॥ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস

১. Cammunism in India. P. 271 ২. ঐ। P. 271 ৩. ঐ। ৪. ঐ। P. 272 ৫. ঐ। ৬. Peoples Age, VI (30.11.47), P. 10 ৭. Communism in India, P. 272 ৮. Peoples Age, Supplement, VI (21.4.48) P. 3 ৯. Communism in India, P. 273 ১০. ঐ। ১১. ঐ। ১২. ঐ। ১৩. ঐ। P. 273-74 ১৪. People's Age, VI (14.4.48), P. 10 Communism in India, P. 274-75 ১৫. Communism in India, P. 274

৫ ॥ পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি

১. রণেশ দাশগুপ্ত। ২. ঐ। ৩. রণেশ দাশগুপ্ত, শহীদুল্লাহ কায়সার। ৪. আবদুল হক, রণেশ দাশগুপ্ত, মুনীর চৌধুরী : ৫. ঐ। ৬. ঐ। ৭. রণেশ দাশগুপ্ত, মুনীর চৌধুরী। ৮. রণেশ দাশগুপ্ত। ৯. ঐ। ১০. মুনীর চৌধুরী, রণেশ দাশগুপ্ত। ১১. ঐ। ১২. রণেশ দাশগুপ্ত। ১৩. মুনীর চৌধুরী, রণেশ দাশগুপ্ত। ১৪. ঐ। ১৫. ঐ। ১৬. ঐ। ১৭. রণেশ দাশগুপ্ত। ১৮. মুনীর চৌধুরী, রণেশ দাশগুপ্ত। ১৯. রণেশ দাশগুপ্ত। ২০. রণেশ দাশগুপ্ত, সমর সেন, আবদুল হক, শহীদুল্লাহ কায়সার। ২১. সমর সেন, রণেশ দাশগুপ্ত। ২২. মুনীর চৌধুরী, সমর সেন, আবদুল হক, রণেশ দাশগুপ্ত।

৬ ॥ জননিরাপত্তা আইন ও সরকারী দমননীতি

১. নওবেলাল। ২২.৫.৪৯ ২. ঐ। ১৯.৫.৪৯। ৩. ঐ। ২৭.১০.৪৯ ৪. ঐ। ৫. ঐ। ৬. ঐ। ৭. ঐ। ২৩.২.৫০ ৮. ঐ। ১৩.৪.৫০ ৯. নওবেলালের ২৭.৪.৫০ তারিখের সম্পাদকীয়তে উদ্ধৃত। ২০। ঐ।

৭ ॥ জেল নির্যাতন ও অনশন ধর্মঘট

1. East Bengal Legislative Assembly Proceedings, Third

Session, 1849 Vol. III. No. 4. P. 51 ২. ঐ। P. 50
৩. ঐ। ৪। ঐ। P. 52 ৫. ঐ। P. 53 ৬. মারুফ হোসেন ৭. রণেশ দাশগুপ্ত ৮. ঐ। ৯. ঐ।
১০। ঐ। ১১. E. B. Assembly Procedings, Third Session, 1949 Vol III No. 4, P. 54 ১২. রণেশ দাশগুপ্ত ১৩. E. B. A. Proceedings Third Session, 1949, Vol III ; No. 4 p. 54
১৪. ঐ। ১৫. রণেশ দাশগুপ্ত। ১৬. আবদুল হক। ১৭. মারুফ হোসেন
১৮. ঐ। ১৯. ঐ। ২০. আবদুল হক, রণেশ দাশগুপ্ত।
২১. রণেশ দাশগুপ্ত। ২২. তাজউদ্দীনের ডায়েরি। ১.৬.৪৯
২৩. রণেশ দাশগুপ্ত ২৪. আবদুল হক ২৫. নওবেলাল। ৯.৬.৪৯
২৬. ঐ। ২৭. E. B. Legislative Assembly Proceedings Fourth Session 1949-50, Vol IV-No 5 Pp. 94-94
২৮. রণেশ দাশগুপ্ত। ২৯. ঐ ৩০. ঐ। ৩১. আবদুল হক।
৩২. রণেশ দাশগুপ্ত। ৩৩. রণেশ দাশগুপ্ত, মারুফ হোসেন।
৩৪. রণেশ দাশগুপ্ত ৩৫. রণেশ দাশগুপ্ত, মারুফ হোসেন। ৩৬. ঐ।
৩৭. মারুফ হোসেন। ৩৮. মারুফ হোসেন, রণেশ দাশগুপ্ত।
৩৯. ঐ। ৪০. E. B. Legislative Assembly Proceedings. Fourth Sessson, 1949-50 Vol IV-No. 5 P. 95
৪১. রণেশ দাশগুপ্ত, মারুফ হোসেন। ৪২. রণেশ দাশগুপ্ত।
৪৩. রণেশ দাশগুপ্ত। ১৪. ঐ। ৪৪. রণেশ দাশগুপ্ত, মারুফ হোসেন।
৪৫. ঐ। ৪৬. রণেশ দাশগুপ্ত ৪৭. F B. Legislative Assembly Proceedings, Fourth Session, 1949-50, Vol V-No. 5, p. 93-94 ৪৮. ঐ। P. 95 ৪৯. ঐ। P. 95-96 ৫০. দৈনিক আজাদ। ৮.১.৫০ ৫১. রণেশ দাশগুপ্ত, মারুফ হোসেন। ৫২. ঐ। ৫৩. রণেশ দাশগুপ্ত।
৫৪. ঐ। ৫৫. আবদুল হক। ৫৬. রণেশ দাশগুপ্ত। ৫৭. ঐ।

৮ ॥ পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন এলাকায় কৃষক সংগ্রাম

১. নওবেলাল। ১.৯.৪৯ ২. ঐ। ৩. ঐ। ৪. ঐ।
৫. ঐ। ৬. ঐ। ৭. ঐ। ৮. ঐ। ৯. ঐ।
১০. ঐ। ১১. নওবেলাল। ৮.৯.৪৯

৯ ॥ নাচোল কৃষক বিদ্রোহ এবং পরবর্তী নির্যাতন

১. দৈনিক আজাদ। ১২.১.৫০ ২. ঐ। এবং আজহার হোসেন
৩. আজাহার হোসেন। ৪. আজাদ। ১২.১.৭০। ৫. আজাহার হোসেন। ৬. ঐ। ৭. আজাদ। ১২.১.৭০। ৮. ঐ।
৯. আজাহার হোসেন। ১০. আজাহার, আবদুল হক, রণেশ দাশগুপ্ত।
১১. ঐ। ১২. আবদুল হক। ১৩. আজাহার হোসেন।
১৪. আবদুল হক। ১৫. ঐ। ১৬. ঐ। ১৭. ঐ।
১৮. E. B. Legislative Assembly Proceedings, Fourth Session 1949-50. Vol, IV. No. 6.2.50, P. 12
১৯. ঐ। ২০. ঐ। ২১. ঐ। ২২. ঐ। ২৩. ঐ। P. 13-19 ২৪. ঐ। P. 15 ২৫. ঐ। P. 61
২৬. ঐ। P. 19

১০ ॥ রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে গুলিবর্ষণ ও রাজবন্দী হত্যা

১. আবদুল হক। ২. আবদুল হক। আবদুশ শহীদ—'খাপরা ওয়ার্ডে ২৪শে এপ্রিল।'—'গণশক্তি' ২৬.৪.৭০ ৩. ঐ।
৪. ঐ। ৫. আবদুল হক ৬. ঐ। ৭. ঐ। ৮. আবদুশ শহীদ—'খাপরা ওয়ার্ডে ২৪শে এপ্রিল'। ৯. ঐ। ১০. ঐ।
১১. ঐ। ১২. আবদুল হক ১৩. ঐ। ১৪. ঐ।
১৫. ঐ। ১৬. আবদুশ শহীদ,—খাপরা ওয়ার্ডে ২৪শে এপ্রিল। এবং শফিউদ্দীন আহমদ। ১৭. ঐ। ১৮. ঐ।
১৯. ঐ। ২০. শফিউদ্দীন আহমদ। ২১. আবদুশ শহীদ, আবদুল হক, শফিউদ্দীন আহমদ ২২. শফিউদ্দীন আহমদ।
২৩. আবদুল হক। ২৪. আবদুল শহীদ, শফিউদ্দীন, আবদুল হক।
২৫. আবদুল হক। ২৬. শফিউদ্দীন আহমদ। ২৭. ঐ।
২৮. আবদুল হক। ২৯. আবদুল হক, শফিউদ্দীন। ৩০. আবদুল হক।
৩১. সত্যেন সেন। গ্রাম বাংলার পথে পথে; পৃষ্ঠা: ৭৬। এবং আবদুল হক। ৩২. আবদুল হক, আবদুশ শহীদ, শফিউদ্দীন আহমদ। ৩৩. ঐ।

১১ ॥ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির উপর মাও সেতুঙ ও চীনা লাইনের প্রভাব

১. Communism in India by Overstreet and Windmiller.